বিশ্ব নবীর সাহাবী

৪

তালিবুল হাশেমী

বিশ্ব নবীর সাহাবী

৪র্থ খণ্ড

তালিবুল হাশেমী

অনুবাদ ঃ আবদুল কাদের

আধুনিক প্রকাশনী

ঢাকা-চট্টগ্রাম-খুলনা

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ২০৭

২য় প্রকাশ

রজব	১৪৩০
আষাঢ়	১৪১৬
জুলাই	২০০৯

বিনিময় : ১৮৫.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

خیر البشرکے تیس جان نثار -এর বাংলা অনুবাদ

BISHA NABIR SAHABI-4th Volume by Talibul Hashemy. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Price : Taka 185.00 Only.

অনুবাদকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ। 'বিশ্বনবীর সাহাবী'র চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হলো। এক বছর আগেই খণ্ডটি প্রকাশিত হওয়ার নির্ধারিত কর্মসূচী ছিল। কাগজ সংকটের কারণে প্রকাশে এই বিলম্ব ঘটলো। এ ব্যাপারে আধুনিক প্রকাশনী কর্তৃপক্ষ অসহায় ছিলেন। আশা করি, পাঠকবর্গ বিষয়টি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।

'বিশ্বনবীর সাহবী'র চতুর্থ খণ্ডে ৩০জন সাহাবীর জীবনী স্থান পেয়েছে। এই সাহাবীদের জীবনীও আমাদের জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে অনুকরণীয় আদর্শ। আল্লাহ পাক আমাদেরকে তাদের জীবনী থেকে যথার্থ শিক্ষা গ্রহণের তাওফিক প্রদান করুন, এই মুনাজাতই আমরা করি।

অনুবাদকের ক্ষেত্রে এবং মুদ্রণজনিত কোন ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে সহৃদয় পাঠকবর্গ অবশ্যই আমাদের গোচরীভূত করবেন। আমরা পরবর্তীতে তা শুধরে নেওয়ার চেষ্টা করবো। আল্লাহ পাক আমাদের এই প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমীন।

ঢাকা, ৩রা মাঘ, ১৪০১ সাল।
১৪ই শাবান, ১৪১৫ হিজরী।
১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৯৫ সন।

বিনয়াবনত
আবদুল কাদের

সূচীপত্র

১। হযরত যায়েদ (রা) বিন হারিছা	৯
২। হযরত যোবায়ের (রা) ইবনুল আওয়াম	২৮
৩। হযরত মিকদাদ (রা) বিন আমর (আল আসওয়াদ)	৪৮
৪। হযরত মুসয়াব (রা) বিন উমায়ের	৬২
৫। হযরত আবু যার গিফারী (রা)	৭৪
৬। হযরত সালমান ফারসী (রা)	৯২
৭। হযরত ইবনে উম্মে আবদ (রা) ফকিহুল উম্মাত	১০৭
৮। হযরত হুজায়ফা (রা) ইবনুল ইয়ামান—"সাহিবুস সির"	১২৫
৯। হযরত খাব্বাব (রা) বিন আরাত	১৩৯
১০। হযরত উতবা (রা) বিন গাযওয়ান	১৪৯
১১। হযরত উসমান (রা) বিন মাজউন	১৬২
১২। হযরত সোহায়েব রুমী (রা)	১৭৪
১৩। হযরত আবু আবদুল্লাহ সালেম (রা)	১৮২
১৪। হযরত তোফায়েল জুন্নর (রা)	১৮৯
১৫। হযরত সায়াদ (রা) বিন মুয়াজ	১৯৮
১৬। হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা)	২১৪
১৭। হযরত খোবায়েব আনসারী (রা)	২৩৬
১৮। হযরত উসায়েদ (রা) বিন হুজায়ের আশহালী	২৫১
১৯। হযরত মুছান্না (রা) বিন হারিছা শাইবানী	২৬৭
২০। হযরত জিরার (রা) বিন আযওয়ার আসাদী	২৯৩
২১। হযরত আদি (রা) বিন হাতেম তাই	৩১০
২২। হযরত জারির (রা) বিন আবদুল্লাহ আল বাজলী	৩২০
২৩। হযরত সাখার (রা) বিন হারব—কুরাইশ সেনাপতি	৩৩৫
২৪। হযরত সাঈদ (রা) বিন আমের	৩৬৪
২৫। হযরত সোহায়েল (রা) বিন আমর	৩৭১
২৬। হযরত ছাবিত (রা) বিন কায়েস আনসারী	৩৮৮
২৭। হযরত উমায়ের (রা) বিন সায়াদ	৩৯৭
২৮। হযরত আমর (রা) বিন উমাইয়া জুমরী	৪০৬
২৯। হযরত আবু তালহা যায়েদ (রা) বিন সাহাল আনসারী	৪১৯
৩০। হযরত হারিছ (রা) বিন রবয়ী	৪৩১
৩১। গ্রন্থপঞ্জী	৪৪১

بسم الله الرحمن الرحيم

হযরত যায়েদ (রা) বিন হারিছা

রাসূলের (সা) ইন্তেকালের বেশ কিছু বছর পরের ঘটনা। একদিন ফারুকে আ'জমের জালিলুল কদর পুত্র হযরত আবদুল্লাহ (রা) মসজিদে নববীর এক কোণে একজন যুবককে দেখলেন। তার কপাল সৌভাগ্যের আলোয় এমনভাবে ঝলমল করছিল যে, বার্ধক্যপীড়িত আবদুল্লাহ'রও তার প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হলো। পাশেই বসা ছিলেন আবদুল্লাহ বিন দিনার। তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "এই যুবকটি কে? হায় সে যদি আমার নিকট আসতো।"

এক ব্যক্তি বললেন, "আবু আবদুর রহমান! আপনি কি তাকে চিনেন না। সে হলো যায়েদের (রা) পুতা মুহাম্মাদ (র) বিন উসামা (রা)। "হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন ওমর এই কথা শুনে শ্রদ্ধায় মাথা নত করলেন এবং হাত দিয়ে মাটি তন্নতন্ন করে খুঁজতে লাগলেন। অতপর বললেন, "রাসূলুল্লাহ (সা) যদি তাঁকে দেখতেন তাহলে (তার পিতা ও দাদার মত) তাকেও ভাল বাসতেন।"

একথাগুলো বলতে বলতে তাঁর গলার স্বর ধরে এলো এবং চোখ দিয়ে অবলীলাক্রমে অশ্রু ঝরে পড়তে লাগলো, সে সময় মুহাম্মাদের (র) দাদা যায়েদ (রা) বিন হারিছার সঙ্গে সাইয়েদেনা মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ'র (সা) ভালবাসা এবং যায়েদ (রা) বিন হারিছার নিজের প্রভুর প্রতি গভীর সম্পর্কের কথা তাঁর স্মরণ হলো। তিনি বিচলিত হয়ে পড়লেন। তিনিই ছিলেন যায়েদ (রা) বিন হারিছা। যিনি প্রিয় নবীকে (সা) ভাল বাসতেন এবং প্রিয় নবীর (সা) নিকট তিনিও ছিলেন অত্যন্ত প্রিয়। তাঁর জীবনের অসংখ্য দিন-রাত রহমতে আলমের (সা) খিদমতে অতিবাহিত হয়েছিল। তাঁর প্রসঙ্গে হুজুর (সা) বলেছিলেন ঃ "আমি যায়েদের উত্তরাধিকারী এবং যায়েদ আমার উত্তরাধিকারী।"

তিনি এক সময় রাসূলের (সা) পুত্র [ইবনে মুহাম্মাদ (সা)] নামে মশহুর ছিলেন। এ জন্যই তাঁর সন্তান-সন্ততি দেখে বড় বড় মর্যাদাবান সাহাবী (রা) পর্যন্ত অস্থির হয়ে পড়তেন এবং রাসূলের পবিত্র যুগের কথা তাঁদের স্মরণ হতো। হযরত যায়েদ (রা) নিজের সকল কিছু প্রিয় নবীর (সা) ভালবাসায় উৎসর্গ করেছিলেন।

ইয়েমেনের একটি সম্ভ্রান্ত কবিলা বনু কাজায়া'র (বনু কালাব) সরদার হারিছা বিন শারাহিলকে আল্লাহ তায়ালা প্রভূত নিয়ামত দিয়ে অভিষিক্ত

করেছিলেন। তার গোত্রের বনু মায়ানের এক নেক স্বভাব মহিলা সা'দা বিনতে ছালাবা তার সহধর্মীনি ছিলেন। কয়েকটি সন্তানও তাকে দেয়া হয়েছিল এবং ধনসম্পদেরও কোন কমতি ছিল না। স্বামী-স্ত্রী এবং তিন সন্তান আসমা, জাবালা এবং যায়েদ সমন্বয়ে গঠিত এই ছোট পরিবার হাসি-খুশীতে দিন অতিবাহিত করছিল। হঠাৎ করে বাতাসের গতি পরিবর্তিত হয়ে গেল। সা'দা একবার নিজের ৮ বছরের পুত্র যায়েদকে সঙ্গে নিয়ে এ কাফেলার সহযাত্রী হয়ে নিজের মাতা-পিতার বাড়ী যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে বনি কাইন বিন জাসারের লোকজন কাফেলার ওপর অতর্কিত হামলা চালায়। মাল ও সামান ছাড়া তারা সা'দার কলিজার টুকরাকে ছিনিয়ে নিয়ে গায়েব হয়ে যায়। নিজের নয়নমণিকে এভাবে ছিনিয়ে নেয়ায় হতভাগী মায়ের দুনিয়া অন্ধকার হয়ে আসে। তিনি চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কাঁদতে লাগলেন। তাঁর কান্না ও ফরিয়াদে আসমান এবং যমীনের কলিজা ফেটে যাচ্ছিল। (অন্য রেওয়ায়াত অনুযায়ী) হযরত যায়েদকে (রা) অপহরণের সময় তাঁর মাতা সা'দা ওফাত পেয়েছিলেন। তিনি দুই পুত্র জাবালা এবং যায়েদ ও কন্যা আসমাকে সাথে নিয়ে নাইওর গিয়েছিলেন। সা'দার মৃত্যু ঘটলে হারিছা আসমা এবং জাবালাকে নিজের নিকট নিয়ে যান। কিন্তু যায়েদ নানার কাছেই রয়ে যান। কিছুদিন পর বনু ফাযারাহর লোকজন তায় গোত্রের ওপর অতর্কিতে হামলা চালায় এবং মাল আসবাব এবং যায়েদ (রা) সহ লোকজনকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। হারিছা যখন প্রাণাধিক পুত্রের অপহরণের খবর পেলেন তখন শোকে দুঃখে পাগল হয়ে গেলেন। গ্রামে গ্রামে এবং অলিতে গলিতে যায়েদ যায়েদ বলে ডেকে ফিরলেন। মরুভূমি, জঙ্গল ও পাহাড় সকল স্থানেই তন্নতন্ন করে খুঁজলেন। কিন্তু যায়েদের কোন সন্ধান পেলেন না। পুত্র থেকে বিচ্ছিন্ন পাগল পিতা জীব জন্তু, বৃক্ষ ও পাথর সবার নিকটই পুত্রের কথা জিজ্ঞাসা করতেন। উত্তপ্ত লু হাওয়া এবং ভোরের সমীরণের নিকটও তার এই আশা ছিল যে, তারা যেন আল্লাহর ওয়াস্তে তার নয়নমণির খবর এনে দেয়। পুত্রের বিচ্ছিন্নতার কথা তার জপমালা হয়ে গিয়েছিল। তিনি যখন অপহৃত পুত্রের জন্য ক্রন্দন করতেন তখন শুধু বন্ধুরাই নয় শত্রুও কেঁদে দিতো।

"আমি যায়েদের জন্য কেঁদে কেটে সারা হলাম। কিন্তু জানি না সে কোথায় গেছে। জানি না, সে জীবিত আছে কিনা। জীবিত থাকার আশার আলো জ্বালিয়ে রাখবো কিনা। না সে মৃত্যুর পেয়ালা পান করেছে। খোদার কসম! আমি বার বার জিজ্ঞেস করেছি। তা সত্ত্বেও আমি জানি না যে তুমি নরম যমীনের আস্তরণে ডুবে গেছ কিনা অথবা পাহাড় তোমাকে গিলে ফেলেছে। হায়! আমি যদি জানতে পেতাম যে তোমার প্রত্যাবর্তন কখনো সম্ভব। (তুমি

কি জানো যে) তোমার প্রত্যাবর্তনে আমার দুনিয়া আবাদ হবে। সূর্যোদয় আমাকে তার কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং সূর্যাস্ত পুনরায় তার কথা জীবন্ত করে তোলে। বসন্তের সমীরণ তার বিচ্ছিন্নতার আগুন ভড়কে দেয়। আহ! আমি কত দুঃখে নিমজ্জিত হয়েছি। হে আমার পুত্র! আমি তোমার সন্ধানে দুনিয়ার কোণে কোণে ফিরবো। তোমার সন্ধানে উট ক্লান্ত হয়ে পড়লেও আমি ক্লান্ত হবো না। অথবা আমি যদি মারাও যাই। প্রত্যেক মানুষই মরণশীল। যদিও আশার মরীচিকা তাকে ধোঁকা দিয়ে চলেছে। আমি কায়েস এবং ওমরকে ওসিয়ত করছি। অতপর ইয়াযিদকে [ইয়াযিদ ও জাবালা যায়েদের(রা) সতালো ভাই ছিলেন] এবং তারপর জাবালাকে। ওসিয়তটি হলো তারা যেন যায়েদের সন্ধান অব্যাহত রাখে।" অসংখ্য রাত ও দিন এভাবেই কেটে গেল।

অন্যদিকে হারিছা বিন শারাহিলের অপহৃত পুত্রের জন্য আল্লাহর কুদরত বিরাট মর্যাদা নির্ধারণ করে রেখেছিলেন। এই মর্যাদাও এমন যে তাতে ফেরেশতারাও ঈর্ষা করতো।

অপহরণকারীরা যায়েদকে (রা) স্নেহময়ী মাতার কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ওকাযের বাজারে নিয়ে যায়। সেখানে উম্মুল মু'মিনীন খাদিজাতুল কুবরার (রা) ভ্রাতুষ্পুত্র হাকিম বিন জাযাম তাঁকে চারশ দিরহামের বিনিময়ে কিনে নেয় এবং মক্কা ফিরে এসে ফুফুর নিকট হস্তান্তর করে। হযরত খাদিজার (রা) সঙ্গে যখন সারওয়ারে আলমের (সা) বিয়ে হয় তখন তিনি (সা) সেখানে যায়েদকে (রা) দেখতে পান। সেই নওজোয়ান ছেলের সুন্দর চরিত্র তাঁর খুব পসন্দ হলো। তিনি তাঁকে হযরত খাদিজার (রা) নিকট থেকে চেয়ে নেন। এমনিভাবে এই বুলন্দ সৌভাগ্যের যুবক ১৫ বছর বয়সে এমন এক পবিত্র ব্যক্তিত্বের গোলামীর ভাগ্য লাভ করেন যিনি ছিলেন দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ মানব। এ ধরনের গোলামের সৌভাগ্যের আন্দাজ কে করতে পারে? যায়েদের (রা) সুন্দর চরিত্র এবং সীমাহীন নিষ্ঠা হুজুরের (সা) স্নেহধন্য করেছিল। যায়েদের প্রতি হুজুরেরও (সা) এমন ভালবাসা সৃষ্টি হয়েছিল যে, তার দর্শন ছাড়া তিনি মুহূর্তকালও শান্তিতে থাকতে পারতেন না।

সেই যুগে এক বছর বনু কালাবের কতিপয় ব্যক্তি হজ্জের জন্য মক্কা এলো। বনু কাজায়া এবং তাদের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। একদিন বনু কালাব হারিছা বিন শারাহিলের সেই ক্রন্দন গাথা অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে উচ্চারণ করছিলো। সে সময় যায়েদ (রা) সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি হজ্জবুদ্ধি

হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। বনু কালাবের লোকদের দৃষ্টিও তার ওপর পড়লো। তারা তৎক্ষণাৎ চিনে ফেললো যে এই হলো সেই হারিছার অপহৃত পুত্র। তারা যায়েদকে (রা) নিকটে ডেকে নাম ও অন্যান্য বিষয় জিজ্ঞেস করলো। তাতে তাদের ধারণা সঠিক বলে প্রমাণিত হলো। তখন তারা যায়েদকে (রা) তাঁর পিতার দুঃখের কাহিনী শুনালেন এবং তাঁকে তাদের সঙ্গে যেতে বললেন। কিন্তু যায়েদের (রা) রাসূল (সা) প্রেম এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, মাতা, পিতা ও আত্মীয়-স্বজনের ভালোবাসা তার সামনে কিছুই ছিল না। তিনি বনু কালাবের হাজীদেরকে বললেন ঃ

"বুজর্গ ও ভাইয়েরা আমার। অনুগ্রহপূর্বক আমার শোকার্ত খান্দানকে আমার এই পয়গাম পৌঁছে দিবেন যে, যদিও আমি তাদের থেকে দূরে রয়েছি কিন্তু নিজের কওমের প্রতি ভালবাসা পোষণ করি। আমি খানায়ে কাবার মাশয়ারে হারামের নিকট থাকি। সেই দুঃখ ও শোক ভুলে যাও যা তোমাদেরকে রুগ্ন করে রেখেছে এবং উটের মত চলে দুনিয়ার মাটি তন্নতন্ন করে বেড়িও না। খোদার শোকর যে আমি বনী মায়াদের এক সম্রান্ত খান্দানভুক্ত। যারা বংশ পরিক্রমায় মর্যাদাশালী।"

এ সকল হাজী ফিরে গিয়ে যখন হারিছা বিন শারাহিলকে তার অপহৃত পুত্রের খবর এবং তার পয়গাম পৌঁছে দিলেন তখন নিরাশ ও শোকার্ত পিতা আনন্দের আতিশয্যে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লো। জ্ঞান ফিরতেই নিজের ভাই কাব এবং অন্য পুত্র জাবালাকে সঙ্গে নিয়ে তৎক্ষণাৎ মক্কা রওয়ানা হলো। কয়েক দিনের দূরত্ব কয়েক ঘন্টায় অতিক্রম করে প্রিয় নবীর (সা) খিদমতে পৌঁছে অবলীলাক্রমে কান্না শুরু করে দিল। বছরের পর বছর ধরে নিজের নয়নমণিকে দেখতে না পাওয়া পিতা আবেগাপ্লুত হয়ে হিচকী টেনে টেনে কান্নারত অবস্থায় রহমতে আলমের (সা) খিদমতে এই আরজ করলো ঃ

"হে সাহেবে কোরাইশ! হে ইবনে আবদুল মুত্তালিব! হে হেরেমের মুতাওয়াল্লি। হে গরীবদের অভিভাবক। হে মুসিবতজাদাদের বন্ধু। আমি একজন মুসিবতজাদা মানুষ। আল্লাহর ওয়াস্তে আমার কলিজার টুকরোকে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ে দিন এবং তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিন। তার আযাদীর জন্য আমি আমার সকল সম্পদ দিয়ে দিতে প্রস্তুত আছি।"

হুজুর (সা) দুঃখ প্রপীড়িত ও শোকার্ত পিতাকে সাহস দিলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন ঃ "তোমার কলিজার টুকরো কে?" সে বললো, "যায়েদ"।

হুজুর (সা) বললেন ঃ "যায়েদ যা পসন্দ করবে তাই আমি মেনে নেব। যদি সে তোমাদের সঙ্গে যেতে চায় তাহলে তাতে আমার কোন আপত্তি নেই। আমি কোন ফিদিয়া গ্রহণ ছাড়াই তাকে তোমাদের হাওয়ালা করে দিব। আর যদি সে আমার সঙ্গে থাকতে চায় তাহলে আমি এমন নই যে, তাকে জোরপূর্বক পাঠিয়ে দিব।"

বস্তুত ফায়সালার জন্য যায়েদকে (রা) ডাকা হলো। তিনি এক নজরেই নিজের পিতা, চাচা এবং ভাইকে চিনে ফেললেন। কিন্তু হুজুরের (সা) মর্যাদা ও আদবের কথা খেয়াল রেখে তাদের দিকে মনোযোগী হলেন না। হুজুর (সা) জিজ্ঞাসা করলেন ঃ

"যায়েদ, এরা কারা তা জানো?"

তিনি আরজ করলেন ঃ "জী হ্যাঁ। ইনি আমার পিতা। ইনি আমার চাচা এবং ইনি আমার ভাই।"

হুজুর (সা) বললেন ঃ "ওঠো এবং তাঁদেরকে সালাম করো।"

যায়েদ (রা) নির্দেশ পেতেই উঠে দাঁড়ালেন এবং তাঁদের সঙ্গে মিলিত হলেন। এ সময় বিচ্ছিন্ন পিতা নিজের হারিয়ে যাওয়া "কলিজার টুকরাকে" বুকে চেপে ধরে এত কাঁদলেন যে, দাড়ি ও কাপড় ভিজে গেল। এটা এমন এক ভাবাবেগের দৃশ্য ছিল যে, যেই তা দেখেছিল সেই না কেঁদে পারেননি। আবেগ যখন কিছুটা ঠাণ্ডা হলো তখন হুজুর (সা) বললেন ঃ "যায়েদ, তোমার পিতা এবং চাচা তোমাকে নিতে এসেছেন। আমি তোমাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিলাম। তুমি যদি তাঁদের সঙ্গে যেতে চাও তাহলে উৎসাহের সঙ্গে যেতে পার।"

হযরত যায়েদ কাল বিলম্ব না করে জবাব দিলেন ঃ

"হে আমার প্রভু! আপনার চেয়ে আমি কাউকে অগ্রাধিকার দিতে পারি না। আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে আপনার কদম থেকে বিচ্ছিন্ন করবেন না।"

এ কথা শুনে হারিছা বিন শারাহিল হতভম্ব হয়ে পড়লেন। তিনি যায়েদকে (রা) বললেন ঃ

"যায়েদ, আফসোস! তুমি আযাদী, পিতা, চাচা, ভাই, খান্দান এবং স্বদেশভূমির চেয়ে গোলামীকে অগ্রাধিকার দিচ্ছ।"

যায়েদ বললেন ঃ "আমার প্রভু আমার উপর এত মেহেরবান এবং দয়ালু যে আপন মাতা-পিতাও নিজের সন্তানের উপর এত দয়ালু ও স্নেহপরায়ণ হয় না।

এ জন্য আমি তার গোলামীকে হাজার আযাদীর উপর অগ্রাধিকার দিয়ে থাকি।"

হযরত যায়েদের (রা) জবাব শুনে হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সা) এত খুশী হলেন যে, তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁকে স্বাধীন করে দিলেন। অতঃপর তাঁর হাত ধরে কা'বা শরীফে তাশরীফ নিলেন এবং কুরাইশের সাধারণ সমাবেশে ঘোষণা করলেন ঃ

"হে মানুষেরা! সাক্ষী থেকো যে, আজ থেকে যায়েদ আমার পুত্র। আমি তার উত্তরাধিকারী এবং সে আমার উত্তরাধিকারী হবে।"

হারিছা, কাব এবং জাবালা হুজুরের (সা) এই স্নেহময়তা দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়লেন। তাঁরা তাঁর (সা) উদার হৃদয় ও শরাফতীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন এবং হৃষ্টচিত্তে স্বদেশ ফিরে গেলেন।

অন্য এক রেওয়ায়াতে আছে যে, হুজুর (সা) অনেক পূর্বেই হযরত যায়েদকে (রা) নিজের পুত্র বানিয়ে নিয়েছিলেন। যায়েদের (রা) পিতা ও চাচা যখন মক্কা এলেন তখন হুজুর (সা) যায়েদকে (রা) পুত্র বানানোর ঘোষণা পুনরুল্লেখ করেছিলেন মাত্র। এই ঘটনার পর লোকজন হযরত যায়েদকে (রা) "যায়েদ বিন মুহাম্মাদ" বলতে লাগলো।

এসব ঘটনা নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বেকার। রহমতে আলম হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সা) যখন নবুওয়াতের আসনে সমাসীন হলেন তখন হযরত খাদিজাতুল কুবরা (রা), হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) এবং হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুর সঙ্গে হযরত যায়েদও কোন সংশয় ও সন্দেহ ছাড়াই অবিলম্বে হুজুরের (সা) উপর ঈমান আনয়ন করেন। সাধারণভাবে মশহুর আছে যে, গোলামদের মধ্যে সর্বপ্রথম হযরত যায়েদ (রা) ঈমান এনেছিলেন। কিন্তু তিনি গোলাম ছিলেন না। বরং হুজুর (সা) বেশ কিছুদিন পূর্বেই তাঁকে আজাদ করে দিয়েছিলেন। এ জন্য ইসলাম গ্রহণে অগ্রগণ্যতার মর্যাদায় তিনি উল্লিখিত তিন বুজর্গের সমান সমান। [এই প্রসঙ্গে ইমাম জুহরী লিখেছেন যে, যায়েদ (রা) বিন হারিছার পূর্বে অন্য কেউ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন বলে আমাদের জানা নেই। তিনি সম্ভবত একথাই বলতে চান যে, হযরত যায়েদই (রা) সর্বপ্রথম ঈমান এনেছিলেন। কিন্তু জমহুর ওলামার মত হলো ঃ হযরত খাদিজাতুল কুবরা (রা), হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা), হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু এবং হযরত যায়েদ (রা) এই চার ব্যক্তিরই ইসলামে অগ্রগণ্যতার মর্যাদা রয়েছে।]

হুজুরে আকরাম (সা) প্রিয় চাচা শেরে খোদা হযরত হামযার (রা) সংগে তাঁর ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই দুই ভাই পরস্পরকে খুব ভাল বাসতেন। হযরত হামযা (রা) যখন কোন যুদ্ধে যেতেন তখন হযরত যায়েদকে (রা) নিজের ওসি নিযুক্ত করে যেতেন। উভয়ের গভীর সম্পর্কের পরিমাণ সহীহ বুখারীর এই হাদীস থেকে অনুমান করা যায়। হাদীসটিতে বলা হয়েছে ঃ হুদায়বিয়া সন্ধির পর হুজুর (সা) মক্কা থেকে রওয়ানা হলেন। এ সময় হযরত হামযার (রা) কন্যা উমামাহ (রা) "হে চাচা, হে চাচা" বলতে বলতে দৌড়াতে লাগলো। হযরত আলী (রা) তাঁকে কোলে তুলে নিলেন এবং পরে তার হাত ধরে হযরত ফাতিমাতুজ জোহরার (রা) নিকট দিলেন এবং বললেন যে, এ হলো তোমার চাচার কন্যা। এই কথায় হযরত জাফর (রা) বিন আবি তালিব এবং হযরত যায়েদ (রা) বিন হারিছা নবীর (সা) দরবারে দাবী করে বসলেন যে, উমামাহর (রা) তাঁদের নিকট থাকা উচিত। হযরত জাফর (রা) বলতেন যে, সেতো আমার চাচার কন্যা এবং তার আপন খালা(আসমা বিনতে আমিস) আমার স্ত্রী। এমনিভাবে হযরত আলীও (রা) উমামার (রা) চাচার পুত্র হওয়ার ভিত্তিতে নিজের অধিকার দাবী করতেন। কিন্তু হযরত যায়েদ (রা) বলতেন যে, "সে আমার ভাইয়ের মেয়ে।" প্রিয়নবী (সা) হযরত জাফরের (রা) পক্ষে ফায়সালা দিয়েছিলেন। কেননা তাঁর স্ত্রী ছিলেন উমামার (রা) আপন খালা।

রহমতে আলম (সা) হযরত যায়েদকে (রা) আপন পুত্রের মত ভালবাসতেন। এ জন্য তিনি মানুষের মধ্যে "হিব্বু রাসূলিল্লাহ" উপাধিতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। হযরত যায়েদের (রা) ওপর প্রিয় নবীর (সা) সীমাহীন স্নেহ অকারণে ছিল না। বাস্তবতঃ এই জালিলুল কদর ব্যক্তিত্ব অসংখ্য গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন। অসাধারণ নিষ্ঠা, রাসূলের (সা) প্রতি গভীর ভালবাসা এবং আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের (সা) পথে জীবন কুরবান করার সীমাহীন আবেগ নবীর (সা) নিকট তাঁকে অত্যন্ত প্রিয় করে তুলেছিল। মক্কী এবং মাদানী জীবনে এমন কোন মুসিবত ও কঠোরতা ছিল না যা তিনি নিজের প্রভুর সঙ্গে সহ্য করেননি। নবুওয়াতের চতুর্থ বছরে আল্লাহর নির্দেশ মুতাবিক রাসূলে করিম (সা) যখন হকের দাওয়াত প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন এবং আরবের বিভিন্ন গোত্রকে প্রকাশ্যে হকের দিকে আহবান জানালেন তখন লাত ও উজ্জার পূজারীদের ক্রোধাগ্নি জ্বলে উঠলো এবং তারা হক পন্থীদের ওপর চরম নির্যাতন শুরু করলো। সেই ভয়াবহ যুগে বিশ্ব কয়েকবারই অবলোকন করেছে যে, বিশ্ব নবী (সা) কোন কবিলাতে হকের তাবলীগের জন্য যাচ্ছেন আর তিনি উটের ওপর নিজের পিছনে হযরত যায়েদকে (রা) বসিয়ে

রেখেছেন। হুজুর (সা) যদি পদব্রজে গমন করতেন তাহলে যায়েদও(রা) তাঁর জন্য নিজেকে উৎসর্গ করার আবেগ নিয়ে সাথে সাথে গমন করতেন।

নবুওয়াতের দশম বছরের শওয়াল মাসে প্রিয়নবী (সা) হযরত যায়েদকে(রা) সঙ্গে নিয়ে বনু বকর গোত্রে তাশরীফ নিলেন। কিন্তু তারা তাঁকে গ্রহণ করলো না। অতপর তিনি কাহতান গোত্রে গেলেন। তারাও তাঁর সঙ্গে শত্রুতামূলক আচরণ করলো। সেখান থেকে তিনি তায়েফে তাশরীফ নিলেন এবং সেখানকার তিন সরদার আবদি ইয়ালিল বিন আমর, মাসউদ বিন আমর এবং হাবিব বিন আমরকে হকের দাওয়াত দিলেন। এই তিন ভাই খুব খারাপ ব্যবহার করলো। আল্লামা ইবনে সায়াদ এবং ইবনে জারির তাবারী বর্ণনা করেছেন যে, এই তিন ব্যক্তি হুজুরকে (সা) অত্যন্ত অভদ্র ও অসৌজন্যমূলক জবাব দিল। আবদি ইয়ালিল বললো, "খোদা তোমাকে নবী বানিয়ে নিজের হাতে কাবার গিলাফ ছিন্নভিন্ন করেছে।" মাসউদ বললো, "নবী বানানোর জন্য তোমাকে ছাড়া খোদা কি আর মানুষ পেলো না।" হাবিব বললো, "যদি তুমি ঠিকই নবী হও, তাহলে তোমার বিরুদ্ধে কথা বলা অসৌজন্যমূলক কাজ। আর যদি তুমি খোদাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে থাকো তাহলে আমাকে সম্বোধন করে কথা বলার যোগ্যই নও তুমি। বরং তুমি এখান থেকে চলে যাও।" তারা শুধু একথা বলেই ক্ষান্ত হল না বরং তায়েফের কিছু ছোকরা ও আদিবাসীদেরকে রাসূলকে (সা) উত্যক্ত করার জন্য উস্কে দিল। শয়তানের এসব চ্যালা চামুণ্ডা হুজুরের (সা) দশদিন তায়েফ অবস্থানকালে প্রচণ্ড হৈ হুল্লোড় করলো। হুজুর (সা) যেদিকেই যেতেন তারা পিছু পিছু তালি বাজাতো, চীৎকার করতো, গালি দিত এবং পাথর ছুঁড়ে মারতো। হযরত যায়েদ (রা) নিজেকে হুজুরের (সা) ঢাল বানিয়ে নিতেন। তিনি এই চেষ্টাই করতেন যে নিক্ষিপ্ত পাথর বা ইট যেন রাসূলের (সা) পবিত্র দেহে না লেগে তাঁর শরীরে লাগে। কিন্তু চারদিক থেকে যখন পাথর নিক্ষিপ্ত হতে লাগলো তখন যায়েদ(রা) কতক্ষণ আর হুজুরকে (সা) রক্ষা করতে পারতেন। হুজুরও (সা) আহত হতেন এবং যায়েদও (রা)। দশম দিনে সেই হতভাগারা নির্যাতনের চরম পর্যায়ে এসে পৌঁছলো। রহমতে আলম (সা) মারাত্মকভাবে আহত হলেন এবং তাঁর পবিত্র দেহ রক্তাক্ত হয়ে পড়লো। হযরত যায়েদও (রা) জখমে জখমে অস্থির হয়ে পড়লেন। বাধ্য হয়ে হুজুরে আকরাম (সা) শহরের বাইরে আঙ্গুরের এক বাগানে আশ্রয় নিলেন। বাগানটির মালিক ছিল মক্কার অন্যতম সরদার উতবা বিন রবিয়া এবং শাইবা বিন রবিয়া। বাগানে আশ্রয় নেয়ার পর হযরত যায়েদ (রা) নিজের চাদর দিয়ে হুজুরের (সা) পবিত্র দেহের রক্ত পরিষ্কার করলেন। তারপর নিজের ক্ষত পরিষ্কার করলেন। বাগানে কিছুক্ষণ

অবস্থানের পর হুজুর (সা) হযরত যায়েদের (রা) সঙ্গে মক্কা ফিরে এলেন। হযরত যায়েদ(রা) হুজুরের (সা) সন্তুষ্টির কোন সুযোগই হাতছাড়া হতে দিতেন না। হিজরতের কয়েক বছর পূর্বে একবার রাসূলে আকরাম (সা) বলেন, "যে ব্যক্তি কোন জান্নাতী মহিলাকে বিয়ে করতে চায় সে যেন উম্মে আইমানকে(রা) বিয়ে করে।" উম্মে আইমান (রা) হুজুরের (সা) আয়া ছিলেন। তিনি তাঁকে খুব শ্রদ্ধা করতেন এবং এতো ভাল বাসতেন যে তাকে "আমার মা" বলে ডাকতেন। হযরত যায়েদ (রা) হুজুরের (সা) সন্তুষ্টির জন্য অবিলম্বে হযরত উম্মে আইমানকে (রা) বিয়ে করেন। বাস্তবত তিনি হযরত যায়েদের (রা) চেয়ে বয়সে কিছুটা বড় ছিলেন।

হযরত উম্মে আইমানের (রা) গর্ভে হযরত উসামা (রা) বিন যায়েদ জন্মগ্রহণ করেন। হযরত যায়েদ (রা) এবং উম্মে আইমানের (রা) সঙ্গে সম্পর্কের ভিত্তিতে হুজুর (সা) হযরত উসামাকে (রা) এতো ভালবাসতেন যে, তিনিও "হিব্বু রাসূলিল্লাহর" উপাধিতে প্রসিদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।

বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (সা) সাহাবায়ে কিরামকে (রা) মদীনায় হিজরতের অনুমতি দিলে হযরত যায়েদও (রা) হিজরত করে মদীনা চলে গেলেন এবং ভিন্ন ভিন্ন রেওয়ায়াত অনুযায়ী হযরত কুলছুম (রা) বিন হাদাম আনসারী অথবা হযরত সায়াদ (রা) কিন খাইছামা আনসারীর মেহমান হলেন। প্রিয়নবী (সা) যখন মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনা তাশরীফ আনলেন তখন তিনি এবং হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) হযরত যায়েদকে(রা) হযরত আবু রাফে' (রা) এবং আবদুল্লাহ বিন আরিকতের সঙ্গে নিজেদের পরিবার পরিজনকে নিয়ে আসার জন্য মক্কা প্রেরণ করলেন। বস্তুত হযরত ফাতিমাতুজ জোহরা (রা), হযরত উম্মে কুলছুম (রা) উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাওদা (রা) বিনতে যাময়া, হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন আবু বকর (রা), হযরত উম্মে রুমান (রা), উন্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা) এবং হযরত আসমা (রা) বিনতে আবু বকর (রা) এসব সাহাবীর সঙ্গে মক্কা থেকে মদীনা হিজরত করেন। বদরের যুদ্ধের পর হুজুরের (সা) নির্দেশ অনুযায়ী হযরত যায়েদ (রা) পুনরায় মক্কা গমন করেন এবং তাঁর বড় কন্যা হযরত যয়নবকে (রা) সঙ্গে নিয়ে মদীনা ফিরে আসেন।

হিজরতের পাঁচ মাস পর রাসূলে আকরাম (সা) মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। এ সময় হযরত যায়েদ (রা) বিন হারিছাকে আবদুল আশহাল গোত্রের নেতা হযরত উসাইদ (রা) বিন হুজাইর আনসারীর

ইসলামী ভাই বানান। তিনিও অত্যন্ত মর্যাদাবান সাহাবী ছিলেন এবং আনসারদের সাবিকুনাল আউয়ালুনের মধ্যে গণ্য হতেন।

চতুর্থ হিজরীতে প্রিয়নবী (সা) নিজের ফুফাতো বোন হযরত যয়নব (রা) বিনতে জাহাশের বিয়ে দিয়েছিলেন হযরত যায়েদের (রা) সঙ্গে। হযরত যয়নবের (রা) মোহর হুজুর (সা) হযরত যায়েদের (রা) পক্ষ থেকে স্বয়ং আদায় করেছিলেন। এ বিয়ের পূর্বে হযরত যায়েদ (রা) নবী (সা) পরিবারের একজন সদস্য হিসেবে রাসূলের (সা) সঙ্গে থাকতেন। এরপর হুজুর (সা) তাকে পৃথক বাড়ীতে স্থানান্তর করেন এবং সংসার করার জন্য অত্যাবশ্যকীয় আসবাবপত্র দান করেন। হযরত যয়নব (রা) প্রায় এক বছর পর্যন্ত হযরত যায়েদের (রা) স্ত্রী ছিলেন। খান্দান ও নসবের ভারসাম্যহীনতা এবং প্রকৃতিগত অসাদৃশ্যের কারণে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বনিবনা হতে পারেনি। হযরত যায়েদ (রা) বার বার নবীর (সা) নিকট হযরত যয়নবের (রা) কঠোর মেযাজের অভিযোগ আনলেন। এমনকি তাঁকে তালাক দেয়ার অভিপ্রায়ও ব্যক্ত করলেন। হুজুর (সা) তাঁকে এই কাজ করতে নিষেধ করলেন। এরশাদ হলো,

أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللّٰهَ

"তুমি নিজের স্ত্রীকে নিজের নিকট রাখো (ছেড়ে দিও না) এবং আল্লাহকে ভয় কর।" (সূরায়ে আহ্‌যাব-৩৭)

হযরত যায়েদ (রা) সে সময় চুপ মেরে গেলেন। কিন্তু স্বামী স্ত্রীর মধ্যে তিক্ততা বেড়েই চললো। সম্পর্ক যখন চরম পর্যায়ে পৌছলো তখন হযরত যায়েদ (রা) হযরত যয়নবকে (রা) তালাক দিয়ে দিলেন। তাঁর ইদ্দত পুরো হলে হুজুর (সা) আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী হযরত যায়েদের (রা) মাধ্যমেই হযরত যয়নবের (রা) নিকট নিজের বিয়ের পয়গাম প্রেরণ করলেন। তিনি হযরত যয়নবকে (রা) এই পয়গাম পৌছালেন। এ সময় তিনি বললেন, "আল্লাহর পক্ষ থেকে যতক্ষণ কোন নির্দেশ না আসবে ততক্ষণ আমি কিছুই বলতে পারবো না।" একথা বলার অব্যবহিত পরই এই আয়াত নাযিল হলো ঃ

فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنٰكَهَا (الا حزاب - ٣٧)

"পরে যায়েদ যখন তার নিকট থেকে নিজের প্রয়োজন পূর্ণ করে নিলেন তখন আমরা তাকে (তালাক প্রাপ্তা মহিলাকে) তোমার সঙ্গে বিয়ে দিলাম।"

এমনিভাবে হযরত যয়নব (রা) বিনতে জাহাশ উম্মুল মু'মিনীনভুক্ত হলেন। এই বিয়ের ফলে মুনাফিক, ইহুদী ও মুশরিকরা হুজুরকে (সা) বদনাম করার

জন্য সমালোচনার তুফান বইয়ে দিল। অপবাদের ভিত্তি তারা এই বানিয়ে নিয়েছিল যে, মুহাম্মাদ (সা) তো পুত্রবধুকে বিয়ে করা হারাম বলে অভিহিত করে থাকেন। কিন্তু তিনি স্বয়ং নিজের পুত্র যায়েদের (রা) স্ত্রীর সঙ্গে বিয়ে করেছেন। তাদের এই ফিতনামূলক কথার জবাব আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে এভাবে দেয়া হয়েছে ঃ

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ ط

"(হে জনগণ!) মুহাম্মাদ, তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কারো পিতা নয়, বরং আল্লাহর রাসূল ও সর্বশেষ নবী।" (আল আহযাব- ৪০)

একথার সঙ্গে সঙ্গেই মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে ঃ

اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَاءِ هِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ

মুখ-ডাকা পুত্রদেরকে তাদের পিতার সাথে সম্পর্ক-সূত্রে ডাকো, এটাই আল্লাহর নিকট অধিক ইনসাফের কথা।" (আল আহযাব-৫)

এ নির্দেশের পর লোকজন হযরত যায়েদকে (রা) "যায়েদ (রা) বিন মুহাম্মাদ"-এর পরিবর্তে যায়েদ (রা) বিন হারিছা বলতে লাগলেন এবং মুখ-ডাকা পুত্রও আপন পুত্রের মত হয়ে থাকে এ জাহেলী ধারণা চিরকালের জন্য বাতিল হয়ে গেল।

হযরত যায়েদ (রা)–এর চরিত্রের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো জিহাদের প্রতি উৎসাহ। শৌর্যবীর্য ও বীরত্ব তাঁর শিরা উপশিরায় পূর্ণ ছিল এবং হক পথে জীবন বিলিয়ে দেয়ার আবেক সবসময়ই তার মধ্যে টগবগ করতো। তিনি একজন বিশেষজ্ঞ তীরন্দাজ ছিলেন। তীর নিক্ষেপই তাঁর শখের বস্তু ছিল। হিজরাতের পর যুদ্ধের সিলসিলা শুরু হলে বদর থেকে মাওতা পর্যন্ত সকল যুদ্ধেই হযরত যায়েদ (রা) বীরবিক্রমে যুদ্ধ করেন। মাররে ইয়াসি' যুদ্ধে যেহেতু হুজুর (সা) তাঁকে মদীনায় নিজের স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করেছিলেন সেহেতু তিনি তাতে অংশ নিতে পারেননি। নামকরা যুদ্ধসমূহে অংশগ্রহণ ছাড়া হযরত যায়েদের (রা) সাত অথবা ৯টি সামরিক অভিযানে (সারিয়্যা) নেতৃত্ব দানের সৌভাগ্য হয়েছিল। এসব অভিযানের মধ্যে কতিপয়ের বিশ্লেষণ নিম্নরূপঃ

১. সারিয়্যায়ে কারদা ঃ এই সারিয়্যাহ বা যুদ্ধ নজদের একটি ঝর্ণা 'কারদা'র নিকট বিভিন্ন রেওয়ায়াত অনুযায়ী দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় হিজরীর

জমাদিউস সানিতে সংঘটিত হয়। হযরত যায়েদের (রা) নেতৃত্বে মুসলমানরা শত্রুকে শিক্ষণীয়ভাবে পরাজিত এবং অনেক উট, মাল ও আসবাব সহ দুশমনের একজন সরদার ফুরাত বিন হাইয়ান আজলীকে গ্রেফতার করেন।

২. সারিয়্যায়ে জামুম : এই যুদ্ধকে সারিয়্যায়ে জামুহও বলা হয়ে থাকে। ৬ষ্ঠ হিজরীর রবিউস সানিতে রাসূলে আকরাম (সা) হযরত যায়েদকে (রা) বনু সুলাইমের মুকাবিলার জন্য প্রেরণ করেন। এই কবিলা মদীনা মুনাওয়ারার চার মনযিল দূরত্বে জামুম নামক খেজুর বাগানে বাস করতো। হযরত যায়েদ (রা) বনু সুলাইমকে সমূলে উৎখাত করলেন। অনেক উট এবং বকরী গনিমতের মাল হিসেবে লাভ করলেন। তাছাড়া দুশমনের অনেক লোককে গ্রেফতার করে মদীনা নিয়ে এলেন।

৩. সারিয়্যায়ে আইস : ৬ষ্ঠ হিজরীর জমাদিউল আউয়ালে হুজুর (সা) খবর পেলেন যে, কুরাইশের সামান ভর্তি একটি কাফেলা সিরিয়া থেকে ফিরে আসছে। তিনি হযরত যায়েদকে (রা) ১৭০ সওয়ারসহ সেই কাফেলার পথরোধ করার নির্দেশ দিলেন। হযরত যায়েদ (রা) সেই কাফেলাকে আইস নামক স্থানে ঘিরে ফেললেন এবং কাফেলার সকলকে গ্রেফতার করে মদীনা নিয়ে এলেন। গনিমতের মাল হিসেবে রূপার অনেক সামান পাওয়া গেল। কয়েদীদের মধ্যে হুজুরের (সা) বড় কন্যা হযরত যয়নবের (রা) স্বামী আবুল আসও ছিলেন। তিনি হযরত যয়নবের (রা) আশ্রয় নিয়ে মুক্তি পেলেন। হুজুর(সা) তার সকল মালও ফিরিয়ে দিলেন।

৪. সারিয়্যায়ে তারাফ : মদীনা মুনাওয়ারা থেকে ৩৬ মাইল দূরত্বে ইরাকের দিকে তারাফে একটি ঝরণা ছিল। ৬ষ্ঠ হিজরীর জমাদিউস সানিতে হুজুর (সা) এক দুশমন গোত্রের উৎখাতের জন্য হযরত যায়েদকে (রা) সেখানে প্রেরণ করলেন। দুশমনরা মুকাবিলার হিম্মত পেলো না। এবং তারা হযরত যায়েদের (রা) পৌছার পূর্বেই পালিয়ে গেল।

৫. সারিয়্যায়ে হিসমা : সারিয়্যায়ে তারাফের অব্যবহিত পরই হুজুর (সা) হযরত যায়েদকে (রা) পাঁচ শ' সওয়ার দিয়ে বনি জাযামকে উৎখাতের জন্য হিসমা প্রেরণ করলেন। তারা কাসতানতুনিয়ায় দৌতগিরী শেষে ফেরার পথে হযরত দাহিয়া কালবীকে (রা) লুটে নিয়েছিল এবং তারা যথার্থ শাস্তির যোগ্য ছিল। হযরত যায়েদ (রা) এই অভিযানে অত্যন্ত সতর্কতা এবং দূরদর্শিতার সঙ্গে কাজ করছিলেন। তিনি দিনের বেলা সঙ্গীদেরসহ পাহাড়ে লুকিয়ে থাকতেন। এবং রাতে সফর করতেন। এমনকি হিসমা পৌছা পর্যন্ত দুশমনের কানে পর্যন্ত এই খবর পৌছেনি। হযরত যায়েদ (রা) হঠাৎ করে হামলা

চালিয়ে তাদেরকে কঠিন শিক্ষা দিলেন। বনু জাযামের সরদার হুনাইদ বিন এওয়াজ পুত্রসহ নিহত হলো। গনিমতের মাল হিসেবে এক হাজার উট, পাঁচ হাজার বকরী এবং অনেক কয়েদী পাওয়া গেল। হযরত যায়েদ (রা) এসব বস্তু হযরত যায়েদ (রা) বিন রিফায়ার মাধ্যমে প্রিয় নবীর (সা) খিদমতে পাঠিয়ে দিলেন। গনিমতের মাল যখন মদীনা পৌঁছলো তখন ঘটনাক্রমে বনু জাযামের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি আবু ইয়াযিদ (রা) বিন আমর নবীর (সা) দরবারে উপস্থিত ছিলেন। তিনি যেহেতু পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এ জন্য হুজুর (সা) তাঁকে খুব সম্মান করতেন। তিনি যখন নিজের কবিলাবাসীদের জন্য সুপারিশ করলেন তখন রহমতে আলম (সা) সকল কয়েদীকে মুক্ত করে দিলেন এবং সব গনিমতের মালও তাদেরকে ফেরত দিলেন।

৬. সারিয়্যায়ে উম্মে কারফা ফাযারিয়া (অথবা সারিয়্যায়ে ওয়াদিউল কুরা) ঃ ৬ষ্ঠ হিজরীর রমযান মাসে হযরত যায়েদ (রা) একটি বাণিজ্যিক কাফেলার সঙ্গে সিরিয়ার দিকে গমন করছিলেন। কুরা উপত্যকায় বনু ফাযারার একদল মানুষ কাফেলার উপর অতর্কিতে হামলা চালালো এবং বাণিজ্যিক পণ্য লুটে নিল।

হযরত যায়েদের (রা) সঙ্গে মুসলমানদের একটি ছোট দল ছিল। ফাযারী ডাকাতদের হাতে তারা খুব নির্যাতিত হলো। হযরত যায়েদ (রা) অত্যন্ত কষ্টে জীবন বাঁচিয়ে মদীনা পৌঁছে সকল ঘটনা রাসূলে আকরামের (সা) খিদমতে পেশ করলেন। বনু ফাযারার লোকজন এর আগেও কয়েকবার ডাকাতি ও রাহাজানি করেছিল। এক্ষণে হুজুর (সা) তাদেরকে শাস্তি দানের জন্য একটি শক্তিশালী সৈন্যদল দিয়ে হযরত যায়েদকে (রা) প্রেরণ করলেন। তিনি সতর্কতার সঙ্গে দিনে লুকিয়ে থেকে এবং রাতে সফর করে বনু ফাযারার ওপর গিয়ে চড়াও হলেন। ফাযারীরা মুকাবিলার সাহস করলো না এবং তারা সবাই পালিয়ে গেল। অবশ্য তাদের শাসক উম্মে কারফা বিনতে রবিয়া বিন বদর এবং তার কন্যাকে মুসলমানরা গ্রেফতার করলো। হযরত যায়েদ (রা) মদীনা ফিরে এলেন। এ সময় বিশ্ব নবী (সা) হযরত আয়েশা সিদ্দিকার (রা) হুজরাতে উপস্থিত ছিলেন। উম্মুল মুমিনীন (রা) বর্ণনা করেছেন যে, যায়েদ(রা) আমার ঘরের দরজা খটখটালেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে অবস্থায় ছিলেন সেই অবস্থাতেই বাইরে তাশরীফ নিলেন এবং দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত যায়েদের (রা) সঙ্গে সেই অভিযানের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন।

৭. মাওতার যুদ্ধ ঃ অষ্টম হিজরীর জমাদিউল আউয়ালে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। হুজুরে আকরাম (সা) হারিছ (রা) বিন উমায়ের ইযদীকে ইসলামের

দাওয়াতের পত্র দিয়ে বসরার শাসকের নিকট প্রেরণ করেছিলেন। তিনি দামেস্কের নিকট মাওতা নামক স্থানে পৌছলেন। এই সময় বালকার সরদার শুরাহবিল বিন আমর গাসসানী তাঁকে শহীদ করে ফেললো। (অন্য এক রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত হারিছ (রা) বসরার শাসকের নিকট পত্র পৌছিয়ে ফিরে আসছিলেন।)

দূত হত্যা একটি সঙ্গীন অপরাধ। হুজুর (সা) তার প্রতিশোধ গ্রহণার্থে তিন হাজার মুজাহিদের একটি বাহিনী প্রেরণ করলেন। এই বাহিনীর আমীর নিয়োগ করেছিলেন হযরত যায়েদ (রা) বিন হারিছাকে। হুজুর (সা) কিছুদূর পর্যন্ত মুজাহিদদের সঙ্গে সঙ্গে গেলেন এবং তাঁদেরকে বিদায় করার সময় বললেন, যায়েদ (রা) যদি শহীদ হয়ে যান তাহলে জাফর (রা) বিন আবি তালিব সেনাবাহিনীর আমীর হবেন। তিনিও যদি শহীদ হয়ে যান তাহলে আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহা নেতৃত্ব গ্রহণ করবেন। আল্লামা ইবনে সায়াদ বর্ণনা করেছেন যে, এ সময় হযরত জাফর (রা) হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুর আপন ভাই এবং [হুজুরের (সা) চাচার পুত্র ছিলেন] আরজ করলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যায়েদকে (রা) আমার ওপর আমীর নিয়োগ করবেন এটা আশা করিনি। সারওয়ারে আলম (সা) ফরমালেন ঃ

"একথা রাখো। তুমি জানোনা যে, আল্লাহর নিকট উত্তম কি।"

এই সৈন্য বাহিনী মাওতা পৌছলে খৃস্টানদের বিরাট বাহিনী নিজেদের মিত্র গোত্রদেরসহ মুকাবিলায় ঝাঁপিয়ে পড়লো। তাদের সর্বোমোট সংখ্যা প্রায় এক লাখ ছিল। এ সত্ত্বেও মুসলমানরা আল্লাহর ওপর ভরসা করে সেই ভয়াবহ খোদাদ্রোহী শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করলেন। অত্যন্ত রক্তাক্ত যুদ্ধ সংঘটিত হলো। এই যুদ্ধে হযরত যায়েদ (রা) পূর্ণাঙ্গ অটলতা এবং বাহাদুরী প্রদর্শন করলেন। সঙ্গীদেরকে উৎসাহ দানের জন্য তিনি শত্রু ব্যূহের গভীরে পৌছে তাদেরকে অনুপ্রাণিত করলেন। যুদ্ধ যখন প্রচণ্ডরূপ ধারণ করলো তখন হযরত যায়েদের (রা) বুকে একটি বর্শা বিদ্ধ হলো এবং তিনি শহীদ হয়ে নীচে পড়ে গেলেন। হযরত জাফর (রা) সামনে অগ্রসর হয়ে ইসলামের ঝাণ্ডা তুলে ধরলেন। দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধের পর তিনিও যখন শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করলেন তখন হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহা নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। যখন তিনিও শহীদ হলেন তখন হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ পতাকা হাতে তুলে নিলেন এবং মুজাহিদদেরকে একত্রিত করে দুশমনের ওপর এমন

প্রচণ্ড বেগে হামলা চালালেন যে, তারা পরাজিত হলো এবং মুসলমানরা সফল ও বিজয়ীর বেশে মদীনা ফিরে এলেন।

অনেক মুহাদ্দিস এবং নেতৃস্থানীয় চরিতকার এ প্রসঙ্গে একটি রেওয়ায়াত ধারাবাহিকতার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। তাঁরা বলেছেন, মাওতায় যখন প্রচণ্ড যুদ্ধ সংঘটিত হচ্ছিল তখন রাসূলে আকরাম (সা) সাহাবায়ে কিরামের (রা) মধ্যে মসজিদে নববীতে বসেছিলেন। হঠাৎ করে তিনি বললেন ঃ

"যায়েদ (রা) শহীদ হয়ে গেছেন এবং এখন জাফর ঝাণ্ডা তুলে ধরেছেন। জাফরও শহীদ হয়ে গেছেন এবং এখন পতাকা আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহার হাতে। তিনিও জান্নাতের পথ নিলেন। এখন সেই ব্যক্তি ঝাণ্ডা হাতে তুলে নিলেন যিনি আল্লাহর অন্যতম তরবারী হিসেবে বিবেচিত"। [অন্য এক রেওয়ায়াতে আছে যে, এ সময় হুজুর (সা) দাঁড়িয়ে প্রথমে এই তিন বুজর্গের গুণাবলী বর্ণনা করলেন। অতপর তিনি বললেন, হে আল্লাহ! যায়েদকে ক্ষমা কর। হে আল্লাহ! যায়েদকে ক্ষমা কর। হে আল্লাহ! যায়েদকে ক্ষমা কর! হে আল্লাহ! জাফর এবং আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহাকে ক্ষমা কর।—তাবকাতে ইবনে সায়াদ]

সে সময় আল্লাহ পাক যুদ্ধের নকশা হুজুরের (সা) সামনে এনে দিয়েছিলেন অথবা জিবরিল আমীন (আ) তাঁকে প্রতি মুহূর্তের খবর পৌঁছে দিচ্ছিলেন। পরিস্থিতি যাই হোক না কেন এ ব্যাপারে সকলেই ঐকমত্য পোষণ করেন যে, মুজাহিদদের ফিরে আসার পূর্বেই হুজুর (সা) হযরত যায়েদ (রা), জাফর (রা) এবং আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহার শাহাদাতের খবর মুসলমানদেরকে দিয়েছিলেন। সহীহ বুখারীতে আছে যে, হুজুর (সা) যে সময় মুসলমানদেরকে এই খবর প্রদান করেন তখন তার চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিল। আল্লামা ইবনে আছির উসুদুল গাব্বাহতে লিখেছেন যে, এই সময় হুজুর (সা) একথাও ইরশাদ করেছিলেন ঃ "এরা ছিল আমার ভাই, আমার প্রিয় এবং আমার সঙ্গে আলোচনাকারী।"

হযরত খালিদ (রা) বিন সুমরাহ থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত যায়েদের (রা) অপ্রাপ্ত বয়স্কা কন্যা পিতার শাহাদাতের খবর শুনে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। তা দেখে হুজুরও (সা) কাঁদতে লাগলেন এবং তিনি এত কেঁদেছিলেন যে তাঁর বাকরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিলো। হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদা হয়রান হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! একি।" তিনি বললেনঃ "এটা ভালবাসা, আবেগ যা প্রতিটি ভালবাসাকারীর অন্তরে নিজের প্রিয় ব্যক্তির জন্য হয়ে থাকে।"

হাফেজ ইবনে হাজার (র) লিখেছেন, শাহাদাতের সময় হযরত যায়েদ(রা) বিন হারিছার বয়স ছিল ৫৫ বছর। অন্যদিকে তাবকাতে ইবনে সায়াদে হযরত উসামা বিন যায়েদের (রা) একটি রেওয়ায়াতে উল্লেখ আছে। তাতে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমার পিতা থেকে বয়সে ১০ বছরের বড় ছিলেন। তাবকাতের রাওয়ায়াত যদি সঠিক বলে মনে করা হয় তাহলে শাহাদাতের সময় হযরত যায়েদের (রা) বয়স ৫১-৫২ বছরের বেশী হতে পারে না।

হাফেজ ইবনে হাজার (র) হযরত যায়েদের (রা) হুলিয়া মোবারক বর্ণনায় বলেছেন, আকৃতি ছিল বেঁটে। নাক ছিল চ্যাপ্টা এবং রং ছিল গভীর গমের রং। (ইসাবাহ)

আল্লামা ইবনে আছির (র) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত যায়েদের রং ছিল খোলা গমের মতো। (উসুদুল গাব্বাহ)

হযরত যায়েদ (রা) জীবনে পাঁচটি বিয়ে করেছিলেন। স্ত্রীরা হলেন, হযরত উম্মে আইমান (রা), হযরত যয়নব (রা) বিনতে জাহাশ (যিনি পরে উম্মুল মুমিনীন হন) উম্মে কুলসুম (রা) বিনতে উকবা বিন আবি মুয়িত [তিনি হুজুরের (সা) ফুফাতো বোন আরওয়া বিনতে কুরাইযের কন্যা এবং হযরত উসমান (রা) বিন আফফান তাঁর সতালো ভাই ছিলেন], দুররাহ (রা) বিনতে আবি লাহাব [তিনি হুজুরের (সা) চাচার কন্যা ছিলেন] এবং হিন্দ (রা) বিনতে আওয়াম [তিনি হুজুরের (সা) ফুফাতো বোন ছিলেন]। হযরত যোবায়ের (রা) বিন আওয়াম তাঁর সহোদর ছিলেন এবং উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদিজাতুল কুবরা (রা) তাঁর আপন ফুফু ছিলেন।

হযরত যায়েদের (রা) মোট তিনজন সন্তান ছিলেন। হযরত উম্মে আইমানের (রা) গর্ভে হযরত উসামা (রা) বিন যায়েদ এবং উম্মে কুলছুমের(রা) গর্ভে যায়েদ বিন যায়েদ ও রোকেয়া বিনতে যায়েদ (রা)।

হযরত উসামা (রা) মহানবীর (সা) প্রিয়তম সাহাবী হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছিলেন। যায়েদ এবং রোকেয়া শৈশবকালেই মারা যান।

হযরত যায়েদ (রা) বিন হারিছা আসমানী ফজিলতের অধিকারী ছিলেন। তিনিই একমাত্র সাহাবী যাঁর নাম কুরআনে পাকে উল্লেখ আছে। এই মর্যাদা আর কোন সাহাবী লাভ করেননি। তাঁর চারিত্রিক গুণাবলীর মধ্যে রয়েছে রাসূল প্রেম, প্রতিশ্রুতিপূরণ, জিহাদে উৎসাহ, ইবাদাতে গভীর আগ্রহ, দারিদ্র এবং সচ্ছলতা এবং বিনয় প্রদর্শন। সৎচরিত্র এবং জীবন উৎসর্গের আবেগের

কারণে তিনি রাসূলের (সা) সান্নিধ্য লাভে সক্ষম হয়েছিলেন এবং তিনি হিব্বুন্নাবি (সা) উপাধিতে মশহুর হয়েছিলেন। উম্মুল মুমিমীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা) বলতেন, "কোন সময় এমন হয়নি যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোন যুদ্ধে হযরত যায়েদকে (রা) প্রেরণ করেননি এবং তাঁকে সেই বাহিনীর নেতা বানাননি। তিনি যদি হুজুরের (সা) ওফাতের সময় জীবিত থাকতেন তাহলে হুজুর (সা) তাঁকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করতেন।

এমনিভাবে হযরত সালমা (রা) বিন আকওয়া থেকে বর্ণিত আছে যে, "আমি সাতটি যুদ্ধে হযরত যায়েদের (রা) সঙ্গে অংশ নিয়েছি। আমি দেখেছি যে, প্রত্যেক যুদ্ধেই হুজুর (সা) হযরত যায়েদকে (রা) সেনাবাহিনীর সেনাপতি বানিয়েছেন।"

মহানবী (সা) হযরত যায়েদকে (রা) নিজের পরিবারের একজন সদস্য হিসেবে মনে করতেন। কোন ব্যক্তি যদি তাঁর ব্যাপারে কোন খারাব কথা বলতো তাহলে হুজুর (সা) খুব দুঃখ পেতেন। একবার কতিপয় ব্যক্তি হযরত উসামা (রা) বিন যায়েদের বংশ সম্পর্কে ঠাট্টা বিদ্রূপ করা শুরু করলো [শুধু এই ভিত্তিতে যে, হযরত যায়েদের (রা) রং ছিল গমের রংয়ের আর হযরত উসামার (রা) রং ছিল কালো]। হুজুর (সা) পর্যন্ত এই কথা পৌছল তাতে তিনি খুব মনোকষ্ট পেলেন। সহীহ্ বুখারীতে হযরত আয়েশা সিদ্দিকার (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, "সেই যুগে একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) অত্যন্ত উৎফুল্লচিত্তে বাড়ী তাশরীফ আনলেন। সে সময় তাঁর চেহারা মুবারক খুশীতে ডগমগ করছিল। এসেই বললেন, আয়েশা জানো, কেবলই মুজাযযার মুদালজী (মুখের ভাব দেখে যিনি স্বভাব বলতে পারে) এসেছিল। সে সময় যায়েদ (রা) ও উসামা (রা) দু'জনে একই চাদরের নীচে ছিল। দু'জনের পা শুধু চাদরের বাইরে ছিল। মুজাযযার উভয়ের পা দেখেই বললেন, এই পা একে অপর থেকে সৃষ্টি।"

এ সময় হুজুরের খুশী হওয়ার কারণ এই ছিল যে, সেই ব্যক্তি সত্যের স্বীকৃতি দিয়েছিল। এর ফলে বিদ্বেষ পোষণকারীদের মুখ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। নচেৎ সাধারণ অবস্থায় এসব লোকের কথা দলিল হয় না। তাছাড়া হুজুর (সা) জ্যোতির্বিদ ও গণকদের কথায় আস্থা স্থাপন পসন্দ করতেন না।

হযরত ওমর ফারুক (রা) নিজের খিলাফতকালে সাহাবীদের (রা) বৃত্তি নির্ধারণ করলেন। এ সময় তিনি স্বীয় পুত্রের বৃত্তি আড়াই হাজার এবং উসামা (রা) বিন যায়েদের (রা) তিন হাজার ঠিক করলেন। হযরত আবদুল্লাহ (রা) আরজ করলেন ঃ

"আমি সকল যুদ্ধে উসামার পাশাপাশি থেকেছি এবং আপনিও কোন যুদ্ধে যায়েদের পিছনে থাকেননি। তারপরও আপনি আমার বৃত্তি উসামার থেকে কম কেন নির্ধারণ করেছেন?"

হযরত ওমর বললেন ঃ

"জানে ফিদার বা কলিজার টুকরা আমার। তুমি ঠিকই বলেছ। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) উসামাকে তোমার চেয়ে এবং উসামার পিতাকে তোমার পিতার চেয়ে বেশী ভাল বাসতেন।"

হযরত যায়েদ (রা) এবং তাঁর পুত্র উসামাকে (রা) কত গভীরভাবে ভাল বাসতেন তা এই ঘটনা থেকে অনুমান করা যায়। মাওতার যুদ্ধের পর হুজুর(সা) শহীদদের প্রতিশোধ গ্রহণার্থে একটি বাহিনী তৈরী করলেন। যদিও এই বাহিনীতে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা), হযরত ওমর ফারুক (রা), হযরত সায়াদ (রা) বিন আবি ওয়াক্কাস, হযরত সাঈদ (রা) বিন যায়েদ, হযরত আবু ওবায়দাহ (রা) ইবনুল জাররাহ এবং হযরত কাতাদাহ (রা) বিন নুমানের মত জালিলুল কদর সাহাবা শামিল ছিলেন। কিন্তু হুজুর (সা) ১৮ বছর বয়স্ক উসামাকে (রা) সেই বাহিনীর আমীর নিয়োগ করলেন। কতিপয় ব্যক্তি তাতে বিস্ময় প্রকাশ করলেন। এ সময় তিনি গুরুতর অসুস্থ ছিলেন। তা সত্ত্বেও পবিত্র মাথায় পট্টি বেঁধে হুযরার বাইরে তাশরীফ নিলেন এবং মিম্বরের ওপর বসে খুতবা দিলেন। তাতে তিনি ইরশাদ করলেন ঃ

"আমি, খবর পেয়েছি যে, তোমাদের মধ্য থেকে কতিপয় ব্যক্তি উসামার নেতৃত্ব সম্পর্কে অভিযোগ উত্থাপন করেছ। হে মানুষেরা! এটা আমার জন্য কোন নতুন কথা নয়। এর পূর্বে তোমরা উসামার পিতা যায়েদকে সেনাবাহিনীর নেতা বানানোর প্রশ্নে অভিযোগ করেছিলে। আল্লাহর কসম! যায়েদ সব ধরনের নেতৃত্বের যোগ্য ছিল এবং সে আমার সীমাহীন প্রিয় ছিল এবং তারপর উসামা আমার নিকট তোমাদের চেয়ে বেশী প্রিয়।"

হযরত যায়েদের (রা) বছরের পর বছর ধরে রহমতে আলমের (সা) পবিত্র খিদমতে কাটানোর সৌভাগ্য হয়েছিল এবং রাসূলে করিম (সা) স্বয়ং তাঁকে প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন। এ জন্য তিনি দ্বীন ও দুনিয়া প্রত্যেক ব্যাপারেই হুজুরের (সা) অনুসরণ করতেন। সবসময় তালি লাগানো ও মোটা কাপড় পরিধান করতেন। নিজের জুতা নিজে মেরামত করতেন। সাধারণত যবের রুটি খেতেন। যবের রুটি পানি অথবা দুধ দিয়ে ভিজিয়ে আনন্দের সঙ্গে খেয়ে নিতেন। জনৈক ব্যক্তি বলেন, "আবু উসামা! আপনি এত ঘাটিয়া বা নিম্নমানের পোশাক পরেন?" হযরত যায়েদ (রা) তার জবাবে বললেন ঃ

"আমাদের মান-ইজ্জত তো শুধুমাত্র ইসলামের কারণে। মূল্যবান পোশাক দিয়ে কি হয়।"

হযরত যায়েদ (রা) যদিও একজন সফল সামরিক অফিসার এবং দূরদর্শী সেনাপতি ছিলেন। কিন্তু যুদ্ধের ময়দানে একজন সাধারণ সিপাহী এবং তাঁর মধ্যে কোন পার্থক্য পরিদৃষ্ট হতো না। তাঁর মধ্যে এমন আবেগ পরিলক্ষিত হয়নি যে, তিনি বাহিনীর সরদার এবং অন্যরা তাঁর অধীনস্থ সিপাহী। হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন আমের বলেন, হযরত যায়েদ (রা) কোন সফর বা অভিযানে গেলে নিজের জন্য তাঁবু খাটাতেন না বরং রৌদ্রের সময় একটি চাদর কোন বৃক্ষ বা ঝোপের ওপর দিয়ে তার ছায়ায় আরাম করে নিতেন। নিজের সংগীদেরকেও সাদাসিধে জীবন যাপনের হেদায়াত দিতেন। সঙ্গীদের যদি পানির প্রয়োজন হতো তাহলে স্বয়ং পানি ভরে আনতেন। একদিন এক তাঁবুতে নিজের কাঁধের ওপর মশক ভর্তি পানি বহন করে আনছিলেন। জনৈক ব্যক্তি বললেন, "হে আমীর! এটা আমাকে দিন।" তিনি বললেন, "আল্লাহ তায়ালা তোমাকে প্রতিদান দিন। এ কাজ আমি নিজেই করবো। যাতে আমার দিল ও দিমাগে ইমারতের গন্ধ সৃষ্টি না হয়।"

আর্থিক অবস্থার কথা আর বলতে কি! বাড়ীতে শুধুমাত্র খেজুর পাতার পুরাতন মাদুর এবং সাধারণ কয়েকটি বরতন ছাড়া অন্য কোন সামান ছিল না। একবার এক ব্যক্তি তাঁর সীমাহীন সাদাসিধে জীবনের জন্য বিস্ময় প্রকাশ করলে তিনি বললেন, "এই গৃহের আরাম-আয়েশে কি ফায়দা। এ থেকে তো বিদায় নিতেই হবে।"

হযরত যায়েদের (রা) আল্লাহর ইবাদাতের প্রতি গভীর আকর্ষণ ছিল। রাতে খুব কম শুতেন এবং বেশীরভাগ সময় নামাযে অতিবাহিত করতেন। সারা জীবনই তাহাজ্জুদের নামায পড়েছেন। শেষ রাতে সঙ্গীদেরকেও নামাযের জন্য জাগিয়ে দিতেন। আল্লাহভীতিতে অধিকাংশ সময় অশ্রুসজল থাকতেন। মেহমানদের সঙ্গে অত্যন্ত বিনয় প্রকাশ করতেন। মিসকিন, গরীব, ইয়াতিম, বিধবা এবং অভাবগ্রস্তদের খিদমত ফরজ মনে করে করতেন। সমগ্র জীবন আল্লাহভীতি, রাসূল প্রেম ও আনুগত্য, ইবাদাত ও তাকওয়া এবং খিদমতে খালকের প্রতিচ্ছবি ছিলেন। এসব গুণের কারণেই যায়েদ (রা) রহমতে আলমের (সা) মাহবুব হতে পেরেছিলেন।

হযরত যোবায়ের (রা) ইবনুল আওয়াম

নবুওয়াতের প্রথম যুগের ঘটনা। একদিন মক্কায় এক ভীতিপ্রদ খবর রটে গেল। এই অপয়া খবর হকপন্থীদেরকে চরম দুশ্চিন্তায় নিক্ষিপ্ত করলো। প্রত্যেকের মুখে একথাই উচ্চারিত হচ্ছিল যে, এটা কি করে সম্ভব? এখনো আবু তালিব জীবিত রয়েছেন এবং বনু হাশিমের তরবারী ভোঁতা হয়ে যায়নি।এই খবর সঠিক ছিল অথবা শুধুমাত্র গুজব তা কেউই নিশ্চিত করে বলতে পারছিল না। কিছু লোক বলছিল যে, মুহাম্মাদকে (সা) মুশরিকরা গ্রেফতার করেছে। আবার অন্যরা বলছিল যে, হুজুরকে (সা) শহীদ করে ফেলা হয়েছে। বনু হাশিম অত্যন্ত ক্রোধান্বিত অবস্থায় ছিল। এ ব্যাপারে তারা কোন পদক্ষেপ গ্রহণ প্রশ্নে চিন্তা করছিলেন এমন সময় বনু আসাদের একজন যুবকের কানেও এই খবর পৌঁছলো। ১৬ বছর বয়স্ক বিরাট আকৃতির স্থূলকায় যুবক রহমতে আলমকে (সা) গভীরভাবে ভালবাসতেন। কিছুক্ষণ পূর্বেই সে দুপুরের বিশ্রামের জন্য স্বগৃহে এসেছিলো। এ খবর শুনতেই সে তড়পে উঠলো। খুঁটি থেকে ঝুলন্ত তরবারী নামিয়ে তার খাপ মাটিতে ফেলে দিল এবং তরবারী হাতে মক্কার গলিতে লাফিয়ে পড়লো। তার গতি ছিল রাসূলের (সা) পবিত্র বাসগৃহের দিকে। সে সময় ক্রোধে তার চেহারা লাল হয়ে গিয়েছিল এবং অত্যন্ত দ্রুতগতিতে রাস্তা অতিক্রম করছিল। খুব শীঘ্র সে হুজুরের (সা) গৃহে পৌঁছে গেল। সেখানে পৌঁছে সে খুব আনন্দিত হলো। সে দেখলো যে মহানবী (সা) সুস্থ অবস্থায়ই রয়েছেন। হুজুর (সা) হাতে তরবারীসহ যুবককে দেখে মুচকি হাসলেন এবং বললেন, "কি ভাই, ভালোতো। এ সময় তুমি নাঙ্গা তরবারি হাতে কিভাবে এলে?"

যুবকটি আরজ করলো, "হে আল্লাহর রাসূল আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। আমি শুনেছিলাম যে দুশমনরা আপনাকে গ্রেফতার করেছে অথবা সম্ভবত আপনাকে শহীদ করে ফেলা হয়েছে।"

ইরশাদ হলো : "আচ্ছা, এই কথা! যদি বাস্তবিকই এমন হতো তাহলে তুমি কি করতে?"

যুবকটি নির্দ্বিধায় আরজ করলো : "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর কসম, আমি মক্কাবাসীদের সঙ্গে লড়াই করে মরতাম।" তার জবাব শুনে রহমতে আলমের (সা) চেহারা মুবারকে খুশীর হিল্লোল বয়ে গেল। তিনি

যুবকটির জীবন উৎসর্গের আবেগের প্রশংসা করলেন এবং তার কল্যাণ কামনা করে দোয়া করলেন। এমনকি তার তরবারীর জন্যও দোয়া করলেন। এটিই প্রথম তরবারী ছিল যা হক পথে রাসূলে বরহকের সমর্থনে বুলন্দ হয়েছিল। সত্যিকার রাসূল প্রেমিক এই যুবক ছিল বনু আসাদ গোত্রের প্রস্ফুটিত ফুল সাইয়েদেনা হযরত যোবায়ের (রা) ইবনুল আওয়াম।

সাইয়েদেনা হযরত আবু আবদুল্লাহ যোবায়ের (রা) ইবনুল আওয়াম (বিন খুয়ায়েলদ বিন আসাদ বিন আবদুল উজ্জা বিন কুসাই) ইসলামের ইতিহাসে এক মহান ব্যক্তিত্ব ছিলেন। নবীর (সা) দরবার থেকে তিনি "হাওয়ারীয়ে রাসূল" উপাধি পেয়েছিলেন। মহানবী (সা) নিজের পবিত্র মুখ দিয়ে তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। এভাবে তিনি আসহাবে আশারায়ে মুবাশশিরার মধ্যে পরিগণিত হন। সাইয়েদেনা হযরত ওমর ফারুক (রা) তাঁকে দ্বীনের আরকানের মধ্যে একটি রুকন হিসেবে আখ্যায়িত করতেন। হযরত যোবায়েরের (রা) সঙ্গে রাসূলের (সা) কয়েক ধরনের সম্পর্ক ছিল।

১. তিনি হুজুরের (সা) ফুফু হযরত সুফিয়া (রা) বিনতে আবদুল মুত্তালিবের পুত্র ছিলেন। এমনিভাবে হুজুর (সা) তার মামাতো ভাই ছিলেন।

২. উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদিজাতুল কুবরা (রা) হযরত যোবায়েরের(রা) ফুফু ছিলেন। এদিক থেকে প্রিয় নবী (সা) হযরত যোবায়েরের (রা) ফুফা ছিলেন।

৩. উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকার (রা) বড় বোন হযরত আসমা (রা) বিনতে আবু বকর সিদ্দীককে (রা) হযরত যোবায়েরের (রা) সঙ্গে বিয়ে দেয়া হয়েছিল। এদিক থেকে হুজুর (সা) তার ভায়রা হন।

৪. হযরত যোবায়েরের (রা) নসবের ধারা কুসাই বিন কিলাবে পৌছে রাসূলের (সা) নসব ধারার সঙ্গে মিলে যায়। এমনিভাবে তারা উভয়েই একই প্রপিতামহের বংশোদ্ভূত ছিলেন।

হযরত যোবায়ের (রা) নবীর (সা) হিজরতের প্রায় ২৮ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। শৈশবকালেই পিতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত হন। চাচা নওফিল বিন খুয়ায়েলদ নিজের অভিভাবকত্বে তাকে লালন-পালন করেন। হযরত যোবায়েরের (রা) মাতা হযরত সুফিয়া (রা) অত্যন্ত বাহাদুর এবং শেরদিল মহিলা ছিলেন। সুতরাং তিনি হযরত যোবায়ের (রা) থেকে কঠিন মেহনত ও পরিশ্রমের কাজ নিতেন এবং অনেক সময় তাকে শাসন করতেও দ্বিধা করতেন না। নওফিল বিন খুয়ায়েলদ একদিন ভ্রাতুষ্পুত্রকে মায়ের হাতে মার খেতে

দেখে অস্থির হয়ে পড়লেন এবং হযরত সুফিয়াকে (রা) কঠোরভাবে বাধা দিলেন এবং বললেন যে, এভাবে তুমি ছেলেকে মেরে ফেলবে। তিনি বনু হাশিমের নিকটও সুফিয়া যাতে ছেলের ওপর কঠোরতা অবলম্বন না করে তা বলতে বলেন। যখন একথা সাধারণ্যে প্রচার হয়ে গেল তখন হযরত সুফিয়া(রা) লোকদের সামনে এই গাথা পড়লেন ঃ "যে একথা বলেছে যে, আমি তার (যোবায়ের) সঙ্গে শক্রতা পোষণ করি সে ভুল বলেছে। আমি তাকে এ জন্য মেরে থাকি যাতে সে আকলমন্দ হয় এবং শক্রকে পরাজিত করে ও গনিমতের মাল লাভ করে।

হাফেজ ইবনে হাজার (র) ইসাবাতে লিখেছেন যে, শৈশবকালে হযরত যোবায়েরের (রা) সঙ্গে এক যুবকের মুকাবিলা হয়ে গেল। তিনি এমন মার দিলেন যে, সেই ব্যক্তির হাত ভেঙে গেল। লোকজন হযরত সুফিয়ার (রা) নিকট অভিযোগ করলো। এ সময় তিনি সর্বপ্রথম জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তোমরা যোবায়েরকে কেমন পেয়েছো। বাহাদুর অথবা বুয দিল?

মোটকথা মায়ের প্রশিক্ষণের প্রভাবে পরবর্তীতে হযরত যোবায়ের (রা) বিরাট বাহাদুর হতে পেরেছিলেন।

হযরত যোবায়ের (রা) এমন এক বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন যে বংশের ওপর ইসলাম সূর্যের কিরণমালা দাওয়াতে হকের প্রথম যুগেই পড়েছিল। তার ফুফু হযরত খাদিজাতুল কুবরা (রা) ইসলাম গ্রহণকারী প্রথম মহিলা ছিলেন। মাতা হযরত সুফিয়াও (রা) নবুওয়াতের প্রথম যুগে ঈমান এনেছিলেন। ইসলামের আলো তাদের অন্তরকে আলোকিত না করাটা ছিল অসম্ভব ব্যাপার। বস্তুত তিনি ভিন্ন ভিন্ন রেওয়ায়াত অনুযায়ী আট, বারো অথবা ১৬ বছর বয়সেই দাওয়াতে হককে লাব্বাইক বলেছিলেন। কতিপয় ঐতিহাসিক ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে তার ক্রমিক নম্বর চতুর্থ অথবা পঞ্চম বলে লিখেছেন। কিন্তু এটা সঠিক নয়। অবশ্য সাবিকুনাল আউয়ালুনের মধ্যে তিনি বিশেষ স্থান রাখতেন। ইসলাম গ্রহণ না করা পর্যন্ত চাচার স্নেহের আধার ছিলেন। কিন্তু যেই তিনি দাওয়াতে হক কবুল করলেন সেই চাচার আচরণ পরিবর্তন হয়ে গেল এবং সে তার ওপর কঠিন নির্যাতন শুরু করলো। হাফেজ ইবনে কাছির (র) আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া গ্রন্থে আবুল আসওয়াদ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত যোবায়েরের (রা) চাচা চাটাই দিয়ে তাকে পেচিয়ে আগুন উসকে দিয়ে তাতে ধুনি দিত এবং নিজের বাপ-দাদার ধর্মের ওপর ফিরে আসার কথা বলতো। কিন্তু যোবায়ের (রা) প্রতিবারই বলতেন, অবশ্যই নয়, অবশ্যই নয়, "এখন আর আমি কাফের হবো না।"

চাচার নির্যাতন যখন সীমা ছাড়িয়ে গেল তখন হযরত যোবায়ের (রা) মহানবীর (সা) ইঙ্গিতে হাবশা হিজরাত করলেন। কিছুদিন সেখানে কাটানোর পর মক্কা ফিরে এলেন এবং বাণিজ্যিক পেশা গ্রহণ করলেন। কিছু দিন পর স্বয়ং রহমতে আলম (সা) মদীনা হিজরাত করেন। সে সময় হযরত যোবায়ের (রা) একটি বাণিজ্যিক কাফেলার সঙ্গে সিরিয়া গিয়েছিলেন। যখন তিনি সিরিয়া থেকে মক্কার দিকে ফিরে আসছিলেন তখন রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) সমভিব্যাহারে মদীনা তাশরীফ নিচ্ছিলেন। ঘটনাক্রমে পথিমধ্যে হযরত যোবায়েরের (রা) সঙ্গে তাদের সাক্ষাত ঘটে। এ সময় তিনি হুজুর (সা) ও সিদ্দীকে আকবারের (রা) খিদমতে কিছু সাদা কাপড় হাদিয়া হিসেবে পেশ করেন। অতপর মক্কা তাশরীফ নেন।

কিছুদিন পরই তিনি নিজের মা হযরত সুফিয়া (রা) এবং স্ত্রী আসমা বিনতে আবু বকর সিদ্দীককে (রা) সঙ্গে নিয়ে মদীনা হিজরত করেন এবং কিছুদিন কুবায় অবস্থান করেন। সেখানেই প্রথম হিজরীতে (অন্য এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী দ্বিতীয় হিজরীতে) হযরত আসমার (রা) গর্ভে হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন যোবায়ের জন্মগ্রহণ করেন। তার জন্মের পূর্বে কয়েকমাস পর্যন্ত কোন মুহাজির গৃহে সন্তান জন্মগ্রহণ করেনি। এজন্য মদীনার ইহুদীরা গুজব রটিয়ে দিয়েছিল যে, তারা মুসলমানদের ওপর জাদু করে রেখেছে এবং তাদের বংশধারা বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ (রা) জন্মগ্রহণ করলে মুসলমানরা সীমাহীন খুশী হলেন। তারা আনন্দের আতিশয্যে এতো জোরে নারায়ে তাকবীর ধ্বনি দিয়েছিল যে, পাহাড় গুঞ্জরিত হয়ে উঠেছিল। মুসলমানদের এত খুশীর কারণ ছিল এই শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার কারণে ইহুদীদের জাদুর তেলেসমাতি প্রকাশ হয়ে পড়েছিল।

মহানবী (সা) মদীনায় মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেন। তখন হযরত যোবায়েরের (রা) ইসলামী ভাই হন হযরত সালমাহ (রা) বিন সালামাহ বিন ওয়াকাশ। তিনি ছিলেন আওস বংশের বনু আবদুল আশহালের একজন সম্মানিত সদস্য এবং বাইয়াতে উকবায়ে কবিরায় অংশগ্রহণকারীদের অন্যতম। মদীনায় অবস্থানের প্রাথমিক কয়েক বছর হযরত যোবায়েরের (রা) জীবিকা ছিল কৃষি নির্ভর। রাসূলে আকরাম (সা) তাকে বনু নজিরে একটি খেজুরের বাগান এবং অন্যস্থানে কিছু জমি দান করেছিলেন। তা থেকে খুব কম আয় হতো। এ জন্য অত্যন্ত টানাটানিতে দিন কাটতো। পরে তিনি কৃষির সঙ্গে ব্যবসাও শুরু করেন। আল্লাহ তায়ালা তাতে খুব বরকত দিলেন এবং তিনি খুব সচ্ছল হয়ে গেলেন।

হিজরতের পর যুদ্ধের সিলসিলা শুরু হলে হযরত যোবায়ের (রা) প্রতিটি যুদ্ধে পূর্ণাঙ্গ অটলতা এবং অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করেন। কয়েকবার স্বয়ং হুজুরে আকরাম (সা) তার বীরত্ব ও জীবন উৎসর্গের আবেগের প্রকাশ্যে প্রশংসা করেন। শেরে খোদা হযরত আলী মুরতাজা (রা) তাঁকে আরবের সর্বশ্রেষ্ঠ বাহাদুর হিসেবে আখ্যায়িত করতেন। হক ও বাতিলের প্রথম যুদ্ধ বদরের ময়দানে সংঘটিত হয়। এ সময় হযরত যোবায়ের (রা) তরবারী দুশমনের ব্যূহের ওপর বিদ্যুৎ বেগে আপতিত হলো এবং তাদেরকে ছিন্নভিন্ন করে ফেললো। তিনি যেদিকে অগ্রসর হতেন সেদিকেই দুশমন বাহিনী কচু কাটা হতো। সেদিন তাঁর মাথায় হলুদ রংয়ের পাগড়ী ছিল। হুজুরের (সা) দৃষ্টি তার ওপর পড়লে বললেন ঃ

"আজ মুসলমানদের সাহায্যার্থে ফেরেশতাও হলুদ পাগড়ী বেঁধে আসমান থেকে নেমে এসেছেন।"

হযরত আসমা (রা) বিনতে আবু বকর সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, প্রচণ্ড যুদ্ধের সময় একজন যুদ্ধবাজ মুশরিক একটি উঁচু টিলার ওপর চড়ে হুংকার ছাড়লো ঃ

"কেউ কি আছে যে আমার মোকাবিলা করবে।"

হুজুর (সা) একজন সাহাবীকে (রা) সম্বোধন করে বললেন, "তুমি কি তার সঙ্গে মোকাবিলা করতে যাবে? তিনি আরয করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আপনি চাইলে আমি প্রস্তুত আছি।"

ইত্যবসরে মহানবীর (সা) দৃষ্টি পড়লো হযরত যোবায়েরের (রা) ওপর। তিনি নিকটেই বসে ছিলেন এবং ক্রোধে দাঁত কটমট করছিলেন। হুজুর (সা) বললেন, "হে সুফিয়ার (রা) পুত্র দাঁড়াও এবং এই মুশরিকের মোকাবিলা কর।" হযরত যোবায়ের (রা) তীরের মত তার ওপর গিয়ে পতিত হলেন এবং তার সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হলেন। উভয়েই খুব শক্তিশালী ছিলেন এবং একে অপরকে টিলা থেকে নীচে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করতে লাগলো। হুজুর (সা) বলেন, "তাদের মধ্য থেকে যে আগে নীচে পড়বে সেই মারা যাবে। তারপর তিনি হযরত যোবায়েরের (রা) জন্য দোয়া করলেন। কয়েক মুহূর্ত পরই উভয়েই নীচে এমনভাবে পড়লো যে মুশরিক নীচে ছিল এবং হযরত যোবায়ের (রা) তার ওপর। চোখের পলকে হযরত যোবায়ের (রা) নিজের তরবারী দিয়ে মুশরিকটির গর্দান উড়িয়ে দিলেন। তারপর হযরত যোবায়ের (রা) কুরাইশের নামকরা বাহাদুর ওবায়দা বিন সাঈদ বিন আছের সঙ্গে মোকাবিলা করলেন।

সহীহ বুখারীর রেওয়ায়াত অনুযায়ী স্বয়ং হযরত যোবায়ের (রা) এই মোকাবিলার অবস্থা এই ভাষায় বর্ণনা করেছেন ঃ

"বদরের দিন আমার মুকাবিলা হয় ওবায়দা বিন সাঈদ বিন আছের সঙ্গে তার আপাদমস্তক লোহায় ঢাকা ছিল। শুধু তার চোখ দেখা যাচ্ছিল। তার কুনিয়াত ছিল আবু জাতুল কারাশ। সে হুংকার দিয়ে বললো, আমি হলাম আবু জাতুল কারাশ। আমি আমার বর্শা দিয়ে তার ওপর হামলা করলাম এবং তাক করে তার চোখে বর্শা মারলাম। সে মারা গেল।"

হযরত যোবায়ের (রা) আবু জাতুল কারাশকে শেষ করে ফেলেছিলেন। এ সময় তিনি তার বর্শা লাশের ওপর পা রেখে খুব মুশকিলের সংগে এমনভাবে বের করলেন যে, বর্শার ফালা বাকা হয়ে গেল। মহানবী (সা) হযরত যোবায়েরের (রা) সেই বর্শা ফেরত নিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর নিকট থেকে হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) চেয়ে নিলেন। অতপর এই বর্শা ফারুকে আজমের (রা) কব্জায় আসে। ফারুকে আজমের পর হযরত যোবায়ের (রা) এই বর্শা পুনরায় ফেরত নেন। কিন্তু আমিরুল মুমিনীন উসমান (রা) জুন্নুরাইন তাঁর থেকে তা চেয়ে নেন। হযরত উসমানের (রা) শাহাদাতের পর এই বর্শা আলী (রা) পরিবারের নিকট পৌছে। অতপর হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রা) তাঁর নিকট থেকে নিয়ে নেন এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নিজের কাছে রাখেন।

হযরত যোবায়েরের (রা) যে তরবারী বদরের ময়দানে চমকিত হয়েছিল তাও এই বর্শার মত স্মরণীয় বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। বদরের দিন হযরত যোবায়ের (রা) স্বয়ং তাড়াহুড়োর সময় এই তরবারী এমনভাবে চালান যে তাতে করাতের মত দাঁত পড়ে গিয়েছিল। এই তরবারীতে রূপার কাজ করা ছিল। হযরত যোবায়েরের (রা) শাহাদাতের পর এই তরবারী তাঁর জালিলুল কদর পুত্র হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন যোবায়েরের (রা) কব্জায় আসে। সহীহ বুখারীতে হযরত উরওয়াহ (রা) বিন যোবায়ের (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, আবদুল্লাহ (রা) বিন যোবায়েরের শাহাদাতের পর খলীফা আবদুল মালিক বিন মারওয়ান উমুব্বী আমাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ

"হে উরওয়াহ! তুমি কি যোবায়েরের (রা) তরবারী চিন?

আমি বললাম ঃ "হ্যাঁ।"

আবদুল মালিক জিজ্ঞেস করলো, "তার চিহ্ন কি?"

আমি বললাম, "বদরের দিন তাতে দাঁত পড়ে গিয়েছিল?"

আবদুল ম্যালিক বললেন, "হ্যাঁ ঠিকই বলেছ। দুই বাহিনীর মুখোমুখি সংঘর্ষে তাতে দাঁত পড়ে গিয়েছিল।" তারপর সে আমাকে এই তরবারী দিয়ে দেয়।

উরওয়াহর (রা) পুত্র হিশাম বর্ণনা করেছেন যে, উরওয়াহর (রা) পর সেই পবিত্র তরবারী নিয়ে যোবায়ের (রা) পরিবারে ঝগড়া হয়। আমরা পরস্পর তার মূল্য নির্ধারণ করলাম তিন হাজার দিরহাম এবং আমাদের মধ্যে একজন তা নিয়ে নিল। হায়! আমি যদি তরবারীটা নিয়ে নিতাম।

বদরের যুদ্ধে হযরত যোবায়েরের (রা) কাঁধে এক অথবা দু'টি তরবারীর আঘাত লেগেছিল। দু'টি আঘাতের মধ্যে একটি ছিল গুরুতর। সেই আঘাতের দাগ মিশে গেলেও সেখানে গর্তের মত হয়ে গিয়েছিল। হযরত উরওয়াহ বিন যোবায়ের (রা) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি শৈশবকালে সেই গর্তে আঙ্গুল ঢুকিয়ে খেলা করতেন।

ওহোদের যুদ্ধে হযরত যোবায়ের (রা) সেই চৌদ্দজন ছাবিত কদম বা অটল সাহাবীর (রা) অন্যতম ছিলেন যারা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিশ্ব নবীর(সা) ঢাল হিসেবে দাঁড়িয়েছিলেন এবং এক মুহূর্তের জন্যও তাদের ধৈর্যের বিচ্যুতি ঘটেনি। হাফেজ ইবনে কাছির (র) ইউনুস বিন ইসহাক থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ওহোদের দিন তালহা বিন আবি তালহা মুশরিকদের ঝাণ্ডাবাহী ছিলো। যুদ্ধের ময়দানে এসে সে মুসলমানদেরকে লড়াইয়ের আহ্বান জানালো। হযরত যোবায়ের (রা) দৌড়ে তার কাছে গেলেন এবং লাফ দিয়ে তার উটে চড়ে তাকে ধাক্কা দিয়ে উট থেকে মাটিতে ফেলে দিলেন এবং নিজের তরবারী দিয়ে তাকে জবেহ করে ফেললেন। মহানবী (সা) হযরত যোবায়েরের (রা) প্রশংসা করলেন এবং বললেন ঃ

"প্রত্যেক নবীর একজন করে হাওয়ারী বা সাহায্যকারী থাকতো এবং আমার সাহায্যকারী হলো যোবায়ের (রা)। যোবায়ের (রা) যদি তাকে মুকাবিলার জন্য বের না হতো তাহলে আমি স্বয়ং তার মুকাবিলার জন্য যেতাম।" (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া)

কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত যোবায়ের (রা) তালহাকে নয় বরং তার পুত্র কিলাব বিন তালহাকে হত্যা করেছিলেন এবং তালহা বিন আবি তালহার হত্যাকারী ছিলেন হযরত আলী মুরতাজা (রা)। যাহোক, ওহোদের ময়দানে হযরত যোবায়েরের (রা) হাতে মুশরিকদের একজন নামকরা যোদ্ধা অবশ্যই নিহত হয়েছিল।

যুদ্ধকালে এক সময় বিশ্ব নবী (সা) নিজের পবিত্র তরবারী খাপ থেকে বের করলেন এবং বললেন ঃ

"কে আছে যে আজ এর হক আদায় করবে?"

হযরত যোবায়ের (রা) এবং হযরত আবু দুজানা আনসারী (রা) তিনবার এই খিদমতের জন্য নিজেদেরকে পেশ করলেন। অবশেষে হুজুর (সা) এই তরবারী হযরত আবু দুজানাকে (রা) প্রদান করলেন। এ সত্ত্বেও হযরত যোবায়েরের (রা) জীবন উৎসর্গের আবেগ ইতিহাসের পাতায় চিরস্থায়ী হয়ে রইলো।

সহীহ বুখারীতে হযরত উরওয়াহ বিন যোবায়ের (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, ওহোদের যুদ্ধে রাসূলে আকরাম (সা) যখন আহত হলেন এবং মুশরিকরা চলে গেল, তখন তিনি তাদের পুনরায় ফিরে আসার ধারণায় বললেন, "কে তাদের পিছু নেবে? সাহাবীদের মধ্য থেকে ৭০ জন এ কাজের জন্য এগিয়ে এলেন। এই সত্তর জনের মধ্যে হযরত যোবায়েরও (রা) ছিলেন।

সহীহ বুখারীতে হযরত উরওয়াহর (রা) মুখে হযরত আয়েশা সিদ্দীকার(রা) এই কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে,

اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ مِنْ بَعْدِ مَآ اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ

(ال عمران : ١٧٢)

সেই সকল সাহাবীর ব্যাপারে নাযিল হয়েছিল যারা হুজুরের (সা) এরশাদ তামিলে ওহোদের যুদ্ধের পর মুশরিকদের পিছু ধাওয়া করেছিলেন। তাদের মধ্যে হযরত যোবায়ের (রা) এবং হযরত আবু বকর সিদ্দীকও (রা) ছিলেন।

পঞ্চম হিজরীতে তাওহীদ অনুসারীরা খন্দকের মত কঠিন যুদ্ধের সম্মুখীন হন। এ সময় মুশরিকরা বিরাট এক ঢলের মত এসে মদীনার ওপর হামলা করে বসে। বিশ্ব নবী (সা) মদীনার চারপাশে খন্দক বা পরিখা খনন করে সেই বাহিনীর মুকাবিলা করেন। মুশরিকদের অবরোধ প্রায় তিন সপ্তাহ অব্যাহত ছিল। তখন যদিও কোন বড় যুদ্ধ হয়নি তবুও উভয় পক্ষের মধ্যে মাঝে মধ্যে সংঘর্ষ ঘটেছিল। হাফেজ ইবনে কাছির (র) "আল বিদায়া" গ্রন্থে ইবনে ইসহাকের উদ্ধৃতি সহ বর্ণনা করেছেন যে, পরিখার যুদ্ধের সময় একদিন নওফিল বিন আবদুল্লাহ বিন মুগিরাহ মাখজুমী নিজেদের সেনা ছাউনী থেকে বাইরে বেরিয়ে মুসলমানদেরকে যুদ্ধের জন্য আহবান জানালো। হযরত যোবায়ের (রা) বিদ্যুতবেগে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং তরবারী দিয়ে

তাকে দু' টুকরো করে ফেললেন। এ সময় তার তরবারীতে করাতের মত দাঁত পড়ে গেল। নওফিলকে নরকে প্রেরণের পর হযরত যোবায়ের (রা) একটি বীরত্ব গাঁথা পড়তে পড়তে ফিরে এলেন। গাঁথাটির ভাবার্থ হলো ঃ "আমি হলাম সেই ব্যক্তি যে নিজেকেও রক্ষা করে এবং নবী মুস্তাফা উম্মিকেও রক্ষা করে।।"

ইহুদী বনু কুরাইজা এবং মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক বন্ধুত্বের চুক্তি ছিল। কিন্তু পরিখার যুদ্ধের সময় ইহুদীদের নিয়ত বদলে গেল এবং তারা মুসলমানদের পেছনে খঞ্জর ঢুকিয়ে দেয়ার পরিকল্পনা করতে লাগলো। হক পন্থীদের জন্য এটা ছিল নাজুক সময়। হুজুর (সা) এসব গাদ্দারের অশুভ পরিকল্পনা সম্পর্কে জ্ঞাত হলেন। তিনি মুসলমানদেরকে একত্রিত করে বললেন, "বনি কুরাইজার খবর কে আনবে?" হযরত যোবায়ের (রা) অগ্রসর হয়ে আরজ করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমি যাবো"।

বিশ্ব নবী (সা) তিনবার নিজের কথার পুনরুক্তি করলেন এবং তিনবারই হযরত যোবায়ের (রা) নিজেকে সেই ভয়ংকর কাজের জন্য পেশ করলেন। হুজুর (সা) তার এই আবেগে খুব খুশী হলেন। সহীহ বুখারীতে হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, হুজুর (সা) সে সময় একথা ইরশাদ করেছিলেন।

"প্রত্যেক নবীর একজন করে হাওয়ারী হয় এবং আমার হাওয়ারী হলো যোবায়ের (রা)।"

সহীহ বুখারীতেই হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রা) থেকে এই রেওয়ায়াত বর্ণিত আছে যে, খন্দকের বা পরিখার যুদ্ধে ওমর বিন আবি সালমা এবং আমাকে মহিলাদের সঙ্গে রাখা হয়েছিল। আমি দেখলাম যে, ঘোড়ায় চড়ে যোবায়ের দুই অথবা তিনবার বনি কুরাইজার দিকে গেলেন এবং ফিরে এলেন। সন্ধ্যায় যখন আমার সংগে তাঁর মুলাকাত হলো তখন আমি বললাম আব্বাজান! আমি আপনাকে বনি কুরাইজার দিকে যেতে দেখেছিলাম। হযরত যোবায়ের (রা) বললেন ঃ

"পুত্র! তুমি আমাকে দেখেছিলে?"

আমি বললাম, "হ্যাঁ"। হযরত যোবায়ের (রা) বললেন ঃ "রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছিলেন যে, বনু কুরাইজার খবর কে আনবে। আমি খবর জানার জন্য গিয়েছিলাম। যখন ফিরে এলাম তখন হুজুর (সা) আমার জন্য নিজের মাতা-পিতাকে একত্রিত করলেন এবং বললেন, ফিদাকা আবি ওয়া উম্মি অর্থাৎ আমার মাতা-পিতা তোমার জন্য কুরবান হোক।"

অধিকাংশ চরিতকারই বর্ণনা করেছেন যে, 'ফিদাকা আবি ওয়া উম্মি" বাক্যটি রাসূলের (সা) মুখ দিয়ে হযরত যোবায়ের (রা) ইবনুল আউওয়াম এবং হযরত সায়াদ (রা) বিন আবি ওয়াক্কাস ছাড়া আর কারোর জন্যই বের হয়নি। খন্দকের যুদ্ধের পরিণতি হয়েছিল যে, ২২ দিনের অবরোধের পর কাফিররা আসমানী মুসিবত এবং মুসলমানদের অসাধারণ ধৈর্য ও অবিচলতার সামনে টিকতে না পেরে ভেগে গিয়েছিল।

খন্দকের যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই হযরত যোবায়ের (রা) বনি কুরাইজার যুদ্ধে অংশ নেন। তারপর ৬ষ্ঠ হিজরীতে বাইয়াতে রিদওয়ানের দুর্লভ সম্মানের অধিকারী হন। ৬ষ্ঠ হিজরীতে অথবা সপ্তম হিজরীর শুরুতে খায়বারের যুদ্ধ সংঘটিত হলো। এই যুদ্ধেও হযরত যোবায়ের (রা) জীবন বাজী রেখে অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করেন। ঐতিহাসিক ইবনে হিশাম বর্ণনা করেছেন যে, খায়বারের রঈস মারহাব যখন হযরত আলী মুরতাজার (রা) হাতে নিহত হলো তখন তার বিশাল বপুধারী যুদ্ধবাজ ভাই ইয়াসির ক্রোধান্বিত হয়ে ময়দানে এলো। হযরত যোবায়ের (রা) তার মুকাবিলার জন্য অগ্রসর হলেন। তাঁর আকার-আকৃতি ইয়াসিরের তুলনায় কিছুই ছিল না এবং ধারণা করা হচ্ছিল যে, সে আজ ইয়াসিরের হাত থেকে রেহাই পাবে না। তাঁর মাতা হযরত সুফিয়াও (রা) হুজুরের (সা) সঙ্গে মদীনা থেকে এসেছিলেন। তিনি অস্থির হয়ে হুজুরের (সা) নিকট আরজ করলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল! আজ আমার কলিজার টুকরা শহীদ হয়ে যাবে।"

মহানবী (সা) বললেন, "না। ইনশাল্লাহ সে দুশমনের ওপর বিজয়ী হবে।" বস্তুত কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর হযরত যোবায়ের (রা) ইয়াসিরকে হত্যা করলেন।

অষ্টম হিজরীতে যখন দশ হাজার পবিত্র নফসের সৈন্য বাহিনী মক্কায় বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করলেন তখন হযরত যোবায়ের (রা) এক বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছিলেন। তিনি মুহাজিরদের ঝাণ্ডাবাহী হিসেবে নিয়োজিত হন এবং নবীর (সা) বিশেষ ঝাণ্ডা তাকেই প্রদান করা হয়। সহীহ বুখারীতে হযরত উরওয়াহ বিন যোবায়ের (রা) থেকে মক্কা বিজয়ের ব্যাপারে বর্ণিত আছে যে, "একটি বাহিনী এলো যার সংখ্যা অন্যান্য সকল দলের চেয়ে কম ছিল। তাতে রাসূলুল্লাহ (সা) এবং কতিপয় সাহাবী ছিলেন এবং নবীর ঝাণ্ডা যোবায়ের(রা) ইবনুল আউওয়ামের নিকট ছিল।" সহীহ মুসলিমে আছে যে, মক্কা বিজয়ের দিন হযরত যোবায়ের (রা) ইসলামী বাহিনীর বাম বাহুর সরদার ছিলেন। কিন্তু অধিকাংশ চরিতকারই বুখারীর রেওয়ায়াতকে

অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং লিখেছেন, হযরত যোবায়ের (রা) সর্বশেষে ও সবচেয়ে ছোট দলে ছিলেন। রহমতে আলমও (সা) সেই দলে ছিলেন। ঐতিহাসিক ইবনে সায়াদ বর্ণনা করেছেন যে, মক্কা বিজয়ের পর যখন চারদিকে শান্তি নেমে এলো তখন হযরত যোবায়ের (রা) এবং হযরত মিকদাদ (রা) ইবনুল আসওয়াদ কিন্দি নিজের ঘোড়ার ওপর সওয়ার হয়ে রাসূলের (সা) নিকট উপস্থিত হলেন। এ সময় তাঁরা এক মহান সৌভাগ্যের অধিকারী হন। বিশ্ব নবী (সা) দাঁড়িয়ে তাঁদের চেহারা থেকে ধুলো পরিষ্কার করে দেন।

মক্কা বিজয়ের পর হুনাইনের রক্তাক্ত যুদ্ধ সংঘটিত হয়। হযরত যোবায়ের(রা) এই যুদ্ধেও বীরত্বের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। এক সময় অনেক মুশরিক নিজেদের ঘাঁটি থেকে বের হয়ে একযোগে হযরত যোবায়েরের (রা) ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। হযরত যোবায়ের (রা) একাকী এমন সাহসিকতা ও দৃঢ়তার সাথে লড়াই করেছিলেন যে, কাফিররা পালিয়ে বেঁচেছিল। হুনাইনের পর হযরত যোবায়ের (রা) তায়েফ ও তাবুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তারপর বিদায় হজ্জে তিনি রহমানবীর (সা) সহযাত্রী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন।

একাদশ হিজরীতে বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (সা) ইন্তেকাল করলে হযরত যোবায়েরের (রা) ওপর দুঃখের পাহাড় ভেঙ্গে পড়লো এবং তিনি ভগ্ন হৃদয়ে নির্জনত্ব গ্রহণ করেন। প্রথমে খিলাফত প্রশ্নে তিনি হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুকে (রা) সমর্থন করেন। [হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) তাঁর শ্বশুর ছিলেন।] কিন্তু তারপর তাঁর ধারণা বদলে যায় এবং কিছুদিন পর তিনি সকল মুসলমানের মত হযরত সিদ্দীকে আকবারের (রা) বাইয়াত করেন। দুই তিন বছর তিনি অত্যন্ত নীরবভাবে কাটান। তবে, ফারুকে আজমের (রা) খিলাফতকালে তাঁর রক্ত টগবগিয়ে উঠলো এবং নিজের ছোট বয়স্ক পুত্র আবদুল্লাহকে সঙ্গে নিয়ে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর জন্য সিরিয়া পৌঁছলেন। সে সময় সিরিয়ার সিদ্ধান্তমূলক যুদ্ধ ইয়ারমুকের ময়দানে সংঘটিত হচ্ছিল। হযরত যোবায়ের (রা) সেই যুদ্ধে বিস্ময়কর বাহাদুরী প্রদর্শন করলেন। সহীহ্ বুখারীতে তাঁর পুত্র উরওয়াহ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলের (সা) সাহাবীরা ইয়ারমুকের যুদ্ধে যোবায়েরকে (রা) বললেন, আপনি প্রচণ্ডভাবে হামলা করেন না কেন যাতে আমরাও প্রচণ্ডভাবে হামলা করতে পারি। তিনি বললেন, আমি যদি প্রচণ্ডভাবে হামলা চালাই তাহলে তোমরা মিথ্যা প্রতিপন্ন হবে। (অর্থাৎ আমাকে অনুসরণ করতে পারবে না)। লোকেরা

বললো, এমনটি হবে না। হযরত যোবায়ের (রা) কাফেরদের ওপর (এক প্রচণ্ড) হামলা করলেন, এবং তাদের ব্যূহ তছনছ করে সামনে অগ্রসর হয়ে গেলেন। কিন্তু কোন মুসলমান তাকে অনুসরণ করতে পারলো না। তিনি যখন ফিরে আসতে লাগলেন তখন কাফেররা ঘোড়ার লাগাম ধরে ফেললো এবং তাঁর কাঁধের ওপর দু'টি আঘাত হানলো। বদরের যুদ্ধেও তাঁর কাঁধে একটি আঘাত লেগেছিল। আমি শৈশবকালে সেই আঘাতের ফলে সৃষ্ট গর্তে আমার আঙুল ঢুকিয়ে খেলা করতাম।" এতো শুধু একটি ঘটনা। ওয়াকেদী, তাবারী এবং আরো কতিপয় ঐতিহাসিক ইয়ারমুকের যুদ্ধে হযরত যুবায়েরের (রা) জানবাজী ও সাহসিকতার আরো কয়েকটি ঘটনাও বর্ণনা করেছেন। এসব ঘটনা থেকে জানা যায় যে, তিনি এই রক্তাক্ত যুদ্ধে অন্যতম বিশিষ্ট বাহাদুর ছিলেন।

সিরিয়া বিজয়ের পর ইসলামী মুজাহিদরা হযরত আমর (রা) ইবনুল আছের নেতৃত্বে মিসরের ওপর চড়াও হলেন এবং সেখানকার মশহুর শহর ফুসতাত অবরোধ করলেন। ফুসতাতের দুর্গ খুব মজবুত ছিল এবং মুজাহিদদের সংখ্যা খুব স্বল্প থাকার কারণে হযরত আমর (রা) ইবনুল আছ আমিরুল মুমিনীনের নিকট সাহায্য চেয়ে পাঠালেন। ফারুকে আজম (রা) চার হাজার সৈন্য হযরত যোবায়ের (রা) ইবনুল আওয়াম, হযরত উবাদাহ (রা) বিন ছামেত, হযরত মিকদাদ (রা) বিন আসওয়াদ কিন্দী এবং হযরত মাসলামা (রা) বিন মুখাল্লাদের নেতৃত্বে প্রেরণ করলেন এবং হযরত আমরকে(রা) লিখলেন যে, "তাদের মধ্যেকার প্রত্যেক অফিসার এক হাজার সওয়ারের সমান। এ জন্য এই সৈন্য সংখ্যাকে ৮ হাজার মনে করবেন"। মিসরীয়দের প্রতিরক্ষা এত মজবুত ছিল যে, এই সৈন্য পৌঁছার পরও সাত মাস পর্যন্ত দুর্গ জয় করা যায়নি। একদিন হযরত যোবায়ের (রা) প্রচণ্ডভাবে উত্তেজিত ও আবেগাপ্লুত হয়ে পড়লেন এবং সিঁড়ি লাগিয়ে তরবারী হাতে দুর্গের প্রাচীরের ওপর চড়ে বসলেন। আরো কতিপয় মুজাহিদও তাঁকে অনুসরণ করলেন এবং প্রাচীরের ওপর চড়ে তারা নারায়ে তাকবীর ধ্বনি বুলন্দ করলেন। নীচের সৈন্যরাও না'রা দেয়া শুরু করলো। খৃষ্টানরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়লো। ইত্যবসরে হযরত যোবায়ের (রা) প্রাচীর থেকে নেমে দুর্গের দরজা খুলে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সকল ইসলামী সৈন্য ভেতরে ঢুকে পড়লেন। খৃষ্টানরা অস্ত্র সমর্পণ করলো এবং নিরাপত্তা চাইলো। হযরত আমর (রা) তাদের দরখাস্ত কবুল করলেন এবং ফুসতাতের ওপর ইসলামী পতাকা উড়িয়ে দিলেন।

ফুসতাত বিজয়ের পর হযরত যোবায়ের (রা) সিকান্দারিয়া পদানত করার ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। সিকান্দারিয়া দুর্গ ছিল খুবই মজবুত।

আর এ কারণেই তা জয় বা পদানত করা অকল্পনীয় ব্যাপার ছিল বলে ধারণা করা হতো। ইসলামী সৈন্যেরা দীর্ঘদিন যাবত তা অবরোধ করেছিলেন। অবশেষে একদিন হযরত যোবায়ের (রা) এবং মাসলামা (রা) বিন মুখাল্লাদ সৈন্য বাহিনীর কতিপয় মজবুত দল নিজেদের সঙ্গে নিলেন এবং এমন প্রচণ্ডভাবে হামলা করলেন যে, দুশমনের তাদের আনুগত্য করা ছাড়া আর কোন পথ রইলো না।

তেইশ হিজরীতে সাইয়েদেনা ফারুকে আজম (রা) শাহাদাতের পেয়ালা পান করলেন। তিনি শাহাদাতের পূর্বে হযরত উসমান (রা), হযরত আলী (রা), হযরত তালহা (রা), হযরত যোবায়ের (রা), হযরত আবদুর রহমান (রা) বিন আওফ এবং হযরত সায়াদ (রা) বিন আবি ওয়াক্কাসের নাম মুসলমানদের সামনে পেশ করে ওসিয়ত করলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) এই ছ'জন বুজর্গের প্রতি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন। এ জন্য আমার পর এই ছ'জনের মধ্য থেকে একজনকে খিলাফতের দায়িত্ব অর্পণ করতে হবে। তারা সকলেই হযরত আবদুর রহমান বিন আওফকে সালিশ মানলেন। তিনি প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট থেকে ব্যক্তিগতভাবে মত নেয়ার পর হযরত উসমানের (রা) পক্ষে রায় দিলেন। হযরত যোবায়ের (রা) এই নির্বাচনকে কালবিলম্ব না করে মেনে নিলেন এবং হযরত উসমানের (রা) হাতে বাইয়াত করেন। কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে যে, এ সময় হযরত যোবায়ের (রা) উদারতা প্রদর্শন করে হযরত আলীর (রা) পক্ষে রায় দিয়েছিলেন। কিন্তু বেশীরভাগ মত হযরত উসমানের (রা) পক্ষে ছিল। সুতরাং তিনি মজলিসে শুরার সিদ্ধান্তের সামনে মাথা নত করে দিলেন।

আমীরুল মুমিনীন হযরত উসমানের (রা) খিলাফতকালে হযরত যোবায়ের (রা) পুনরায় নির্জনত্ব গ্রহণ করেন এবং সব ধরনের বিশৃংখলা থেকে দূরে সরে থাকেন। কিন্তু সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে তাঁর প্রচণ্ড প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল। একবার নাক দিয়ে রক্ত পড়ার কারণে হযরত উসমান (রা) হজ্জ করতে অক্ষম হয়ে পড়লেন। বরং জীবন সম্পর্কেই নিরাশ হয়ে পড়লেন। এ সময় জনগণের দাবীর পরিপেক্ষিতে তিনি হযরত যোবায়েরকে (রা) আমীরে হজ্জ এবং নিজের স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করলেন। তিনি কসম খেয়ে একথাও বললেন যে, অবশ্যই যোবায়ের (রা) তোমাদের মধ্যে উত্তম এবং রাসূলুল্লাহ(সা) তোমাদের চেয়ে তাঁকে বেশী ভলবাসতেন। (সহীহ বুখারী—কিতাবুল মানাকিব)

৩৫ হিজরীতে বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীরা মদীনা মুনাওয়ারাতে নিজেদের রাজত্ব কায়েম এবং খলিফার বাসস্থান অবরোধ করে নিলো। এই নাযুক মুহূর্তে

হযরত যোবায়ের (রা) নিজের বড় পুত্র আবদুল্লাহকে (রা) খলিফার বাড়ীতে হেফাজতের জন্য নিয়োগ করলেন। কিন্তু একদিন বিদ্রোহীরা অন্যদিক থেকে প্রাচীর টপকে খলীফার ঘরে ঢুকে পড়লো এবং আমীরুল মু'মিনীন হযরত উসমান (রা) জুন্নুরাইনকে অত্যন্ত নৃশংসভাবে শহীদ করে ফেললো। আমীরুল মু'মিনীনের এই নৃশংসভাবে শাহাদাতে হযরত যোবায়ের (রা) খুব দুঃখ পেলেন। এদিকে বিদ্রোহীরা এত নির্মম ছিল যে তারা আমীরুল মু'মিনীনের(রা) কাফন দাফনেও সম্মত ছিল না। শেষে হযরত যোবায়ের (রা) এবং কতিপয় মুসলমান জীবন বাজী রেখে হযরত উসমানকে (রা) শহীদের কাফন পরান এবং রাতের সময় গোপনে হযরত যোবায়ের (রা) তাঁর জানাযার নামায পড়ান এবং মদীনা থেকে কিছু দূরে হাশ কাওকাব নামক স্থানে তাকে দাফন করেন।

হযরত উসমান গনির (রা) শাহাতাদের পর সাইয়েদেনা আলী মুরতাজা (রা) খলীফার পদে সমাসীন হন। তাঁর খিলাফতকালের প্রথমেই পরিস্থিতি ও ঘটনাবলী ভিন্নদিকে মোড় নেয়। হযরত উসমানের (রা) কিসাসের প্রসঙ্গে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুর মুকাবিলায় সংশোধনের ঝাণ্ডা তুলে ধরলেন। হযরত যোবায়ের (রা), হযরত তালহা (রা) এবং অন্য কতিপয় সাহাবী উম্মুল মু'মিনীনের (রা) উৎসাহী সমর্থক ছিলেন। অন্যদিকে আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী মুরতাজার (রা) সঙ্গেও জালিলুল কদর সাহাবীর একটি বিরাট দল ছিলেন। ৩৬ হিজরীর ১০ই জমাদিউস সানিতে সমকালীন যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষদের মধ্যে চরম দুঃখজনক উষ্ট্রের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মুসতাদরাকে হাকিমের রেওয়ায়াত অনুযায়ী যুদ্ধ শুরুর পূর্বে সাইয়েদেনা আলী মুরতাজা (রা) একাকী ঘোড়ায় চড়ে ময়দানে তাশরীফ নিলেন এবং হযরত যোবায়েরকে (রা) ডেকে বললেন ঃ

"আবু আবদুল্লাহ! তোমার কি সেদিনের কথা স্মরণ আছে যেদিন আমরা উভয়ে পরস্পর হাত ধরাধরি করে রাসূলের (সা) সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম। হুজুর (সা) তোমার নিকট জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আলীর সঙ্গে কি তোমার বন্ধুত্ব আছে? তুমি ইতিবাচক জবাব দিয়েছিলে। এ সময় হুজুর (সা) বলেছিলেন, একদিন তুমি আলীর সঙ্গে অন্যায় যুদ্ধে লিপ্ত হবে।"

হযরত যোবায়ের (রা) জবাব দিলেন, "হ্যাঁ, আমার স্মরণ হয়েছে।"

হযরত আলী (রা) একথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে স্ববাহিনীতে ফিরে গেলেন। কিন্তু হযরত যোবায়েরের (রা) অন্তরের জগতে পরিবর্তন এলো। তিনি সেই

সময়ই যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে বসরা রওয়ানা হয়ে গেলেন। আমর বিন জারমুজ নামক এক ব্যক্তি ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে তাঁর পিছু ধাওয়া করলো। হযরত যোবায়ের (রা) বসরা পৌঁছে নিজের গোলামকে সামান ও আসবাবসহ রওয়ানা হওয়ার হেদায়াত দিলেন এবং স্বয়ং বসরার জনবসতি থেকে দূরে চলে গেলেন। এ সময় ইবনে জারমুজ ঘোড়া দৌড়ে তার নিকট পৌছলো এবং জিজ্ঞাসা করলো, "আবু আবদুল্লাহ! আপনি কওমকে কেমন রেখে এসেছেন?"

হযরত যোবায়ের (রা) ঃ "লোকজন পরস্পরের রক্ত বহানোর জন্য অস্থির হয়ে উঠেছে।"

ইবনে জারমুজ ঃ "আপনি কোথায় যাচ্ছেন?"

হযরত যোবায়ের (রা) ঃ "আমি আমার ভুল বুঝতে পেরেছি এবং এখন আমি সেই হাঙ্গামা থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে কোন দিকে চলে যেতে চাই।"

ইবনে জারমুজ বললো, তাহলে আমিও আপনার সঙ্গে যাবো। কিছুদূর যাওয়ার পর যোহরের নামাযের সময় হয়ে গেল। হযরত যোবায়ের (রা) নামায পড়ার জন্য নামলেন। ইবনে জারমুজ বললো, আমিও আপনার সঙ্গে নামায পড়বো।

হযরত যোবায়ের (রা) বললেন, "আমি তোমাকে নিরাপত্তা দিচ্ছি। তুমিও কি আমার ব্যাপারে এটা করবে?"

ইবনে জারমুজ বললো, "অবশ্যই।"

এই ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতির পর উভয়েই ঘোড়া থেকে নেমে নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন। হযরত যোবায়ের (রা) যেই সিজদায় গেলেন সেই আমর বিন জারমুজ গাদ্দারী করে তার গর্দানের ওপর তরবারীর আঘাত হানলো এবং হাওয়ারীয়ে রাসূলের (সা) পবিত্র মাথা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেললো। তারপর সে হযরত যোবায়েরের (রা) যিরাহ, তরবারী এবং মাথা নিয়ে আমীরুল মু'মিনীন আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুর খিদমতে উপস্থিত হলো। আশা ছিল আমীরুল মু'মিনীন তার কাজের প্রশংসা করবেন। কিন্তু শেরে খোদা হযরত যোবায়েরের (রা) তরবারীর দিকে বেদনার্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন ঃ

"এই তরবারী রাসূলের (সা) সামনে থেকে দুশনের মেঘমালা সরিয়ে দিয়েছে। হে ইবনে সুফিয়ার (রা) হন্তা। তোমার জন্য জাহান্নামের সুসংবাদ।"

বর্ণিত আছে যে, এ সময় ইবনে জারমুজ নিরাশ অবস্থায় এই কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন ঃ

"আমি আলীর (রা) নিকট যোবায়েরের (রা) মাথা নিয়ে হাজির হলাম। এ কাজের বিনিময়ে আমি তার সান্নিধ্য আশা করেছিলাম। আমি যখন তাঁর নিকট গেলাম তখন সে আমাকে জাহান্নামের সুসংবাদ দিলো। এই সুসংবাদ ছিল কত খারাপ আর তোহ্ফাও দিল কত মন্দ।"

শাহাদাতের সময় হযরত যোবায়েরের (রা) বয়স ৬৪ বছর ছিল। শাহাদাতস্থল আসসিবা উপত্যকাতেই তাকে দাফন করা হয়। এই দুঃখজনক ঘটনার কয়েক বছর পূর্বে হযরত যোবায়ের (রা) এবং হযরত আসমার (রা) মধ্যে কতিপয় কারণে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু হযরত আসমা (রা) যেই তাঁর শাহাদাতের খবর পেলেন সেই শোকে ও দুঃখে মুহ্যমান হয়ে পড়লেন এবং অবলীলাক্রমে তার মুখ দিয়ে উচ্চারিত হলো এই মরসিয়া ঃ

"ইবনে জারমুজ যুদ্ধের দিন এক বুলন্দ হিম্মত অশ্বারোহীর সঙ্গে গাদ্দারী করলো এবং গাদ্দারীও এমন অবস্থায় করলো যে, সে একাকী ও সামানহীন অবস্থায় ছিল।

হে আমর! তুই যদি পূর্বেই তাকে সতর্ক করে দিতি তাহলে তুই তাকে এমন ব্যক্তি হিসেবে পেতি যে, না তার অন্তরে ভীতি সৃষ্টি হতো এবং না হাত কাঁপতো।

তোর মা তোর জন্য ক্রন্দন করুক। তুই একজন মুসলমানকে (অন্যায়ভাবে) হত্যা করেছিস। তোর ওপর অবশ্যই আল্লাহর আজাব নাযিল হবে।" ইবনে আছিরের বক্তব্য অনুযায়ী হযরত আতিকা (রা) বিনতে যায়েদ এই কবিতা বলেছিল]

হযরত যোবায়ের (রা) জীবনে বিভিন্ন সময়ে সাতটি বিয়ে করেছিলেন। স্ত্রীদের নাম হলো ঃ হযরত আসমা (রা) বিনতে আবুবকর সিদ্দীক (রা), হযরত উম্মে খালিদ (রা) বিনতে খালিদ (রা) বিন সাঈদ বিন আছ, রাবাব(রা) বিনতে আনিফ, যয়নব (রা) বিনতে মুরছাদ, হযরত উম্মে কুলছুম (রা) বিনতে উকবা, হালাল (রা) বিনতে কায়েস এবং আতিকা (রা) বিনতে যায়েদ বিন আমার বিন নোফায়েল।

সহীহ বুখারী থেকে জানা যায় যে, হযরত যোবায়ের (রা) শাহাদাতকালে চার স্ত্রী, ৯ পুত্র এবং ৯ কন্যা রেখে যান। পুত্রদের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ(রা), উরওয়াহ (রা), মানযার (রা) [তাঁরা হযরত আসমার (রা)

গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন] এবং মাসয়াব (র) [রাবাব (রা) বিনতে আনিফের গর্ভে] ইসলামী ও ইলমী খিদমতের জন্য খ্যাতি লাভ করেন।

হযরত যোবায়ের (রা) খুব দীর্ঘাকৃতির ছিলেন। তিনি যখন ঘোড়ায় সওয়ার হতেন তখন পা মাটিতে ঠেকে যেত। গোধুম বর্ণ এবং মাথায় ছিল ঘন চুল। দাড়ি ছিল হালকা।

বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সা) হযরত যোবায়েরকে (রা) মদীনার উপকূলে কিছু জমি দান করেছিলেন। এ জমি তিনি স্বহস্তে আবাদ করতেন। খায়বর জয়ের পর হুজুর (সা) তাঁকে বনু নাজিরের একটি খেজুরের বাগান দিয়েছিলেন। হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রা) খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর হযরত যোবায়েরকে (রা) জরিফ নামক স্থানে একটি জায়গীর দান করেছিলেন। তাঁর পর হযরত ওমর ফারুক (রা) আকিক নামক স্থানে একখণ্ড সবুজ শ্যামল জমি দিয়েছিলেন। বদরী সাহাবী হওয়ার কারণে সরকারের পক্ষ থেকে তিনি যুক্তিযুক্ত বৃত্তি পেতেন। সময় সময় গনিমতের মাল থেকেও প্রচুর পরিমাণ পেতেন। সর্বোপরি আল্লাহপাক তাঁর ব্যবসায়ে প্রচুর বরকত দিয়েছিলেন। এভাবে তিনি ধনীদের কাতারভুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। জমি ছাড়াও বিভিন্নস্থানে তাঁর ১৫টি বাড়ীও ছিল (১১টি মদীনায়, দু'টি বসরায়, একটি কুফাতে এবং একটি মিসরে)। শাহাদাতের সময় তাঁর অস্থাবর সম্পত্তির মূল্য ছিল আনুমানিক পাঁচ কোটি ২ লাখ দিরহাম কিন্তু নজিরবিহীন উদারতা এবং দানশীলতার জন্য তিনি ২২ লাখ দিরহাম ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। শাহাদাতের পর এই ঋণ তাঁর সম্পত্তি থেকে আদায় করা হয়।

সাইয়্যেদেনা হযরত যোবায়ের (রা) ফজিলত ও প্রশংসার আসমানে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন। রাসূলের (সা) যুগে তিনি সব ধরনের মর্যাদা এবং সম্মান লাভ করেছিলেন। তিনি দ্বীন গ্রহণের প্রশ্নেও এমন অগ্রগামী ছিলেন যে, ১২ অথবা ১৬ বছর বয়সে হক মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরেন। সে সময় এ ধরনের কাজ তরবারীর তীক্ষ্ণ ধারের ওপর জীবন সঁপে দেয়ার নামান্তর ছিল। সেই ভয়ংকর যুগে সর্বপ্রথম মহানবীর (সা) সমর্থনে তরবারী ধরেন, হক পথে সব ধরনের মুসিবত সহ্য করেন এবং দুই হিজরতের সৌভাগ্য লাভ করেন। বদর থেকে শুরু করে তাবুক পর্যন্ত প্রতিটি যুদ্ধেই আশ্চর্য ধরনের বীরত্ব ও সাহসিকতার প্রমাণ দেন। হক পথে এত আঘাত পেয়েছিলেন যে শরীরের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য এমন কোন অংশ ছিল না যা ক্ষতের নিশানা শূন্য ছিল। হাওয়ারীয়ে রাসূলের (সা) সুমহান লকব হাসিল করেছিলেন। বাইয়াতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য হয়েছিল। রাসূলের (সা) পবিত্র মুখে

জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছিলেন। সিরিয়া ও মিসরের জিহাদে নজীরবিহীন বাহাদুরী প্রদর্শন করেন। শাহাদাতের পেয়ালাও পান করেছিলেন এমন অবস্থায় যে, মাথা সিজদারনত এবং মুখে তাকবীর উচ্চারিত হচ্ছিল।

হযরত যোবায়েরের (রা) চরিত্রও বিভিন্ন ধরনের ফুলে সুশোভিত ছিল। ইনফাক ফী সাবীলিল্লাহ বা আল্লাহর পথে ব্যয়, যুহদ ও তাকওয়া, আল্লাহভীতি, নিজের চেয়ে অন্যকে প্রধান্য দান এবং আমানতদারী ছিল তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সহীহ্ বুখারীতে আছে যে, হযরত যোবায়ের (রা) নিজের সকল বাড়ী (১৫টির মধ্যে ১৫টিই) হক পথে দান (ওয়াকফ) করেছিলেন। এমনিভাবে বাইহাকী মুগিছ বিন সামনী (রা) থেকে এবং আবু নঈম (রা) সাঈদ বিন আজীজ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত যোবায়েরের (রা) এক হাজার গোলাম ছিল। এসব গোলাম প্রতিদিন তাঁকে খিরাজ আদায় করতো (অর্থাৎ তারা যে কাজ করতো তার মজুরির নির্দিষ্ট অংশ হযরত যোবায়েরকে (রা) আদায় করত)। হযরত যোবায়েরের (রা) সকল অর্থ তৎক্ষণাৎ দান করতেন এবং নিজের গৃহে এমনভাবে প্রবেশ করতেন যে, তার নিকট এক দিরহামও অবশিষ্ট থাকতো না।

হযরত যোবায়েরের (রা) দিয়ানত এবং আমানতের খুবই সুখ্যাতি ছিল। লোকেরা শুধু নিজেদের মালমাত্তাই তাঁর নিকট আমানত রাখতেন না বরং মৃত্যুর সময় তাদের সন্তান ও মালের রক্ষক বানানোর আকাংখা প্রকাশ করতো। বস্তুত হযরত উসমান জুন্নুরাইন (রা), হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন মাসউদ এবং হযরত আবদুর রহমান (রা) বিন আওফের মত জালিলুল কদর সাহাবীবৃন্দ তাঁকে নিজেদের ওসি বানিয়েছিলেন। সহীহ্ বুখারীতে হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত যোবায়ের (রা) এ জন্য খ্যাত হয়ে গিয়েছিলেন যে, লোকজন তার নিকট মাল নিয়ে আসতো এবং আমানত হিসেবে তা রেখে দিত। যোবায়ের (রা) বলতেন যে এতো আমানত নয় বরং অতীত বস্তু। কেননা আমি তা খরচ হয়ে যাওয়ার ভয় করি।

যুহদ ও তাকওয়া এবং আল্লাহভীতির ব্যাপারটা এমন ছিল যে, প্রতিটি ব্যাপারেই নবীর সুন্নাত অনুসরণের চেষ্টা করতেন এবং খুব সাধারণ ব্যাপারেও আল্লাহর ভয়ে কেঁপে উঠতেন। কুরআনে হাকিমে বর্ণিত কিয়ামতের বর্ণনা সম্বলিত কোন আয়াত শুনলেই ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়তেন। হযরত যোবায়ের (রা) যদিও হাওয়ারীয়ে রাসূল ছিলেন এবং বছরের পর বছর ধরে রাসূলের ফয়েজ লাভ করেছিলেন তবুও পূর্ণ আল্লাহভীতির কারণে হাদিস কমই বর্ণনা

করতেন। সহীহ বুখারীতে হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রা) তাঁর হাদিস কম বর্ণনার কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন ঃ

"আমি যোবায়েরকে (রা) বললাম, আমি আপনাকে রাসূলের (সা) নিকট থেকে হাদিস বর্ণনা করতে শুনি না। যেমন অমুক অমুক হাদিস বর্ণনা করেন। তিনি বললেন, আমি হুজুরের (সা) সঙ্গ কখনো ত্যাগ করিনি। কিন্তু তাঁকে বলতে শুনেছি যে, যে আমার ব্যাপারে মিথ্যা বলে (অর্থাৎ আমার সঙ্গে মিথ্যা সংশ্লিষ্ট করে) তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম।"

হযরত যোবায়ের (রা) থেকে মোট ৩৮টি হাদিস বর্ণিত আছে। এসব হাদিসের অধিকাংশই আখলাক সম্পর্কিত।

ফারুকে আজম (রা) নিজের শাহাদাতের পূর্বে যে ছ'জন বুজর্গকে খিলাফতের জন্য মনোনীত করেছিলেন তাঁদের মধ্যে হযরত যোবায়েরও (রা) ছিলেন। কিন্তু তিনি নিজের চেয়ে অন্যকে প্রাধান্য দেয়ার স্বভাবের পরিচয় এমনভাবে দিয়েছিলেন যে, হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুর সমর্থনে নিজের নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন এবং মজলিসে শূরা যখন হযরত উসমান জুন্নুরাইনের (রা) সমর্থনে সিদ্ধান্ত প্রদান করেন তখন তিনি টুশব্দ না করে হযরত উসমানের (রা) বাইয়াত করেন।

হযরত যোবায়ের (রা) সঠিক অর্থে মর্দে মুমিন ছিলেন এবং কোন ব্যক্তিকে হঠাৎ করে অথবা ধোঁকা দিয়ে হত্যা করা কোন অবস্থাতেই বৈধ বা জায়েয মনে করতেন না। মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে আছে যে, তিনি যখন হযরত আয়েশা সিদ্দীকার (রা) সঙ্গে দাওয়াতে ইসলাহ'র বা সংশোধনের দাওয়াতের ঝাণ্ডা উড্ডীন করলেন তখন এক ব্যক্তি তাঁকে বললেন যে, আপনি ইঙ্গিত দিলে আলীকে (রা) হত্যা করে ফেলবো। তিনি বললেন, তুমি এ কাজ কিভাবে করবে। আলীর (রা) নিকট তো বিরাট বাহিনী রয়েছে। সে বললো, আমি আলীর (রা) বাহিনীতে একজন সিপাহী হিসেবে ঢুকে পড়বো এবং কোন সময় সুযোগ বুঝে তাঁর গর্দান উড়িয়ে দিব। তিনি বললেন, অবশ্যই নয়। আমি রাসূল (সা) থেকে শুনেছি, "হঠাৎ করে হত্যার জিঞ্জির হলো ঈমান। এ জন্য কোন মুমিন কাউকে হঠাৎ করে যেন হত্যা না করে।"

হযরত যোবায়ের (রা) খুব মর্যাদাবান ছিলেন। রাসূলের (সা) কবি হযরত হাসসান বিন ছাবিত তাঁর শানে কাসিদাহ রচনা করেছেন এবং তাতে হযরত যোবায়েরের (রা) মর্যাদা অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের ভাষায় বর্ণনা করেছেন। সেই কাসিদার কতিপয় পংক্তি এখানে উল্লেখ করা হলো ঃ

"তিনি নবীর (সা) প্রতিশ্রুতি ও সুন্নাতের ওপর কায়েম ছিলেন। তিনি হলেন হুজুরের (সা) হাওয়ারী এবং কাজেই তার সত্যতা প্রমাণিত হয়।

তিনি এমন মশহুর অশ্বারোহী এবং বাহাদুর, যিনি সেই দিন হামলা করতেন যখন মানুষ (যুদ্ধের) ভয়ে লুকিয়ে ফিরতো।

রাসূলের (সা) সঙ্গে তাঁর নিকটাত্মীয়ের সম্পর্ক ছিল এবং তিনি সেই ব্যক্তি যাঁর দ্বারা ইসলামের সাহায্য হয়েছে।"

হযরত মিকদাদ (রা) বিন আমর (আল আসওয়াদ)

"হে আল্লাহর রাসূল! আমরা সে রকম নই যে মূসার (আ) কওমের মত বলে দেব যে,

فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاَّ اِنَّا هٰهُنَا قٰعِدُوْنَ (المائده - ٢٤)

অর্থাৎ, তুমি এবং তোমার রব গিয়ে লড়াই কর এবং আমরা তো এখানে বসে থাকবো। আমরা তো বরং বলি যে চলুন, যেদিকে আপনার রব আপনাকে হুকুম দিচ্ছেন, সেদিকে চলুন। সেই আল্লাহর কসম যার কুদরতের কব্জায় আমাদের জীবন রয়েছে এবং যিনি আপনাকে হকের সঙ্গে প্রেরণ করেছেন। আমরা আপনার ডাইনে লড়াই করবো এবং বামে লড়াই করবো, সামনে লড়াই করবো এবং পিছনে লড়াই করবো এবং আল্লাহর কসম যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের মধ্য থেকে একটি চোখও পলক ফেলবে ততক্ষণ আপনার সঙ্গ পরিত্যাগ করবো না।"

হক এবং বাতিলের প্রথম যুদ্ধ বদরে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে দীর্ঘ দেহী, বলিষ্ঠ, মাথায় ঘন চুল এবং মুখমণ্ডলে সুন্দর দাঁড়ি বিশিষ্ট এক ব্যক্তি অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে উপরিউক্ত বাক্যাবলী মহানবীর (সা) খিদমতে পেশ করছিলেন এবং আনন্দের আতিশয্যে হুজুরের (সা) পবিত্র চেহারা প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠছিল। এই বাক্যাবলী শুধু রহমতে আলমকেই খুশী করেনি বরং সে সময় উপস্থিত রাসূলের (সা) সকল পতঙ্গেরই রক্ত উত্তপ্ত করে তুলেছিল। বীরত্বের আবেগে তাদের চেহারা লাল হয়ে গিয়েছিল এবং বাহুর মাশল ফুলে ফুলে উঠছিল। অতপর যখন বিশ্ব নবী (সা) এই সাহাবীর জন্য দোয়া করলেন তখন প্রত্যেকেই ঈর্ষান্বিত হলো যে, হায়! এই বাক্যাবলী যদি তার মুখ দিয়ে বের হতো! ইতিহাসের পাতায় স্থায়ীভাবে অংকিত হয়ে যাওয়া বাণী বলার সৌভাগ্য দ্বীনে হকের যে জীবন উৎসর্গকারীর লাভ হয়েছিল তিনি ছিলেন আবুল আসওয়াদ মিকদাদ (রা) বিন আমর। আত্মোৎসর্গের আবেগের নজিরবিহীন ঘটনা তাঁকে সাহাবায়ে কিরামের (রা) দৃষ্টিতে অত্যন্ত প্রিয় সম্মানের পাত্র বানিয়ে দিয়েছিল। হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন মাসূদ বলতেন ঃ

"বদরের যুদ্ধে মিকদাদের সঙ্গী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ আমার নিকট এত প্রিয় যে দুনিয়াপূর্ণ নেয়ামতসমূহও তার সামনে খুবই নগণ্য ব্যাপার।"

বয়স কম হওয়ার কারণে হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রা) বদরের যুদ্ধে শরীক হতে পারেননি। তিনি বলতেন ঃ

"হায়! আমি যদি বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণের যোগ্য হতাম এবং এই বাক্যাবলী আমার মুখ দিয়ে বের হতো!"

চরিত গ্রন্থসমূহে হযরত মিকদাদের (রা) পুরো নাম চারভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। তাহলো ঃ মিকদাদ বিন আমর বাহরাবী, মিকদাদ বিন আমর কিন্দী, মিকদাদ বিন আসওয়াদ আল কিন্দী আল হাজরামী এবং মিকদাদ বিন আল আসওয়াদ কারশী আযযাহরী।

তাঁকে বাহরাবী এ জন্য বলা হয়েছে যে, তাঁর পিতা ও পিতামহের জন্মভূমি ছিল বাহরা। অথবা অন্যসব রেওয়ায়াত অনুযায়ী তাঁর সম্পর্ক ছিল বাহরা বিন আমরের কবিলার সঙ্গে। এই গোত্র হলো কাজায়ার একটি শাখা। বর্ণিত আছে যে, হযরত মিকদাদের (রা) জন্মের পূর্বে তার গোত্রের জনৈক ব্যক্তি প্রতিবেশী কোন ব্যক্তিকে হত্যা করেছিল। সুতরাং মিকদাদের (রা) পিতা আমর বিন স্যা'লাবা কিসাসের ভয়ে পালিয়ে কিন্দাহ চলে গিয়েছিলেন। এই কিন্দাহ ছিল হাজরা মাওতের (ইয়েমেন) জিলাসমূহের একটি শহর। সেখানে কিন্দী বংশের শাসন ছিল। আমর বিন সা'লাবা বনু কিন্দার সঙ্গে মিত্রতা বা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা এবং একজন কিন্দী মহিলাকে বিয়ে করেন। হযরত মিকদাদ (রা) সেই মহিলার গর্ভে কিন্দাহতে জন্ম গ্রহণ করেন এবং সেখানেই যৌবনপ্রাপ্ত হন। এই সম্বন্ধের দিক থেকে তাঁকে কিন্দী এবং হাজরামী বলা হয়ে থাকে। হযরত মিকদাদের (রা) তখন যৌবনকাল। বনু কিন্দার একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি আবি শামার বিন হাজার আল কিন্দীর সঙ্গে তার ঝগড়া হলো। মিকদাদ (রা) খুব তাগড়া যুবক ছিলেন। তিনি তরবারী দিয়ে আবি শামারকে ঘায়েল করে ফেললেন এবং স্বয়ং নিজের খান্দানসহ পালিয়ে মক্কা গিয়ে উপস্থিত হলেন। এখানে তিনি আসওয়াদ বিন আবিদ ইয়াযুদ কারাশী আযযাহারীর সঙ্গে মিত্রতা পূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করে তার আশ্রয় গ্রহণ করলেন। শীঘ্রই তিনি নিজের শক্তিমত্তা, বীরত্ব এবং সুন্দর আচরণের মাধ্যমে আসওয়াদ বিন আবদি ইয়াগুছের সুদৃষ্টি ভাজন হলেন এবং সে তাঁকে পোষ্যপুত্র বানিয়ে নিল। এই পোষ্যপুত্রের ভিত্তিতে তিনি মিকদাদ বিন আল আসওয়াদ কারাশীর আযযাহারী নামে খ্যাত হয়ে গেলেন। এটাই কিয়াস করা হয় যে, উদয়ুহুম লি আবায়িহিম (লোকদেরকে তাদের পিতার সম্বন্ধে ডেকো) এই নির্দেশ নাযিলের পর তাঁকে মিকদাদ বিন আমরই বলা হয়ে থাকতো। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো যে, বিভিন্ন রেওয়ায়াতে তাঁর নাম "মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ"ই বর্নিত হয়েছে।

ঐকমত্য অনুসারে তাঁর কুনিয়াত ছিল আবুল আসওয়াদ। কতিপয় রেওয়ায়াত থেকে প্রকাশ পায় যে কখনো কখনো হুজুর (সা) স্বয়ং তাঁকে "আবুল আসওয়াদ" বলে ডাকতেন।

মক্কায় হযরত মিকদাদের (রা) অবস্থানের পর কেবলমাত্র কিছুদিন কেটেছিল। এ সময়ের মধ্যেই ইসলামের ধুমধাম পড়ে গেল। যুবক মিকদাদকে আল্লাহ তায়ালা সুশ্রীর সঙ্গে সুন্দর প্রকৃতিও দান করেছিলেন। যেইমাত্র তৌহিদের দাওয়াত তাঁর কানে পৌছলো তৎক্ষণাৎ তিনি ইতস্তত না করেই তাতে সাড়া দিলেন এবং নবীর (সা) আস্তানাতে উপস্থিত হয়ে নিজের হাত সারওয়ারে আলমের (সা) পবিত্র হাতে রাখলেন। এটা সেই যুগ ছিল যখন বাহ্যিকভাবে তাওহীদের দাওয়াতের সফলতা অসম্ভব বলে পরিদৃষ্ট হতো এবং তাওহীদের সন্তানদের একটি ছোট্ট দল মুশরিকদের ভয়ানক নির্যাতনের শিকার হয়েছিল। মিকদাদ (রা) বিদেশী ছিলেন। কিন্তু বুকে ছিল ইস্পাতের অন্তর। পরীক্ষার সময় তিনি বীরত্বের সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং অটলতা ও ত্যাগের এমন প্রদীপ জ্বাললেন যা অনন্তকাল পর্যন্ত উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। এক রেওয়ায়াতে আছে যে, তিনি সাত মুসলমানের অন্যতম ছিলেন যাঁরা সর্বপ্রথম সাকিয়ে কাওসারের (সা) পবিত্র হাতে তাওহীদের পাত্র পান করেছিলেন। কিন্তু অন্যান্য অনেক রেওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, সে সময় হক পন্থীদের সংখ্যা তার থেকেও বেশী হয়েছিল। যাহোক, তিনি যে অগ্রগামী মুসলমান ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। ইসলাম গ্রহণের পর অন্যান্য মুসলমানের মত তিনিও মুশরিকদের নির্যাতনের নিগড়ে আবদ্ধ হয়ে পড়েন। কাফেরদের নির্যাতনের মাত্রা যখন সীমা ছাড়িয়ে গেল তখন হুজুরের (সা) ইংগিতে হাবশা বা আবিসিনিয়া হিজরত করলেন। সকল চরিতকারই হাবশার দ্বিতীয় হিজরতের ৮৩ জন মুহাজিরের উল্লেখের সময় তাঁর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। হাবশায় একটি সময় পর্যন্ত উদ্বাস্তুর জীবন অতিবাহিত করার পর মক্কা ফিরে এলেন। সে সময় মুসলমানরা মদীনা হিজরতের অনুমতি পেয়েছিলেন এবং তারা অব্যাহতভাবে স্বদেশভূমি ত্যাগ করে মদীনা গমন করছিলেন। হযরত মিকদাদ (রা) এবং তাঁর একজন সঙ্গী হযরত উতবাহ (রা) বিন গাযওয়ানের পথে এমন কিছু বাধা এসে দাঁড়ায় যে, তাঁরা বেশ কিছু দিন যাবত মদীনা রওয়ানা হতে পারেননি। এমনকি বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফাও (সা) হিযরত করে মদীনা তাশরীফ রাখেন। এই রেওয়ায়াত আল্লামা ইবনে আছিরের (রা) তাবকাতে ইবনে সায়াদের এক রেওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, হযরত মিকদাদ (রা) হুজুরের (সা) পূর্বে মদীনা গিয়েছিলেন এবং হযরত কুলসুম (রা) বিন হাদমের বাড়ীতে অবস্থান করেছিলেন। ইবনে আছির

বর্ণনা করেছেন, প্রথম হিজরীর শওয়াল মাসে দুশ' মানুষের সমন্বয়ে গঠিত মক্কার মুশরিকদের একটি সৈন্যবাহিনী আকরামা বিন আবি জেহেলের নেতৃত্বে (অথবা অন্য রেওয়ায়াত অনুযায়ী আবু সুফিয়ান) মদীনার দিকে রওয়ানা দেয়। হযরত মিকদাদ (রা) এবং হযরত উতবাহ (রা) বিন গাযওয়ানও কোন বাহানায় সেই বাহিনীতে শামিল হন। রাসূলে আকরাম (সা) মুশরিকদের এই তৎপরতা সম্পর্কে খবর পেয়ে হযরত উবায়দাহ ইবনুল হারিছের (রা) নেতৃত্বে ৬০ জন মুজাহিদের একটি দলকে মুশরিকদের বিরুদ্ধে মুকাবিলার জন্য প্রেরণ করলেন। ইতিহাসে এই ঘটনা সারিয়ায়ে নাবেগা নামে প্রসিদ্ধ। মুশরিকরা মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ না করে টহল দিয়ে ফিরে গেল। অবশ্য হযরত মিকদাদ (রা) এবং উতবাহ (রা) সুযোগ পেয়ে মুসলমানদের সঙ্গে মিলিত হলেন এবং তাঁদের সঙ্গে মদীনা মুনাওয়ারা পৌছে হুজুরের (সা) খিদমতে হাজির হলেন।

হিজরতের প্রথম যুগে হযরত মিকদাদ (রা) অত্যন্ত দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে জীবন কাটান। রহমতে আলম (সা) তা জানতে পেয়ে হযরত মিকদাদ (রা) এবং তাঁর মত দু'জন আরো গরীব মুহাজিরের খরচ-খরচা নিজের কাঁধে নিলেন। সহীহ মুসলিমে হযরত মিকদাদের (রা) যবানে বর্ণিত আছে ঃ

একবার আমার ও আমার দুই সঙ্গীর ওপর কঠিন সময় এলো। আমরা সকলেই দারিদ্র্যে পতিত হলাম। এমনকি একবেলার রুটির জন্যও অস্থির থাকতাম। যখন অব্যাহতভাবে অভুক্ত থাকার মত পরিস্থিতির উদ্ভব হলো তখন আমরা সাহাবীদের (রা) নিকট আমাদের খাওয়ানোর আবেদন জানালাম। কিন্তু কেউই আমাদের আবেদনে সাড়া দিলেন না (সে সময় সকলের অবস্থাই করুণ ছিল)। অবশেষে আমরা রাসূলের (সা) খিদমতে হাজির হলাম এবং আমাদের অবস্থা বর্ণনা করলাম। হুজুর (সা) আমাদের তিনজনকেই বাড়ী নিয়ে গেলেন। [মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলের রেওয়ায়াত অনুযায়ী হুজুর (সা) তাদের মেযবান হযরত কুলসুম (রা) বিন হাদামের বাড়ীতে স্থান দিলেন] সে সময় হুজুরের (সা) নিকট শুধু তিনটি (অথবা অন্য রেওয়ায়াত অনুযায়ী চার) বকরী ছিল। হুজুর (সা) বকরীগুলোর দুধ পান করতে বললেন। বস্তুত আমরা সে বকরীগুলোর দুধ দোহন করে পান করতাম এবং রাসূলের (সা) অংশ রেখে দিতাম। হুজুর (সা) রাতের বেলা তাশরীফ আনতেন। এসেই তিনি প্রথমে আমাদেরকে আস্তে আস্তে সালাম করতেন। এটা এ জন্য করতেন যে যাতে নিদ্রিত ব্যক্তিরা জেগে না ওঠেন এবং জাগরিতরা শুনে না ফেলেন। অতপর তিনি মসজিদে গিয়ে নামায পড়তেন।

নামায থেকে ফারেগ হয়ে আবার আসতেন এবং নিজের অংশের দুধ পান করতেন। একদিন আমি নিজের অংশের দুধ পান শেষ করেছি। এমন সময় শয়তান আমার অন্তরে ওয়াসওয়াসা বা সন্দেহ সৃষ্টি করলো। শয়তান বললো হুজুর (সা) বেশীরভাগ সময় আনসারদের নিকট কাটান। তাঁরা হুজুরকে (সা) হাদিয়া স্বরূপ খানা-পিনার অনেক জিনিস পেশ করে থাকে এবং তিনি তা খেয়ে থাকেন। তাঁর এই দুধের প্রয়োজন নেই। বস্তুত আমি ধারণা করে সব দুধ পান করলাম এবং হুজুরের (সা) জন্য কিছুই অবশিষ্ট রাখলাম না। কিন্তু দুধ পান করার পর খেয়াল হলো যে, হুজুর (সা) অভুক্ত থাকতে পারেন এবং তিনি যখন নিজের অংশের দুধ পাবেন না তখন আমাকে বদদোয়া দিতে পারেন এবং আমার দ্বীন ও দুনিয়া বরবাদ হয়ে যাবে। এই খেয়াল হতেই আমার শরীরের লোমগুলো খাড়া হয়ে গেল এবং আমি খুব বেচাইন হয়ে পড়লাম। কোনভাবেই আমি শান্তি পাচ্ছিলাম না। ইতিমধ্যে হুজুর (সা) এসে হাজির হলেন। নিয়ম অনুযায়ী খুব নরম স্বরে সালাম করলেন। অতপর নামায পড়লেন তারপর দুধের পাত্র দেখলেন। পাত্রটি শূন্য ছিল। হুজুর (সা) আকাশের দিকে তাকালেন। আমি ধারণা করলাম যে, ব্যস, তিনি এখন আমার জন্য বদদোয়া করবেন এবং আমি বরবাদ হয়ে যাবো।

কিন্তু আমি এ দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলাম যে বদদোয়ার পরিবর্তে রহমতে আলম (সা) এই দোয়া করলেন, "হে আল্লাহ! যে আমাকে খাইয়েছে তাকে তুমি খাওয়াও এবং যে আমাকে পান করিয়েছে তাকে তুমি পান করাও।" তারপর আমি চাদর গায়ে জড়িয়ে এই ইচ্ছায় উঠলাম যে, বকরীগুলোর মধ্যে যে বকরীটি সবচেয়ে বেশী মোটা তাজা সেটি জবাই করে তার গোশত ভুনে হুজুরের (সা) খিদমতে পেশ করবো। কিন্তু তিনটি বকরিই যাচাই করে দেখলাম যে, তাদের স্তন দুধে পূর্ণ রয়েছে। আমি একটি পাত্র হাতে নিলাম এবং আল্লাহর নাম নিয়ে তাতে দুধ দোহানো শুরু করলাম। পাত্রটি যখন ভরে গেল এবং তার ওপর ফেনা দেখা যেতে লাগলো তখন আমি সেই দুধ রাসূলে আকরামের (সা) খিদমতে পেশ করলাম। তিনি বললেন, "তুমি কি তোমার অংশ পান করেছো?" আমি আরজ করলাম, "আপনি পান করুন।"

হুজুর (সা) কিছু দুধ পান করে বাকীটুকু আমাকে দিলেন। আমি আরয করলাম, "হে আল্লাহর রাসূল! আপনি পান করুন। হুজুর (সা) দ্বিতীয়বার দুধ পান করলেন। কিন্তু পাত্রে কিছু দুধ তবুও রয়ে গেল। তিনি তা আমাকে দিলেন। আমি বুঝতে পারলাম যে, তিনি খুব আসুদাহ হয়ে গেছেন এবং তাঁর দোয়ার বরকতে দুধ শেষ হলো না। তাছাড়া তিনি নিজের দোয়ার বরকতের

মধ্যে আমাকেও অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছেন। আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলাম এবং এতো হাসলাম যে, মাটিতে লুটিয়ে পড়লাম। হুজুর (সা) জিজ্ঞেস করলেন, "আবুল আসওয়াদ এটা কি?" আমি ঘটনা বিবৃত করলাম। হুজুর(সা) বললেন, "এটা ছিল আল্লাহর রহমত। তুমি তোমার দুই সঙ্গীকে কেন জাগাওনি। তারাও এই দুধ পান করতে পারতো।"

দ্বিতীয় হিজরীর রমযান মাসে বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে সারওয়ারে আলম (সা) মদীনাতে সাহাবায়ে কিরামের (রা) সঙ্গে পরামর্শ করলেন। সে সময় সর্বপ্রথম হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) এবং ওমর ফারুক (রা) উদ্দীপনাময় বক্তৃতা পেশ করলেন। তাদের পর হযরত মিকদাদ (রা) সেই মুখলিস কথা বললেন, যা উপরে উল্লিখিত হয়েছে। সে সময় মুসলমানদের সাজ-সরঞ্জামহীনতার অবস্থা এমন ছিল যে, তাদের নিকট সর্বমোট ৭০টি উট এবং দু'টি ঘোড়া ছিল। একটি ঘোড়ার ওপর সওয়ার ছিলেন হযরত হারিছা (রা) বিন সুরাকা আনসারী খাজরাজী। অন্যটির ওপর ছিলেন হযরত মিকদাদ (রা)। বদর পৌছে হযরত হারিছা (রা) হাওজ থেকে পানি পান করছিলেন। এমন সময় একজন মুশরিক (অনেকের বক্তব্য অনুযায়ী হাব্বান ইবনুল আরকা) তাকে তাক করে তীর নিক্ষেপ করলো। এই তীর তাঁর গলায় বিদ্ধ হলো এবং লড়াই শুরু হওয়ার পূর্বেই তিনি জান্নাতের পথে যাত্রা করলেন। তাঁর বিধবা মা হযরত রুবাইয়ি (রা) বিনতে নাজার [যিনি হযরত আনাস (রা) বিন মালিকের ফুফু ছিলেন] নিজের ভাগ্যবান পুত্রকে সীমাহীন ভালবাসতেন। যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর হুজুরের (সা) খিদমতে হাজির হয়ে আরজ করলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার অনুগত এতিম পুত্রের ওপর পাগলের মত ফিদা ছিলাম। সে যদি বেহেশতে গিয়ে থাকে তাহলে ভাল। তা না হলে আপনি দেখবেন যে, আমি আমার অবস্থা কি করি।"

হুজুর (সা) বললেন ঃ

"বেহেশত কি। হারিছাকে তো আল্লাহ তায়ালা জান্নাতুল ফিরদাউস প্রদান করেছেন।"

হযরত রুবাইয়ির (রা) ঠোঁটের ওপর অপ্রত্যাশিত মুচকি হাসি দেখা দিল এবং বলতে লাগলেন, "কি মজা! কি মজা! হে হারিছা।"

হযরত হারিছার (রা) শাহাদাতের পর কাফেরদের একশ' যিরাহ পরিধানকারী সওয়ারের মোকাবিলায় হযরত মিকদাদ (রা) বদরের ময়দানে মুসলমানদের একমাত্র ঘোড় সওয়ার ছিলেন। তিনি ঘোড় সওয়ারী, নিযাহবাজী

এবং তীর নিক্ষেপে পূর্ণ ধরনের নিপুণতা রাখতেন। পরবর্তী পর্যায়ে এমনকি তাঁকে আরবের এক হাজার বাহাদুরের সমান মনে করা হতো। যুদ্ধের ময়দান যখন গরম হয়ে উঠলো তখন তিনি নিজের ঘোড় দৌড় এবং নিযাহবাজীর এমন কৃতিত্ব দেখালেন যে, শত্রুপক্ষ ভীত সন্ত্রস্ত এবং বিমূঢ় হয়ে গেল। তিনি যেদিকে অগ্রসর হতেন মুশরিকদের ব্যূহে আতংক ছড়িয়ে পড়তো। মোট কথা, যুদ্ধের পূর্বে তিনি সারওয়ারে কায়েনাতের (সা) সঙ্গে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা জীবনবাজী রেখে পূরণ করে দেখিয়েছিলেন।

বদরের যুদ্ধের পর হযরত মিকদাদ (রা) ওহোদ, খন্দক এবং সকল মশহুর গাযওয়া বা যুদ্ধে অত্যন্ত বীরত্ব ও অটলতার সঙ্গে বাহাদুরীর হক আদায় করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে জিকারদ অথবা গাব্বাহর যুদ্ধে তাঁর বিশেষ কৃতিত্বের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ৬ষ্ঠ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে আইনিয়া বিন হাছান ফাযারী মদীনা থেকে কয়েক মাইল দূরে জিকারদের নিকট গাব্বাহর চারণভূমিতে অতর্কিত হামলা চালায় এবং রাখাল হযরত যার (রা) বিন আবু যার গিফারীকে (রা) শহীদ করে হুজুরের (সা) ২০টি দুগ্ধালো বকরী হাঁকিয়ে নিয়ে যায়। ঘটনাক্রমে সে সময় মশহুর সাহাবী হযরত সালমা (রা) ইবনুল আকওয়া এবং রাসূলের (সা) আযাদকৃত গোলাম হযরত রাবাহ (রা) ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে সেখানে এসে উপস্থিত। হযরত সালমা (রা) ছিলেন একজন নিপুণ তীরন্দাজ ও দ্রুতগতিসম্পন্ন ঘোড় সওয়ার। তিনি এই ঘটনা স্বচক্ষে দেখলেন। ফলে হুজুরের (সা) প্রতি ভালবাসা ও দীনের মর্যাদাবোধ তাঁকে অস্থির করে তুললো। প্রথমে তিনি নিকটবর্তী একটি টিলার ওপর চড়ে মদীনার দিকে মুখ করে তিনবার "ইয়া সাবাহাহ'র নারা লাগালেন। অতঃপর হযরত রাবাহকে (রা) ঘোড়ার ওপর সওয়ার করিয়ে হুজুরকে (সা) খবর দেয়ার জন্য মদীনা রওয়ানা করলেন এবং স্বয়ং একাকী গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে লুণ্ঠনকারীদের ওপর সমানে তীর ও পাথর নিক্ষেপ করলেন। এমনকি তারা উটনীগুলো ফেলে পালিয়ে গেল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই অন্যদের সাহায্য নিয়ে আবার ফিরে এলো এবং হযরত সালমার (রা) জীবন বিপন্ন হয়ে পড়লো। ওদিকে এই ঘটনার খবর পেয়ে হুজুর (সা) মুসলমানদেরকে লুটেরাদের পিছু ধাওয়া করার নির্দেশ দিলেন। সে সময় সর্বপ্রথম যে তিনজন জানবাজ ঘোড়া দৌড়িয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছিলেন তাঁরা ছিলেন হযরত মুহরিয বিন নাজলা আল মুকাল্লাব বিহি আখরাম উসদী (রা), হযরত আবু কাতাদাহ আনসারী (রা) এবং হযরত মিকদাদ (রা) বিন আমর। আখরাম (রা) ঘোড়া দৌড়ে আগে চলে গেলেন এবং আবদুর রহমান ফাযারীর হাতে শাহাদাতপ্রাপ্ত হলেন। তাঁর পিছনে ছিলেন হযরত আবু কাতাদাহ (রা)। তিনি নিজের নিযাহর

সাহায্যে আবদুর রহমানকে জাহান্নামে প্রেরণ করে তৎক্ষণাৎ হযরত আখরামের (রা) প্রতিশোধ নিয়ে নিলেন। ঠিক সেই সময় হযরত মিকদাদ (রা) আবু কাতাদাহ (রা) এবং সালমার (রা) সঙ্গে মিলিত হলেন। এক্ষণে এই তিন জানবাজ লুটেরাদেরকে বর্শার নিশানা বানিয়ে ছাড়লো। ইত্যবসরে হুজুর (সা) প্রেরিত আরও কতিপয় সওয়ার এসে উপস্থিত হলেন। হতভাগা লুটেরারা এবার পালানোর মধ্যেই তাদের কল্যাণ নিহিত বলে মনে করলো। কিন্তু মুজাহিদরা সূর্যাস্ত পর্যন্ত তাদের পিছু ধাওয়া অব্যাহত রাখলো। রাতে জিকারদ ফিরে এলে সেখানে রাসূলে আকরামকে(সা) পাঁচশ' শসস্ত্র মুজাহিদ দলের সঙ্গে উপস্থিত পেলেন। হুজুর (সা) হযরত সালমা (রা), আবু কাতাদাহ (রা), মিকদাদ (রা) এবং অন্যান্য মুজাহিদের জানবাজীতে সন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন। সেই বছরই হযরত মিকদাদ (রা) বাইয়াতে রিদওয়ানে শরীক হওয়ার সম্মান লাভ করেন।

প্রতিনিধি দলের বছর অর্থাৎ নবম হিজরীতে আরবের প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহ থেকে নবীর (সা) দরবারে প্রতিনিধিদল আগমন শুরু হলো। এসব প্রতিনিধি দলের অধিকাংশই ইসলাম গ্রহণের জন্য হাজির হলেন। অবশ্য কতিপয় দল শরীয়তের হুকুম আহকাম শেখার জন্য এবং কতিপয় দল দেশী অথবা পার্থিব লক্ষ্যেও এসেছিলেন। সেই সময় বাহরা থেকেও একটি প্রতিনিধিদল মদীনা পৌঁছে। তারা হযরত মিকদাদের (রা) সগোত্রীয় এবং স্বদেশী ছিলেন। এ জন্য তারা সোজা তাঁর নিকট গমন করেন। হযরত মিকদাদ (রা) তাঁদেরকে স্বাগত জানালেন — আরামের সঙ্গে বসালেন এবং তারপর তাঁদের জন্য হায়েশ তৈরী করালেন। হায়েশ এক ধরনের আরবী সুস্বাদু খাবার। এই খাবার খেজুর, ছাতু এবং ঘি মিলিয়ে তৈরী করা হয়। প্রতিনিধিদল এই খাবার অত্যন্ত উৎসাহের সাথে খেলেন। হযরত মিকদাদ (রা) খাবারের এক পেয়ালা রাসূলে আকরামের (সা) খিদমতে প্রেরণ করলেন। হুজুর (সা) তা থেকে প্রয়োজন মত গ্রহণ করে পেয়ালাটি ফেরত পাঠালেন। এক্ষণে মিকদাদ দু'বেলা সে পেয়ালা মেহমানদের সামনে রাখতেন আর তারা খুব আসূদাহ হয়ে খেতেন। কিন্তু তারপরও কিছু না কিছু হায়েশ বেঁচে থাকতো। একদিন তাঁরা আশ্চর্য হয়ে হযরত মিকদাদকে জিজ্ঞেস করলেন :

"আমরা শুনেছি যে, তোমাদের খাদ্য হলো যব এবং খেজুর। কিন্তু যে খাবার তুমি অব্যাহতভাবে কয়েকদিন আমাদেরকে পরিবেশন করছো তা এত সুস্বাদু এবং উত্তম যে, বাড়ীতেও আমাদের তা খুব কম জোটে। তুমি এই খাদ্য কোথা থেকে সরবরাহ করছো।"

হযরত মিকদাদ বললেন, "বন্ধুগণ! আমি অধম কিসের যোগ্য। এতো আমার আকা মুহাম্মাদ (সা)-এর বরকত। হুজুরের (সা) আঙ্গুলি মোবারক এই খানাকে স্পর্শ করেছে।" একথা শুনতেই প্রতিনিধি দলের সদস্যবৃন্দ সমস্বরে বলে উঠলেন ঃ "অবশ্যই মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহর রাসূল।"

এরপর তাঁরা আরো কয়েকদিন মদীনা মুনাওয়ারায় অবস্থান করেন। তাঁরা কুরআন ও শরীয়তের হুকুম আহকাম শিখেন এবং তারপর স্বদেশ ফিরে যান। দশম হিজরীতে হযরত মিকদাদ (রা) বিদায় হজ্জে প্রিয় নবীর (সা) সফরসঙ্গী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন।

রাসূলে আকরামের (সা) ওফাতের পর আনসার (রা) ও মুহাজিররা (রা) খিলাফতের সমস্যা সমাধানের জন্য সাকিফায়ে বনু সায়েদা হতে একত্রিত হলেন। এ সময় হযরত মিকদাদ (রা) সেসব সাহাবীর অন্যতম ছিলেন যাঁরা খিলাফতের জন্য হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুর পক্ষে মত প্রকাশ করেছিলেন। তা সত্ত্বেও যখন বেশীর ভাগ মুসলমান হযরত আবু বকর সিদ্দীককে (রা) খলীফা নির্বাচন করলো তখন তিনিও কিছুদিন পর অন্যান্য অধিকাংশ বিরোধিতাকারী বুজর্গের মত সিদ্দিকে আকবরের (রা) বাইয়াত করে নিলেন।

হযরত ওমর ফারুকের (রা) শাসনামলে হযরত আমর (রা) ইবনুল আছ মিসরে সামরিক অভিযান চালান। এ সময় মিসরীয়রা বিরাট লোক-লশকর এবং সাজ-সরঞ্জামসহ মুসলমানদেরকে প্রতি পদে পদে বাধা দেয়। হযরত আমরের (রা) নিকট খুব কম সৈন্য ছিল। তিনি খিলাফতের দরবারে সাহায্য প্রার্থনা করলেন। হযরত ওমর ফারুক (রা) তাঁর বার্তা পেতেই চার হাজার সিপাহী এবং চারজন অফিসার তাঁকে সাহায্যের জন্য প্রেরণ করেন। তিনি এ সময় লিখে পাঠান যে, এসব অফিসারের প্রত্যেকেই এক হাজার মানুষের সমান। এই অফিসাররা ছিলেন হযরত যোবায়ের (রা) ইবনুল আওয়াম, হযরত মিকদাদ (রা) বিন আমর, হযরত উবাদাহ (রা) বিন ছামেত এবং হযরত মাসলামা (রা) বিন মুখাল্লাদ। এই সাহায্য পৌঁছার কারণে হযরত আমর (রা) ইবনুল আছের হাত খুব শক্তিশালী হলো এবং মুসলমানরা কিছুদিনের মধ্যেই মিসরের মাটিতে ইসলামের ঝাণ্ডা পতপত করে উড়িয়ে দিলেন। এ অভিযানের সময় হযরত মিকদাদ (রা) এবং অন্যান্য অফিসারবৃন্দ যে অসাধারণ সাহসিকতা, হিম্মত ও বাহাদুরী প্রদর্শন করেছিলেন, ঐতিহাসিকরা তা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে যে, মিসর গমনের পূর্বে হযরত মিকদাদ (রা) সিরিয়ার জিহাদেও অংশগ্রহণ

করেছিলেন। আল্লামা ইবনে কাছির (রা) ইয়ারমুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বিখ্যাত সাহাবীবৃন্দের মধ্যে হযরত মিকদাদের (রা) নাম বিশেষভাবে নিয়েছেন এবং "আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া" গ্রন্থে লিখেছেন, যুদ্ধ শুরুর পূর্বে তিনি সূরায়ে আনফাল এবং সূরায়ে তওবা তিলাওয়াতকারী অন্যতম ক্বারী ছিলেন।

রাসূলের (সা) দরবার থেকে হযরত মিকদাদ (রা) মদীনার বনি আদিলা মহল্লায় জমি লাভ করেছিলেন। তারপরও তিনি জরফে জায়গীর পেয়েছিলেন। জরফ ছিল মদীনা থেকে তিন মাইল দূরে অবস্থিত। শেষে হযরত মিকদাদ (রা) সেখানে গিয়েই স্থায়ী বাসিন্দা হন। হাফেজ ইবনে হাজার (র) লিখেছেন, মিকদাদ (রা) এমনিতেই মোটাসোটা মানুষ ছিলেন। কিন্তু শেষ বয়সে তাঁর পেট অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গিয়েছিল (সম্ভবত তিনি ইসতিসকা নামক ব্যাধিতে আক্রান্ত ছিলেন)। তার একজন রোমক গোলাম তাকে অস্ত্রপচার করেন। কিন্তু ব্যাধি সারার পরিবর্তে কষ্ট আরো মারাত্মক আকারে বৃদ্ধি পায়। এই অবস্থায় তিনি ৩৩ হিজরীতে পরপারের ডাকে সাড়া দেন। সে সময় তাঁর বয়স ৭০ বছর অতিক্রম করেছিল। লাশ জরফ থেকে মদীনা আনা হলো। আমীরুল মু'মিনীন হযরত উসমান (রা) বিন আফফান স্বয়ং নামাযে জানাযা পড়ান। তারপর হাজার হাজার মুসলমান অশ্রু ভারাক্রান্ত নেত্রে রাসূলের (সা) সেই জানবাজ সাহাবীর লাশ কাকী' গোরস্থানে দাফন করেন।

হযরত মিকদাদ (রা) বিন আমরের স্থান সেসব সাহাবীর মধ্যে পরিগণিত যাঁদের মর্যাদা ও ফজিলতের ব্যাপারে মুসলমানদের সকল থট্স অব স্কুলের চিন্তা নায়কগণ ঐকমত্য পোষণ করেন। ঈমানী আবেগ ও জীবন উৎসর্গের জযবার বদৌলতে তিনি আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের (সা) প্রিয়পাত্র হতে পেরেছিলেন। একবার রাসূলে আকরাম (সা) বলেছিলেন, আল্লাহ পাক আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, চার ব্যক্তির সঙ্গে মুহাব্বত রাখো এবং আল্লাহ আমাকে খবর দিয়েছেন যে, তিনিও সেই চার ব্যক্তিকে ভালবেসে থাকেন। জিজ্ঞাসা করা হলো, তারা কারা? তিনি বললেন, আলী (রা), মিকদাদ (রা), সালমান (রা) এবং আবু যর (রা)।

আল্লামা ইবনে আবদুল বার (র) ইস্তিয়াবে সঠিক সনদসহ এই রেওয়ায়াত উল্লেখ করছেন যে, রাসূলে করিম (সা) এক ব্যক্তিকে কুরআন শরীফ পড়তে শুনলেন। সে নিজের কণ্ঠস্বরকে কুরআনের সঙ্গে উঁচু করছিল। হুজুর (সা) বললেন, এই ব্যক্তি ইবাদাতগুজার মানুষ। অন্য একজনও নিজের কণ্ঠস্বর উঁচু করছিলো হুজুর (সা) বললেন, এই ব্যক্তি নিজেকে প্রদর্শন করছে। লোকজন গিয়ে দেখলো যে প্রথম ব্যক্তি ছিলেন মিকদাদ (রা)। ইমাম মুহাম্মাদ

বাকের (র) বলেছেন, মিকদাদ (রা) এমন ব্যক্তি যাঁর কখনো সন্দেহ হয়নি এবং হক পথ থেকে সরে যাওয়ার কোন চিন্তাও হয়নি।

কতিপয় রেওয়ায়াত থেকে প্রকাশ পায় যে, হযরত মিকদাদ (রা) কুরআনের হাফেজ ছিলেন এবং লোকদেরকে কুরআন তালিম দিতেন।

আল্লামা শেখ মুস্তাফা সাদেক রাফেয়ী নিজের কিতাব "ইজাযুল কুরআনে" লিখেছেন যে, "মুসলমানরা বিভিন্ন দিকে চলে গেলেন এবং প্রত্যেক শহরের লোকজন অবশিষ্ট হাফেজদের মধ্য থেকে কোন একজনের নিকট থেকে কুরআন শিক্ষা শুরু করলেন। বস্তুত দামেস্ক ও হেমসবাসী হযরত মিকদাদ(রা) বিন আসওয়াদের নিকট থেকে কুরআন শিখেছিলেন।"

সহীহ বুখারীতে আছে যে, রাসূলের যুগে অপরাধীদের হত্যা করার কাজে নিয়োজিত সাহাবীদের মধ্যে হযরত মিকদাদ (রা) অন্যতম। হযরত মিকদাদ (রা) ছিলেন একজন মরদে সিপাহী। তিনি সাদাসিধে ও স্পষ্টবাদী ছিলেন। কতিপয় কারণে তিনি দীর্ঘদিন পর্যন্ত শাদী করতে পারেননি। একদিন হযরত আবদুর রহমান (রা) বিন আওফ জিজ্ঞাসা করে বসলেন, মিকদাদ (রা) তুমি বিয়ে কেন করছো না? স্বতস্ফূর্তভাবে জবাব দিলেন, "তোমার কন্যাকে আমার সঙ্গে বিয়ে দাও।" হযরত আবদুর রহমান (রা) তাঁর এই জবাবে খুব ক্ষুব্ধ হন এবং তাঁকে কঠোর কথা শুনান। হযরত মিকদাদ (রা) নবীর (সা) দরবারে এ ব্যাপারে অভিযোগ করলে তিনি বললেন ঃ

"কেউ যদি তোমার সংগে মেয়ে বিয়ে দিতে অস্বীকৃতি জানায়, তাহলে আমি তোমার সঙ্গে আমার চাচার মেয়েকে বিয়ে দেব।"

সুতরাং এরপর হুজুর (সা) হযরত দাবায়াহ (রা) বিনতে যোবায়ের বিন আবদুল মুত্তালিবের সঙ্গে হযরত মিকদাদের বিয়ে দেন। এভাবে প্রিয় নবীর (সা) সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপনেরও সৌভাগ্য লাভ ঘটে।

হযরত মিকদাদ (রা) প্রিয় নবীর খুব প্রিয় ছিলেন। তিনি রাসূলের (সা) প্রতি পতঙ্গের মত ফিদা ছিলেন এবং তাঁর নিকট থেকে জ্ঞান অর্জনে টু শব্দটি করতেন না। অনেক সময় এমনও হতো যে, যদি কোন সাহাবী হুজুরের (সা) নিকট সরাসরি কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে না পারতেন তাহলে হযরত মিকদাদকে (রা) মাধ্যম বানাতেন। সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আছে যে, একবার হযরত আলী (রা) রাসূলের (সা) নিকট হযরত মিকদাদের (রা) মাধ্যমে একটি বিশেষ মাসয়ালা জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

হযরত মিকদাদ (রা) লৌকিকতা ছাড়াই রাসূলের (সা) নিকট মাসয়ালা জিজ্ঞাসা করতেন। তার প্রমাণ সহীহ মুসলিমের এই হাদিসেই পাওয়া যায়।

"মিকদাদ (রা) বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কাফেরদের মধ্যে কারো সঙ্গে যদি আমার সংঘর্ষ বেধে যায় এবং সে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাকে। তারপর তরবারী দিয়ে আমার একটি হাত কেটে দেয়। অতপর আমার থেকে বাঁচার জন্য কোন বৃক্ষের আশ্রয় নেয় এবং বলে যে আমি একমাত্র আল্লাহর জন্য ইসলাম কবুল করছি, তাহলে হে আল্লাহর রাসূল! এই কালেমা উচ্চারণের পর আমি কি তাকে হত্যা করতে পারি? তিনি বললেন, অবশ্যই নয়। আমি বললাম হে আল্লাহর রাসূল! সে তো এই কালেমা তখন উচ্চারণ করেছে যখন প্রথম আমার হাত কেটে নেয়। অতপর আমি তাকে কেন হত্যা করবো না। তিনি বললেন, কখনই হত্যা করবে না। কেননা যদি তাকে হত্যা করো তাহলে সে এখন এমন মর্যাদা সম্পন্ন মুসলমান হয়ে যাবে যেমন তুমি তার হত্যার পূর্বে ছিলে। আর এখন তোমার রক্ত তেমনি হালাল হবে যেমন কালেমা পাঠের পূর্বে তার ছিল।"

একবার জনৈক ব্যক্তি তাঁর স্থূল দেহ নিয়ে উপহাস করে বললো "আবুল আসওয়াদ আল্লাহ তায়ালা জিহাদে শরীক হওয়া থেকে তোমাকে মাফ করে দিয়েছেন।" তিনি তৎক্ষণিক জবাব দিলেন, "না ভাই না।" আল্লাহর নির্দেশ হলো ঃ

انْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالاً وَّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط

"পাতলা হও, অথবা ভারী হও বের হয়ে পড়ো এবং নিজের ধন সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ কর।" (আত তাওবাহ ৪১)

তিনি তোষামোদী ও চাটুকারিতাকে ঘৃণা করতেন। সহীহ মুসলিমে আছে, একবার হযরত উসমানের (রা) খিলাফত কালে এক ব্যক্তি আমিরুল মুমিনীনের সামনে তার প্রশংসা করতে লাগলো। হযরত মিকদাদ (রা) তা শুনছিলেন। তিনি উবু হয়ে পাথরের টুকরো উঠালেন এবং সেই ব্যক্তির মুখের ওপর নিক্ষেপ করতে লাগলেন। হযরত উসমান (রা) বললেন, হা, হা কি করছো। মিকদাদ (রা) জবাব দিলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "যখন তোষামোদকারীকে দেখবে তখন তার মুখের ওপর মাটি নিক্ষেপ করবে।"

হযরত মিকদাদের (রা) জীবনে যদিও রাসূলের (সা) জন্য জীবন উৎসর্গকরণ ও জিহাদের প্রেরণা সবচেয়ে বেশী প্রোজ্জ্বল দিক তবুও রাসূলের (সা) সঙ্গে সুদীর্ঘ সুহবতের ফলে তিনি মর্যাদাবান সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কতিপয় মাসয়ালায় তিনি নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতেন এবং লোকদেরকে তা শিক্ষাও

দিতেন। মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে আবদুর রহমান বিন জাবির (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, আমার পিতা বর্ণনা করেছেন, একদিন আমরা মিকদাদ (রা) ইবনুল আসওয়াদের নিকট বসেছিলাম। এক ব্যক্তি তাঁর পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে তাঁকে বললো মুবারক এই দুই চক্ষু। যে চক্ষু রাসূলের (সা) দর্শন লাভ করেছে। খোদার কসম। আমাদের আকাংখা হয় যে আপনি যা কিছু দেখেছেন আমরাও তা দেখি এবং যেসব স্থানে আপনি গেছেন আমরাও সেসব স্থানে যাই। একথা শুনে মিকদাদ (রা) অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন। আমি খুব আশ্চর্যান্বিত হলাম এই ভেবে যে সেই বেচারাতো কোন খারাপ কথা বলেনি। বরং ভাল কথাই বলেছিল। অতপর মিকদাদ (রা) তার দিকে মনোযোগী হয়ে বললেন, যে যুগে আল্লাহ তায়ালা তাকে পয়দাই করেননি সে যুগে থাকার আকাংখা তার কি করে হলো। সে যদি সেই যুগে জন্ম নিত তাহলে তার ধৈর্য ও অটলতার কি অবস্থা হতো কে জানে। খোদার কসম। রাসূলের (সা) যুগে এমন লোকও ছিল যাদেরকে আল্লাহ তায়ালা উপুড় করে দোযখে নিক্ষেপ করেছেন। কারণ, তারা রাসূলের (সা) দাওয়াত কবুল ও তাঁকে সত্য নবী হিসেবে মেনে নেয়নি। তুমি সেই যামানার হওয়ার আকাংখা তো করো কিন্তু আল্লাহর শোকর আদায় করো না। আল্লাহই তোমাকে এমন যুগে সৃষ্টি করেছেন যে, জ্ঞান হতেই তুমি নিজের সৃষ্টিকর্তাকে চিনে নিয়েছ এবং দ্বীনে হক্বের সত্যতা স্বীকার করে নিয়েছ। এই পথের মুসিবতসমূহ অন্যরা উঠিয়েছে এবং তুমি তা থেকে মাহফুজ থেকেছ। আল্লাহর কসম! আল্লাহ তায়ালা রাসূলকে (সা) খুব কঠিন সময়ে প্রেরণ করেছিলেন। যুগটি এমন ছিল যখন জনগণের নিকট মূর্তিপূজা ছাড়া উত্তম কোন দ্বীন ছিল না। সে সময় তিনি এমন এক কিতাব নিয়ে আসেন যা হক ও বাতিলকে পৃথক করে দিয়েছে। তারই ফলশ্রুতিতে পুত্রকে পিতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। এমনিভাবে এক ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তায়ালা ঈমান আনয়নের সৌভাগ্য দিয়েছিলেন সে নিজেকে মুসলমান হিসেবে দেখতে পেত। আর তার পিতা, পুত্র ও ভাইকে দেখতো কাফের রূপে। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে তারা যদি ঐ অবস্থায় মারা যায় তাহলে দোযখে যাবে। এই বিশ্বাস ও আস্থার পরও তার চোখ কি করে শীতল থাকতে পারে। এই কথা আল্লাহ পাক এই আয়াতে ইরশাদ করেছেন,

وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ

"যারা এই দোয়া করে হে আমাদের পরওয়ারদিগার আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের তরফ থেকে আমাদের চক্ষুকে শীতল করে দাও।"

(আল ফুরকান ৭৪)

হিজরতের পর কিছুদিন হযরত মিকদাদ (রা) অত্যন্ত দারিদ্রে কাটিয়ে ছিলেন। তারপর ব্যবসা শুরু করেন এবং বেশ সচ্ছল হন। হযরত মিকদাদের (রা) স্ত্রী হযরত দাবায়াহ (রা) বিনতে যোবায়ের থেকে বর্ণিত আছে যে একদিন হযরত মিকদাদ (রা) প্রকৃতির ডাকে সাড়া দানের জন্য ঘর থেকে বাইরে গেলেন এবং বাকী' গারকাদের নিকট এক বিরাণ স্থানে বসলেন। হঠাৎ করে তার নিকটের এক গর্ত থেকে একটি বড় ইঁদুর একটি দিনার এনে তার সামনে রাখলো এবং সে বারবার একইভাবে একেকটি দিনার এনে রাখতে লাগলো। এমনিভাবে হযরত মিকদাদের (রা) সামনে ১৭টি দিনার জমা হলো। তিনি দিনারগুলো নিয়ে সরওয়ারে আলমের (সা) খিদমতে হাজির হলেন এবং সকল ঘটনা বর্ণনা করলেন, হুজুর (সা) জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি ইঁদুরের গর্তে হাত ঢুকিয়েছিলে? তিনি আরজ করলেন, খোদার কসম, না। হুজুর (সা) বললেন, "তাহলে এই মালে কোন সাদকা দিতে হবে না। আল্লাহ তাতে বরকত দিন।"

দাবায়াহ (রা) বলেন, "দিনারগুলোর শেষটি তখনও শেষ হয়নি। এই অবস্থায় আমি রৌপ্যের স্তূপ মিকদাদের (রা) ঘরে দেখে নিয়েছিলাম" অর্থাৎ তিনি সচ্ছল হয়ে গিয়েছিলেন। বদরী সাহাবী হওয়ার কারণে হযরত মিকদাদ (রা) প্রচুর ভাতাও পেতেন এবং জরফ ও খায়বারে জায়গীরও পেয়েছিলেন। ওফাতের পর খায়বারের জায়গীর আমীর মাবিয়া (রা) তাঁর উত্তরাধিকারদের নিকট থেকে একলাখ দিরহাম দিয়ে খরিদ করেছিলেন। তাঁর সন্তানদের মধ্যে দাবায়াহ (রা) বিনতে যোবায়ের থেকে শুধুমাত্র একটি মেয়ের কথা জানা যায়। মেয়েটির নাম ছিল কারিমাহ।

হযরত মুসয়াব (রা)

বিন উমায়ের

উমায়ের বিন হাশিমের পুত্র মুসয়াব (রা) শুধু বনু আবদিদ দারের যুবকদের ইজ্জত-আবরুই ছিলেন না বরং সমগ্র মক্কায় তাঁর মত সুর্দশন, ছিমছাম এবং প্রফুল্ল চিত্তের যুবক কেউই ছিলো না। আল্লাহ তায়ালা তাঁর পিতা-মাতাকে অগাধ ধন-সম্পদ এবং সচ্ছলতার নিয়ামত দান করেছিলেন। তাঁরা স্বীয় পুত্রকে অত্যন্ত প্রাচুর্যের মধ্য দিয়ে লালন পালন করেন। মুসয়াবের (রা) যৌবনকাল সৌন্দর্য এবং পরিচ্ছন্ন প্রিয়তার অত্যন্ত সুন্দর মিশ্রণ ছিল। তিনি সর্বোত্তম রেশমী কাপড় পরিধান এবং ভাল সুগন্ধি ব্যবহার করতেন। যে গলি দিয়ে যেতেন সেই গলি সুগন্ধিতে সুবাসিত হয়ে যেত। যে কাপড় তিনি পরতেন তার এক জোড়ার মূল্য ছিল দু'শ দিরহাম। সে যুগে অর্থের এই পরিমাণ নিঃসন্দেহে বিরাটই ছিল। পায় থাকতো হাজারামী পাদুকা মধ্যম দেহী এই যুবক বেশীরভাগ সময় সাজ-গোজ এবং মাথার চুল সুন্দর বানানোর কাজেই ব্যয় করতেন। কিন্তু সুদর্শন ও প্রফুল্লচিত্ত হওয়ার পরও তিনি অত্যন্ত পবিত্র চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। প্রিয় নবী (সা) যখন দাওয়াতে হকের কাজ শুরু করেন তখন মুসয়াবের (রা) পবিত্র ও পরিষ্কার দিমাগ তা সঙ্গে সঙ্গে কবুল করে। হকপন্থীরা সে সময় অত্যন্ত কঠিন অবস্থার মধ্য দিয়ে কাল কাটাচ্ছিলেন। মুশরিকরা জুলুম-নির্যাতনের মাধ্যমে তাওহীদপন্থীদের জীবন সম্পূর্ণরূপে দুর্বিসহ করে রেখেছিল এবং রহমতে আলম (সা) কতিপয় জীবন উৎসর্গকারীসহ হযরত আরকাম (রা) বিন আবিল আরকামের গৃহে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

সেই ভয়াবহ সময়ে যুবক মুসয়াব (রা) একদিন রহমতে আলমের (সা) খিদমতে হাজির হয়ে ঈমানের পেয়ালা পান করে হুজুরের (সা) হাতে বাইয়াত করলেন। তারপর তিনি প্রায়ই রাসূলের (সা) দরবারে হাজির হতেন এবং তাঁর ফয়েজে যতদূর সম্ভব অভিষিক্ত হতেন।

প্রথমদিকে হযরত মুসয়াব (রা) ইসলাম গ্রহণের কথা স্বগৃহে গোপন রেখেছিলেন। তাতে দু'ধরনের উপযোগিতা ছিল। প্রথমত তিনি তার স্নেহশীল আম্মাকে দুঃখ দিতে চাইতেন না। কারণ তিনি তাঁকে প্রাণ দিয়ে ভাল

বাসতেন। দ্বিতীয়ত তিনি আম্মার নিকট থেকে এত পরিমাণ আর্থিক সাহায্য নিতেন যে সেই অর্থ মজলুম দ্বীনি ভাইদেরকে দান করতেন। কিন্তু এই লুকোচুরিতো বেশী দিন চলতে পারে না। একদিন কা'বা শরীফের চাবি বাহক উসমান বিন তালহা (যিনি তখনও মুসলমান হননি) তাকে কোথাও একক আল্লাহ রব্বুল আলামীনের ইবাদাত করতে দেখলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর মা ও পরিবারের অন্যান্যদের নিকট গিয়ে বললেন ঃ

"তোমরা তো মুসয়াবের জন্য জীবন দিয়ে ফেলো। আর সেতো মুহাম্মাদকে (সা) কানের দুল বানিয়ে ফিরছে।"

হযরত মুসয়াবের (রা) মা খানাস বিনতে মালিক এবং বংশের অন্যান্যদের ওপর এ খবর বিদ্যুতের মত আপতিত হলো। মুসয়াবের (রা) প্রতি তার গভীর ভালবাসা সীমাহীন ঘৃণায় পরিবর্তিত হলো। প্রথমতো তিনি তাঁকে খুব কিল থাপ্পড় মারলেন। তারপর রশি দিয়ে বেঁধে একাকী কয়েদ করে রাখলেন। মুসয়াব (রা) দ্বীনে হক থেকে মুখ ফিরিয়ে পুনরায় আম্মা এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের স্নেহ ভালবাসার মুখাপেক্ষী হতে পারতেন। কিন্তু তাওহীদের পেয়ালা বা আকর্ষণ তাকে এমন নেশাগ্রস্ত করে ফেলেছিল যে, আরাম-আয়েশের বঞ্চনা এবং কয়েদ ও বন্দীত্বের মুসিবতকে তিনি হাসিমুখে বরণ করে নিয়েছিলেন। এত নির্যাতনের পরও তিনি দ্বীনে হক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া বরদাশত করেননি। কিছুদিন এভাবেই অতিবাহিত হলো। এদিকে মুসলমানদের সঙ্গে কাফেরদের আচরণ ক্রমেই কঠিনতর হতে লাগলো। এমনকি রাসূলে করিম (সা) নির্যাতিত মুসলমানদেরকে আবিসিনিয়া বা হাবশা হিজরতের অনুমতি দিলেন। সুতরাং ১২ জন পুরুষ ও চারজন মহিলার একটি ছোট কাফেলা তৎক্ষণাৎ হিজরতের জন্য এগিয়ে এলেন। হক পথে সর্বপ্রথম স্বদেশ ভূমি ছেড়ে বিদেশ বিভূঁইয়ে গমনকারীদের মধ্যে হযরত মুসয়াবও (রা) শামিল ছিলেন। সুযোগ পেয়ে তিনি নির্যাতনের জিন্দানখানা থেকে পালিয়ে সেই কাফেলার সঙ্গে আবিসিনিয়া গিয়ে উপস্থিত হলেন। আল্লাহর পথে মুহাজিরদের আবিসিনিয়ায় কেবলমাত্র তিন মাসই অতিবাহিত হয়েছিল। এমন সময় তারা খবর পেলেন যে, মক্কার কুরাইশরা মুসলমান হয়ে গেছেন [অথবা রাসূলে আকরামের (সা) বিরোধিতা ত্যাগ করেছেন]। আল্লামা ইবনে সায়াদ (র) এবং বালাজুরির (র) বর্ণনামতে, এ খবর শুনে মুহাজিররা(রা) মক্কা ফিরে এলেন। অবশ্য ইবনে ইসহাক (র) লিখেছেন যে, কতিপয় মুহাজির সেখানেই রয়ে যান। যা হোক, হযরত মুসয়াব (রা) মক্কা প্রত্যাবর্তনকারী সাহাবীদের অন্যতম ছিলেন। শহরের নিকটে পৌছে তাঁরা অবহিত হলেন যে, প্রাপ্ত খবর ছিল ভিত্তিহীন। তা সত্ত্বেও তারা পুনরায়

আবিসিনিয়া ফিরে যাওয়াটা সঠিক মনে করলেন না এবং তাঁদের প্রত্যেকেই কোন না কোন কুরাইশ নেতার নিরাপত্তা নিয়ে শহরে প্রবেশ করলেন। ভিন্ন ভিন্ন মত অনুযায়ী হযরত মুসয়াব (রা) নাজর ইবনুল হারিছ বিন কালদাহ অথবা আবু আজিজ বিন উমায়েরের আশ্রয় লাভ করেছিলেন। আবিসিনিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পর এসব সাহাবীর (রা) ওপর কুরাইশদের জুলুম নির্যাতনের মাত্রা আরো বেড়ে গেল। সুতরাং হুজুর (সা) মজলুম মুসলমানদেরকে পুনরায় আবিসিনিয়া হিজরতের নির্দেশ দিলেন। এবার ৮০ জনের বেশী পুরুষ এবং ১৯ অথবা ২০ জন মহিলা আবিসিনিয়া রওয়ানা হলেন। হযরত মুসয়াব (রা) এই হকপন্থী কাফেলাতেও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এ কাফেলায় তাঁর ভাই আবুর রুম (রা) বিন উমায়েরও শামিল ছিলেন। কুরাইশ মুশরিকরা তাঁদের পথে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলো। কিন্তু তারা কোন না কোনভাবে আবিসিনিয়া পৌঁছতে সফল হলেন। হযরত মুসয়াব (রা) কিছুদিন পর্যন্ত আবিসিনিয়াতে উদ্বাস্তুর জীবন কাটিয়ে পুনরায় মক্কা ফিরে আসেন। নেতৃস্থানীয় চরিতকাররা তাঁর প্রত্যাবর্তনের সাল সম্পর্কে কিছু বলেননি। তবে, বিভিন্নভাবে জানা যায় যে, মদীনায় হিজরতের তিন চার বছর পূর্বে তিনি আবিসিনিয়া থেকে মক্কা প্রত্যাবর্তন করেন এবং বেশীরভাগ সময় প্রিয় নবীর (সা) পবিত্র খিদমতে কাটাতেন [কতিপয় চরিতকার হযরত মুসয়াব (রা) বিন উমায়েরের আবিসিনিয়ায় দ্বিতীয় হিজরতের কথা উল্লেখ করেননি। কিন্তু ইবনে হিশাম (র) ইবনে ইসহাকের (র) উদ্ধৃতি দিয়ে আবিসিনিয়ায় দ্বিতীয় হিজরতকারী মুহাজিরদের তালিকায় হযরত মুসয়াব (রা) বিন উমায়েরের নাম স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন।]

হযরত মুসয়াব (রা) হাবশা থেকে ফিরে এলেন। কিন্তু তার অবস্থা ছিল অত্যন্ত করুণ। মুখের কমনীয়তা এবং সুশ্রী বলতে আর কিছুই ছিল না। পরিধানে ছিল মোটা সোটা কাপড়। তাও আবার কয়েকটি তালি লাগানো। শরীরের নরম চামড়া হয়ে গিয়েছিল পুরু। মলিন হয়ে গিয়েছিল চেহারা। গায়ের রং হেমন্ত কালের পীতবর্ণ ধারণ করেছিল। কিন্তু এ মরদে হকের অটলতা এবং দৃঢ় সংকল্পে সামান্যতম পার্থক্যও সূচীত হয়নি। তিনি মহানবীর (সা) খিদমত এবং দারিদ্রতাকে আরাম আয়েশের জীবন থেকে অগ্রাধিকার দিতেন। হযরত মুসয়াব (রা) একদিন নবীর (সা) দরবারে এমন অবস্থায় উপস্থিত হলেন যে তাঁর পরিধেয় কাপড়ে শুধু তালি আর তালিই পরিলক্ষিত হচ্ছিল। উপরন্তু কাপড়টি ছিল মোটা ও খসখসে। সারওয়ারে আলম (সা) তাঁকে এ অবস্থায় দেখে অশ্রু সিক্ত হয়ে পড়লেন। অন্য আরেক সময় তিনি নবীর (সা) মজলিসে এমনভাবে উপস্থিত হলেন যে, সতর ঢাকার জন্য

সাধারণ কাপড়ও ছিল না। একটি খালের অংশ দিয়ে শরীর ঢেকে রেখেছিলেন এবং সেই খালেরও বহুস্থানে তালি লাগানো ছিল। এটা শরীর কাঁপিয়ে দেয়ার মত একটা দৃশ্য ছিল। অথচ যে শরীর কখনো রেশম ছাড়া কোন পোশাকের সঙ্গে পরিচিত ছিল না। আজ সেই শরীর আবৃত ছিল পচনশীল খাল দিয়ে। বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সা) এবং সাহাবায়ে কিরাম (রা) হক পথের এ মুসাফিরকে এ আশ্চর্য "পোশাকে" দেখে চমকে উঠলেন। হুজুর (সা) বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন ঃ

"কয়েক বছর পূর্বে আমি এ যুবককে সমগ্র মক্কায় সবচেয়ে বিলাসী, সুদর্শন, সুন্দর পোশাক ও সচ্ছল অবস্থায় দেখেছি। কিন্তু আজ আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের (সা) প্রতি ভালবাসার জন্যে সে সকল আরাম আয়েশ কুরবান করে দিয়েছে এবং ভাল কাজের আকর্ষণ তাকে পার্থিব আনন্দ ও আরাম আয়েশ থেকে মুখাপেক্ষীহীন করে ফেলেছে।

দ্বীনের প্রতি হযরত মুসয়াবের (রা) ত্যাগের আবেগ এবং খুলুসিয়াত তাঁকে রহমতে আলমের (সা) স্নেহের পাত্র বানিয়ে দিয়েছিল এবং রাসূলের (সা) দরবারে তিনি বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হয়েছিলেন। তিনি হুজুরের (সা) পবিত্র সুহবতে খুব ফয়েজ লাভ করেছিলেন। অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে তিনি দ্বীনের শিক্ষা হাসিল করতেন এবং কুরআনের যে সূরা অবতীর্ণ হতো তা তৎক্ষণাৎ হিফজ করে ফেলতেন। এমনকি কিছুদিন পর তিনি একজন আলেমে দ্বীন ও ফকিহ হিসেবে পরিচিত হন। হুজুর (সা) তাবলীগ ও দাওয়াতের জন্য যেসব সাহাবীকে বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন হযরত মুসয়াব (রা) তাঁদের অন্যতম ছিলেন।

বছরের পর বছর ধরে রাসূলে আকরাম (সা) একটি নিয়ম পালন করে আসছিলেন। হজ্জের দিনগুলোতে হেরেম শরীফ যিয়ারতকারী বিভিন্ন গোত্রের নিকট গিয়ে তিনি তাওহীদের দাওয়াত দিতেন। কিন্তু কুরাইশ মুশরিকরা বৈরীতামূলক আচরণ দিয়ে তাদেরকে হকের দিকে অগ্রসর হতে দিত না। নবুওয়াতের ১০ম বছরের হজ্জ মওসুমে আল্লাহ তায়ালা এক আশ্চর্য ধরনের অবস্থা সৃষ্টি করলেন। হুজুর (সা) তাবলীগ করতে করতে কতিপয় এমন তাঁবুর নিকট পৌঁছলেন যাতে ইয়াসরাব থেকে আগত কিছু নেক চরিত্রের মানুষ অবস্থান করছিলেন। তাঁরা ছিলেন খাজরাজ গোত্রের মানুষ। সংখ্যায় ছিলেন ৬ জন। এসব ব্যক্তি ইহুদীদের নৈকট্য এবং অন্য কতিপয় কারণে "নবীয়ে আখিরুজ্জামান" বা শেষ নবী ও "দ্বীনে ইবরাহীমের" নাম সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত ছিলেন না। হুজুর (সা) যখন তাঁদের সামনে আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদ ও

মহানত্ব সম্পর্কে বর্ণনা দিলেন তখন তারা প্রভাবিত হলো। তারপর তিনি যখন কুরআনে করিমের কতিপয় আয়াত তিলাওয়াত করলেন তখন তাঁদের অন্তর সম্পূর্ণরূপে বিগলিত হয়ে গেল। তাঁরা পরস্পরের প্রতি চাওয়া চাওয়ি করলেন এবং বললেন, "আল্লাহর কসম! এতো সেই নবী যাঁর উল্লেখ সবসময় ইহুদীদের মুখে উচ্চারিত হয়ে থাকে। দেখো আবার ইহুদীরা আমাদের আগেই ইসলাম গ্রহণ করে না ফেলে।" একথা বলেই তারা সকলেই সে সময় কলেমায়ে শাহাদাত পাঠ করে মুসলমান হয়ে গেলেন। খাজরাজ গোত্রের এসব সৌভাগ্যবান ব্যক্তিত্বের ইসলাম গ্রহণ যেন আনসারদের মধ্যে সৌভাগ্য সূর্যের উদয় ছিল। আল্লাহর এসব পবিত্র বান্দাহ ঈমানের সম্পদে পূর্ণ হয়ে যখন ইয়াসরাব ফিরে গেলেন তখন তারা সেখানে দ্রুতগতিতে দ্বীনে হকের তাবলীগের কাজ শুরু করলেন এবং প্রদীপ থেকে প্রদীপ জ্বলতে লাগলো। বস্তুত পরবর্তী সালে অর্থাৎ নবুওয়াতের একাদশ বছরে ১২ জন মুসলমান (১০ জন খাজরাজী এবং দু'জন আওস) প্রিয় নবীর (সা) যিয়ারতের জন্য মক্কা পৌঁছলেন। হুজুর (সা) আগমনের খবর পেয়ে এক রাতে তাদের নিকট গেলেন। তাঁরা অগ্রসর হয়ে হুজুরকে স্বাগত জানালেন এবং তাঁর হাতে বাইয়াত করলেন। প্রত্যাবর্তনের সময় এসব সাহাবী কুরআন পড়ানো এবং দ্বীনের কথা শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে একজন শিক্ষক প্রদানের জন্য রাসূলের (সা) নিকট আবেদন জানালেন। হুজুর (সা) এই গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য হযরত মুসয়াব(রা) বিন উমায়েরকে নির্বাচন করলেন এবং তাবলীগে হক ও মুসলমানদেরকে সংগঠিত এবং শিক্ষাদানের জন্য তাঁকে মদীনা যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। ত্যাগ ও নিষ্ঠার এ মূর্ত প্রতীক হুজুরের (সা) নির্দেশ পেতেই বিনা ওযর ও চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই ইসলামের প্রথম দায়ী হয়ে তৎক্ষণাৎ ইয়াসরাব রওয়ানা হয়ে গেলেন।

হযরত মুসয়াব (রা) বিন উমায়ের ইয়াসরাবে নিজের দায়িত্ব অত্যন্ত সুন্দরভাবে পালন করলেন। তাঁর সরলতা, পবিত্রতা, বিনয়, মধুর ভাষা এবং উন্নত চরিত্র চুপিসারে লোকদের মনে স্থান করে নিতে লাগলো। তিনি নিজের অবস্থান স্থলে [হযরত আসয়াদ (রা) যারারার বাড়ী] লোকদেরকে ডাকতেন এবং তাদেরকে দ্বীনের কথা শিক্ষা দিতেন। এছাড়া তিনি প্রায়ই আওস ও খাজরাজের বিভিন্ন মহল্লা এবং বাড়ী চক্কর দিতেন। তিনি লোকদেরকে এমন বাগ্মীতাপূর্ণ ও সুন্দরভাবে ইসলামের দাওয়াত দিতেন যে নিঃসন্দেহে তারা প্রভাবিত হয়ে যেতেন। তাঁর সরলতা ও অনাড়ম্বরতার অবস্থা এমন ছিল যে এদিক-ওদিক যাওয়ার সময় কাঁধের ওপর কম্বলের একটি ছোট টুকরো লটকে নিতেন। সামনের দিক থেকে তা বাবলা গাছের কাটা দিয়ে লটকানো

থাকতো। খুব কম সময়ের মধ্যেই তিনি লোকদের মনোযোগ আকর্ষণের কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত হয়েছিলেন এবং তাঁর তাবলিগী প্রচেষ্টায় ইয়াসরাববাসী উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে ইসলামের সীমানায় প্রবেশ করতে লাগলেন। তাদের মধ্যে আওস ও খাজরাজের বড় বড় সরদারও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আওসের মধ্যে হযরত সায়াদ (রা) বিন মায়াজ ও উসায়েদ (রা) বিন হাজিরুল কিতায়ের এবং খাজরাজের মধ্যে থেকে হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাহ, আবু আইয়ুব (রা) আনসারী এবং সায়াদ (রা) বিন রবির মত প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের ইসলাম গ্রহণে ইয়াসরাবে ইসলাম ব্যাপক আকারে বিস্তার লাভ করলো। দাওয়াত ও তাবলীগের কাজের সঙ্গে সঙ্গে হযরত মুসয়াব (রা) ইয়াসরাবের মুসলমানদের তানজিম ও তালিমের ব্যাপারেও গাফিল রলেন না। একদিকে তিনি রাসূলে করিমের (সা) অনুমতি নিয়ে [হযরত সায়াদ (রা) বিন খাছিমা গৃহে] জামায়াতের সঙ্গে জুময়ার নামায পড়ার ভিত্তি রাখলেন। অন্যদিকে নওমুসলিম আনসারদেরকে অত্যন্ত পরিশ্রম করে দ্বীনি শিক্ষা দিলেন। এমনিভাবে কিছু দিনের মধ্যেই ইয়াসরাবের অলিগলিতে একক আল্লাহর ও রাসূলুল্লাহর (সা) চর্চা হতে লাগলো।

পরবর্তী বছর নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বছরে দ্বীনে হকের এই সকল দায়ী ৭৩ জন পুরুষ ও ২ জন মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে হজ্জের জন্য মক্কা পৌছেন। এ সময় হযরত মুসয়াবের (রা) না নিজের ঘরের কথা স্মরণে এলো, না পিতামাতার কথা। তিনি সোজা নবী করিমের (সা) পবিত্র খিদমতে হাজির হলেন এবং নিজের মদীনা অবস্থানকালের সকল অবস্থা ও ঘটনার বিস্তারিত শুনালেন। হুজুর (সা) শুনে খুব খুশী হলেন এবং তাঁর জন্য দোয়া করলেন। হযরত মুসয়াবের (রা) সঙ্গীরা তার তাবলীগে এত প্রভাবিত হয়েছিলেন যে তারা খুব তাড়াতাড়ি হুজুরের (সা) দর্শন লাভ করে নিজের পিপাসা মেটানোর জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু সমগ্র মক্কা হকের ধ্বজাবাহীদের জীবনের শত্রু হয়ে গিয়েছিল। এ জন্য সতর্কতা প্রয়োজন ছিল। সুতরাং রাতের অন্ধকারে হুজুর (সা) তাদের নিকট তাশরীফ নিলেন এবং সকলকে নিজের বাইয়াতের সম্মানে অভিষিক্ত করলেন।

হযরত মুসয়াবের (রা) মা যখন পুত্রের আগমনের খবর পেলেন তখন ডেকে পাঠালেন। তিনি যখন তার নিকট পৌছলেন তখন সে তাকে প্রচুর গালাগালি করলো এবং কেঁদে কেঁদে তাঁকে বললো, পুত্র! এ নতুন ধর্মকে পরিত্যাগ করো যাতে তোমার জন্য ভালবাসায় আমার বুক আবার ভরে যায়।

হযরত মুসয়াব (রা) জবাব দিলেন "মা! আমি আল্লাহর মনোনীত ধর্মকে সন্তুষ্ট চিত্তে ও উৎসাহের সঙ্গে কবুল করেছি। কখনোই তা পরিত্যাগ করতে পারি না।" তার পর মা ধমক দিয়ে বললেন, আবিসিনিয়া যাওয়ার পূর্বে তোমাকে যে চিকিৎসা করা হয়েছিল এখনো সে চিকিৎসাই করতে হবে।

হযরত মুসয়াবও (রা) খুব সাহসের সঙ্গে জবাব দিলেন ঃ

"মা! তুমি কি জবরদস্তি করে আমাকে আমার দ্বীন পরিত্যাগ করাতে পারো। স্মরণ রেখো, এখন যদি কেউ আমাকে কষ্ট দেয়ার চেষ্টা করে তাহলে আমি তাকে হত্যা করবো।"

তারপর তাঁর মা অসহায় হয়ে কাঁদতে লাগলেন। হযরত মুসয়াব (রা) অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বুঝালেন, "মা! কল্যাণ কামনা করে তোমাকে পরামর্শ দিচ্ছি যে, আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের ওপর ঈমান আনয়ন কর। তাতেই তোমার কল্যাণ নিহিত রয়েছে।"

কিন্তু কুফর ও শিরক তাঁর মাকে একদম গিলে রেখেছিল।

সে বললো ঃ "প্রোজ্জ্বল তারকাসমূহের কসম! আমি কখনই তোমার দ্বীন কবুল করবো না। আমার চোখের সামনে থেকে দূর হয়ে যাও।"

হযরত মুসয়াব (রা) রহমতে আলমের (সা) পবিত্র খিদমতে ফিরে এলেন এবং তাঁর ৭৫ জন সঙ্গীর সঙ্গে ইয়াসরাব চলে গেলেন। এসব পবিত্র আত্মার মানুষ বাইয়াতের সময় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, রহমতে আলম (সা) যদি তাঁদের শহরে শুভ পদার্পণ করেন তাহলে তারা হুজুর (সা) এবং তাঁর সঙ্গীদেরকে নিজেদের জান ও মাল দিয়ে সাহায্য ও হিফাজত করবেন। সুতরাং তাদের প্রত্যাবর্তনের পর হুজুর (সা) সাহাবীদেরকে (রা) মদীনায় হিজরতের অনুমতি দিলেন। প্রিয় নবীর (সা) ইঙ্গিত পেয়ে নির্যাতিত মুসলমানরা সেই নতুন দারুল আমানের দিকে হিজরত শুরু করলেন এবং দুই তিন মাসের মধ্যে তাঁদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মদীনা পৌঁছে গেলেন। তাঁদের মধ্যে হযরত মুসয়াব (রা) বিন উমায়েরও শামিল ছিলেন। সারওয়ারে আলমের (সা) হিজরতের শুধুমাত্র ১২ দিন পূর্বে তাঁরা মক্কাকে বিদায় জানান এবং মদীনা পৌঁছে আওস সরদার হযরত সায়াদ (রা) বিন মায়াজের বাড়ী অবস্থান শুরু করেন। কয়েকদিন পর মহানবীও (সা) হিজরত করে মদীনা তাশরীফ আনলেন এবং মুসলমানদের মাদানী জীবন শুরু হয়ে গেল।

হিজরতের পর প্রথম পাঁচ মাস আনসারদের গৃহসমূহ মুহাজিরদের জন্য আম বা সাধারণ মেহমানখানা ছিল। কিন্তু এ জীবন এবং পরিস্থিতি খুব

সুশৃংখল ছিল না। এ জন্য রাসূলে আকরাম (সা) প্রতিপালন ও জামানতের জন্য একটি সহজ আর স্থায়ী এবং সুশৃংখল কর্মপদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। বস্তুত হিজরতের পাঁচ মাস পর তিনি হযরত আনাস (রা) বিন মালিকের প্রশস্ত বাড়ীতে আনসার ও মুহাজিরদেরকে একত্রিত করলেন এবং তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করলেন। তিনি এক একজন মুহাজির ও আনসারকে ডাকতেন এবং তাঁদেরকে সম্বোধন করে বলতেন, "আজ থেকে তোমরা দু'জন ভাই ভাই।" এই পবিত্র মজলিসে হযরত মুসয়াব (রা) বিন উমায়েরের ভ্রাতৃত্বের আত্মীয়তা রাসূলের (সা) মেযবান বনু নাজ্জারের রঈস হযরত আবু আইয়ুব আনসারীর (রা) সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করা হলো।

হিজরতের পরও হযরত মুসয়াব (রা) অব্যাহতভাবে দাওয়াত ও তাবলীগ এবং ওয়াজ নসিহতের কাজে ব্যাপৃত রইলেন। দ্বিতীয় হিজরীতে সংঘটিত বদরের যুদ্ধের সময় তিনি সেই ৩১৩ জন পবিত্র আত্মার অন্যতম ছিলেন। যাঁরা অটলতা ও সংকল্প এবং ইসলাম ও ত্যাগের অতুলনীয় বা অক্ষয় ছবি ইতিহাসের পাতায় সেঁটে দেন। তাঁরা 'আসহাবে বদর'-এর মহান উপাধিতে বিভূষিত হন। হক ও বাতিলের প্রথম এই সংঘর্ষে রাসূলে করিম (সা) মুহাজিরদের সবচেয়ে বড় ঝাণ্ডা তাঁকে প্রদান করেছিলেন। এটাও তাঁর জন্য ছিল বিশেষ মর্যাদা।

তৃতীয় হিজরীতে সংঘটিত ওহোদের যুদ্ধেও হুজুর (সা) ঝাণ্ডা বহনের মর্যাদা হযরত মুসয়াবকে (রা) দিয়েছিলেন। ঘটনাক্রমে একটি ভুলের জন্য যুদ্ধের মোড় পরিবর্তিত হয়ে গেল এবং রাসূলের (সা) শাহাদাতের খবর ছড়িয়ে পড়লো। সে সময় মুসলমানরা তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়লো।

এক দল বললো, "রাসূলের (সা) পর লড়াই করে আর কি লাভ? আর একথা বলেই তারা মদীনা রওয়ানা হলেন।"

দ্বিতীয় দল বললো, "হুজুরের (সা) পর জীবিত থেকে কি লাভ? একথা বলেই তারা শাহাদাতের জন্য বীরের মত কাফের বাহিনীর মধ্যে ঢুকে পড়লো।"

তৃতীয় দলে ছিল তারা, যারা হুজুরের (সা) চারপাশে বেষ্টনী দিয়ে তাঁকে হেফাজত করে চলেছিলেন। এই দলে ছিলেন মাত্র ১৪ জন জানবাজ।

হযরত মুসয়াব (রা) বিন উমায়েরের শাহাদাত অন্বেষণকারী অটল মুজাহিদদের দ্বিতীয় দলে শামিল ছিলেন। তাঁর সিনা ছিল দ্বীনী জ্ঞানের খনি। তিনি যখন রাসূলের (সা) শাহাদাতের খবর শুনলেন তখন তাঁর মুখ দিয়ে এই আয়াত উচ্চারিত হলো ঃ

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلاَّ رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ

"এবং মুহাম্মাদ (সা) তো একজন রাসূল। তাঁর পূর্বেও রাসূল অতিবাহিত হয়েছে।"

এই আয়াত পড়েই তিনি উচ্চস্বরে নারা লাগালেন ঃ "আমি রাসূলের মাথা নত হতে দেব না।"

একথা বলেই তিনি এক হাতে নাঙ্গা তরবারী এবং অন্যহাতে ঝাণ্ডা নিয়ে কাফেরদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। মুশরিকদের মশহুর অশ্বারোহী ইবনে কামইয়া অগ্রসর হয়ে তরবারী দিয়ে আঘাত হানলো। এই আঘাতে তাঁর ডান হাত শহীদ হয়ে গেল। হযরত মুসয়াব (রা) তৎক্ষণাৎ বাঁ হাত দিয়ে ঝাণ্ডা ধরলেন। ইবনে কামইয়া অপর হাতও শহীদ করে ফেললো। তিনি কর্তিত বাহুর সাহায্যে ঝাণ্ডা বুক দিয়ে ধরলেন। সম্ভবতঃ তিনি দৃঢ় সংকল্প করেছিলেন। যে, যতক্ষণ শ্বাস-প্রশ্বাস চলবে ততক্ষণ ইসলামী ঝাণ্ডা অবনত হতে দিবেন না। হতভাগা ইবনে কামইয়া তারপর ক্রোধান্বিত হয়ে তাঁর ওপর বর্শা দিয়ে এমন এক আঘাত হানলো যে, ইলম ও ইশকে পূর্ণ হযরত মুসয়াবের (রা) পবিত্র বুকে তা বিধে গেল এবং তিনি তার প্রকৃত স্রষ্টার সঙ্গে মিলিত হলেন। তিনি যেই মাটিতে পতিত হলেন সেই তাঁর ভাই আবুর রুম (রা) বিন উমায়ের অগ্রসর হয়ে ঝাণ্ডা হাতে তুলে নিলেন এবং যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তা উঁচুতে তুলে ধরে বীরের হক আদায় করতে লাগলেন। যুদ্ধের পর সেই ঝাণ্ডা অবনত না করে মদীনা নিয়ে এলেন।

কুরাইশরা যখন যুদ্ধের ময়দান থেকে ফিরে গেল এবং মুসলমানরা নিজেদের শহীদদের কাফন দাফনের দিকে দৃষ্টি দিলেন তখন তাঁরা দেখলেন যে মক্কার সেই সুদর্শন কমনীয় চেহারার যুবক মুসয়াব (রা) রক্তাক্ত অবস্থায় মাটির ওপর উপুর হয়ে পড়ে আছে। বিশ্ব নবী (সা) তার শাহাদাতের খবরে খুব দুঃখ পেলেন। তিনি সেই ইলম ও আমলে পূর্ণ ব্যক্তিত্বের লাশের নিকট দাঁড়িয়ে গেলেন এবং এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন ঃ

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلاً –

"মু'মিনদের মধ্যে কিছু এমনও আছেন যে তাঁরা আল্লাহর নিকট যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা সত্য করে দেখিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে কতিপয় নিজেদের মুদ্দাত পূর্ণ করেছেন এবং কতপিয় এখনো ইন্তিজার করছেন এবং নিজেদের ইচ্ছায় কোন পরিবর্তন করেননি। (আল আহযাব-২৩)

[সহীহ বুখারীতে হযরত আনাস (রা) বিন মালিক থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁর চাচা হযরত আনাস (রা) বিন নজর সম্পর্কে এই আয়াত নাযিল হয়েছিল। হযরত আনাস (রা) বিন নজর অন্যতম জালিলুল কদর সাহাবীদের মধ্যে পরিগণিত হতেন। তিনি বনু নাজ্জার খান্দানের একজন সরদার ছিলেন এবং আত্মীয়তার দিক থেকে রাসূলে আকরামের (সা) পরদাদী সালমার ভ্রাতুষ্পুত্র হতেন। দ্বিতীয় বাইয়াতে উকবাতে ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। কোন কারণে বদরের যুদ্ধে শরীক হতে পারেননি। এ জন্য তাঁর অন্তরে খুব দুঃখ ছিল। হুজুরের (সা) খিদমতে হাজির হয়ে আরজ করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আফসোস যে আমি বদরের যুদ্ধে শরীক হতে পারিনি। আল্লাহ যদি আমাকে সুযোগ দেন তাহলে বিশ্ব দেখবে যে আমি ভবিষ্যতে কি করি।"

ওহোদের যুদ্ধে অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে অংশ নেন। হুজুরের (সা) শাহাদাতের খবর শুনে মুসলমানরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়লো। এ সময় হযরত আনাস (রা) অগ্রসর হলেন। রাস্তায় হযরত সায়াদ (রা) বিন মায়াজের সঙ্গে মুলাকাত হলে তিনি বললেন "সায়াদ কোথায় যাচ্ছো। আল্লাহর কসম আমি ওহোদের দিকে জান্নাতের খোশবু পাচ্ছি।" একথা বলেই তিনি হাতে তরবারী নিয়ে কাফেরদের মাজমাতে ঢুকে পড়লেন এবং জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত আঘাতের পর আঘাত খেতে খেতে লড়াই চালাতে লাগলেন। আঘাতে আঘাতে সারা শরীর জর্জরিত হয়ে গিয়েছিল এবং লাশ চেনা যাচ্ছিল না। তাঁর বোন রবি (রা) বিনতে নজর হাতের আঙ্গুল দেখে চিনতে পারলেন। শরীরে তীর, বর্শা এবং তরবারীর ৮০টি আঘাত ছিল।

হযরত আনাস (রা) বিন মালিক বলেন যে, একবার আমার ফুফু রবি বিনতে নজরের হাতে এক আনসারী মেয়ের দাত ভেঙ্গে গেল। তাঁর অভিভাবকরা কিসাস দাবী করে বসলেন এবং হুজুর (সা) কিসাসের নির্দেশ জারি করে দিলেন। আনাস (রা) বিন নজর এই খবর পেয়ে কেঁপে উঠলেন এবং হুজুরের (সা) খিদমতে হাজির হয়ে আরজ করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর কসম! রবির দাঁত ভাঙ্গা যাবে না।" হুজুর (সা) বললেন "এটাই আল্লাহর নির্দেশ।" আল্লাহর কি ইচ্ছা! মেয়েটির উত্তরাধিকাররা দিয়্যত নিতে রাজী হয়ে গেল এবং রবি'র দাঁত রক্ষা পেল। এই সময় হুজুর (সা) বলেছিলেন যে, আল্লাহর কিছু বান্দাহ এমন আছে সে যখন কসম খায় তখন আল্লাহ তাদের কসম পূর্ণ করে দেন।]

অতপর হুজুর (সা) বিহ্বল হয়ে বললেন ঃ "আমি মক্কায় তোমার মত সুদর্শন ও সুন্দর পোশাক পরিহিত আর কাউকে দেখিনি। কিন্তু আজ তোমার

চুল ধুলি মলিন ও অবিন্যস্ত এবং তোমার শরীরের ওপর শুধুমাত্র একটি চাদর রয়েছে। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তোমরা কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তায়ালার নিকট হাজির হবে।"

তারপর তিনি হযরত মুসয়াবের (রা) কাফনের নির্দেশ দিলেন। হক পথের এই শহীদের চাদর এত ছোট ছিল যে তা দিয়ে মাথা ঢাকা হলে পা বেরিয়ে যেত এবং পা ঢাকা হলে মাথা বেরিয়ে পড়তো, অবশেষে হুজুর (সা) বললেন যে, মাথা চাদর দিয়ে ঢেকে দাও এবং পা "আজখার" ঘাস দিয়ে ঢেকে এই শহীদকে মাটি দিয়ে দাও। সাহাবীরা (রা) নির্দেশ পালন করলেন। আর এভাবেই সেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ব্যক্তিত্ব বাহ্যিক দুনিয়া থেকে চিরকালের জন্য বিদায় নিলেন।

হযরত মুসয়াবের (রা) বিয়ে হয়েছিল মশহুর মহিলা সাহাবী হযরত হামনা (রা) বিনতে জাহাশের [রাসূলের (সা) ফুফাতো বোন] সঙ্গে। তিনি যয়নব নাম্নী একটি মেয়ে রেখে যান।

হযরত মুসয়াব (রা) বিন উমায়ের অন্যতম মশহুর সাহাবী ছিলেন। তিনি ঠিক ভরা যৌবনে একাকী আরাম আয়েশের জীবন শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পরিত্যাগ করেছিলেন এবং হক পথে এমন এমন নির্যাতন সহ্য করেছিলেন যে, তার অবস্থা পাঠ করে চোখ অশ্রু ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। হযরত মুসয়াবের (রা) দারিদ্র ও মুসিবত দেখে শুধুমাত্র সাহাবায়ে কিরামই (রা) নন বরং কখনো মওজুদাত হুজুরও (সা) দুঃখ ভারক্রান্ত হয়ে পড়তেন। কিন্তু স্বয়ং হযরত মুসয়াবের (রা) সবর ও শোকর এবং মুখাপেক্ষীহীনতার অবস্থা এমন ছিল যে, তিনি সবসময় হাসি খুশী থাকতেন এবং পার্থিব আনন্দ সম্পূর্ণরূপে ভুলেই গিয়েছিলেন।

হযরত মুসয়াব (রা) সাবিকুনাল আউয়ালুনের সেই পবিত্র দলের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন যারা হক পথে ভিন্ন হিজরত করার সম্মান লাভ করেছিলেন। মদীনার তাঁর তাবলীগী প্রচেষ্টার যে ফল পাওয়া গিয়েছিল তা ইসলামের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল অধ্যায়। ইলম ও ফজলের দিক থেকে তাঁর মর্যাদা এত উঁচুতে ছিল যে অনেক সাহাবী তাঁকে ঈর্ষা করতেন। ওহোদের ময়দানে তাঁর কাফন যে পদ্ধতিতে হয়েছিল তা বড় বড় জালিলুল কদর সাহাবীর জন্য জীবৎকালে শিক্ষণীয় ঘটনা ছিল। সহীহ্ বুখারীতে আছে যে, একবার হযরত আবদুর রহমান (রা) বিন আওফের সামনে (লৌকিকতাপূর্ণ) খাবার এলো। এ সময় তাঁর ইসলামের প্রথম যুগের কথা স্মরণ হলো। তিনি বললেন, "মুসয়াব (রা) বিন উমায়ের আমার থেকে উত্তম ছিলেন। তিনি শহীদ হয়ে গেলেন এবং

এক চাদর ছাড়া তাঁর কাফন জুটলো না............ সম্ভবত আমাদেরকে দুনিয়াতেই সকল নিয়ামত দিয়ে দেয়া হয়েছে।" একথা বলে তিনি কাঁদতে লাগলেন এবং খাওয়া ছেড়ে দিলেন। অন্য আরো কয়েকটি রেওয়ায়াত থেকেও জানা যায় যে, সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে যখন হযরত মুসয়াবের (রা) কথা আলোচনা হতো তখন তাঁরা অশ্রু সজল হয়ে উঠতেন এবং তাঁদের মুখ দিয়ে এই মরদে হকের জন্য সালাম ও মাগফিরাতের দোয়া বের হতো।

হযরত আবু জার গিফারী (রা)

সর্বোত্তম মানব রহমতে আলম (সা) একদিন কতিপয় সাহাবীর (রা) মধ্যে বসেছিলেন। এমন সময় শ্যামবর্ণের এক আকর্ষণীয় দেহের এক ব্যক্তি হুজুরের (সা) খিদমতে হাজির হলেন। ব্যক্তিটির মাথা ও দাড়ির কেশ ছিল পক্ক। তিনি প্রিয় নবীর (সা) খিদমতে উপস্থিত হয়ে এমনভাবে সালাম করলেন যে, তাতে সীমাহীন শ্রদ্ধা ও ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটছিল। তাঁকে দেখে সারওয়ারে আলমের (সা) প্রোজ্জ্বল চেহারা হাসিখুশীতে পূর্ণ হয়ে গেল এবং রাসূলের (সা) মুখ দিয়ে একথাগুলো উচ্চারিত হলো ঃ

"আবু জার থেকে বেশী কোন সত্যবাদীর ওপর আসমান ছায়া দান করেনি এবং যমীন এমন কোন ব্যক্তিকে কাঁধের ওপর তোলেনি।"

এবং সৃষ্টির প্রতিটি অণু পরমাণু স্বাক্ষ্য দিয়েছিল যে, অবশ্যই সাইয়েদুল মুরসালিন সত্য কথা বলেছিলেন।

আবু জার (রা) সেই সময় ইসলামের সত্যতার স্বাক্ষ্য দিয়েছিলেন যখন খাদিজাতুল কুবরা (রা), আবু বকর সিদ্দীক (রা), আলী মুরতাজা (রা) এবং যায়েদ বিন হারিছা (রা) ছাড়া কেউই "আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ" বলেননি এবং কেউই সারা জীবন আবু জারের (রা) মুখে হক ছাড়া অন্য কথা শোনেননি। এমনকি তাঁর সত্যবাদিতা ও স্পষ্টবাদিতা আসমান ও দুনিয়ায় উর্মি সংঘাত তুলেছিলো।

ভিন্ন রেওয়ায়াত অনুযায়ী হযরত আবু জারের (রা) প্রকৃত নাম ছিল বারির অথবা জুনদুব। বনু গিফার গোত্রের সঙ্গে তিনি সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। এই গোত্র ছিল কিনানা বিন খাযিমা বংশোদ্ভূত। বংশটির উর্ধতন ১৫তম পুরুষে রাসূলে আকরামের (সা) প্রপিতামহ ছিলেন। গিফার বিন মিবাল হযরত আবু জারের(রা) উর্ধতন সপ্তম পুরুষের এক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। তারই নামানুসারে কিনানী বংশোদ্ভূত আরবদের এই গোত্রকে গিফারী বলা হতো। গিফার পর্যন্ত হযরত আবু জারের (রা) নসবনামা নিম্নরূপ ঃ

আবু জার (জুনদুব অথবা বারির) বিন জানাদাহ বিন কায়েস বিন আমর বিন মালিল বিন সায়ির বিন হাযাম বিন গিফার। মায়ের নাম ছিল রানলাহ বিনতে রবিয়াহ। তিনিও গিফার গোত্রভুক্ত ছিলেন। বনু গিফারের ঠিকানা ও

আবাসস্থল ছিল মদীনা মুনাওয়ারা থেকে ৮০ মাইল দূরে বদরের পাশে। তার নিকটেই ছিল সেই সড়ক যা মক্কা মুকাররমাকে সিরিয়া ও ফিলিস্তিনের সাথে সংযুক্ত করেছিল। বনু গিফারের লোকজন খুব দরিদ্র ছিল এবং অত্যন্ত কষ্টে জীবন কাটাতো। তা সত্ত্বেও তাঁরা দীর্ঘদিন যাবত ধৈর্য ও অল্পে তুষ্টি নিজেদের অভ্যাসে পরিণত করে রেখেছিলেন। কিন্তু এমন এক সময় এলো যে, দারিদ্র্য ও দুঃসহ অবস্থা তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে ফেললো এবং তারা ডাকাতি ও লুণ্ঠনকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করলো। তারা শুধুমাত্র মক্কা ও সিরিয়ার মধ্যে যাতায়াতকারী বাণিজ্যিক কাফেলাই লুট করতো না বরং আশেপাশের গোত্রসমূহকেও মাঝে মধ্যে লুটের নিশানা বানাতো। হযরত আবু জার (রা) এই পরিবেশে জ্ঞানের চোখ খুললেন। যখন তিনি দেখলেন যে কবিলার যুবকরা নিত্যনতুন অভিযানে গমন করে এবং বিভিন্ন ধরনের মাল ও আসবাবে পূর্ণ হয়ে ফিরে আসে তখন তিনিও তাদের সঙ্গে শরীক হয়ে গেলেন। কিন্তু সর্বশক্তিমানের তাঁর মাধ্যমে অন্য কাজ নেয়ার ইচ্ছা ছিল। কি জানি কি এক অজ্ঞাত কারণে একাকী তাঁর জীবনে বিপ্লব হয়ে গেল এবং তাঁর স্বভাব লুটতরাজ, হত্যা, গারতগিরী ও রাহাজানী থেকে বিরূপ হয়ে গেল। সেই সঙ্গে তিনি কবিলার দেব-দেবী এবং মূর্তিদের ওপরও বিতৃষ্ণ হয়ে পড়লেন। মহান রব তাঁকে তাওহীদের রাস্তা দেখিয়ে দিলেন এবং তিনি রাত-দিন একক আল্লাহর ইবাদাতে মশগুল থাকতে লাগলেন। নিজেই নামাযের কোন পদ্ধতি ঠিক করে নিলেন এবং যেদিকেই আল্লাহ তায়ালা ঝুঁকিয়ে দিতেন সেদিকেই মুখ করে নামায পড়ে নিতেন। সহীহ মুসলিমে আছে যে, ইসলাম গ্রহণের পূর্বেই আবু জারের (রা) ওপর আল্লাহভীতি বিজয়ী হয়ে গিয়েছিল। স্বয়ং তিনি বর্ণনা করেছেন ঃ

"আমি রাতে নামাযের জন্য দাঁড়াতাম এবং দাঁড়িয়েই থাকতাম। এমনকি সুবহে কাজিব হয়ে যেতো। সে সময় আমি নিজেকে মাটিতে নিক্ষেপ করতাম এবং এমনভাবে পড়ে থাকতাম যেন কোন কাপড় পড়ে রয়েছে। আমার ওপর যখন রোদ পড়তো তখন আমি উঠতাম।"

গিফারের লোকজন তাঁর মুখ দিয়ে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র কথা শুনতেন এবং আশ্চর্য হয়ে যেতেন যে তাকে কোন ধরনের পাগলামীতে পেয়ে বসেছে। সে সময় মক্কা থেকে ইসলামের সূর্য উদিত হয়েছে এবং হাদিয়ে বরহক (সা) তাওহীদের দাওয়াতের কাজ শুরু করে দিয়েছেন। একদিন গিফার গোত্রের এক ব্যক্তি মক্কা গেল। সেখানে তার কানে হকের দাওয়াত পৌঁছলো। ফিরে এসে হযরত আবু জারের (রা) সঙ্গে দেখা করলো এবং বললো, 'আবু জার' তোমার মত মক্কাতেও এক ব্যক্তি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে থাকেন এবং

লোকদেরকে মূর্তিপূজা থেকে নিষেধ করেন।" আবু জার (রা) তো প্রথম থেকেই কোন হাদি বা পথপ্রদর্শকের সন্ধানে ছিলেন। এ খবর পেয়ে ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। তিনি তৎক্ষণাৎ সহোদর উনাইসকে একথা বলে মক্কা প্রেরণ করলেন যে, সে মক্কা গিয়ে সেই ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাত করবে যে মানুষদেরকে একক আল্লাহর দিকে আহবান জানিয়ে থাকে। তারপর ফিরে এসে তার অবস্থা বর্ণনা করবে। উনাইস (রা) একজন উঁচুদরের কবি এবং অত্যন্ত জ্ঞানী মানুষ ছিলেন। মক্কা পৌছে তিনি বিশ্ব নবীর (সা) ইরশাদসমূহ শুনে খুব প্রভাবিত হন। ফিরে এসে আবু জার (রা) জিজ্ঞেস করলেন, "মক্কার তাওহীদের দাবীকে তুমি কেমন দেখেছ?"

উনাইস জবাব দিলেন, "লোকজন তাকে কবি, জাদুকর ও গণক বলে থাকে। কিন্তু আল্লাহর কসম! আমি তাকে তেমন দেখিনি। তিনি কবিও নন গণকও নন এবং জাদুকরও নন। তিনি তো শুধু জনগণকে কল্যাণের দিকে আহবান জানান। এবং অকল্যাণ থেকে বিরত রাখেন।"

এই সংক্ষিপ্ত জবাবে হযরত আবু জার (রা) খুশী হতে পারলেন না এবং বরং পরিস্থিতি যাচাইয়ের জন্য মক্কা রওয়ানা হয়ে গেলেন।

মক্কা পৌছে হযরত আবু জার (রা) কা'বাতে অবস্থান করলেন। বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফাকে (সা) চিনতেন না। কারোর নিকট জিজ্ঞাসা করাকেও তিনি যুক্তিসিদ্ধ মনে করলেন না। আল্লাহর প্রতি দৃঢ় আস্থা ছিল যে, তিনিই দাবীরে হকের সঙ্গে সাক্ষাত ঘটিয়ে দেবেন। এভাবেই কয়েকদিন চলে গেল। একদিন হযরত আলী (রা) তাঁকে একদিকে ডেকে নিয়ে গেলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, "ভাই, তোমাকে এখানে কয়েকদিন ধরে দেখছি। তুমি কোন্ বস্তুর সন্ধান করছো?" হযরত আবু জার (রা) জবাব দিলেন, "তুমি যদি আমাকে মনিবলে মকসুদে পৌছে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দাও এবং মুখ না খোল তাহলে বলে দিচ্ছি।"

হযরত আলী (রা) বললেন, "তুমি মুতমায়িন বা নিশ্চিন্ত থাকো। তোমার গোপন ফাঁস হবে না।"

তারপর হযরত আবু জার (রা) নিজের মকসুদ বা লক্ষ্যের কথা বললেন। হযরত আলী (রা) তাঁর কথা শুনে বললেন, "তুমি হেদায়াতের পথ পেয়ে গেছ। যার সন্ধানে তুমি এসেছ নিঃসন্দেহে তিনি আল্লাহর সাচ্চা রাসূল।" "হযরত আবু জারের (রা) ওপর ভাবাবেগ দেখা দিল। তিনি হযরত আলীর (রা) নিকট দরখাস্ত করলেন, আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে সেই পবিত্র সত্তার

নিকট পৌঁছে দিন।" অন্য এক রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত আলী (রা) প্রথম দিন কিছু জিজ্ঞাসা না করে হযরত আবু জারকে (রা) স্বগৃহে নিয়ে গেলেন। রাত কাটিয়ে আবু জার (রা) পুনরায় কা'বা শরীফে গিয়ে পৌঁছলেন। দ্বিতীয় দিন হযরত আলী (রা) পুনরায় তাঁকে নিজ গৃহে নিয়ে গেলেন এবং কা'বায় অবস্থানের মাকসাদ জিজ্ঞেস করলেন—হযরত আবু জার (রা) তাঁর নিকট থেকে গোপনীয়তা রক্ষার প্রতিশ্রুতি নিলেন। অতপর নিজের অবস্থা কমবেশী বর্ণনা করলেন এবং বললেন যে, আমি এখানে শুধুমাত্র মক্কার দায়ীয়ে হকের সন্ধানে অবস্থান করছি।]

হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু তাঁকে সঙ্গে নিয়ে নবীর (সা) খিদমতে উপস্থিত হলেন। হুজুরের (সা) নবুওয়াতের মহত্বপূর্ণ প্রোজ্জ্বল মুবারক চেহারা দর্শনে আবু জারের (রা) অন্তর সাক্ষ্য দিল যে, বাস্তবিকই তিনি আল্লাহর সাচ্চা রাসূল। অস্থির চিত্তে আরজ করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে আপনার দাওয়াতের বিস্তারিত জানান।"

হুজুর (সা) এমন সুন্দরভাবে আবু জারের (রা) সামনে ইসলাম পেশ করলেন যে, তাঁর অন্তর ঈমানের আবেগে পূর্ণ হয়ে গেল। তৎক্ষণাৎ তিনি কালেমায়ে শাহাদাত পড়ে ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভ হয়ে গেলেন। তার পূর্বে শুধুমাত্র চার পবিত্র ব্যক্তিত্ব ঈমানের নেয়ামতে ভাগ্যবান হওয়ার সুযোগ লাভ করেছিলেন। তাঁরা হলেন, উম্মুল মু'মিনীন খাদিজা (রা), সিদ্দীকে আকবার(রা), আলী মুরতাজা (রা) এবং যায়েদ বিন হারিছা (রা)। এরপর হুজুর (সা) আবু জারকে (রা) জিজ্ঞেস করলেন :

"গিফারী ভাই তোমার পানাহারের কি ব্যবস্থা ছিল?"

তিনি আরজ করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! খাবার তো কিছুই পাইনি। যমযমের পানি পান করে পেটপূর্ণ করেছি।"

সে সময় হযরত সিদ্দীকে আকবার (রা) পাশেই ছিলেন। তিনি আরজ করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! যদি অনুমতি হয় তাহলে আমি কি কিছু খাওয়াতে পারি?" হুজুর (সা) বললেন, "হাঁ, হাঁ, অবশ্যই।"

সিদ্দীকে আকবার (রা) হযরত আবু জারকে (রা) সঙ্গে নিয়ে বাড়ী গেলেন। রাসূলে আকরামও (সা) সঙ্গে গেলেন। সেখানে সিদ্দীকে আকবার (রা) তায়েফের শুকনো আঙ্গুর প্রিয় নবী (সা) এবং আবু জারের (রা) খিদমতে পেশ করলেন। মক্কা পৌঁছার পর হযরত আবু জারের (রা) এটাই ছিল প্রথম খাবার। অতপর রাসূলে করিম (সা) আবু জারকে (রা) বললেন :

"আবু জার (রা) এখন তুমি নিজের কবিলায় ফিরে যাও এবং তাদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দাও। যখন দাওয়াতে হকের ব্যাপকতার খবর পাবে তখন এখানে পুনরায় চলে এসো। বর্তমানে তুমিও মক্কাতে নিজের ইসলাম গ্রহণের কথা গোপন রেখো।"

আবু জারের (রা) অন্তর তাওহীদের আবেগে পূর্ণ ছিল। আরজ করলেন ঃ "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর কসম, আপনি অনুমতি দিন। আমি মক্কায় আমার ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করে যাবো।" হুজুর (সা) তার আবেগ ও উদ্যম দেখে চুপ মেরে গেলেন।

তারপর আবু জার (রা) সোজা কা'বার হেরেমে তাশরীফ নিলেন। সেখানে মুশরিকদের 'মাজমা' ছিল। আবু জার (রা) মুশরিকদেরকে সম্বোধন করে উচ্চস্বরে বললেন ঃ

"হে মানুষেরা, একক আল্লাহ ব্যতীত কেউই পূজার যোগ্য নয় এবং মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহর সত্য রাসূল।"

আবু জারের (রা) মুখ দিয়ে এই কথা বের হতে না হতেই মুশরিকরা চারদিক থেকে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং মেরে মেরে রক্তাক্ত করে দিল। ইত্যবসরে আব্বাস (রা) বিন আবদুল মুত্তালিব এসে পড়লেন। একজন বিদেশীকে এই অবস্থায় দেখে তার অন্তর বিগলিত হয়ে গেল। তিনি আবু জারের (রা) ওপর উপুর হয়ে পড়ে মুশরিকদেরকে বললেন, "তোমরা থামো, কেন অন্যায়ভাবে এই গরীবের জীবন নিচ্ছ।" আব্বাস (রা) তখনো ঈমান আনয়ন করেননি। এ জন্য মুশরিকরা তাঁর কথা খুব মানতো। তাঁর কথায় তারা আবু জারকে (রা) ছেড়ে দিলেন। কিন্তু তাওহীদে মাতোয়ারা আবু জার (রা) পরের দিন পুনরায় কা'বা পৌঁছলেন এবং মুশরিকদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দিতে লাগলেন। মুশরিকরা তাঁকে পুনরায় ধরলো এবং নির্যাতন শুরু করলো। এবারও আব্বাস (রা) তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন এবং মুশরিকদের বুঝালেন যে, "এই ব্যক্তি গিফারের যুদ্ধবাজ ও রক্তপিপাসু গোত্রের সদস্য। তোমরা যদি তাকে মেরে ফেলো তাহলে তোমাদের কোন বাণিজ্যিক কাফেলা মনযিলে মাকসূদ পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না। গিফারীদের সঙ্গে খামাখাহ শত্রুতা কেন কিনে নিচ্ছ।"

মুশরিকদের বোধোদয় হলো এবং তারা আবু জারকে (রা) ছেড়ে দিল। আবু জার বুঝতে সক্ষম হলো যে, তাদের অন্তরে মোহর লেগে গেছে। তাদের ওপর তার কথার কোন আছর হবে না। তাদেরকে আল্লাহর সত্য রাসূলই (সা) হেদায়াতের পথে আনতে পারেন। এ জন্য নিজস্ব বলয়ে গিয়ে তাবলীগ

করাটাই উত্তম হবে। একথা চিন্তা করে তিনি স্বদেশের পথে রওয়ানা হয়ে গেলেন। সেখানে পৌছে তিনি সর্বপ্রথম দুই সহোদর এবং মাকে তাওহীদের দাওয়াত প্রদান করলেন। এ তিনজনই কালবিলম্ব না করে দাওয়াতে সাড়া দিলেন। অতপর তিনি নিজের কবিলাকে ইসলামের দিকে আহবান জানালেন। অর্ধেক গোত্র তখনই মুসলমান হয়ে গেল এবং বাকী অর্ধেক মহানবীর (সা) হিজরতের পর ঈমান এনেছিলেন।

হযরত আবু জার (রা) দীর্ঘদিন পর্যন্ত স্বগোত্রের লোকজনদেরকে ইসলামের শিক্ষা দিতে থাকেন। যখন বদর, ওহোদ, খন্দক প্রভৃতি যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল তখন তিনি স্বদেশভূমি থেকে হিজরত করেন। মদীনাতুর রাসূলে (সা) পৌছে নবীর (সা) দরবারে হাজির হলেন এবং নিজেকে সারওয়ারে দো আলমের (সা) খিদমতের জন্য ওয়াকফ করে দিলেন। [এক রেওয়ায়াতে আছে যে, রাসূলে আকরাম (সা) ৩২টি দুধালো উটনী হযরত আবু জারকে (রা) দিয়েছিলেন। তিনি উটনীগুলো নিয়ে মদীনা থেকে ১২ মাইল দূরে অবস্থিত জিকারদের নিকট এক জঙ্গলে মুকিম হয়ে গেলেন। তাঁর স্ত্রী লায়লা এবং পুত্র জারও (রা) সঙ্গে ছিলেন। ৬ষ্ঠ হিজরীর রবিউল আউয়ালে বনু গাতফানের লুটেরারা আইনিয়া বিন হিসান ফাযারীর নেতৃত্বে হঠাৎ করে হামলা চালালো। এই হামলায় জার (রা) শহীদ হয়ে গেলেন। লুটেরারা সকল উটনী ও আবু জারের (রা) স্ত্রীকে হাঁকিয়ে নিয়ে চললো। সময় মতই সাহাবীরা এই খবর পেলেন এবং পিছু ধাওয়া করলেন ও সকলকে মুক্ত করে আনলেন। এই ঘটনা গাযওয়ায়ে জি কারদ নামে মশহুর হয়ে আছে।] তাবুকের যুদ্ধের প্রাক্কালে আবু জার গিফারীও (রা) নিজের প্রভু (সা) সহ তাবুক রওয়ানা হয়ে গেলেন। পথে তাঁর উট দুর্বল হয়ে পড়লো এবং তিনি ইসলামী বাহিনীর পেছনে পড়ে গেলেন। অন্তরে জিহাদের অনুপ্রেরণা ছিল। সেখানেই উট ছেড়ে দিলেন এবং সব সামান পিঠে নিয়ে পদব্রজে মনযিলে মাকসুদের দিকে রওয়ানা দিলেন। সামনে অগ্রসর হয়ে ইসলামী বাহিনী একস্থানে অবস্থান করলো। এক ব্যক্তি হুজুরের (সা) নিকট আরজ করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঐ দূরে একজন মানুষ আসছে। কে যে হবেন তা জানা নেই?" হুজুর (সা) বললেন, "আবু জার হবে।"

লোকজন দেখলো যে, সত্যি তিনি আবু জার (রা) ছিলেন। রাসূলে করিমের (সা) নিকট আরজ করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল আল্লাহর কসম তিনি আবু জারই।"

হুজুর (সা) বললেন, "আবু জার (রা) একাকীই চলে থাকে। একাকীই মারা যাবেন এবং কিয়ামতের দিন একাকী উঠবেন।"

হযরত আবু জার (রা) গিফারীর যুহদ, তাকওয়া এবং আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি ভালবাসার অবস্থাটা এমন ছিল যে প্রিয় নবী (সা) তাঁকে "মসিহুল ইসলাম লকবে বিভূষিত করেছিলেন।"

একদিন হযরত আবু জার (রা) রাসূলে আকরামের (সা) খিদমতে আরজ করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! এক ব্যক্তি কতিপয় ব্যক্তিকে ভালবাসে। কিন্তু তাঁদের আমল বাস্তবায়নের শক্তি রাখে না। তার ব্যাপারে আপনার কি ইরশাদ।"

হুজুর (সা) বললেন, "সেই ব্যক্তি যাঁদেরকে ভালবাসেন তাঁদের সঙ্গেই থাকবেন।"

আবু জার (রা) গিফারী আরজ করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমি শুধু আপনাকে এবং আল্লাহ তায়ালাকে ভালবাসি।" হুজুর (সা) বললেন, "তুমি অবশ্যই আল্লাহ্ এবং আল্লাহর রাসূলের (সা) সঙ্গে রয়েছো।"

মহানবী (সা) আবু জার গিফারীকে (রা) এত স্নেহ করতেন যে, মৃত্যুশয্যাতেও তিনি তাকে ডেকে পাঠান। আবু জার (রা) নবীর (সা) নিকট পৌঁছে গভীর ভালবাসার সঙ্গে তাঁর ওপর ঝুঁকে পড়েন। হুজুর (সা) তার মুবারক হাত নিজের পবিত্র শরীরের সঙ্গে লাগালেন। আবু জার (রা) প্রায় আত্মহারা হয়ে পড়লেন। হুজুরের (সা) ওফাতের পর আবু জারের (রা) অন্তরের দুনিয়া উজার হয়ে গেল।

তিনি মদীনা ত্যাগ করে সিরিয়া গিয়ে বসবাস শুরু করেন। তাঁর জীবন ছিল যুহদ ও আল্লাহভীতি এবং দারিদ্র ও অল্পে তুষ্টির এক আশ্চর্য নমুনা। যা কিছু হাতে আসতো তা আল্লাহর পথে বিলিয়ে দিতেন। শুধু একটি চাদর শরীরে শোভা পেত। শায়খাইনের (রা) পর তিনি অনুভব করলেন যে, ধন-সম্পদের প্রতি লোকদের মোহ সৃষ্টি হয়েছে। সাদাসিধে পোশাকের স্থলে আড়ম্বরপূর্ণ পোশাকের ব্যবহার শুরু হয়ে গেছে। বিজয় এবং গনিমতের মালের আধিক্যে কোষাগার স্ফীত হয়ে উঠেছে। সাধারণ ঘরের পরিবর্তে প্রাসাদ নির্মাণ শুরু হয়ে গেছে। আবু জার (রা) এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করে বেচাইন হয়ে গেলেন। তিনি সর্বশক্তি নিয়োগ করে মুসলমানদেরকে ডেকে বললেন, "ভাইয়েরা আমার! ধন-সম্পদ জমা করা এবং আরাম-আয়েশের জীবন পরিচালনা করার মধ্যে সরাসরি ধ্বংস রয়েছে। আল্লাহর নির্দেশ হলো ঃ

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُوْنَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ -

"যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে এবং তা আল্লাহর পথে খরচ করে না তাদেরকে বেদনাদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও।" (আত তাওবা ঃ ৩৪)

তোমরা যদি আল্লাহর নির্দেশ থেকে বিদ্রোহ ঘোষণা কর তাহলে তার প্রতিশ্রুতি কখনো টলতে পারে না।

হযরত আবু জার গিফারী (রা) যেভাবে এই আয়াতের তাফসির করতেন সে ব্যাপারে সিরিয়ার গভর্ণর আমীর মুয়াবিয়া (রা) এবং অধিকাংশ সাহাবী ভিন্ন মত পোষণ করতেন। তাঁরা বলতেন যে, আহলে কিতাব অর্থাৎ ইহুদী ও খৃষ্টানদের সঙ্গে এই আয়াত সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু আবু জার (রা) বলতেন যে, অবশ্যই নয়। এই আয়াত ইহুদী, খৃষ্টান এবং মুসলমান সকলের সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে। তিনি কঠোরভাবে এই মতই পোষণ করতেন এবং ভয়-ভীতি ও লোভ-লালসার কোন অস্ত্রই তাঁকে এই মত প্রকাশ থেকে বিরত রাখতে পারতো না। তাঁর কথার মর্মার্থ ছিল এই ঃ

"হে বিত্তবান মুসলমানরা! তোমরা যদি নিজের সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় না করো, তাহলে কিয়ামতের দিন তোমাদের জমাকৃত সম্পদ তোমাদের মুখমণ্ডলে, পাশে এবং পিঠে দাগ দেবে। মনে রেখো, সম্পদে তিন বস্তু শরীক থাকে। (১) উত্তরাধিকার। তুমি কখন এই দুনিয়া থেকে বিদায় নেবে সে ব্যাপারে তারা অপেক্ষমান থাকে এবং তারা তোমার সঞ্চিত সম্পদ কবজা করতে চায় (২) তকদির। যা তোমাকে জিজ্ঞাসা ব্যতিরেকে সিদ্ধান্ত জারী করে দেয়। (৩) স্বয়ং তুমি। তুমি যদি এই উভয়ের ওপর বাজি নিতে পারো তাহলে অবশ্যই তুমি তা কর। আল্লাহ বলেন, "তুমি নেকী ও কল্যাণকে কখনই পেতে পারো না যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি নিজের প্রিয় বস্তু সবার জন্য আম করে না দাও।"

"ভুলে যেও না যে, মানুষ মরার পর শুধু তিনটি বস্তুই তার কাজ দেবে(১) নেক আওলাদ। তারা তার জন্য মাগফিরাত কামনা করে। (২) সাদকায়ে জারিয়াহ (৩) ইলম যা থেকে মানুষ ফয়েজ লাভ করে থাকে।

গরীব লোকেরা আবু জারের (রা) বাণী শুনে, তাঁর ওপর পতঙ্গের মত আপতিত হতে লাগলো। অন্যদিকে ধনীরা তাঁর কথায় অমঙ্গলের পদধ্বনি শুনতে পেলো।

আমীরে মুয়াবিয়া (রা) নিজের প্রাসাদ আল খাজরা নির্মাণ করছিলেন। হঠাৎ করে একদিন হযরত আবু জার (রা) সেই স্থান দিয়ে যাচ্ছিলেন। প্রাসাদের ঠাটবাট দেখে আমীর মুয়াবিয়াকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

"এই প্রাসাদ নির্মাণ যদি আল্লাহর সম্পদ দিয়ে হয়ে থাকে তাহলে তা হবে খিয়ানত। আর তা নির্মাণে যদি নিজের সম্পদ ব্যয় করে থাকো তাহলে তা হবে অপচয়।"

আমীরে মুয়াবিয়া (রা) একথার কোন জবাব দিলেন না। কিন্তু তাঁর অন্তরে হযরত আবু জারের (রা) ব্যাপারে খটকা সৃষ্টি হয়ে গেল। কিছুদিন পর আমীর মুয়াবিয়া (রা) সাইপ্রাস অভিযানের ইচ্ছা করলেন। সেনাবাহিনী রওয়ানা হতে লাগলো। এমন সময় তিনি হযরত আবু জার গিফারীকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কি জিহাদে যেতে চান?" আবু জার (রা) তো আল্লাহর রাস্তায় নিজের জীবন ওয়াকফ করে রেখেছিলেন। তিনি জবাব দিলেন ঃ

"গৃহে এক হাজার দিন অতিবাহিত করার চেয়ে আল্লাহর পথে একদিন জিহাদ করা উত্তম। আমি জিহাদের আহবানে সাড়া দিচ্ছি।"

একথা বলেই তিনি ইসলামী বাহিনীতে গিয়ে শামিল হলেন। ইসলামের মুজাহিদরা যখন সাইপ্রাস জয় করে নিল তখন হযরত আবু জার গিফারী (রা) সিরিয়ায় ফিরে এসে লোকদের মধ্যে পুনরায় নিজের মত প্রচার করতে লাগলেন। সরকারের বিরুদ্ধে তিনি এত কঠোরভাবে সমালোচনা করতেন যে, আমীর মুয়াবিয়ার (রা) সঙ্গে বিবাদ বেধে যাওয়ার উপক্রম হলো। একদিন আমীর মুয়াবিয়া (রা) উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ আবু জারের (রা) খিদমতে প্রেরণ করলেন। তিনি সেই অর্থ কয়েক ঘন্টার মধ্যে অভাবীদের ভেতর বিতরণ করে দিলেন। পরের দিন আমীর মুয়াবিয়া (রা) পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে একজন দূতকে তাঁর নিকট এই বলে প্রেরণ করলেন যে, গতকাল ভুলবসত সেই অর্থ আপনাকে দেয়া হয়েছিল। তা ফিরিয়ে দিন। উদ্দেশ্য ছিল যে, যদি এই অর্থ আবু জারের (রা) নিকট বর্তমান থাকে তাহলে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা যাবে যে, আপনিতো এক রাতের জন্যও সম্পদ জমা রাখা হারাম মনে করেন। অথচ এই অর্থ আপনি কেমন করে নিজের নিকট রেখেছিলেন। দূত যখন আবু জারের নিকট পৌঁছলো এবং তার নিকট অর্থ ফিরিয়ে দেয়ার দাবী জানালো তখন তিনি বললেন, "সেই অর্থতো আমি সূর্য ওঠার পূর্বেই অভাবীদের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছি।" দূত আমীরে মুয়াবিয়ার (রা) নিকট ফিরে গেলো এবং তাঁকে হযরত আবু জারের (রা) জবাব শুনালো। জবাব শুনে তাঁর মুখ দিয়ে অযাচিতভাবে বেরিয়ে এলো, "আবু জার (রা) বাস্তবিকই সত্যবাদী। যা বলে তার ওপর আমলও করে।"

আমীর মুয়াবিয়া একদিন হযরত আবু জারকে (রা) ডেকে পাঠালেন। তিনি যখন তাশরীফ রাখলেন তখন তাঁকে খাবার দাওয়াত দিলেন। দস্তরখানের

ওপর বিভিন্ন ধরনের খাবার সাজিয়ে রাখা হয়েছিল। আবু জারের (রা) মত দরবেশ মানুষ কি করে এই খাবারে হাত লাগাতে পারে। তৎক্ষণাৎ তিনি দাওয়াত গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালেন এবং বললেন ঃ

"রাসূলের (সা) যুগ থেকে সপ্তাহে আমার খাবারের পরিমাণ হলো এক ছা' যব। আল্লাহর কসম! আমি তা থেকে বেশী খাবো না। এভাবেই আমি আমার দোস্ত রাসূলে আকরামের (সা) নিকট গিয়ে উপস্থিত হবো।"

আমীর মুয়াবিয়া (রা) এবং হযরত আবু জারের (রা) মধ্যে অসন্তোষ যখন বৃদ্ধি পেল তখন আমীরুল মু'মিনীন হযরত উসমান (রা) হযরত আবু জারকে (রা) মদীনা ডেকে পাঠালেন। সেখানেও তিনি নিজের বিশেষ মত জনগণের মধ্যে প্রচার শুরু করলেন। হযরত উসমান (রা) চরমপন্থী ধ্যান-ধারণা দেখে তাঁকে ফতওয়া দান থেকে বিরত থাকতে বললেন। কিন্তু হযরত আবু জার(রা) এই নিষেধাজ্ঞা সহ্য করতে পারলেন না। তিনি বললেন, "আল্লাহর কসম! আমার গর্দানের ওপর যদি তরবারীও রাখা হয় এবং আমার ইয়াকিন হয় যে, গর্দান কাটার পূর্বে যা কিছু প্রিয় নবীর (সা) নিকট থেকে শুনেছি তা শোনাতে পারবো তাহলে তা অবশ্যই শুনিয়ে দেবো।" "হযরত উসমান (রা) আবু জারকে (রা) "রাবযাহ" চলে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন। মরু আরবের একটি ছোট গ্রাম হলো রাবযাহ। আবু জার গিফারী (রা) নিজেও নির্জনত্ব পসন্দ করতেন। নিজের পরিবার-পরিজনকে সঙ্গে নিলেন এবং আনন্দের সঙ্গে রাবযাহ গিয়ে বসবাস শুরু করলেন।

ইরাকের লোকজন হযরত আবু জারের (রা) রাবযাহ অবস্থানের কথা জানতে পেলো। তারা তাঁর নিকট একটি বার্তা প্রেরণ করলেন। এই বার্তায় তারা জানালো যে উসমান (রা) আপনার সঙ্গে অন্যায় আচরণ করেছেন। আপনি যদি আমাদের নেতৃত্ব দান করেন তাহলে আমরা উসমানের (রা) বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঝাণ্ডা তুলে ধরবো।

হযরত আবু জার (রা) গিফারী জবাবে বলে পাঠালেন ঃ "উসমান (রা) যা কিছু করেছেন তাতেই আমার কল্যাণ রয়েছে বলে আমি মনে করি। তোমরা তাতে নাক গলিও না এবং আমীরুল মু'মিনীনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করো না। কেননা যারা নিজের আমীরকে হেয় করে আল্লাহ তাদের তাওবা কবুল করেন না।"

ইরাকীরা চুপ মেরে গেল এবং হযরত আবু জার গিফারী (রা) দুনিয়ার হৈ-হাঙ্গামা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ধৈর্য এবং অল্পে তুষ্ট থেকে জীবন কাটাতে লাগলেন। ৩১ অথবা ৩২ হিজরীতে হজ্জের মওসুমে হযরত আবু জার গিফারী

(রা) কঠিন রোগে আক্রান্ত হলেন। রাবযাহর সকল মানুষ হজ্জের জন্য রওয়ানা হয়ে গিয়েছিল। সে সময় তাঁর নিকট শুধুমাত্র জীবন সঙ্গিনী এবং এক কন্যা উপস্থিত ছিলেন। আবু জার গিফারীর (রা) মৃত্যু যন্ত্রণা শুরু হলে তাঁর স্ত্রী কাঁদতে লাগলেন। আবু জার (রা) খুব ক্ষীণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "কাঁদছো কেন?"

স্ত্রী জবাব দিলেন, "আপনি এক বিরাণ স্থানে মৃত্যুবরণ করছেন। আমার নিকট আপনাকে কাফন দেয়ার মত কাপড় নেই। তাছাড়া আমার বাহুতে এমন শক্তিও নেই যে, আপনার স্থায়ী আবাস তৈরী করতে পারি।"

হযরত আবু জার গিফারী (রা) বললেন, "শোনো, একদিন আমরা কতিপয় ব্যক্তি রাসূলে আকরামের (সা) খিদমতে উপস্থিত ছিলাম। হুজুর (সা) বললেন, তোমাদের মধ্যে এক ব্যক্তি মরুভূমিতে মারা যাবে এবং তার জানাযায় মুসলমানদের একটি দল বাইরে থেকে এসে অংশ নেবে। সে সময় যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা শহরে ওফাত পেয়েছেন। এখন আমিই শুধু বাকী রয়েছি। রাসূলে আকরাম (সা) যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তা অবশ্যই আমার জীবনে ঘটবে বলে আমি বিশ্বাস করি। তুমি বাইরে গিয়ে দেখো হুজুরের (সা) ইরশাদ অনুযায়ী মুসলমানদের কোন দল অবশ্যই আসছেন।" পাশেই একটি টিলা ছিল। হযরত আবু জারের (রা) স্ত্রী তাতে আরোহণ করে অপেক্ষা করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর দূরে বালি উড়তে দেখা গেল। অতপর তার মধ্যে কতিপয় সওয়ার দেখা গেল। নিকটে এলে আবু জারের (রা) স্ত্রী তাঁদেরকে ডেকে বললেন, "ভাইসব! নিকটেই একজন মুসলমান আখিরাতের সফরের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তাঁর কাফন ও দাফনে আমাকে সাহায্য কর।" কাফেলার লোকেরা জিজ্ঞাসা করলেন, "লোকটি কে?" তিনি জবাব দিলেন, "আবু জার গিফারী (রা)।" আবু জারের (রা) নাম শুনেই কাফেলা ওয়ালারা অস্থির হয়ে পড়লেন এবং "আমাদের মাতা-পিতা তাঁর ওপর কোরবান হোক" একথা বলেই তাঁর দিকে অগ্রসর হলেন।

এদিকে আবু জার (রা) মেয়েকে বললেন, "কলিজার টুকরো আমার! একটি বকরী জবেহ করো এবং গোশতের হাড়ি চুলায় চড়িয়ে দাও। কিছু মেহমান আসছেন। তাঁরা আমার কাফন-দাফন করবেন। তাঁরা যখন আমার দাফনের কাজ শেষ করবেন তখন তাদেরকে বলবে যে, আবু জার (রা) আপনাদেরকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলেছেন, যতক্ষণ আপনারা এই গোশত না খাবেন ততক্ষণ এখান থেকে বিদায় হবেন না।"

কাফেলার লোকজন যখন হযরত আবু জারের (রা) তাঁবুতে প্রবেশ করলেন তখন তাঁর শেষ অবস্থা। খুব দুর্বল কণ্ঠে বললেন, "তোমাদের শুভ হোক। বহু বছর পূর্বে হাদিয়ে বরহক (সা) তোমাদের এখানে আগমনের খবর দিয়েছিলেন। আমি তোমাদেরকে ওসিয়ত করছি যে, "আমাকে এমন কোন ব্যক্তি কাফন পরাবে না যিনি বর্তমানে সরকারী কর্মচারী আছে অথবা অতীতে ছিলে।" ঘটনাক্রমে সেই কাফেলায় একজন আনসার যুবক ছাড়া সকলেই কোন না কোনভাবে সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সে অগ্রসর হয়ে বললো, "হে রাসূলে করিমের (সা) প্রিয় বন্ধু! আমি আজ পর্যন্ত সরকারী চাকরি থেকে সম্পর্কহীন রয়েছি। আমার নিকট দু'টি কাপড় রয়েছে। কাপড় দু'টি আমার আম্মা নিজ হাতে বুনেছেন। অনুমতি দিলে এই কাপড় দিয়ে আপনার কাফন দিতে পারি।"

হযরত আবু জার (রা) হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়লেন এবং অতপর "বিসমিল্লাহি ওয়া বিল্লাহি ওয়া আলা মিল্লাতিহী রাসূলিল্লাহি" বলে মহান আল্লার নিকট জীবন সোপর্দ করে দিলেন।

এই কাফেলার অধিকাংশ মানুষ ছিলেন ইয়েমেনের অধিবাসী। ঘটনাক্রমে তাঁদের সঙ্গে ছিলেন ফাকিহুল উম্মাহ বা উম্মাহর ফকিহ হযরত আবদুল্লাহ(রা) বিন মাসউদ। তিনি জানাযার নামায পড়ালেন এবং সকলে মিলে ন্যায় ও হেদায়াতের সূর্যকে দাফন করলেন। তাঁরা যখন রওয়ানা হতে চাইলেন তখন আবু জার গিফারীর (রা) কন্যা কসম দিয়ে খাবার খাওয়ালেন।

আল্লামা তাবারী (র) বর্ণনা করেছেন যে, যাওয়ার সময় হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন মাসউদ হযরত আবু জারের (রা) পরিবার পরিজনকে সঙ্গে নিলেন এবং মক্কা মুয়াজ্জামা পৌছে তাঁদেরকে হযরত উসমানের (রা) হাওয়ালা করে দিলেন। অন্য এক রেওয়ায়াতে আছে যে, হজ্জ থেকে ফিরে হযরত উসমান(রা) স্বয়ং তাঁদেরকে রাবযাহ থেকে মদীনা নিয়ে গেলেন এবং স্থায়ীভাবে তাঁদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিলেন। সাইয়েদেনা আবু জার গিফারী (রা) অন্যতম মহান সাহাবী ছিলেন। তাঁর মর্যাদার ব্যাপারে মিল্লাতে ইসলামিয়া ঐকমত্য ঘোষণা করে থাকেন।

ইসলাম গ্রহণে অন্যতম অগ্রগামী, রাসূল প্রেম, কুরআন ও হাদিসে উৎসাহী, দারিদ্র ও আল্লাহভীতি, ত্যাগ ও অল্পে তুষ্টি, তাকওয়া ও তাওয়াক্কুল, তাবলীগ ও ইরশাদ এবং সত্যবাদিতা ও স্পষ্টবাদিতা ছিল হযরত আবু জারের (রা) চরিত্রের উল্লেখযোগ্য দিক। সাইয়েদেনা হযরত উমর ফারুক (রা) জ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁকে হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন মাসউদের সমান মনে করতেন।

শেরে খোদা আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু বলতেন, আবু জার (রা) এত জ্ঞান অর্জন করেছেন যে, মানুষ তা লাভে অক্ষম এবং সেই থলেকে এমনভাবে বন্ধ করে দিয়েছেন যে, তা থেকে সামান্যও কমেনি।

রহমতে আলম (সা) হযরত আবু জারকে (রা) সীমাহীন স্নেহ করতেন। তিনি যখন নবীর (সা) মজলিশে উপস্থিত হতেন তখন হুজুর (সা) সর্বপ্রথম তাঁকেই সম্বোধন করতেন। তিনি যদি মজলিশে উপস্থিত না থাকতেন তাহলে তাঁকে তালাশ করে আনা হতো এবং হুজুর (সা) তাঁর সঙ্গে মুসাফিহা করতেন।

নবীর (সা) দরবারে খুব কম সাহাবীই (রা) এমন ছিলেন যাঁরা লৌকিকতা ছাড়া হুজুরের (সা) নিকট প্রশ্ন করতে পারতেন। কিন্তু রহমতে আলম (সা) হযরত আবু জারকে (রা) এতো অধিক ভালবাসতেন যে, তিনি স্বাধীনভাবে সাধারণ সাধারণ ব্যাপারেও প্রশ্ন করতেন। মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে আছে, হযরত আবু জারের (রা) প্রতি রাসূলে করিমের (সা) শ্রদ্ধা ও ভালবাসা চরম পর্যায়ের ছিল। মদীনা আগমনের পর অধিকাংশ সময় তিনি রাসূলে আকরামের (সা) খিদমতে অতিবাহিত করতেন এবং মন-প্রাণ ঢেলে দিয়ে হুজুরের (সা) খিদমত করাই ছিল তাঁর সবচেয়ে প্রিয় কাজ। এই খিদমতের বদৌলতে তিনি রাসূলের (সা) দরবারে এত নৈকট্য এবং আস্থা লাভ করেছিলেন যে, হুজুর (সা) তাঁকে গোপান কথাও বলতেন এবং তিনিও গোপনীয়তা রক্ষার দায়িত্ব পুরোপুরি আদায় করতেন।

একবার হযরত আবু জার (রা) মদীনার একটি মসজিদে শুয়ে ছিলেন। এমন সময় সারওয়ারে আলম (সা) তাশরীফ আনলেন এবং বললেন ঃ

"আবু জার! এমন সময় যদি আসে যে তোমাকে এই মসজিদ থেকে বের করে দেয়া হবে তাহলে তুমি কি করবে?"

আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! মসজিদে নববীতে (সা) চলে যাবো অথবা নিজের ঘরে বসে থাকবো।"

তিনি বললেন ঃ "সেখান থেকেও যদি বের করে দেয়া হয় তাহলে কি করবে?

আরজ করলেন ঃ "তরবারী বের করবো।" হুজুর (সা) তাঁর কাঁধের ওপর হাত রেখে তিনবার বললেন ঃ

"আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন। তরবারী বের করবে না। বরং ধৈর্যের সঙ্গে কাজ করবে এবং যেখানে তোমাকে চলে যেতে বলা হবে সেখানে চলে যাবে।"

হযরত আবু জার (রা) হুজুরের (সা) সেই ইরশাদের ওপর শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত আমল করেছিলেন। সকল অবস্থাতেই নিজের মত নির্ভয়ে প্রকাশ করতেন। কিন্তু সমকালীন শাসকের বিরুদ্ধে কখনো তরবারী ধরেননি। প্রকৃতপক্ষে শুধু এই ইরশাদই নয় বরং হুজুরের (সা) নিকট থেকে তিনি যা কিছু শুনতেন তা জীবনের জপমালা বানিয়ে নিতেন এবং শুধুমাত্র স্বয়ং নিজেই তার ওপর আমল করতেন না বরং লোকদেরকেও তার ওপর আমল করার নসিহত করতেন। কোন হাদিস বর্ণনা করার সময় তিনি এই বলে শুরু করতেন ঃ "আমার বন্ধু রাসূলুল্লাহ (সা) আমার নিকট থেকে এই প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন অথবা আমি আমার খলিল বা দোস্ত রাসূলুল্লাহকে (সা) একথা বলতে শুনেছি।" হুজুরের (সা) ওফাতের পর কখনো তাঁর কথা উল্লেখ করা হলে হযরত আবু জারের (রা) চক্ষু দিয়ে দরদর করে অশ্রু ঝরে পড়তো এবং প্রচণ্ড আবেগে কণ্ঠ দিয়ে কোন স্বর বের হতো না।

হযরত আবু জার (রা) বছরের পর বছর ধরে যদিও নবীর (সা) ফয়েজে অভিষিক্ত হয়েছিলেন তবুও তাঁর থেকে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা শুধুমাত্র ২৮১টি। নির্জনতাই তার প্রধান কারণ। তিনি হুজুরের (সা) যেসব ইরশাদ মুসলমানদের নিকট পৌঁছিয়েছিলেন তার বেশীর ভাগই ছিল তাওহীদ ও আখলাকের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

তাঁর থেকে বর্ণিত কতিপয় হাদীস সংক্ষিপ্তাকারে এখানে বরকত হিসেবে উল্লেখ করা হলো ঃ

১. রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ "হে আবু জার! কোন নেক কাজকেই উপহাসাস্পদ এবং সাধারণ মনে করে ছেড়ে দিও না। উদাহরণ স্বরূপ নিজের ভাইয়ের সাথে উদারতার সঙ্গে মিলিত হওয়াটাও নেক কাজ।" (মুসলিম)

২. রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ হে আবু জার! যখন তুমি তরকারি রান্না করবে তখন শুরবা বেশী রাখবে এবং যে প্রতিবেশী সাহায্য পাওয়ার যোগ্য তার বাড়ি উপযুক্ত অংশ পাঠাবে। (মুসলিম)

৩. রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের খাদেম তোমাদের ভাই। প্রত্যেক মুসলমানের উচিত সে নিজে যা খাবে তা নিজের খাদেমকেও খাওয়াবে। যা নিজে পরবে তাকেও তা পরাবে এবং এমন কাজ দিয়ে তাকে কষ্ট দেবে না যা তার সাধ্যের বাইরে। যদি এমন কাজ তাকে করতে বলা হয়, তাহলে স্বয়ং তাকে সাহায্য করতে হবে। (বুখারী)

৪. নবী (সা) বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি যদি কাউকে ফাসেক অথবা কাফের বলে এবং সে তা না হয় তাহলে তা সেই গালি দানকারীর ওপর আপতিত হবে। (বুখারী)

৫. আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, কোন্ আমল সবচেয়ে উত্তম। তিনি বলেছিলেন, আল্লাহর ওপর ঈমান আনা এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করা। আমি আরজ করলাম। তারপর কোন্ আমল সবচেয়ে উত্তম। তিনি বললেন, গোলাম আযাদ করা। আমি আরজ করলাম। কোন্ গোলাম আযাদ করা সর্বোত্তম। তিনি বললেন, যে গোলাম সবচেয়ে বেশী মূল্যবান এবং মালিকের বেশী পসন্দনীয় তাকে আযাদ করাই সর্বোত্তম। আমি আরজ করলাম, যদি আমি তা না করতে পারি। বললেন, তুমি সেই অভাবীকে সাহায্য করো যে কোন মজদুরী অথবা পেশায় নিয়োজিত রয়েছে অথবা কোন অদক্ষ লোককে কাজ বাতিয়ে দাও। আমি আরজ করলাম, আমি যদি তাও না করতে পারি। বললেন, তুমি এমনভাবে জীবন কাটাও যাতে তোমার থেকে মানুষ কোন কষ্ট না পায়। কেননা তোমার জন্য এসব কথা সাদকা। (বুখারী)

৬. রাসূলুল্লাহ (সা) একবার ইরশাদ করলেন, একজন আগমনকারী পরওয়ারদিগারের নিকট থেকে এসে আমাকে খবর দিলেন যে, আমার উম্মত থেকে কোন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলো এবং আল্লাহর সঙ্গে কোন বস্তুকে শরীক করলো না তাহলে সে বেহেশ্তে প্রবেশ করবে। আমি আরজ করলাম যদি সে যিনা এবং চুরিও করে। বললেন, হাঁ যদি সে যিনা এবং চুরিও করে (সে অবশ্যই জান্নাতে দাখিল হবে)। (বুখারী)

অন্য এক রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত আবু জার (রা) হুজুরের (সা) নিকট চারবার এই সওয়াল করেছিলেন এবং তিনি প্রত্যেকবার একই জবাব দিয়েছিলেন। অবশ্য চতুর্থবার তিনি "যদিও আবু জারের (রা) নিকট তা যত অপসন্দনীয়ই হোক না কেন"—একথাটি অতিরিক্ত বলেছিলেন। হযরত আবু জারের (রা) অভ্যাস ছিল যে, তিনি যখন এই হাদিস বর্ণনা করতেন তখন হুজুরের (সা) একথাও অবশ্যই উল্লেখ করতেন।

৭. রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন, যে একটি নেকী করবে সে দশগুণ বদলা পাবে এবং আমি তার ওপরও বেশী করবো এবং যে খারাপ কাজ করবে সে শুধু একটি খারাপ কাজের বদলা পাবে। এবং এরও সম্ভাবনা রয়েছে যে আমি তাকে ক্ষমা করে দিতে পারি। যে আমার দিকে এক বিঘত পরিমাণ অগ্রসর হবে আমি তার দিকে এক হাত এগিয়ে যাবো এবং যে আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হবে আমি তার দিকে দুই হাত অগ্রসর হবো

এবং যে আমার দিকে আস্তে আস্তে মনোহর ভঙ্গীতে অগ্রসর হবে আমি তার দিকে ত্বরিত গতিতে অগ্রসর হবো। যে আমার সঙ্গে দুনিয়ার সমান গুনাহ করে মিলিত হবে আমি তার সঙ্গে ততবড় মাগফিরাত নিয়ে মিলিত হবো। শর্ত হলো সে আমার সঙ্গে কাউকে শরীক করবে না। -(মুসলিম)

৮. রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, হে আবু জার! সর্বপ্রথম নবী ছিলেন আদম এবং সর্বশেষ হলাম আমি মুহাম্মাদ (সা)।

-(তিরমিজি, ইবনে হাব্বান, আবু নঈম ও ইবনে আসাকির)

হযরত আবু জার (রা) গিফারীর চরিত্রের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হলো যুহদ ও তাকওয়া এবং সবর ও অল্পে তুষ্টি। তিনি খুব সাদাসিধে প্রকৃতির এবং দরবেশ মানসিকতার মানুষ ছিলেন। তাঁর সাধনা ও আল্লাহর প্রতি ভরসার জীবন দেখে স্বয়ং নবী করিম (সা) বলতেন, আবু জারের (রা) মধ্যে ঈসা (আ) বিন মরিয়মের মত সাধনা রয়েছে।

হাফিজ ইবনে হাজার (র) ইসাবাতে লিখেছেন যে, হযরত আবু জারের(রা) জীবনের শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত এই সাধনার জীবনই বিজয়ী ছিল। বিজয়ের আধিক্যে মুসলমানদের সমাজে যে পরিবর্তন এসেছিল হযরত আবু জার (রা) তার সামান্য পরিমাণ প্রভাবই কবুল করেছিলেন। নবীর (সা) যুগে যেমন জীবন কাটাতেন পরেও সবসময় সেই একইভাবে কাটাতেন।

একবার তিনি রাসূলে আকরামের (সা) নিকট নেতৃত্বের খাহেশ করেছিলেন। তাতে হুজুর (সা) বলেছিলেন, "আবু জার তুমি নেতৃত্বের বোঝা বইতে পারবে না। তোমার জন্য আমি সেই বস্তু পসন্দ করি যা নিজের জন্য পসন্দ করে থাকি।"

তারপর তিনি সারা জীবনে কোন পদের খাহেশ করেননি। চার হাজার দিরহাম ভাতা পেতেন। এই অর্থ থেকে বছরের সব প্রয়োজনীয় জিনিস কিনে যা অবশিষ্ট থাকতো তা অভাবগ্রস্তদের মধ্যে বন্টন করে দিতেন। ঘরে নগদ অর্থ রাখার তিনি কঠোর বিরোধী ছিলেন এবং লোকদেরকেও তা নিষেধ করতেন। "কানযুল উম্মালে" আছে, তিনি লোকদেরকে বলতেন যে, দুনিয়ায় শুধু দু'টি কাজ করবে। এক পরকালের আকাংখা এবং দ্বিতীয় হালাল রুজি। এছাড়া আর তৃতীয় কোন কাজের চেষ্টা করো না। যদি তোমাদের নিকট হালাল মাধ্যমে দুই দিরহাম এসে যায় তাহলে এক দিরহাম নিজের পরিবার পরিজনের জন্য ব্যয় করো এবং অপর দিরহামটি আল্লাহর পথে দান কর। তৃতীয় দিরহামের জন্য কখনো ইরাদা করো না। কারণ তা তোমাদেরকে ক্ষতিসাধন করবে।

মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে হযরত আবু আসমা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার তিনি রাবযাহতে হযরত আবু জারের (রা) নিকট গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে তিনি তাঁর স্ত্রীকে অত্যন্ত ক্লান্ত অবস্থায় দেখতে পেলেন এবং হযরত আবু জার (রা) বলছিলেন যে, দেখো, এই আল্লাহর বাঁদী আমাকে ইরাক যেতে বাধ্য করছে এবং আমি যখন ইরাকে গমন করবো তখন লোকজন নিজেদের দুনিয়া নিয়ে আমার দিকে অগ্রসর হবে। তারা জানে না যে, আমার খলিল রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে বলেছেন যে, পুলসিরাতে খুব সরু একটি পিছল রাস্তা রয়েছে। যার ওপর থেকে পা সরে সরে যেতে চাইবে। তোমাদের সকলকে সেই রাস্তা অতিক্রম করতে হবে। তোমাদের বোঝা যদি তোমাদের সামর্থ অনুযায়ী হয় এবং তোমরা হালকা থাকো তাহলে তোমরা খুব সহজেই এই রাস্তা অতিক্রম করতে পারবে। কিন্তু তোমাদের ওপর যদি উটের মত বোঝা বোঝাই থাকে তাহলে রাস্তা অতিক্রম করা খুব কঠিন হবে।

তাবকাতে ইবনে সায়াদে আছে একবার ইরাকের গভর্ণর হযরত আবু মূসা আশয়ারী (রা) হযরত আবু জারের (রা) সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। তিনি তাঁকে হে আমার ভাই, হে আমার ভাই বলে সম্বোধন করছিলেন আর হযরত আবু জার (রা) বলছিলেন যে, গভর্ণর হওয়ার পর তুমি আর আমার ভাই নেই। হযরত আবু মূসা (রা) জিজ্ঞেস করলেন, তা কেন? হযরত আবু জার (রা) বললেন, গভর্ণর হওয়ার পর তুমি কি কি করেছ তা আমি জানি না। প্রথমে বলো, কোন বড় প্রাসাদ তো বানাওনি। পশুর পালতো একত্রিত করোনি। কৃষিকাজ করে খাদ্য তো মজুদ করোনি। হযরত আবু মূসা (রা) যখন প্রত্যেক প্রশ্নের জবাব নেতিবাচক দিলেন তখন বললেন, "হাঁ এখন তুমি আমার ভাই।"

একবার জনৈক ব্যক্তি হযরত আবু জারকে (রা) এক চাদরে নামায পড়তে দেখলেন। নামায থেকে ফারেগ হওয়ার পর তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার নিকট কি একটি চাদরই রয়েছে। বললেন, "হ্যাঁ" তিনি বললেন, কিছু দিন হলো আমি আপনার নিকট দু'টি কাপড় দেখেছিলাম। বললেন, "হ্যাঁ" তার মধ্যে থেকে একটিকে আমার চেয়েও অভাবগ্রস্তকে দিয়ে দিয়েছি। "তিনি বললেন : "আপনার নিজেরই তো তা প্রয়োজন ছিল।" বললেন, "আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন। তুমি আমাকে দুনিয়ার জঞ্জালে ফাঁসাতে চাচ্ছো। আমার নিকট একটি চাদর আছে। কিছু বকরী আছে। যার দুধ আমি পান করে থাকি। কয়েকটি খচ্চর আছে যা সওয়ারীর কাজে আসে। একজন খাদেম

আছে। যে খাবার রান্না করে দেয়। এসবের চেয়ে আর বেশী কি কি নেয়ামত আমার চাই? চরিত গ্রন্থসমূহে হযরত আবু জারের (রা) প্রসঙ্গে এ ধরনের কুড়িটি ঘটনা পাওয়া যায়। এ থেকে স্পষ্ট হয় যে, হযরত আবু জারের (রা) মধ্যে আল্লাহভীতি ও অল্পে তুষ্টি ছাড়া ত্যাগ, বদান্যতা, মেহমানদারী এবং বিনম্রতার মত সুন্দর গুণাবলীও পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। প্রকৃতপক্ষে হযরত আবু জার (রা) একজন সর্বগুণে গুণান্বিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন এবং তাঁর চরিত্রের প্রতিটি দিক ইসলামী মিল্লাতের জন্য মশাল হিসেবে বিবেচ্য।

হযরত সালমান ফারসী (রা)

সাইয়্যেদুল আবরার রহমতে আলম (সা)-এর শুভাগমনের অনেক বছর পূর্বে ইস্পাহানের (পারস্য) উপকণ্ঠে "জি" নামক এক গ্রামে "আবুল মুলক" নামের একটি ধনী খান্দান বাস করতো। এই গ্রামের সরদার "বুজাখশান বিন মুরসালান আবুল মুলকি" ইরানের দরবারে খুব প্রতিপত্তি রাখতো। সে শুধু একজন বড় জমিদারই ছিল না বরং একটি উপাসনাগারের পরিচালকও ছিল। বুজাখশানের একটি ছোট পুত্র ছিল। তার নাম ছিল মাবাহ। এই পুত্রের জন্য সে জীবনও দিতে প্রস্তুত ছিল। সে তাকে অত্যন্ত আদর যত্নে লালন-পালন করে। মাতা-পিতার আদর যত্নে লালিত পালিত হওয়া সত্ত্বেও সে খুব সৌভাগ্যবান ছিল। তাঁর স্বভাবে ঔদ্ধত্য ও যথেচ্ছাচার নাম মাত্রও ছিল না। সে একজন সাদাসিধে এবং নীরব প্রকৃতির ছেলে ছিল। সমবয়স্ক ছেলেদের সঙ্গে খেলার পরিবর্তে যে সবসময় উপাসনালয়ে আগুন জ্বালানোতে ব্যস্ত থাকতো। উপাসনালয় যাতে সবসময় আলোকোজ্জ্বল থাকে এবং তার আগুন যাতে না নেভে এটাই ছিল তার প্রচেষ্টা।

একদিন বুজাখশান মাবাহকে বললো, পুত্র! আমি আজ প্রয়োজনীয় কাজের কারণে ক্ষেতে যেতে পারবো না, এ জন্য ক্ষেতের দেখাশুনার দায়িত্ব তোমার ওপর রইলো। মাবাহ পিতার নির্দেশ পালনার্থে তৎক্ষণাৎ ক্ষেতের দিকে রওয়ানা দিল। পথিমধ্যে ছিল খৃস্টানদের গীর্জা। সে সময় তারা ইবাদাতে মশগুল ছিল এবং উচ্চৈস্বরে মুনাজাত করছিলো। মাবাহ তাদের আওয়াজ শুনে গীর্জায় চলে গেল। খৃস্টানদের ইবাদাতের পদ্ধতি দেখে সে খুব প্রভাবিত হলো এবং স্বধর্ম অগ্নিপূজার ব্যাপারে অসন্তুষ্ট হয়ে পড়লো। খৃস্টানরা যখন ইবাদাত শেষ করলো তখন মাবাহ তাদের সরদারকে বললো যে, তাদের ধর্ম তার খুব পসন্দ হয়েছে। সেদিন থেকেই সে অগ্নিপূজা ছেড়ে দিল এবং তাদের ধর্ম গ্রহণ করলো। খৃস্টানরা খুব খুশী হলো এবং তারা সে সময়ই সে যুবককে খৃস্টধর্মে দীক্ষিত করে নিল।

মাবাহর অন্তরে হক অনুসন্ধানের ব্যস্ততা ছিল। খৃস্টানদের নিকট জিজ্ঞাসা করলো খৃস্ট ধর্মের কেন্দ্র কোথায়। তাঁরা বললো, সিরিয়ায়। মাবাহ কথাটি মনে রাখলো এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত গীর্জায় রইলো। যখন সূর্য ডুবে যাওয়ার সময় হলো তখন বাড়ী ফিরে এলো। পিতা জিজ্ঞাসা করলো ক্ষেত দেখে

এসেছোতো। মাবাহ্ জবাব দিল, "না, রাস্তায় একটি গীর্জা ছিল। কিছু মানুষ সেখানে ইবাদাতে মশগুল ছিল। তাদের ইবাদাত পদ্ধতি আমার খুব পছন্দ হলো এবং আমি সারাদিন তাদের নিকটেই কাটিয়েছি। "বুজাখশান পুত্রের "পথভ্রষ্টতায়" খুব ক্রোধান্বিত হলো। সে বললো, "তাদের ধর্ম সম্পূর্ণরূপে অদ্ভুত এবং আমাদের পবিত্র ধর্মের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। আজ থেকে ঘর থেকে বের হওয়া তোমার জন্য নিষিদ্ধ করা হলো।" একথা বলে সে তার কলিজার টুকরার পায়ে বেড়ি দিয়ে বন্দী করে রাখলো। মাবাহ্ অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে নির্জনত্বের জিন্দানখানায় কাটাতে লাগলো। একদিন সুযোগ পেয়ে সে খৃষ্টানদের নিকট একটি বাণী প্রেরণ করলো। বাণীতে সে বললো, সিরিয়া গমনকারী কোন কাফেলা পাওয়া গেলে তাকে যেন খবর দেয়া হয়। ঘটনাক্রমে কিছুদিন পরই সিরিয়া থেকে কিছু মানুষ বাণিজ্য ব্যাপদেশে সেখানে এলো। তারা যখন সিরিয়া প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রস্তুত হলো তখন খৃষ্টানরা মাবাহকে খবর দিল। মাবাহ্ কোন উপায়ে বেড়ি থেকে নাজাত লাভ করলো এবং সিরিয়া গমনকারী কাফেলায় শামিল হয়ে গেল।

সিরিয়া পৌঁছে মাবাহ্ লোকদের নিকট সেখানকার সবচেয়ে বড় ধর্মীয় নেতার ঠিকানা জিজ্ঞাসা করলো এবং পুনরায় তার খিদমতে পৌঁছে তাকে খৃষ্ট ধর্ম শিক্ষাদানের জন্য অনুরোধ জানালো। আরো বললো যে, খৃষ্ট ধর্ম হাসিলের জন্য সে সুদূর পারস্য থেকে এখানে এসেছে। উসকুফ মাবাহর দরখাস্ত কবুল করলো এবং সে তার নিকট থাকতে লাগলো। এই উসকুফ একজন কপট মানুষ ছিল। প্রকাশ্যতঃ সে সঠিক মানুষের মত কাটাতো। কিন্তু অভ্যন্তরীণ দিক থেকে সে ছিল আরাম-আয়েশের পূজারী এবং ধন-সম্পদ জমা করাই ছিল তার একমাত্র কাজ। সে সাত মটকী সোনা চাঁদী জমা করে রেখেছিল। মাবাহ্ তার লোভ-লালসা এবং বদকাজ দেখে মনে মনে খুব ফুঁসতো। কিন্তু কিছুই করতে পারতো না। কেননা মানুষ উসকুফকে অত্যন্ত ইজ্জত ও সম্মানের দৃষ্টিতে দেখতো। কিছুদিন পর উসকুফের পরপারের ডাক এলো। তার কাফন দাফনের জন্য লোকজন একত্রিত হলো। এ সময় মাবাহ্ তার অভ্যন্তরীণ সব কথা লোকদের নিকট খুলে বললো এবং তাদেরকে তার জমাকৃত সম্পদের কাছে এনে হাজির করলো। লোকজন খুব উত্তেজিত হলো এবং উসকুফের লাশ শুলে চড়িয়ে খুব করে পাথর মারলো। তারপর তারা একজন আবেদ ও যাহেদ পাদরীকে তার স্থলাভিষিক্ত করলো। এই ব্যক্তি বাস্তবিকই নেক স্বভাব এবং পার্থিব আরাম আয়েশকে ঘৃণা করতো। তার প্রতি মাবাহর খুব ভক্তি শ্রদ্ধা জন্মালো এবং সে মন ও অন্তর দিয়ে তার খিদমতে লেগে থাকতো। পাদরীও যথাসাধ্য মাবাহকে ফয়েজ দেয়ার চেষ্টা করতো। শেষে তারও জীবন সন্ধ্যা

ঘনিয়ে এলো। মৃত্যু যন্ত্রণা উপস্থিত হলে সে মাবাহকে বললো, আমার মৃত্যুর পর তুমি মোসালের অমুক ব্যক্তির নিকট চলে যাবে। সে খৃষ্ট ধর্মের একজন সাচ্চা প্রেমিক। সে ছাড়া কোন হক পূজারীকে পাওয়া তোমার জন্য মুশকিলই হবে।

মাবাহ মরহুম পাদরীর ওসিয়ত অনুযায়ী মোসাল পৌছলো এবং যে ব্যক্তির ঠিকানা দেয়া হয়েছিল তার খিদমতে পৌছে জ্ঞান অর্জনে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। আল্লাহর কি কুদরত! কিছুদিন পরই সেও শেষ সফরের প্রস্তুতি নিলো। মৃত্যুর সময় সে মাবাহকে ওসিয়ত করলো ঃ

"হে আমার পুত্র! আমাকে দাফন করে তুমি নাসিবাইনে অমুক ব্যক্তির নিকট চলে যাবে। আমার জানা মতে সে ব্যক্তিই তোমাকে দ্বীনে হকের ওপর চালাবে। অন্যান্য মানুষ দ্বীনে পরিবর্তন এনেছে এবং পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে।"

মাবাহ হকের অনুসন্ধানে নাসিবাইন পৌছলো। সেখানকার পাদরী তাকে নিজের অভিভাবকত্বে নিলেন। মাবাহ কেবলমাত্র কিছুদিন হলো সেই পবিত্র ব্যক্তির সুহবতে ফয়েজ পেয়েছিলো। এমন সময় মৃত্যুদূত তার দরজাতে এসেও উপস্থিত হলো। যখন সে মৃত্যুদূতের হাতে নিজের জীবন তুলে দিচ্ছিল তখন মাবাহ জিজ্ঞাসা করলো, "আমার পবিত্র অভিভাবক! আমার জন্য আপনার ইরশাদ কি।" পাদরী বললো, "পুত্র! যে নূরে হকের অনুসন্ধানে তুমি ব্যাপৃত রয়েছো। তা উমুরিয়ার অমুক ব্যক্তির নিকট পাবে। আমার মৃত্যুর পর সোজা তার নিকট চলে যাবে।"

মাবাহ নাসিবাইনের মরহুম পাদরীর কাফন-দাফনের পর সরাসরি উমুরিয়া পৌছলো এবং সেখানকার উসকুফের খিদমতে নিজেকে ওয়াকফ করে দিলো। সে একজন অত্যন্ত পবিত্র এবং পরহেজগার মানুষ ছিল। আল্লাহ তায়ালা তাকে ইলমের সাথে আমলও দান করেছিলেন। মাবাহ তার সুহবত বা সান্নিধ্যে খুব করে ফয়েজ লাভ করলো এবং খৃষ্ট ধর্মের সত্যিকার অনুগামী হয়ে গেল। নিজের উস্তাদের মত সে নিজেও দিন রাত ইবাদাতে মশগুল থাকতো। কয়েকটি বকরী কিনে নিয়েছিল তার দুধ থেকে শারীরিক শক্তি লাভ করতো। কিছুদিন পর উমুরিয়ার পবিত্রদেহী উসকুফেরও শেষ সময় এসে হাজির হলো। যখন সে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করছিলো তখন মাবাহ আরজ করলো ঃ

"আমি হাজার হাজার মাইলের অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্টের সফর অতিক্রম করে এবং কয়েকটি দরজার মাটি শোধন করে আপনার খিদমতে উপস্থিত

হয়েছিলাম। কিন্তু আপনিও আমার সঙ্গ ত্যাগ করে চলেছেন। আপনার পর আমি কোথায় যাবো।"

উমুরিয়ার দরবেশ ব্যক্তিটি ক্ষীণ কণ্ঠে জবাব দিলো ঃ

"হে হক সন্ধানকারী পুত্র! আমি তোমাকে কি পরামর্শ দেবো? এ সময় সারা দুনিয়া নাফরমানীতে ডুবে আছে। কুফর ও শিরকের বিদ্যুত চারদিকে চমকাচ্ছে। এ দুনিয়ায় এমন কোন ব্যক্তি আমার নজরে আসছে না যার নিকট তোমাকে প্রেরণ করবো। অবশ্য এখন সেই শেষ নবীর (সা) আগমন সময় প্রায় সমুপস্থিত। তিনি আরবের মরুভূমি থেকে উঠে দ্বীনে হানিফকে জীবিত করবেন। এবং সেই যমীনে হিজরাত করবেন যাতে প্রচুর খেজুর বৃক্ষ থাকবে। তার দুই কাঁধের মধ্যে নবুওয়াতের মোহর থাকবে। তিনি হাদিয়া কবুল করবেন। কিন্তু নিজের জন্য সাদকাহ হারাম মনে করবেন। তুমি যদি সেই পবিত্র নবীর (সা) যামানা পাও তাহলে তাঁর খিদমতে অবশ্যই উপস্থিত হবে।"

একথা বলেই পবিত্র গুণের অধিকারী উসকুফ শেষ নিশ্বাস নিলো এবং স্রষ্টার সাথে গিয়ে মিলিত হলো।

তারপর মাবাহ শুরু করলো শেষ নবীর (সা) সন্ধান। সবসময় সে এক ধ্যানেই থাকতো। কোন কাফেলা পেলেই তার সঙ্গে সেই পবিত্র ভূমিতে গিয়ে পৌছবে যেখানে নবীয়ে (সা) আখিরুজ্জামান আবির্ভূত হবেন। শেষে একদিন তার অন্তরের ইচ্ছা পূরণ হলো। বনু কালাব গোত্রের একটি কাফেলা উমুরিয়া অতিক্রম করলো। মাবাহ জানতে পেল যে, এই কাফেলা আরব যাবে। তিনি তৎক্ষণাৎ কাফেলা সরদারের নিকট পৌছলো এবং তার গবাদি পশু নিয়ে তাকে সঙ্গে করে আরব নিয়ে যাওয়ার আবেদন জানালো। কাফেলার সরদার তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে গেল এবং মাবাহর গরু ও বকরী নিজের দখলে নিয়ে তাকে সঙ্গে নিয়ে চললো।

কাফেলা যখন আলকুরা উপত্যকায় পৌছলো তখন কাফেলার লোকজনের নিয়ত সেই সাদা-সিধে অন্তরের যুবকের ব্যাপারে পরিবর্তন হয়ে গেল এবং তাকে গোলাম বানিয়ে এক ইহুদীর নিকট বিক্রয় করে দিল। মাবাহ কিছুদিন সেই ইহুদীর নিকট রইলো। ইয়াসরাবে বসবাসকারী সেই ইহুদীর এক আত্মীয় একদিন তার সঙ্গে দেখা করতে এলো। তার একটি গোলামের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। নিজের মেজবানের নিকট এ প্রসঙ্গে সে উল্লেখ করলো। তারপর সে মাবাহকে তার মেহমানের নিকট বিক্রয় করে দিল। এ ব্যক্তি

মাবাহকে নিজের সঙ্গে ইয়াসরাব নিয়ে এলো। ইয়াসরাব পৌঁছে মাবাহ চারিদিকে খেজুর বৃক্ষের ঝাড় দেখলো। তাতে তার আস্থা হলো যে, যে শেষ নবীর (সা) উল্লেখ উমুরিয়ার পাদরী করেছিল, তিনি একদিন এই খেজুর বৃক্ষের মাটিতে অবশ্যই শুভাগমন করবেন। এক্ষণে মাবাহ্ দিন-রাত সেই একই চিন্তায় বিভোর রইল।

শেষে একদিন সেই শুভ সময় সমুপস্থিত হলো। মাবাহ সেই অপেক্ষাতেই এতোদিন ছিল। সে নিজের ইহুদী মালিকের বাগানে এক খেজুর বৃক্ষে আরোহণ করে খেজুর পাড়ছিল। মালিক নীচে বসেছিল। ইত্যবসরে শহর থেকে হন্তদন্ত হয়ে একজন ইহুদী এলো এবং বললো, "খোদা বনু কিলাবকে ধ্বংস করুক। সকলেই কুবাতে এক ব্যক্তির নিকট দৌড়ে যাচ্ছে। এই ব্যক্তি মক্কা থেকে এসেছে। এবং নিজেকে নবী বলে দাবী করছে। তারা তার দাবীর প্রতি আস্থা স্থাপন করে ফেলেছে এবং তাদের শিশু ও মহিলাদের মধ্যেও উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে।"

মাবাহর কানে একথা পৌঁছতেই তার শরীরেও শিহরণ জাগলো। তার অন্তর সাক্ষ্য দিল যে, তার ইপ্সিত বস্তু এসে পৌঁছেছে। ব্যাকুল চিত্তে সে বৃক্ষ থেকে নামলো এবং আগত ইহুদীর নিকট বেপরোয়াভাবে জিজ্ঞাসা করলো ঃ

"তুমি কি বলছিলে? আবার একটু বলো না!"

তার মালিক গোলামের অনুসন্ধানী মন ও ব্যাকুলতার জন্য খুব ক্রোধান্বিত হলো। খুব জোরের সাথে তার মুখের ওপর একটি চড় কষলো এবং বললো, "হতভাগা। তোর কাজ তুই কর। এসব কথায় তোর কি।" মাবাহ অন্তরের ওপর পাথর চাপা দিয়ে চুপ মেরে গেল। কিন্তু তার ধৈর্য ও স্থিতি শেষ হয়ে গিয়েছিল। কিছুদিন পর সুযোগ পেয়ে কিছু খাদ্যদ্রব্য কিনে রাসূলের (সা) দরবারে গিয়ে উপস্থিত হলো এবং এভাবে আরজ করলো ঃ

"হে আল্লাহর মনোনীত বান্দাহ! আপনি এবং আপনার সাথীরা বিদেশী। এই কতিপয় জিনিস আমি সাদকার জন্য রেখেছিলাম। আপনার চেয়ে বেশী হকদার এ বস্তুর জন্য আর কাউকে পাইনি। এসব গ্রহণ করুন।"

হুজুর (সা) মাবাহর নিকট থেকে তা নিয়ে সঙ্গীদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন এবং নিজে কিছুই খেলেন না। মাবাহ মনে মনে বললো, "শেষ নবীর একটি আলামত বা নির্দশন তো দেখতে পেলাম যে, তিনি সাদকা খান না।" দ্বিতীয় দিন পুনরায় কোন খাদ্য বস্তু কিনলো এবং রাসূলের (সা) নিকট উপস্থিত হয়ে আরজ করলো, "এটা হলো হাদিয়া। কবুল করুন।" হুজুর (সা)

হাদিয়া কবুল করলেন। তার কিছু অংশ নিজে খেলেন এবং অবশিষ্টাংশ সাহাবীদের (রা) মধ্যে বন্টন করে দিলেন। মাবাহর পূর্ণ আস্থা হলো যে, সাদকা গ্রহণ থেকে বিরত থাকা এবং হাদীয়া গ্রহণকারী এ ব্যক্তিই শেষ নবী। কিন্তু তখনো নবুওয়াতের মোহর অবলোকন করা বাকী ছিল। কিছু দিনপর মাবাহ শুনতে পেলো যে রাসূলে আকরাম (সা) এক জানাযার সঙ্গে গারকাদ বাকীতে তাশরীফ এনেছেন। ধীরে ধীরে সে সেখানে পৌছলো। হুজুরকে (সা) আদবের সঙ্গে সালাম করলো এবং পবিত্র পিঠের দিকে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো। উদ্দেশ্য যে কোন সময় কাপড় সরলে নবুওয়াতের মোহর দেখে নেবে। হুজুর (সা) মাবাহর অন্তরের অবস্থা অনুভব করতে পারলেন। পবিত্র পিঠ থেকে কাপড় সরিয়ে দিলেন। মাবাহর সামনে তখন মুহরে নবুওয়াত স্বীয় বৈশিষ্ট্যে দেদীপ্যমান ছিল। সে ভক্তি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে ঝুঁকে নিজের কম্পিত ঠোঁট মুহরে নবুওয়াতের ওপর রাখলেন। অতপর অবলীলাক্রমে কাঁদতে লাগলো। হুজুর (সা) বললেন, "সামনে এসো। মাবাহ সামনে এলো এবং হকের অনুসন্ধানে যেসব পর্যায় তাকে অতিক্রম করতে হয়েছিল তার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করলো। হুজুর (সা) মাবার সুদীর্ঘ কাহিনী সকল সাহাবীকেও (রা) শুনালেন। অতপর মাবাহকে মুসলমান করে তাঁর নাম রাখলেন সালমান। সেই দিন থেকেই মাবাহ বিন বুজাখশান সালমান ফারসী (রা) মহান নামে খ্যাত হয়ে গেলেন।

সালমান (রা) এক্ষণে নিজের মনজিলে মাকসুদে পৌছে গিয়েছিলেন। তার জীবনে বিপ্লব সাধিত হয়ে গিয়েছিল। দিনরাত তিনি আকায়ে দোজাহানের খিদমতে হাজির থাকতে চাইতেন। কিন্তু ইহুদীর গোলামীর জিঞ্জির ঘাড়ে এমনভাবে লেগে গিয়েছিল যে কোন মতেই তা থেকে মুক্তি লাভ করা সম্ভব ছিল না। বদর এবং ওহোদের যুদ্ধ এমনিভাবেই কেটে গেল। এই গোলামী তাঁকে এ যুদ্ধসমূহে অংশগ্রহণ থেকে বঞ্চিত রাখলো। হুজুর (সা) সালমানের মজবুরী বা অক্ষমতার কথা জানতেন। একদিন তাকে বললেন, "সালমান! তোমার প্রভু বা মালিককে বিনিময় দিয়ে দাসত্বের জিঞ্জির থেকে তোমার গলা মুক্ত করিয়ে নাও।" সালমানতো (রা) অন্তরে অন্তরে তাই চাইতেন। ইহুদী মালিকের সঙ্গে নিজের মূল্য ঠিক করলেন। সে চল্লিশ আওকিয়া সোনা এবং তিনশ' চারা লাগানোর দাবী জানালো। হুজুর (সা) এ চুক্তির কথা শুনে সাহাবা কিরামকে (রা) বললেন ঃ

"তোমরা সালমানকে (রা) একজন ইসলামের দুশমনের গোলামী থেকে স্বাধীন হওয়ার ব্যাপারে সাহায্য কর।"

সাহাবীরা (রা) আনন্দ চিত্তে সালমানের (রা) সাহায্য করার দায়িত্ব নিলেন। প্রত্যেকেই সামর্থ অনুযায়ী বেশী বেশী চারা একত্রিত করলেন। এমনিভাবে পুরো তিনশ' চারা হয়ে গেল। অতপর সকলে মিলে গর্ত খুড়লেন। হুজুর (সা) স্বয়ং তাশরীফ আনলেন এবং সাহাবীদের সঙ্গে একত্রিত হয়ে সকল চারা ইহুদীর জমিতে লাগিয়ে দিলেন। এখন আর একটি শর্ত বাকী রইলো। আল্লাহ তা পূরণের ব্যবস্থা করলেন।

কিছুদিন পর এক যুদ্ধে হুজুর (সা) চল্লিশ আওকিয়া সোনা পেলেন। হুজুর (সা) এই সোনা সালমানকে (রা) দিয়ে দিলেন এবং বললেন, যাও, তোমার মালিককে দিয়ে মুক্ত হয়ে এসো। সালমান (রা) দৌড়াতে দৌড়াতে গেলেন। এই সোনা ইহুদীকে দিলেন এবং তার গলা থেকে গোলামীর জিঞ্জির ছাড়িয়ে নিজের প্রকৃত মালিকের পায়ের ওপর এসে পড়লেন। সেই দিন থেকে সালমান (রা) ফারসী সর্বাবস্থায় রাসূলে করিমের (সা) খিদমতে উপস্থিত থাকতেন।

পঞ্চম হিজরীর জিলকদ মাসে খন্দকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে মুশরিকদের একটি বিরাট বাহিনী মদীনার ওপর চড়াও হলো। হুজুর (সা) যুদ্ধের ব্যাপারে সাহাবীদের (রা) সঙ্গে পরামর্শ করলেন। হযরত সালমান ফারসী (রা) ইরানের যুদ্ধ কৌশল সম্পর্কে খুব ভালভাবে ওয়াকিফহাল ছিলেন। তিনি আরজ করলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল! দুশমনের বিরাট বাহিনীর মুকাবিলায় আমাদের সংখ্যা অনেক কম। এ জন্য খোলা ময়দানে যুদ্ধ করা ঠিক হবে না। মদীনার চারদিকে খন্দক বা পরিখা খনন করে শহরকে হেফাজত করাটাই উত্তম হবে।"

হুজুর (সা) তাঁর প্রস্তাব খুব পছন্দ করলেন এবং পরিখা খননের কাজ শুরু করে দিলেন। রাসূলে করিমের (সা) সঙ্গে তিন হাজার সাহাবী (রা) এ কাজে শরীক হলেন এবং প্রায় ১৫ দিন কঠিন পরিশ্রমের পর পাঁচ গজ প্রশস্ত ও পাঁচ গজ গভীর পরিখা তৈরী হয়ে গেল। কাজ বন্টনের সময় আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে হযরত সালমানের (রা) সম্পর্কে এক চিত্তাকর্ষক বিতর্ক শুরু হয়ে গেল। আনসাররা বলতেন, "সালমান আমাদের সাথে থাকবে।" আর মুহাজিররা বলতেন, "আমাদের সাথে থাকবে।" হুজুর (সা) একথা কাটাকাটি শুনে বললেন ঃ

"সালমান আমার আহলে বাইতের সদস্য।" আল্লাহর কি কুদরত! পারস্যের উদ্বাস্তু এবং মিসকিন সালমানের (রা) সৌভাগ্য। প্রিয় নবী (সা)

নিজের পবিত্র জবান দিয়ে তাকে নিজের আহলে বাইতে শামিল করছেন। মুশরিকরা রাসূলের শহরকে ধরাধাম থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে এসেছিল। কিন্তু সেই খন্দক তাদেরকে শহর পর্যন্ত পৌঁছতেই দেয়নি।

অধিকন্তু আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদেরকে অদৃশ্যভাবে সাহায্য করলেন এবং এমন সব কারণ সৃষ্টি করে দিলেন যে, মুশরিকরা ২৭ দিন পর অবরোধ তুলে নিয়ে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে গেল।

খন্দকের যুদ্ধের পর হযরত সালমান (রা) প্রত্যেক যুদ্ধে শরীক ছিলেন। তাঁর রাসূল প্রেম এবং জিহাদের উৎসাহ দেখে একবার হুজুর (সা) বললেন ঃ

"জান্নাত তিন ব্যক্তির কামনা করে থাকে। তারা হলেন, আলী (রা), আম্মার (রা) এবং সালমান (রা)।" আরো একবার হুজুর (রা) তাঁকে "সালমানুল খায়ের" নামে ভূষিত করেছিলেন।

সারওয়ারে কায়েনাতের (সা) ওফাতের পর সালমান ফারসী (রা) বেশ কিছুদিন মদীনায় রইলেন। ফারুকে আজমের (রা) খিলাফতকালে তিনি ইরাকে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করলেন। ইরানের ওপর সামরিক অভিযানকালে তিনিও ইসলামী মুজাহিদ বাহিনীতে শরীক হলেন এবং কয়েকটি যুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শন করলেন। ফারুকে আজম (রা) তাঁর মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তিনি সালমানকে (রা) মাদায়েনের গভর্ণর নিয়োগ করলেন এবং প্রায় চার অথবা পাঁচ হাজার দিরহাম বেতন নির্ধারণ করে দিলেন। কিন্তু সেই মরদে দরবেশের গভর্ণরী অবস্থা ছিল আশ্চর্য ধরনের। যে বেতন পেতেন তা মিসকিনদের মধ্যে বন্টন করে দিতেন এবং স্বয়ং চাটাই বয়ন করে রুটির খরচ মেটাতেন। চাটাই বুনার আয়ের এক-তৃতীয়াংশ দান করতেন। খুতবা দানের সময় একটি সাধারণ ধরনের উবা পরিধান করতেন। কোথাও যাওয়ার সময় যীন ছাড়া একটি অতি সাধারণ গাধায় সওয়ার হয়ে এবং একটি ছোট খাটো কামিস পরে যেতেন। লোকজন তাঁকে দেখে হাসতো এবং ঠাট্টা করতো। কিন্তু তিনি সাফ সাফ বলতেন, "ভাল ও মন্দের আন্দাজ তো এই জীবনের পরে হবে। আজ যত ইচ্ছা তত হেসে নাও।"

তার নিকট উটের পশমের একটি পুরাতন কম্বল ছিল। দিনের বেলা তা শরীরের ওপর দিতেন এবং রাতে শোয়ার সময় তা মুড়ি দিতেন। তিনি যখন নিজের দরবেশী পোশাক পরিধান করে বাইরে বেরুতেন তখন লোকজন বলতো, "নেকড়ে বাঘ এসেছে, নেকড়ে বাঘ এসেছে।" একদিন মাদায়েনের বাজার দিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় একজন অপরিচিত মানুষ তাকে মজদুর

মনে করে নিজের সামান উঠাতে বললো। হযরত সালমান (রা) সামান মাথায় নিয়ে তার পেছনে পেছনে চললেন। রাস্তায় লোকজন তা দেখে বললো, "হে রাসূলের সাহাবী, হে আমীর, আপনি এই বোঝা কেন মাথায় তুলেছেন! আনুন আমরা তা পৌছে দিই।" সামানের মালিক হতভম্ব হয়ে গেল। অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে হযরত সালমানের (রা) নিকট ক্ষমা চাইল এবং তার মাথা থেকে সামান নামাতে চাইলো। হযরত সালমান (রা) বললেন ঃ

"ভাই, তুমি এই সামান উঠিয়ে নিজের বাড়ী পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা করেছিলে। এখন আমি তা মনযিলে মকসুদে পৌছে দিয়ে ক্ষান্ত হবো।"

একবার এক ব্যক্তি হযরত সালমান ফারসীর (রা) গৃহে গেল। গিয়ে দেখলো যে, তিনি নিজের হাতে আটা ঠাসছেন। সে জিজ্ঞেস করলো, খাদেম কোথায়? হযরত সালমান (রা) জবাব দিলেন, কোন কাজে পাঠিয়েছি। আমি তার কাঁধে দুই দুইটা কাজের বোঝা চাপানো সমীচীন মনে করি না।"

একদিন কোন এক ব্যক্তি হযরত সালমান ফারসীকে (রা) গালি দিল। তিনি বললেন, "ভাই, কিয়ামতের দিন যদি আমার গুনাহর পাল্লা ভারী হয় তাহলে তুমি যা কিছু বলেছ আমি তার থেকেও খারাপ। আর যদি আমার গুনাহর পাল্লা হাল্কা হয় তাহলে তোমার কথায় আমার ভয় কিসের।"

একবার এক ব্যক্তি হযরত সালমানকে (রা) বললো, আপনারতো ঘর-বাড়ী নেই। আমি আপনার জন্য একটি ঘর বানাতে চাই। হযরত সালমান (রা) তাতে অস্বীকৃতি জানালেন। কিন্তু সেই ব্যক্তি অব্যাহতভাবে পীড়াপীড়ি করতে লাগলো। শেষে হযরত সালমান (রা) বললেন, "ভাই! যদি আমার জন্য ঘর বানাতেই চাও তাহলে এমনভাবে বানাবে যে যদি শুই তাহলে পা যেন দেয়ালে ঠেকে যায়, যদি দাঁড়াই তাহলে মাথা যেন ছাদে ঠেকে যায়।" সে তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী ছোট করে একটি ঝুপড়ি বানিয়ে দিল।

আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওসমান জুন্নুরাইনের (রা) খিলাফতকালে ৩৫ হিজরীতে হযরত সালমান ফারসী ইন্তেকাল করেন। চরিত গ্রন্থসমূহে তাঁর বয়স সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের রেওয়ায়াত আছে। যেমন ৮০ বছর, ১৫০ বছর এবং ২৫০ বছর। হাফেজ ইবনে হাজার (র) ইসাবাতে ২৫০ বছর সম্পর্কিত রেওয়ায়াতকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তিনি যখন মৃত্যু শয্যায় তখন হযরত সাদ বিন আবি ওয়াকাস (রা) তাঁর শুশ্রূষার জন্য গিয়েছিলেন। হযরত সালমান (রা) জার জার হয়ে কাঁদতে লাগলেন। হযরত সাদ (রা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ

"আবু আবদুল্লাহ! [সালমান ফারসীর (রা) কুনিয়ত] কাঁদার কি কারণ থাকতে পারে। রাসূলে করিম (সা) তোমার ওপর সন্তুষ্ট চিত্তে বিদায় নিয়েছেন। এখনতো স্থায়ী জগতে তোমার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাত ঘটবে।"

হযরত সালমান (রা) জবাব দিলেন, "আল্লাহর কসম আমি মৃত্যুকে ভয় করি না। পার্থিব স্বার্থেরও আমার খাহেশ নেই। বরং এ জন্য কাঁদি যে, প্রিয় নবী (সা) আমার নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন যে, আমি যেন দুনিয়া জমা না করি এবং দুনিয়া থেকে সেইভাবে যাই যেভাবে তিনি গিয়েছিলেন। এখন আমার নিকট আসবাবপত্র জমা হয়ে গেছে এবং আমি প্রিয় নবীর (সা) দর্শন লাভ থেকে বঞ্চিত হতে পারি বলে ভীত।" যে আসবাবপত্রের জন্য হযরত সালমান (রা) কাঁদছিলেন। তা ছিল শুধুমাত্র একটি বড় পাত্র, একটি লোটা, একটি পুরানো কম্বল এবং একটি লোহার পাত্র। বালিশের পরিবর্তে মাথার নীচে দু'টি ইট ছিল। তিনি হযরত সা'দ (রা) এবং অন্য লোকদেরকে নসিহত করলেন যে, "সকল অবস্থাতেই আল্লাহকে স্মরণে রেখো এবং হজ্জ অথবা জিহাদ করতে করতে অথবা কুরআন পড়তে পড়তে আল্লাহর সান্নিধ্যে উপস্থিত হওয়ার চেষ্টা করো। তাছাড়া খিয়ানতের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করো না।"

হযরত আবু আবদুল্লাহ সালমান ফারসী (রা) অন্যতম জালিলুল কদর সাহাবী ছিলেন। তিনি রাসূলের (সা) বিশেষ সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। এছাড়াও তিনি ইলম ও ফজল রাসূল প্রেম, ফাহাম ও তাদাববুর আল্লাহভীতি এবং তাফাককুহ ফিদ্দীনের বদৌলতে সাহাবায়ে কিরামের (রা) পবিত্র জামায়াতে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। হযরত সালমানের (রা) মর্যাদা সম্পর্কে মুসলমানদের সকল থটস অব স্কুলের গবেষকদের পূর্ণ ঐকমত্য রয়েছে। তাঁর ইলম ও ফজিলতের ওপর সবচেয়ে বড় সাক্ষ্য স্বয়ং নবী করিমের (সা) এই বক্তব্য, "সালমান (রা) ইলমে পূর্ণ।" শেরে খোদা হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুর নিকট একবার হযরত সালমানের (রা) ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, "সালমান (রা) ইলম ও হিকমতে লোকমান হাকিমের সমান ছিলেন।" অন্য আরেকবার তিনি বলেছিলেন "সালমানকে (রা) প্রথম (অর্থাৎ পূর্বেকার কিতাব ইঞ্জিল ও তাওরাত) এবং শেষ (অর্থাৎ কুরআনে হাকিম)-এর ইলম দেয়া হয়েছে। তিনি এমন এক নদী যা কখনো শুকায় না।" আল্লামা ইবনে সায়াদ বর্ণনা করেছেন যে, ইমামুল ফুকাহা আলেমে রাব্বানী হযরত মায়াজ (রা) বিন জাবাল আনসারী একবার নিজের একজন শাগরেদকে ওসিয়ত করছিলেন যে, চার ব্যক্তির নিকট থেকে

ইলম হাসিল করবে। এই চার ব্যক্তির মধ্যে হযরত সালমান (রা) একজন ছিলেন।

প্রিয় নবীর (স্রা) প্রতি হযরত সালমানের (রা) গভীর ভালবাসা ছিল। তিনি বেশীর ভাগ সময়ই হুজুরের (সা) খিদমতে অতিবাহিত করতেন এবং সামর্থ অনুযায়ী নবীর (সা) ফয়েজে অভিষিক্ত হয়েছিলেন। রাসূলে করিমের (সা) সঙ্গে তার বিশেষ নৈকট্যে কোন কোন সময় উম্মুহাতুল মু'মিনীনেরও (রা) ঈর্ষা জাগতো।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা) সিদ্দীকা বলেন, সালমান (রা) রাতে রাসূলের (সা) খিদমতে এত দেরী করতেন যে, আমাদের (পবিত্র স্ত্রীগণ) আশংকা হতো যে, আমাদের অংশের সময়ও বুঝি হুজুর (সা) সালমানের সঙ্গে কাটিয়ে দেন।

হযরত সালমানের (রা) প্রতি হুজুরের (সা) ভালবাসা এত গভীর ছিলো যে, তিনি তাঁকে অগ্নি উপাসকের বংশোদ্ভূত এবং বিদেশী হওয়া সত্ত্বেও নিজের আহলে বাইতের মধ্যে শামিল করে নিয়েছিলেন। সহীহ মুসলিমে আছে, একবার হযরত সালমান (রা), হযরত বিলাল (রা) এবং হযরত সুহায়েব (রা) একস্থানে একত্রে বসেছিলেন। ঘটনাক্রমে আবু সুফিয়ান (রা) তাঁদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। তিন বুজর্গই বললেন, "আল্লাহর কোন তরবারী এই আল্লাহর দুশমনের গর্দানের ওপর পড়েনি।" হযরত আবু বকর সিদ্দীকও (রা) তাদের নিকটেই ছিলেন। তিনি বললেন, "এই ব্যক্তি কুরাইশের সরদার। তার ব্যাপারে তোমাদের এমন কঠোর কথা বলা উচিত ছিল না। তিন বুজর্গই সিদ্দীকে আকবারের (রা) ইরশাদ পছন্দ করলেন না। হযরত আবু বকর ছিদ্দীক (রা) এই ঘটনা হুজুরের (সা) খিদমতে আরজ করলেন। তিনি বললেন, "সম্ভবত তুমি তাঁদেরকে নারাজ বা অসন্তুষ্ট করে ফেলেছ। তাঁদের নারাজ করার অর্থই হলো আল্লাহকে নারাজ করা।"

হুজুরের (সা) ইরশাদ শুনে সিদ্দীকে আকবার (রা) খুব লজ্জিত হলেন এবং তৎক্ষণাৎ সেই বুজর্গদের নিকট গিয়ে ক্ষমা চাইলেন।

হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র) "ইসতিয়াব" গ্রন্থে এই রেওয়ায়াত উল্লেখ করেছেন যে, একবার রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ আল্লাহ তায়ালা আমাকে চার ব্যক্তির সঙ্গে মুহাব্বাত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন এবং আমাকে খবর দিয়েছেন যে, তিনিও (আল্লাহ) তাঁদের প্রতি ভালবাসা পোষণ করেন।" জিজ্ঞেস করা হলো, এই চার ব্যক্তি কে কে। বললেন, "আলী (রা), মিকদাদ (রা), সালমান (রা) ও আবু জার (রা)।"

মুসতাদরাকে হাকিমে স্বয়ং হযরত সালমান (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, আমি একবার রাসূলের (সা) খিদমতে হাজির হলাম। সে সময় তিনি একটি বালিশে ঠেস দিয়ে বসেছিলেন। তিনি তা আমার সামনে ফেলে দিলেন এবং বললেন, "হে সালমান! যদি কোন মুসলমান নিজের মুসলমান ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাত করতে যায় এবং সে সম্মান প্রদর্শনার্থে তার জন্য নিজের বালিশ পেশ করে তাহলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেবেন।"

হযরত সালমান (রা) একবার হযরত ওমর ফারুকের (রা) নিকট গেলেন। তিনিও সম্মান প্রদর্শনার্থে নিজের পিঠের বালিশ সালমানকে (রা) পেশ করলেন। হযরত সালমান (রা) হযরত ওমরকে (রা) দোয়া দিলেন এবং সেই ঘটনা বর্ণনা করলেন যাতে হুজুর (সা) তাঁকে নিজের বালিশ প্রদান করেছিলেন। হযরত সালমানের (রা) সংসারের প্রতি উদাসীনতা ও তাকওয়ার অবস্থা এমন ছিল যে, সারা জীবন ফকিরের অবস্থায় কাটিয়ে দিয়েছিলেন। এমনকি গভর্ণর হওয়ার পরও ফকিরী অবস্থা বিরাজিত ছিল। তিনি একদম সাদা সিধে স্বভাবের ছিলেন। তাঁর বাসস্থান ছিল একটি ঝুপড়ি। দাঁড়ালে তার ছাদ মাথায় ঠেকতো। আর শুলে তাঁর দেয়াল দুই পায়ে ঠেকে যেতো। আর এই ঝুপড়িও লোকেরা তাঁকে অনেক পীড়াপীড়ি করে বানিয়ে দিয়েছিল। মৃত্যুর সময় ঘরের সকল সামানের মূল্য ২০-২২ দিরহামের বেশী ছিল না।

কুন্দাহ গোত্রে হযরত সালমানের (রা) বিয়ে হয়েছিল। বিয়ের পর স্ত্রীর নিকট গেলেন। সেখানে গিয়ে দেখলেন যে, দেয়ালের স্থানে স্থানে পরদা লটকানো রয়েছে। তিনি বললেন, এই ঘরের কি জ্বর হয়েছে যে, তাকে বাতাস থেকে রক্ষার জন্য কাপড় লটকিয়ে দেয়া হয়েছে অথবা মক্কা মুয়াজ্জমা থেকে কাবা কুন্দাহ গোত্রে এসে পৌঁছেছে ফলে তার ওপর গিলাফ চড়ানো হয়েছে। তারপর তিনি দরজার পর্দা ছাড়া সকল পর্দা দেয়াল থেকে সরিয়ে দিলেন। তাতে দেয়াল পরিষ্কার দেখা যেতে লাগলো। তিনি ঘরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে সেখানে অনেক মূল্যবান সামান পেলেন। জিজ্ঞেস করলেন। এই সামান কার। বলা হলো আপনার এবং আপনার স্ত্রীর।

তিনি বললেন, আমার আকা মুহাম্মাদ (সা) আমাকে বলেছিলেন, দুনিয়ায় তোমার নিকট শুধু এতটুকুন সামান থাকতে হবে যতটুকু কোন মুসাফিরের নিকট পথের প্রয়োজনের জন্য থাকে। আমার এই সামানের প্রয়োজন নেই।

একবার কোন শহর জয়ের পর সঙ্গীদের সাথে সেখানে প্রবেশ করলেন। এ সময় স্থানে স্থানে খানাপিনার বস্তুর স্তুপ দেখতে পেলেন। একজন সঙ্গী আনন্দে আত্মহারা হয়ে বললেন, দেখুন আল্লাহ তায়ালা কত কি প্রদান করেছেন।

হযরত সালমান (রা) তাকে বাধা দিয়ে বললেন, ভাই কিসে এতো খুশী হচ্ছো। এটাও খেয়াল রেখো যে, প্রতিটি দানার হিসাব-কিতাবের দায়িত্ব আমাদের ওপর এসে পৌছেছে।

হযরত সালমান (রা) মাদায়েনের গভর্ণর ছিলেন এবং ৩০ হাজার মানুষের ওপর শাসন কাজ চালাতেন। একবার মাদায়েন থেকে সিরিয়া গমন করলেন। জ্বীন ছাড়া একটি গাধার ওপর সওয়ার হয়ে সেখানে গেলেন। গায়ে ছিল শতর্ধো তালি লাগানো লিবাস। লোকজন বললো, হে আমীর! আপনার একি অবস্থা। তিনি বললেন, ভাই! আরাম-আয়েশ তো শুধু মাত্র আখিরাতের জন্য।

হযরত সালমানের (রা) আল্লাহ্ ভক্তি ও আল্লাহভীতি নিসন্দেহে অসাধারণ ছিলো কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে, তিনি সন্ন্যাসত্ব গ্রহণ করেছিলেন। যেহেতু বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (সা) সন্ন্যাসত্ব গ্রহণ নিষেধ করেছিলেন, সেহেতু হযরত সালমান (রা) সন্ন্যাসত্ব নিজেই শুধু অপছন্দ করতেন না, বরং অন্যদেরকে তা গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে বলতেন। হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র) ইসতিয়াব গ্রন্থে লিখেছেন যে, হযরত সালমানের (রা) পাতানো ভাই হযরত আবু দারদা (রা) আনসারী সীমাহীন আবেদ ও যাহেদ ছিলেন। দিনে রোযা রাখতেন এবং রাত ভর ইবাদাতে মশগুল থাকতেন। একবার হযরত সালমান (রা) তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। তিনি সে সময় বাড়ী ছিলেন না। তাঁর স্ত্রীকে আলুথালু অবস্থায় দেখতে পেলেন। তিনি বললেন, তোমার এ অবস্থা কেন! তিনি জবাব দিলেন, কার জন্য সেজেগুজে থাকবো। তোমাদের ভাইতো দুনিয়া ছেড়ে দিয়েছে। হযরত আবু দারদা (রা) বাড়ী এসে হযরত সালমানকে (রা) দেখে খুব খুশী হলেন। তাঁর সামনে খাবার দিলেন এবং নিজে রোযা রাখার কারণে ক্ষমা চাইলেন।

হযরত সালমান (রা) বললেন, "যদি তুমি না খাও তাহলে আমিও খাবো না।" অতপর হযরত আবু দারদার (রা) নিকটই শুয়ে পড়লেন। কিছু রাত অতিবাহিত হওয়ার পর হযরত আবু দারদা (রা) ইবাদাতের জন্য উঠলেন। এ সময় তিনি তার হাত চেপে ধরলেন এবং বলেন, "আবু দারদা! তোমার ওপর তোমার রব, তোমার চোখ এবং তোমার স্ত্রী সকলেরই অধিকার রয়েছে। রোযার সঙ্গে ইফতার এবং শববিদারীর সঙ্গে শয়নও আবশ্যক। ভোর হলে উভয়েই বিষয়টি রাসূলের (সা) খিদমতে পেশ করলেন। হুজুর (সা) হযরত আবু দারদাকে (রা) সম্বোধন করে বললেন, "সালমান (রা) দ্বীন সম্পর্কে তোমার চেয়ে বেশী জ্ঞান রাখে।"

আল্লামা ইবনে আছির (র) "উসুদুল গাব্বাতে" লিখেছেন যে, প্রিয় নবীর (সা) ইন্তেকালের পর হযরত আবু দারদা (রা) সিরিয়া চলে গেলেন। সেখানে তিনি অবস্থা সম্পন্ন হয়ে উঠলেন। একবার তিনি হযরত সালমানকে (রা) [তিনি এ সময় ইরাকে ছিলেন।] চিঠি লিখলেন ঃ

"এখানে আমি খুব সচ্ছল অবস্থায় আছি। আল্লাহ তায়ালা সম্পদ ও সন্তান উভয় বস্তুই দান করেছেন এবং আমি পবিত্র স্থানে অবস্থান করছি।"

হযরত সালমান (রা) তার জবাবে লিখলেন ঃ

"ভাই। সম্পদ ও সন্তানের আধিক্য অথবা পবিত্র স্থানে থাকাই ভাল নয় বরং উত্তম হলো যে, তুমি এমন কোন আমল কর যা পরকালে তোমার কাজে আসবে।"

হযরত সালমান (রা) থেকে ৬০টি হাদিস বর্ণিত আছে। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) এবং আওস বিন মালিক (রা) তাঁর অন্যতম ছাত্র ছিলেন। হাদিস বর্ণনায় তিনি অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতেন এবং অন্যদের নিকট থেকেও একই ধরনের আশা করতেন। একবার তিনি সাহিবুসসির (গোপন কথা জাননেওয়ালা) হযরত হুজায়ফা (রা) ইবনুল ইয়ামানের মত জালিলুল কদর সাহাবীকেও একটি ব্যাপারে বাধা দিয়ে ছিলেন। ব্যাপারটি হলো তিনি মাদায়েনের লোকদেরকে এমন কিছুকথা শুনাতেন যা হুজুর (সা) ক্রোধান্বিত অবস্থায় কারোর সম্পর্কে বলেছিলেন। তিনি হযরত হুজায়ফাকে (রা) বললেন, "তুমি কি জানো না যে রাসূলুল্লাহ (সা) বলতেন যে, হে আল্লাহ! ক্রোধান্বিত অবস্থায় কারোর সম্পর্কে আমার মুখ দিয়ে কঠোর বাক্য বের হয়ে পড়ে তাহলে সেই বাক্যও তার জন্য কল্যাণকর করে দিও। এখন তুমি লোকদের নিকট এসব কথা বলছো। পরিণামে মুসলমানদের মধ্যে বিশৃংখলা বাড়বে। কেননা যাদের ওপর হুজুর (সা) কখনো সাময়িকভাবে ক্রোধ প্রকাশ করেছিলেন তাদেরকে অন্য মুসলমানরা ভয়ের মনে করবে। তুমি যদি তোমার ভূমিকা পরিত্যাগ না কর তাহলে আমি আমিরুল মু'মিনীন ওমরকে (রা) বলে দেব।" রহমতে আলমের (সা) সীমাহীন স্নেহ পাবার কারণে আহলে বাইতের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। এ জন্য তিনি সাদকার ব্যাপারে খুবই কঠোরতা অবলম্বন করতেন। কোন বস্তুতে যদি সাদকার সামান্যতম সন্দেহও হতো তাহলে তা তিনি পরহেজ করতেন।

পরকাল ভীতির অবস্থা এমন ছিল যে, নিজেও সবসময় এ ব্যাপারে ভীত সন্ত্রস্ত থাকতেন এবং লোকদেরকেও তা স্মরণ করাতেন। বলতেন, তিন ব্যক্তির

ব্যাপারে আমার খুব বিস্ময় লাগে। প্রথম সেই ব্যক্তি যে সবসময় দুনিয়া তলবে থাকে। অথচ, মৃত্যু তার তলবে রয়েছে।

দ্বিতীয় সেই ব্যক্তি যে মৃত্যুকে ভুলে বসে আছে। কিন্তু মৃত্যু তার থেকে মোটেই গাফিল নয়। তৃতীয় সেই ব্যক্তি, যে হোহো করে হাসে। অথচ সে জানে না যে, আল্লাহ তার ওপর সন্তুষ্ট অথবা অসন্তুষ্ট।

একবার নেতৃস্থানীয় কুরাইশবৃন্দ এক স্থানে একত্রিত হয়েছিলেন এবং নিজেদের ফজিলত ও প্রশংসা বর্ণনা করছিলেন। হযরত সালমানও (রা) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁকেও নিজের সম্পর্কে কিছু বলতে বলা হলো। তিনি বললেন ঃ

"ভাইসব। আমি কিসের ওপর গর্ব করবো। আমার শুরু হয়েছে অপবিত্র পানি দিয়ে এবং পরিণামে একদিন এই দেহ দুর্গন্ধ লাশের রূপ পরিগ্রহ করবে। অতপর পরকালে জীবনের সকল আমল তো নিয়ে যাবো। যদি নেকীর পাল্লা ভারী হয় তাহলে আল্লাহ প্রতিদান দেবেন। আর যদি খারাপের পাল্লা ভারী হয় তাহলে স্থায়ী অপমান ও শাস্তি রয়েছে।"

তিনি প্রায়ই বলতেন, তিনটি বিষয় তাঁকে মারাত্মক দুশ্চিন্তায় ডুবিয়ে রাখে এবং তাঁর চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে, এক, রাসূলের (সা) এবং তাঁর সঙ্গীদের বিচ্ছিন্নতা। দ্বিতীয় কবরের আযাব এবং তৃতীয় কিয়ামত ভীতি।

তিনি লোকদেরকে প্রায়ই বিনয়ী হওয়ার উপদেশ দিতেন এবং বলতেন, যে ব্যক্তি দুনিয়ায় আল্লাহর জন্য বিনয়ী হয় আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন তার মাথা বুলন্দ করবেন।

কাজ অথবা কথা যে দিকেই নজর দেয়া যাবে সেদিকেই হযরত সালমানের (রা) চরিত্র আলোকজ্জ্বল বলে পরিদৃষ্ট হবে।

হযরত ইবনে উম্মে আবদ (রা)

ফকিহুল উম্মাত

দাওয়াতে হকের প্রথম যুগে একদিন রহমতে আলম (সা) হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) সঙ্গে মক্কা মুয়াজ্জামার বাইরে জঙ্গলে তাশরীফ নিলেন। হাটাহাটি করতে গিয়ে রাসূলে করিম (সা) পিপাসা অনুভব করলেন। কিন্তু কোথাও পানির সন্ধান পাওয়া গেল না। অবশ্য নিকটেই এক যুবক রাখাল বকরী চরাচ্ছিলো। হযরত আবু বকর (রা) তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ

"মিয়া সাহেব, তুমি কি কোন বকরী দোহন করে আমাদের পিপাসা নিবারণ করতে পারো?"

ছোট দেহ এবং গমের রং-এর সেই হালকা-পাতলা রাখাল অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বললো ঃ

"ভদ্র জনেরা। এই বকরী তো আমার নয়। তার মালিক হলো উকবা বিন আবি মুয়াইত (মক্কার মশহুর মুশরিক)। তার অনুমতি ছাড়া কোন বকরীর দুধ আপনাদেরকে দেয়া আমানতের খিয়ানত হবে।"

বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সা) বললেন ঃ "ঠিক আছে, তুমি এমন বকরী আনো যা দুধ দেয় না। (অথবা যে বকরী বাচ্চা প্রসব করেনি।)

রাখালটি বললো ঃ "এ ধরনের বকরী তো আছে। কিন্তু তা দিয়ে আপনার কি কাজ হবে।"

হুজুর (সা) বললেন, "তুমি আনো তো", রাখাল একটি বকরী পেশ করলো। প্রিয় নবী (সা) তার স্তনের ওপর হাত রেখে দোয়া করলেন। আল্লাহ তায়ালা তৎক্ষণাৎ তা দুধে পূর্ণ করে দিলেন। অতপর সিদ্দীকে আকবার (রা) দুধ দোহনের জন্য বসলেন এবং এত দুধ পেলেন যে, তিনজন পূর্ণ আসুদাহ হয়ে পান করলেন। তারপর হুজুরের (সা) দোয়ায় বকরীর স্তন শুকিয়ে আসল অবস্থায় ফিরে এলো। যুবক রাখাল এই দৃশ্য দেখে হতভম্ব হয়ে গেল। মক্কায় হক দাওয়াতের আওয়াজ তার কানেও এসেছিল। কিন্তু হক দাওয়াতের আহবায়কের সঙ্গে আজই ঘটনাক্রমে মিলিত হওয়ার সুযোগ হলো। এই মু'জিযা দেখে তার অন্তর হাদিয়ে আকরামের (সা) প্রতি ভালবাসা এবং শ্রদ্ধায়

আপ্লুত হয়ে গেল। সে সময় তো চুপ মেরে রইলেন। তবে, শহরে ফিরে গিয়ে নিজের আবেগ আর বেশীক্ষণ ধরে রাখতে পারলেন না এবং একদিন হুজুরের (সা) খিদমতে হাজির হয়ে নিবেদন জানালেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমাকেও আপনার দলে দাখিল করে নিন।" রহমতে আলম (সা) যুবক রাখালের বিশ্বস্ততা ও ঈমানদারী প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি তার দরখাস্ত কবুল করলেন এবং অত্যন্ত মুহাব্বাত ও স্নেহের সাথে তার মাথায় নিজের পবিত্র হাত রাখলেন এবং বললেন, "তুমি শিক্ষিত ছেলে।"

এই ভাগ্যবান যুবক, যাকে সাইয়েদুল আনাম রহমতে আলম (সা) 'শিক্ষিত ছেলে'র উপাধি দান করেছিলেন তার নাম ছিল আবু আবদুর রহমান আবদুল্লাহ (রা) বিন মাসউদ। প্রিয় নবী (সা) প্রায়ই তাঁকে তাঁর মা উম্মে আবদের (রা) সম্বন্ধে "ইবনে উম্মে আবদ" বলে ডাকতেন। [প্রকাশ্যত তার কারণ ছিল যে, হযরত আবদুল্লাহর (রা) পিতা মাসউদ ইসলামের যুগ পায়নি। অবশ্য তাঁর মা উম্মে আবদ (রা) জালিলুল কদর সাহাবিয়াহ ছিলেন। এ জন্যই হুজুর (সা) তাঁকে উম্মে আবদ বলে ডাকতে পসন্দ করতেন।] তিনি বনু খান্দাফের একটি শাখা মাদরাকা খান্দানের বনু হাযিলের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। আল্লামা ইবনে আছির বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর পিতা মাসউদ বিন গাফিল বিন হাবিব বিন শামমাখ বিন ফার বিন মাখযুম আইয়ামে জাহেলিয়াতে আবদ বিন হারেছের মিত্র ছিলেন।

ঈমানের নিয়ামতে পূর্ণ হয়ে হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন মাসউদ নিজেকে প্রিয় নবীর (সা) খিদমতের জন্য ওয়াকফ করে দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে কুরআনে হাকিমের শিক্ষা লাভ করতে লাগলেন। সে সময় পর্যন্ত শুধুমাত্র কয়েকজন নেকবখত ব্যক্তিত্বই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁরা সকলেই কুরাইশের ক্রোধ ও রোষানলের শিকার হয়েছিলেন। একদিন নবুওয়াত প্রদীপের পতঙ্গরা পারস্পরিক পরামর্শ করলো যে, কুরাইশরা আজ পর্যন্ত উচ্চৈস্বরে কুরআন পাঠ শুনেনি। এমন কোন পথ বের করতে হবে যাতে তাদের সামনে উচ্চৈস্বরে আল্লাহর কালাম পাঠ করা যায়।

যুবক আবদুল্লাহ (রা) তৎক্ষাৎ বললেন, "আমি এই দায়িত্ব পালন করবো।"

সাহাবীরা (রা) বললেন, "এটা খুব ভীতিপ্রদ কাজ। একাজ করতে গিয়ে তুমি আবার মুসিবতে নিপতিত হয়ে না যাও। তোমার কবিলা এত শক্তিশালী নয় যে, তোমাকে মুশরিকদের পাঞ্জা থেকে মুক্তি দিতে পারবে।"

আবদুল্লাহ (রা) বিন মাসউদ ঈমানী আবেগে অস্থির হয়ে বললেন, "আমাকে এই কাজ করতে দাও। আল্লাহর ওপর আমার আস্থা আছে এবং তিনিই আমাকে হেফাজত করবেন।" সাহাবীরা (রা) তাঁর ঈমানী জোশ দেখে চুপ মেরে গেলেন।

পরবর্তী দিন সূর্য উঠলো। এ সময় কুরাইশের সকল মুশরিক একস্থানে একত্রিত ছিল। হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন মাসউদ খুব উচ্চৈস্বরে তাদের সামনে কুরআনে করিম তিলাওয়াত শুরু করে দিলেন।

মুশরিকরা এই অপরিচিত কালাম শুনে যারপরনাই বিস্মিত হলো এবং পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলো। একজন বললো, "সেতো সেই কিতাব পড়ছে যা মুহাম্মাদের উপর অবতীর্ণ হয়েছে" একথা শুনে সকল মুশরিক উত্তেজিত হয়ে উঠলো এবং আবদুল্লাহ (রা) বিন মাসউদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। নওজোয়ান আশেকে কুরআনকে এমনভাবে প্রহার করলো যে, তাঁর চেহারা ফুলে গেলো। এবং শরীরের কয়েক অংশ থেকে রক্ত প্রবাহিত হয়ে গেলো। কিন্তু ঈমানের আবেগ এমন ছিল যে, একদিকে তাঁকে প্রহার করা হচ্ছিল। অন্যদিকে তাঁর কুরআন তিলাওয়াত অব্যাহত ছিল। এমনকি মুশরিকরা মারতে মারতে হাঁপিয়ে গেল। আবদুল্লাহ (রা) সেই সময় চুপ হলেন যখন শুরুকৃত কুরআনের সূরাই শেষ হলো।

তিনি যখন পেরেশান অবস্থায় সাহাবায়ে কিরামের (রা) নিকট গেলেন তখন তারা বললেন, "আমাদের এই আশংকাই ছিল এবং এ জন্যই আমরা তোমাকে সেখানে গমনে বাধা দান করেছিলাম।"

হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন মাসউদ বললেন ঃ

"আল্লাহর কসম। আমার দৃষ্টিতে মুশরিকরা আজ থেকে বেশী কখনো অপমানিত হয়নি। আমিতো ইচ্ছা করেছি যে, আগামীকাল পুনরায় তাদেরকে আল্লাহর কালাম শুনাবো।"

সাহাবায়ে কিরাম (রা) বললেন ঃ

"তুমি যা কিছু করেছ তাই যথেষ্ট। এখন আর তোমার যাওয়ার প্রয়োজন নেই। যে কালাম শোনা মুশরিকরা খুব অপছন্দ করতো তা তুমি তাদের কানে পৌছানোর কর্তব্য পালন করেছ।"

আবদুল্লাহ (রা) নিজের বন্ধুদের পীড়াপীড়িতে বাধ্য হয়ে চুপ মেরে গেলেন। কিন্তু কাফেররা তো তাঁকে আরামের সাথে থাকতে দিলো না। তারা আবদুল্লাহ (রা) বিন মাসউদের ওপর সীমাহীন নির্যাতন শুরু করলো। যখন মুশরিকদের

নির্যাতন সহ্যের বাইরে চলে গেল তখন সারওয়ারে কায়েনাত (সা) তাঁদেরকে হাবশা বা আবিসিনিয়া হিজরতের নির্দেশ দিলেন। নবীর (সা) নির্দেশ পালনার্থে হযরত আবদুল্লাহ (রা) দুইবার হাবশায় হিজরত করেন এবং তৃতীয়বার হিজরত করে মদীনা তাশরীফ নিয়েছিলেন। সারওয়ারে আলম (সা) মায়াজ (রা) বিন জাবালের সঙ্গে তাঁর ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করান এবং তাঁর থাকার জন্য মসজিদে নববীর নিকট এক টুকরো জমি দান করলেন।

দ্বিতীয় হিজরীতে যুদ্ধের সিলসিলা শুরু হলো। হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন মাসউদ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি যুদ্ধেই অংশ নিয়েছিলেন। বদরের যুদ্ধে যখন দু'জন আনসার যুবক আবু জেহেলকে মারাত্মকভাবে আহত করলো তখন ঘটনাক্রমে আবদুল্লাহ (রা) বিন মাসউদও প্রিয় নবীর (সা) নির্দেশ পালনার্থে আবু জেহেলকে তালাশ করতে করতে সেখানে পৌঁছে গেলেন। আবু জেহেল সে সময় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করছিল। আবদুল্লাহ (রা) তার বুকের ওপর চড়ে বসলো এবং তার দাড়ি ধরে বলতে লাগলো "হে আল্লাহর দুশমন, তুইই আবু জেহেল। আল্লাহ তোকে খুব অপমানিত করেছে।"

আবু জেহেল বললো, "হায়! কোন কিষাণ যদি আমাকে হত্যা না করতো।" (এখানে কিষাণের অর্থ হলো আনসার, আনসাররা কৃষিজীবী হওয়ার কারণে কুরাইশরা তাদেরকে নিকৃষ্ট মনে করতো।)

হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন মাসউদ আবু জেহেলের কথা শুনে তার ঘাড়ের ওপর পা রাখলেন। আবু জেহেল বললো, "এই মেষ পালক তুই অনেক উঁচু স্থানে চড়েছিস। এতটুকু অন্ততঃ বল যে বিজয় কাদের হয়েছে।"

আবদুল্লাহ (রা) জবাব দিলেন, "এই আল্লাহর দুশমন! আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের (সা) বিজয় লাভ ঘটেছে।" এত টুকুন শুনেই আবু জেহেল হিমশীতল মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো। হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন মাসউদ তার মস্তক কেটে নিলেন এবং তা প্রিয় নবীর পায়ের কাছে এনে রাখলেন। হুজুর (সা) আবু জেহেলের অপবিত্র মাথার দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ

"আলহামদু লিল্লাহিল্লাজি আখযাকা ইয়া আদুব্বাল্লাহা" (হামদ ও ছানার যোগ্য সেই আল্লাহ যিনি হে আল্লাহর দুশমন তোকে অপমানিত করেছে।)

অতপর বললেন, "মাতা ফিরআউনা হাজিহিল উম্মাতি" (এই উম্মাতের ফিরাউনের মৃত্যু ঘটেছে।)

বদরের যুদ্ধের পর হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন মাসউদ অত্যন্ত উৎসাহ এবং বীরত্বের সঙ্গে ওহোদ, খন্দক এবং খায়বারের যুদ্ধে অংশ নেন। হুদায়বিয়া এবং মক্কা বিজয়ের সময়ও তিনি বিশ্ব নবীর (সা) সফর সঙ্গী ছিলেন।

মক্কা বিজয়ের পর অষ্টম হিজরীর শওয়াল মাসে হুনাইনের রক্তাক্ত যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধের কারণসমূহের মধ্যে ছিল ঃ হাওয়াযিন এবং ছাকিফের যোদ্ধা গোত্রসমূহকে শয়তান এই বলে উস্কানী দিল যে, তোমরা যদি মুসলমানদেরকে পরাজিত করতে পারো, তাহলে মক্কাবাসীর যত জায়গীর এবং বাগান রয়েছে তা তোমাদের দখলে আসবে ও একক আল্লাহর পূজারীরাও শেষ হয়ে যাবে।

বস্তুত তারা বনি হিলাল, নাসর, জাশম এবং বনি মুদিরের কবিলাসমূহকে নিজেদের সঙ্গে একত্রিত করলো ও হাজার হাজার যুদ্ধবাজ সৈন্য নিয়ে মক্কার দিকে অগ্রসর হলো। তারা আওতাস নামক স্থানে পৌছেছিল। এমন সময় হুজুর (সা) তাদের গমনাগমন ও তৎপরতার সংবাদ পেলেন। তিনি কালবিলম্ব না করে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিলেন এবং ১২ হাজার তাওহীদের ঝাণ্ডাবাহীসহ মক্কা থেকে রওয়ানা হলেন। ইসলামী বাহিনীতে মক্কার দুই হাজার নওমুসলিমও শামিল ছিলেন। এত বেশী সংখ্যক সৈন্য দেখে মুসলমানদের যবান দিয়ে বের হয়ে গেল, "এখন আমাদের ওপর আর কে বিজয়ী হতে পারে।" এই অহংকার আল্লাহর পসন্দ হলো না এবং তিনি হকপন্থীদেরকে এক কঠিন পরীক্ষায় নিক্ষেপ করলেন।

ইসলামী বাহিনী হুনাইন উপত্যকায় পৌছে দেখতে পেল যে, উপত্যকার উভয় দিকে শত্রু সৈন্যরা তাদের জন্য অপেক্ষা করছে। যেই মুসলমানদের অগ্রবর্তী দল তাদের পাল্লায় এলো তৎক্ষণাৎ তারা প্রচণ্ডভাবে তীর নিক্ষেপ শুরু করলো। অতপর ঘাত বা গুপ্তস্থান থেকে বের হয়ে মুসলমানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। অগ্রবর্তী বাহিনীর বেশীর ভাগ সদস্যই ছিল নওমুসলিম। তারা হতবুদ্ধি হয়ে পেছনের দিকে ভেগে গেল। অন্যান্য মুসলমানও হতবিহ্বল হয়ে পড়লো। এই নাযুক মুহূর্তে প্রিয় নবী (সা) অটল পাহাড়ের মত যুদ্ধের ময়দানে দাঁড়িয়ে ছিলেন এবং সাহাবায়ে কিরামের (রা) ছোট একটি জামায়াত তাঁর চার পাশে জীবন উৎসর্গের নিপুণতা প্রদর্শন করছিলেন। এই ছোট দলের মধ্যে ছিলেন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা), হযরত ওমর ফারুক (রা), হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু, হযরত আব্বাস (রা) এবং হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন মাসউদ। এই ভীত সন্ত্রস্ত পরিস্থিতিতে প্রিয় নবী (সা) উচ্চৈস্বরে এই যুদ্ধ গাঁথা পাঠ করছিলেন ঃ

انا النبي لا كاذب

انا ابن عبد المطلب

"আমি নবী, এতে সামান্য মিথ্যাও নেই

আমি আবদুল মুত্তালিবের পুত্র।"

হুজুর (সা) সে সময় নিজের সাদা খচ্চর দুলদুলের ওপর সওয়ার ছিলেন। তার বাগডোর ছিল হযরত আবু সুফিয়ান (রা) বিন হারিছের হাতে। তিনি এ জন্য রশি ধরে রেখেছিলেন যাতে হঠাৎ করে খচ্চরটি সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে না যায়। কিন্তু দুলদুল সামনে অগ্রসর না হয়ে পেছনের দিকে হটে যাচ্ছিল। এ অবস্থায় হুজুর একবার যিন থেকে নীচে নেমে পড়ছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) বিন মাসউদ অস্থির হয়ে পড়লেন এবং ডেকে বললেন ঃ

"আপনার মাথা উঁচু আল্লাহ আপনাকে উঁচু মর্যাদা দিয়েছেন।"

হুজুর (সা) বললেন, "আবদুল্লাহ! আমাকে এক মুঠো মাটি দাও।" হযরত আবদুল্লাহ (রা) তৎক্ষণাৎ নির্দেশ পালন করলেন। হুজুর (সা) এই মাটি মুশরিকদের প্রতি নিক্ষেপ করলেন। আল্লাহর কুদরতে তা তাদের চোখে গিয়ে ঢুকলো।

তারপর হুজুর (সা) হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন মাসউদকে [অথবা অন্য রেওয়ায়াত অনুযায়ী হযরত আব্বাস (রা)] মুহাজির ও আনসারকে ডাকার নির্দেশ দিলেন। তিনি উচ্চৈস্বরে ডাকা শুরু করলেন, "হে আনসারের দল, হে বাইয়াতে রেদওয়ান করনেওয়ালারা।" পুনরায় প্রত্যেক কবিলার নাম নিয়ে নিয়ে ডাকতে শুরু করলেন। এই ডাক কানে যেতেই সকল মুসলমান এক সঙ্গে উল্টে ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং তরবারী দিয়ে কাফেরদের কাজ সাঙ্গ করে দিল। মুশরিকরা চরমভাবে পরাজিত হলো এবং নিজেদের অসংখ্য নিহত ব্যক্তির লাশ যুদ্ধের ময়দানে রেখে পালিয়ে গেল। বেশুমার গনিমতের মাল মুসলমানদের হস্তগত হলো।

আল্লাহ্ তায়ালা পবিত্র কালামে এই ঘটনার উল্লেখ এই ভাষায় করেছেন ঃ

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِيْ مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ وَّيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ

كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَّضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْاَرْضُ

بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُّدْبِرِيْنَ - ثُمَّ اَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ

عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَنْزَلَ جُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ط وَذٰلِكَ جَزَآءُ الْكٰفِرِيْنَ -

"এই সেদিন হুনাইন যুদ্ধের দিন (আল্লাহর প্রত্যক্ষ সাহায্য ও হাত ধরার ব্যাপারটি তোমরা দেখেছো)। সে দিন তোমাদের সংখ্যা বিপুলতার অহংকার বা অহমিকা ছিল; কিন্তু তা তোমাদের কোন কাজেই আসেনি। যমীন তার অসীম বিশালতা সত্ত্বেও তোমাদের পক্ষে সংকীর্ণই হয়ে গিয়েছিল, আর তোমরা পশ্চাদপসরণ করে পালিয়ে গেলে। অতপর আল্লাহ তাঁর শান্তির অমিয়ধারা তাঁর রাসূল ও ঈমানদার লোকদের ওপর বর্ষণ করলেন, আর সেই বাহিনীও পাঠালেন —যা তোমরা দেখতে পেতে না। আর সত্যের অস্বীকারকারীদের তিনি শাস্তি দান করলেন, কেননা সত্যের বিরোধীদের এই হচ্ছে প্রতিফল।"

১১ হিজরীতে বিশ্ব নবীর (সা) ওফাত হলে হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন মাসউদের ওপর দুঃখের পাহাড় ভেংগে পড়লো এবং অন্তর বিদীর্ণ অবস্থায় নির্জনত্ব গ্রহণ করলেন। কিন্তু কয়েক বছর পর ইয়ারমুকের যুদ্ধের সময় যখন ফারুকে আজম (রা) প্রতিটি সুস্থ মুসলমানকে জিহাদে অংশগ্রহণের উৎসাহ দিলেন, তখন হযরত আবদুল্লাহ শামিল হয়ে গেলেন এবং সিরিয়া পৌঁছে ইয়ারমুকের যুদ্ধে অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনা ও অটলতার সাথে বীরত্ব প্রদর্শন করলেন। জিহাদের ময়দান থেকে ফিরে এলে ফারুকে আজম (রা) ২০ হিজরীতে তাঁকে কুফার কাজী নিয়োগ করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার বাইতুল মাল বা কোষাগার এবং দ্বীনি শিক্ষা বিভাগও তার হাতে ন্যস্ত করলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি কুফাবাসীর নামে যে ফরমান লিখেন তাতে বিশেষভাবে লিখেছিলেন "আমি আবদুল্লাহ বিন মাসউদকে তোমাদের নিকট প্রেরণ করে অত্যন্ত ত্যাগ স্বীকার করেছি।" হযরত ইবনে মাসউদ (রা) পুরো ১০ বছর কুফায় নিজের দায়িত্ব অত্যন্ত সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পালন করেন। তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান জুন্নুরাইন (রা) কোন কথায় অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে পদচ্যুত করেন। তাঁর পদচ্যুতির খবর কুফাবাসীরা খুব কঠিনভাবে গ্রহণ করলো। তারা একত্রিত হয়ে হযরত আবদুল্লাহর (রা) নিকট গমন করলেন এবং বললেন ঃ

"আবু আবদুর রহমান, আপনি কুফা ত্যাগ করবেন না। প্রয়োজন হলে আমরা সকলে আপনার জন্য নিজের জীবন কুরবান করে দেব।"

হযরত আবদুল্লাহ (রা) তাদের কথা মানলেন না এবং বললেন : "আমি আমিরুল মু'মিনীনের নির্দেশ অমান্য করে ফিতনার দরজা খুলবো না।"

সুতরাং নিজের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিয়ে তিনি একটি কাফেলার সঙ্গে হজ্জের জন্য মক্কা রওয়ানা হয়ে গেলেন। রাবযাহ নামক স্থানে পৌছলে তিনি একজন বেদুঈন মহিলাকে রাস্তার মাথায় দাঁড়ানো অবস্থায় পেলেন। সে হযরত আবদুল্লাহ (রা) এবং তাঁর সঙ্গীদেরকে ডেকে বললো, "ভাইসব! নিকটেই একজন মুসলমান শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করছে। তার কাফন দাফনে আমাকে সাহায্য কর।"

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "সেই ব্যক্তি কে?"

মহিলাটি জবাব দিলেন, "রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবী আবু জার গিফারী।"

হযরত আবদুল্লাহ (রা) এবং তাঁর সঙ্গীরা হযরত আবু জারের (রা) নাম শুনে "আমাদের মাতা-পিতা তাঁর ওপর কুরবান হোক" একথা বলে তাঁর কুটিরের দিকে দৌড় দিলেন। সেখানে হযরত আবু জার (রা) শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করছিলেন। তিনি নবাগতদেরকে 'আহলান ওয়া সাহলান' বললেন এবং নিজের কাফন দাফন সম্পর্কে হেদায়াত দিয়ে পরপারের ডাকে সাড়া দিলেন। হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন মাসউদ তাঁর নামাযে জানাযা পড়ালেন। অতপর সবাই মিলে তাঁর লাশ দাফন করলেন। তারপর নিজেদের সফরে রওয়ানা হয়ে গেলেন। মক্কা পৌছে হযরত ইবনে মাসউদ হজ্জ করলেন এবং মদীনা গিয়ে পুনরায় নির্জনত্ব গ্রহণ করলেন। দিন-রাত শুধু আল্লাহর স্মরণ ছাড়া কোন কাজ ছিল না। সেই যুগেই একদিন এক ব্যক্তি তাঁর খিদমতে হাজির হয়ে বললেন, "আবু আবদুর রহমান, আমি আজ রাতে স্বপ্নে দেখেছি যে, আপনি সারওয়ারে কাওনাইনের (সা) খিদমতে হাজির রয়েছেন এবং হুজুর (সা) বলছেন, ইবনে মাসউদ আমার পর তোমার কষ্ট হয়েছে। এসো, আমার নিকট চলে এসো।"

হযরত আবদুল্লাহ (রা) বললেন, "আল্লাহর কসম! তুমি এই স্বপ্ন দেখেছো?" সে ইতিবাচক জবাব দিলো। তারপর তিনি বললেন, "ব্যাস, তাহলে আমার শেষ সময় এসে গেছে। সম্ভবত তুমি আমার জানাযায় শরীক হয়েই মদীনার বাইরে যাবে।"

এ ঘটনার কিছুদিন পরই তিনি শয্যাশায়ী হয়ে গেলেন। যখন অসুস্থতা কঠিন দিকে মোড় নিলো তখন হযরত ওসমান জুন্নুরাইন (রা) তাঁর শুশ্রূষার জন্য তাশরীফ আনলেন। সেই সময় উভয় বুজুর্গের মধ্যকার সম্পর্ক খুব ভাল

ছিল না এবং হযরত উসমান (রা) দু'বছর ধরে তাঁর ভাতাও বন্ধ করে রেখেছিলেন। শুশ্রূষার সময় উভয় বুজুর্গের মধ্যে এই কথোপকথন হয় ঃ

হযরত উসমান (রা) ঃ "আপনার কি অসুখ হয়েছে?"

হযরত আবদুল্লাহ (রা) ঃ "নিজের গুনাহর।"

হযরত উসমান (রা) ঃ "আপনার কি কোন জিনিসের প্রয়োজন আছে?"

হযরত আবদুল্লাহ (রা) ঃ "হ্যাঁ, আল্লাহর রহমতের।"

হযরত উসমান (রা) ঃ "আপনার জন্য কি চিকিৎসক পাঠাবো?"

হযরত আবদুল্লাহ (রা) ঃ "চিকিৎসকই তো আমাকে শয্যাশায়ী করেছে।"

হযরত উসমান (রা) ঃ "আপনার ভাতা জারি করে দেবো?"

হযরত আবদুল্লাহ (রা) ঃ "আমার তা প্রয়োজন নেই।"

হযরত উসমান (রা) ঃ "আপনার সন্তানদের কাজে আসবে।"

হযরত আবদুল্লাহ (রা) ঃ "আপনি আমার সন্তানদের দারিদ্রতা ও অভাবের কথা চিন্তা করবেন না। আমি তারদেকে প্রতি রাতে শয়নের আগে সূরায়ে ওয়াকেয়াহ তিলাওয়াতের পরামর্শ দিয়েছি। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি প্রতি রাতে শয়নের আগে সূরায়ে ওয়াকেয়াহ পাঠ করবে সে কখনো দারিদ্রতা ও অভুক্ত অবস্থায় নিপতিত হবে না।"

আল্লামা ইবনে সাঈদ (র) বর্ণনা করেছেন যে, সেই আলোচনার পর উভয় বুজুর্গের অন্তর পরস্পরের পক্ষ থেকে পরিষ্কার হয়ে গেল।

হযরত আবদুল্লাহর (রা) যখন ইয়াকিন হয়ে গেলো যে, এই রোগ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে না, তখন তিনি হযরত যোবায়ের (রা) ইবনুল আওয়াম এবং তাঁর পুত্র হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়েরকে (রা) ডেকে পাঠালেন এবং তাদেরকে নিজের ধন-সম্পদ, সন্তান ও কাফন-দাফনের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ওসিয়ত করার পর পরপারের ডাকে সাড়া দিলেন। এই ঘটনা ৩২ হিজরীর। সে সময় হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন মাসউদের বয়স ৬০ বছরের কিছু বেশী ছিল। আমীরুল মু'মিনীন হযরত উসমান গনি (রা) নামাযে জানাযা পড়ালেন এবং বাকী' গোরস্তানে হযরত উসমান (রা) বিন মাজউনের পাশে তাঁর লাশ দাফন করা হলো। তাবকাতে ইবনে সায়াদের রাওয়ায়াত অনুযায়ী ইবনে মাসউদের (রা) ওফাতের পর হযরত উসমান (রা) বন্ধকৃত সকল ভাতা চালু করে দিলেন। এই ভাতার পরিমাণ ছিল বার্ষিক পাঁচ হাজার দিরহাম। এমনিভাবে তাঁর সন্তানরা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ একবারে পেয়ে গেলেন।

সাইয়েদেনা হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন মাসউদ প্রোজ্জ্বল ও মহান চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামিতা, কঠিন মুসিবত বরদাশতকরণ, রাসূল প্রেম, জিহাদের প্রতি উৎসাহ, কুরআনের প্রতি ভালবাসা, জ্ঞানের গভীরতা, যুহুদ ও তাকওয়া, সবর ও বিনয়, অল্পে তুষ্টি এবং তাফাক্কুহ ফিদ্বীন বা দ্বীনের জ্ঞান তাঁর অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি সেই সময় তাওহীদের ঝাণ্ডা সমুন্নত করেছিলেন যখন কুরাইশ মুশরিকরা হকপন্থীদের খুন পিপাসু ছিল। দীর্ঘদিন যাবত হক পথে বিভিন্ন ধরনের অন্তর বিদীর্ণকারী নির্যাতন সহ্য করেন। এমনকি প্রিয় স্বদেশভূমিকে বিদায় জানিয়ে হাবশায় হিজরত করতে বাধ্য হন। হাবশা থেকে মদীনা এসে বদর থেকে তাবুক পর্যন্ত প্রত্যেক যুদ্ধেই নিজের নিষ্ঠা ও জানবাজি প্রদর্শন করেন। বিশ্ব নবীর (সা) প্রতি ভালবাসা ও শ্রদ্ধার অবস্থাটা এমন ছিল যে, শান্তি হোক অথবা যুদ্ধ, সফর হোক অথবা মুকিম, একাকী হোক বা লোকের সামনে, তিনি বেশীরভাগ সময়ই নবীর (সা) দরবারে উপস্থিত থাকতেন। এভাবে তিনি একদিকে নবীর ফয়েজে অবগাহিত হতেন। অন্যদিকে হুজুরের (সা) খিদমতের সৌভাগ্য লাভ করতেন। হযরত আবু মূসা আশয়ারী (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, আমরা ইয়েমেন থেকে মদীনা এলাম। এ সময় আমরা আবদুল্লাহ (রা) বিন মাসউদকে রাসূলের (সা) নিকট এত যাতায়াত করতে দেখতাম যে, আমরা দীর্ঘদিন পর্যন্ত ধারণা করেছিলাম যে, তিনি(আবদুল্লাহ) হুজুরের (সা) বাড়ীর একজন সদস্য।

প্রকৃতপক্ষে হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) মহানবীর (সা) বিশেষ খাদেমদের মধ্যে শামিল হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি হুজুরের (সা) বিছানা বিছাতেন, তা গুছিয়ে রাখতেন ও মিসওয়াক এনে পেশ করতেন। হুজুরকে(সা) ওজু করাতেন। তার সওয়ারীর বাগ ধরতেন। মোটকথা রাসূলের (সা) দরবারে তিনি বিশেষ স্থান দখল এবং নৈকট্যের মর্যাদা লাভ করেছিলেন। তিনি রাসূলের (সা) জুতাওয়ালা, বালিশওয়ালা এবং ওজু ওয়ালা এসব উপাধিতে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। রহমতে আলমের (সা) নিকট তাঁর কি মর্যাদা ও মূল্য ছিল তার আন্দাজ তাবকাতে ইবনে সায়াদের একটি রেওয়ায়াত থেকে করা যায়। এই রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে যে, হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন মাসউদের পায়ের পাতা থেকে হাঁটু পর্যন্ত খুব পাতলা ছিল এবং তিনি তা ঢেকে রাখতেন। একদিন রাসূলে আকরাম (সা) ইবনে মাসউদ (রা) এবং আরো কতিপয় সাহাবী সমভিব্যাহারে জঙ্গলে তাশরীফ নিলেন। হযরত ইবনে মাসউদ (রা) হুজুরের (সা) জন্য মিসওয়াক ভাঙ্গার উদ্দেশ্যে পিলু গাছের ওপর

চড়লেন। তাঁর পাতলা পাতলা পা দেখে সাহাবায়ে কিরাম (রা) হাসতে লাগলেন। হুজুরের (সা) নিকট তাদের হাসি পসন্দ হলো না। তিনি বললেন ঃ

"তোমরা ইবনে উম্মে আবদের পাতলা পা দেখে হাসছো। অথচ এই পা-ই হাসরের দিন ইনসাফের দাঁড়িপাল্লায় ওহোদ পাহাড় থেকেও বেশী ভারী হবে।"

ইলম ও ফজিলতের ক্ষেত্রে হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন মাসউদ উম্মাহর স্তম্ভ হিসেবে পরিগণিত হয়ে থাকেন। তিনি সেই ধরনের একজন ফজিলত ওয়ালা সাহাবী। যাদেরকে রাসূলে আকরামের (সা) পর কুরআনের সবচেয়ে বড় আলেম হিসেবে মান্য কর হয়। স্বয়ং হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলতেন যে, তিনি কুরআনে হাকিমের ৭০টি সূরা বিশেষ করে রাসূলের (সা) মুবারক জবান থেকে শুনে ইয়াদ করেছিলেন এবং কুরআনের প্রতিটি আয়াতের ব্যাপারে তার এই জ্ঞান রয়েছে যে, তা কোথায় নাযিল হয়েছে এবং তার শানে নুযুল কি ছিল।

সহীহ বুখারীতে আছে যে, একবার স্বয়ং রাসূলে করিম (সা) লোকদেরকে বললেন যে, কুরআন চার ব্যক্তির নিকট থেকে শিখবে। এই চার ব্যক্তি হলেনঃ আবদুল্লাহ (রা) বিন মাসউদ, সালেম (রা), আবু হোবায়ফার আযাদকৃত গোলাম মায়াজ (রা) বিন জাবাল এবং উবাই (রা) বিন কায়াব। হযরত ওমর ফারুক (রা) ইবনে মাসউদের (রা) জ্ঞানের গভীরতার খুব কদর করতেন। তিনি তার ব্যাপারে বলতেন যে, "তিনি একটি পাত্র, যা জ্ঞানে পরিপূর্ণ।" হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু একবার বলেছিলেন, আবদুল্লাহ (রা) বিন মাসউদ কুরআনের ক্বারী, দ্বীনের ফকিহ ও সুন্নাহর আলেম ছিলেন।

হযরত আবু মূসা আশয়ারী (রা) বলতেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের মধ্যে ইবনে মাসউদের (রা) মত সমুদ্র মওজুদ রয়েছে ততক্ষণ আমার নিকট কোন মাসয়ালা জিজ্ঞেস করো না। হযরত আবু মাসউদ বদরী (রা) বলতেন, রাসূলের (সা) পর আবদুল্লাহ (রা) বিন মাসউদের চেয়ে বড় কেউ কুরআনের আলেম আছেন বলে আমি জানি না।

আল্লাহ তায়ালা হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন মাসউদকে কুরআনের ইলমের সঙ্গে সঙ্গে সুন্দর কিরআতের যোগ্যতাও দিয়েছিলেন। সুললিত কণ্ঠ ও হৃদয়ের উত্তাপ দিয়ে তিনি কুরআন তিলাওয়াত করতেন। একদিন তিনি নামাযে সূরায়ে নিসা পাঠ করছিলেন। এমন সময় মহানবী (সা) হযরত সিদ্দীকে আকবার(রা) এবং ফারুকে আজমকে (রা) সঙ্গে নিয়ে মসজিদে তাশরীফ আনলেন এবং তাঁর তিলাওয়াতে এত খুশী হলেন যে, তিনি যখন নামায থেকে

ফারেগ হলেন তখন বললেন, "যা চাও তাই দেয়া হবে, যা চাও তাই দেয়া হবে।"

অতপর ইরশাদ করলেন ঃ "কুরআন যেভাবে অবতীর্ণ হয়েছে, সেইভাবে যদি কোন ব্যক্তি তরতাজা পড়তে শিখতে চায় তাহলে সে যেন কিরআতে ইবনে উম্মে আবদের অনুসরণ করে।"

অন্য আরো একবার রহমতে আলম (সা) হযরত আব্দুল্লাহ (রা) বিন মাসউদের নিকট থেকে সূরায়ে নিসা শুনলেন। সে সময় গভীর প্রভাবে রাসূলের (সা) পবিত্র চোখ মুদে এলো।

পবিত্র কুরআনের তাফসীরেও তাঁর পূর্ণ কামালিয়াত ছিল। কারোর নিকট থেকে কোন সহীহ হাদিস শুনলে প্রায় সময়ই তার সমর্থনে কুরআনে করিমের আয়াত পড়ে দিতেন। তাফসীর ও হাদিসের কিতাবসমূহে এমন অসংখ্য রেওয়ায়াত পাওয়া যায়, যা থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ তায়ালা হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন মাসউদকে কুরআনের জ্ঞানের সাথে সাথে অসাধারণ মুখস্ত শক্তি এবং মেধা দান করেছিলেন।

হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন মাসউদ হাদিস বর্ণনায় অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতেন। তিনি প্রতি মুহূর্তে এই ভয়ে ভীত থাকতেন যে, হাদীস বর্ণনার সময় এমন কোন শব্দ যেন মুখ দিয়ে বের হয়ে না যায় যা হুজুর (সা) বলেননি। হাদিস বর্ণনার সময় অত্যন্ত আদবের সঙ্গে বসতেন এবং প্রতিটি শব্দ এমন সতর্কতার সঙ্গে মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতেন যেন দায়িত্বের বোঝায় দেবে যাচ্ছেন। মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে আছে, একবার এক হাদিস বর্ণনার পর মুচকি হাসি দিলেন। তারপর লোকদেরকে বললেন, "আমি কেন হাসলাম তাতো তোমরা জিজ্ঞেস করলে না।" লোকেরা বললো, "আপনিই বলুন"। ইরশাদ হলো, "এজন্য যে, এই সময় স্বয়ং রাসূলে করিম (সা) এমনিভাবে মুচকি হেসেছিলেন।" তাঁর সতর্কতার অবস্থাটা এমন ছিল যে হাদিস বর্ণনার সময় "কালা" রাসূলুল্লাহ (সা) এই বাক্য মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতে সবসময় সামর্থ অনুযায়ী বেঁচে থাকার চেষ্টা করতেন। যদি কখনো এই বাক্য মুখ দিয়ে বের হয়ে যেতো তাহলে শরীর কেঁপে উঠতো এবং বলতেন হুজুর (সা) এমনিভাবে বলেছিলেন অথবা তার থেকে কিছু কম অথবা তার থেকে কিছু বেশী অথবা তার সমার্থক শব্দ ইরশাদ করেছিলেন। তাবকাতে ইবনে সায়াদে মশহুর তাবেয়ী হযরত আমর বিন মাইমুন থেকে বর্ণিত আছে, "একবার পুরো একবছর আমার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল যে, প্রতি বৃহস্পতিবার হযরত ইবনে মাসউদের (রা) খিদমতে হাজির হয়ে ফয়েজ হাসিল করতাম। এই সময়ে

একবার ছাড়া আমি কখনো তাঁকে হুজুরের (সা) প্রতি সম্বন্ধ করে কথা বলতে শুনিনি। সে সময় হঠাৎ করে তার মুখ দিয়ে 'কালা' রাসূলুল্লাহি (সা) অংশটি বের হয়ে যায়। তখন তার শরীরে কম্পন দেখা দিল। মাথা ঘর্মাক্ত হয়ে উঠলো। শিরা ফুলে গেল এবং চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়লো।"

এ সত্ত্বেও ইবনে মাসউদ (রা) হুজুরের (সা) ইরশাদসমূহকে সতর্কতা ও ভীতিসহ উম্মাহর নিকট পৌঁছানোকে নিজের দায়িত্ব এবং কর্তব্য বলে মনে করতেন। বস্তুত তাঁর থেকে ৮৪৮টি হাদিস বর্ণিত আছে। তার মধ্যে ৬৪টিতে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম ঐকমত্য পোষণ করেন। ৪১টিতে ইমাম বুখারী ও ৩৫টিতে ইমাম মুসলিম মতদ্বৈততা প্রকাশ করেছেন।

হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন মাসউদ বছরের পর বছর ধরে অব্যাহতভাবে নবুওয়াতের দরবার থেকে সরাসরি ফয়েজ লাভ করেছিলেন। সুতরাং তিনি শরীয়তের আহকামের তথ্যের এক মহাসমুদ্রে পরিণত হয়েছিলেন। তিনি অন্যতম ফকিহ সাহাবী ছিলেন। জমহুর ওলামার নিকট এই পর্যায়ে শুধুমাত্র ৭জন সাহাবী ছিলেন। অর্থাৎ হযরত ওমর ফারুক (রা), হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু, হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা), হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন মাসউদ, হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন আব্বাস, হযরত যায়েদ (রা) বিন ছাবিত এবং হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন ওমর (রা)।

আল্লামা ইবনে হাযম বর্ণনা করেছেন যে, যদি এসব বুজুর্গের ফতওয়া এক স্থানে একত্রিত করা হয় তাহলে প্রত্যেকের ফতওয়া দিয়ে কয়েক ভলিউম করে কিতাব সংকলন করা যায়। এই সাত বুজুর্গের মধ্যেও শুধুমাত্র চারজন অর্থাৎ হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন মাসউদ, হযরত যায়েদ (রা) বিন ছাবিত, হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন আব্বাস এবং হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন ওমরের (রা) এমন বৈশিষ্ট্য ছিল যে, বর্তমান ইসলামী ফিকাহর বেশীরভাগ অংশের ভিত্তি তাঁদের ফতওয়ার ওপর স্থাপিত এবং তারা সকলেই ফকিহুল-উম্মাহ এই লকবে মশহুর হয়েছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন মাসউদের ফতওয়া ও মতামতসমূহের সবই যদিও ফিকহী মাসলাকের নিকট অত্যন্ত ওজনদার ও গুরুত্বপূর্ণ তবুও হানাফী ফিকাহর সবকিছুই নির্ভর করে তার ওপর। তার কারণ হলো, হযরত ইবনে মাসউদ (রা) কুফায় ফিকাহর বাকায়দা তালিম দিতেন এবং তাঁর শিষ্যরা তাঁর ফতওয়াসমূহকে লিখিত আকারে পেশ করতেন। আল্লামা ইবনে কাইয়েম (র) বর্ণনা করেছেন যে, আবদুল্লাহ (রা) বিন মাসউদ ছাড়া কোন সাহাবীর শিষ্যরা তাঁর ফতওয়া ও ফিকহী মতকে লিখে রাখেননি।

হযরত ইবনে মাসউদের (রা) পর তাঁর নামকরা তিনজন ছাত্র আলকামাহ (র) বিন কায়েম নাখয়ী, আসওয়াদ (র) বিন ইয়াযিদ নাখয়ী এবং মাসরূক(র) বিন আবদুর রহমান (আজদা) হামদানী ফিকাহ ও ইজতিহাদের ক্ষেত্রে ব্যাপক খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে আলকামাহ (র) হযরত ইবনে মাসউদের (রা) হাদিসের সবচেয়ে বড় আলেম ছিলেন। তাঁর ওফাতের পর ইবরাহিম (র) বিন ইয়াযিদ নাখয়ী (তিনি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র এবং বিশেষ শাগরিদ ছিলেন) তাঁর ফজিলতের আসনে সমাসীন হন। আল্লামা ইবনে সায়াদ বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ফিকাহর ইমাম ছিলেন এবং তাঁর ফিকহী কামালিয়াত সম্পর্কে সকলেই ঐকমত্য পোষণ করতেন। ইবরাহিমের (র) ফতওয়াবলীর সবচেয়ে বড় আলেম ছিলেন হাম্মাদ (র)। এই হাম্মাদ (র) থেকেই ইমাম আবু হানিফা (র) শিক্ষা লাভ করেন। বস্তুত হানাফী ফিকাহর প্রাসাদ বা ইমারত পরোক্ষভাবে হযরত ইবনে মাসউদের (রা) ফতওয়াসমূহের ভিত্তির ওপর স্থাপিত হয়েছে। ইমাম আবু হানিফা (র) নিজের জ্ঞান ও ইজতিহাদের মাধ্যমে হানাফী ফিকাহর এত উন্নয়ন ঘটিয়েছিলেন যে, ইসলামী দুনিয়ার একটি বিরাট অংশ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে হানাফী মাসলাকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে আসছে।

শিক্ষা ও ফতওয়া প্রদান ছাড়া হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন মাসউদ তাবলীগ এবং ইরশাদের দায়িত্বও পালন করতেন। তিনি একজন উচ্চ শ্রেণীর বক্তা বা খতিব ছিলেন এবং তাঁর খুতবা ও ওয়াজে নজিরবিহীন প্রভাব পড়তো। হাদিস ও চরিতগ্রন্থসমূহে এমন কতিপয় রেওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, কোন কোন সময় তিনি স্বয়ং রাসূলের (সা) উপস্থিতিতে খুতবা দিতেন। হুজুর (সা) তাঁর খুতবার প্রশংসা করেছিলেন। আল্লামা ইবনে আসাকির (র) এবং হাইছামী (র) হযরত আবুদ দারদা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একবার রাসূলুল্লাহ (সা) একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিলেন। তারপর তিনি হযরত আবু বকরকে (রা) বললেন, হে আবু বকর দাঁড়াও এবং খুতবা দাও।

তিনি হুজুর (সা) প্রদত্ত খুতবা থেকেও সংক্ষিপ্ত খুতবা দিলেন। অতপর তিনি হযরত ওমর ফারুককে খুতবা দানের নির্দেশ দিলেন। তিনি নির্দেশ পালন করলেন। কিন্তু তাঁর খুতবা হযরত আবু বকরের (রা) খুতবা থেকেও সংক্ষিপ্ত ছিল। তারপর তিনি অন্য কোন এক ব্যক্তিকে খুতবা দানের নির্দেশ দিলেন। তিনি নিজের খুতবায় ভিন্ন ধরনের কথা বলতে শুরু করলেন। প্রিয়নবী (সা) তাঁর খুতবা পসন্দ করলেন না এবং তাঁকে বসে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। অতপর তিনি হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন মাসউদের দিকে দৃষ্টি ফেরালেন এবং

বললেন, "হে ইবনে উম্মে আবদ, দাঁড়াও এবং খুতবা দাও।" হযরত আবদুল্লাহ (রা) দাঁড়িয়ে গেলেন এবং হামদ ও ছানার পর বললেন ঃ

"হে লোকেরা! নিসন্দেহে আল্লাহ্ পাক আমাদের মালিক এবং নিসন্দেহে ইসলাম আমাদের দ্বীন এবং নিসন্দেহে কুরআন আমাদের ইমাম এবং নিসন্দেহে কা'বা আমাদের কিবলা এবং [হুজুরের (সা) দিকে ইঙ্গিত করে] ইনি আমাদের রাসূল ও নবী (সা)। আল্লাহ এবং তার রাসূল (সা) যেসব বস্তু আমাদের জন্য পসন্দ করেছেন আমরাও তা পসন্দ করেছি এবং আল্লাহ ও তার রাসূল (সা) যেসব বস্তু আমাদের জন্য অপসন্দ করেছেন আমরাও তা অপসন্দ করেছি।"

সারওয়ারে আলম (সা) তাঁর খুতবা শুনে খুব খুশী হলেন এবং বললেন ঃ

"ইবনে উম্মে আবদ ঠিক বলেছে, ইবনে উম্মে আবদ ঠিক বলেছে এবং সত্য বলেছে। আমি তার ব্যাপারে রাজী হয়ে গেছি যার ব্যাপারে আল্লাহ আমার জন্য, আমার উম্মতের জন্য এবং ইবনে উম্মে আবদের জন্য রাজী হয়েছেন।"

হযরত ইবনে মাসউদ (রা) নিজের খুতবা ও ওয়াজে সাধারণত তাওহীদ, জামায়াতে নামায এবং পরকালের ভয়ের কথা বলতেন। তাঁর ইরশাদসমূহের কতিপয় অংশ এখানে উল্লেখ করা হলো ঃ

"হে মানুষেরা! যে দুনিয়া লাভের চেষ্টা করেছে সে আখিরাতের ক্ষতি করেছে এবং যে আখিরাতের চেষ্টা করেছে সে দুনিয়ার ক্ষতি করেছে। অনিত্যের ক্ষতি বাকীর জন্য তোমাদের বরদাশত করা উচিত।"

"হে লোকেরা! দুনিয়ায় যে কপটতা করবে, আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তাকে কপটতার শাস্তি দেবেন। দুনিয়ায় যে খ্যাতির জন্য কাজ করে আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন তার কাজের শুহরত করাবেন (তার জন্য কোন প্রতিদান থাকবে না) এবং যে মর্যাদা ও বড়াইয়ের খাতিরে শীর্ষে ওঠে আল্লাহ তাকে নীচে নিক্ষেপ করবেন এবং যে বিনয় অবলম্বন করে আল্লাহ তার মাথা উঁচু করবেন।"

"ভাইসব! আল্লাহর ইবাদাত কর এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না। কুরআনের সঙ্গে চলো সে যেখানে তোমাদেরকে নিয়ে যায় এবং তোমাদের নিকট যে হক আনবে তা কবুল কর যদিও হক আনয়নকারী অনেক দূরের এবং তোমাদের সঙ্গে তার শত্রুতাও থাকে। তোমাদের নিকট কেউ বাতিল আনলে তা প্রত্যাখ্যান কর যদি সে তোমাদের বন্ধু ও আত্মীয়ও হয়।"

মোট কথা হযরত ইবনে মাসউদের (রা) ওয়াজ ও নসিহত এ ধরনের সুন্দর ভাষণ সম্বলিত হতো।

সাইয়েদেনা ইবনে মাসউদ (রা) যদিও রাসূলের (সা) নৈকট্য লাভকারী অন্যতম সাহাবী হিসেবে পরিগণিত ছিলেন এবং তিনি স্বয়ং প্রিয় নবীর (সা) মুখ দিয়ে কয়েকবার তাঁর মাগফিরাতের সুসংবাদ শুনেছিলেন, তবুও তিনি আল্লাহর ভয়ে সদা কম্পমান থাকতেন। ইবনে সায়াদ (র) তার এই বক্তব্যও নকল করেছেন যে, "হায়! মৃত্যুর পর যদি আমাকে উঠানো না হতো।" আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সবসময় প্রচেষ্টা চালাতেন। খুব বেশী নামায পড়তেন এবং রমযান ছাড়া প্রতি সোমবার, বৃহস্পতিবার এবং আশুরার দিন অবশ্যই রোযা রাখতেন। কোন কোন সময় এমনও হতো যে, কুরআন তিলাওয়াত অবস্থাতেই রাত অতিবাহিত হতো। সুবহিসাদিক থেকে সূর্য ওঠা পর্যন্ত তাসবিহ-তাহলিলে মশগুল থাকাটা তাঁর অভ্যাস ছিল। তিনি নিজেই শুধু নন বরং নিজের পরিবার পরিজনকেও খুব ভোরে জাগিয়ে দিতেন এবং সকল ঘর ইবাদাতে মশগুল হয়ে যেত। জামায়াতের সঙ্গে ও সময়মত নামায আদায়ে পাবন্দ ছিলেন। মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে আছে যে, একবার কুফার গভর্ণর ওয়ালিদ বিন উকবার মসজিদে পৌঁছতে দেরী হয়ে গিয়েছিল। হযরত আবদুল্লাহ (রা) তাঁর জন্য অপেক্ষা না করেই সময়মত নামায পড়িয়েছিলেন। তাতে ওয়ালিদ খুব গোস্বা হয়ে তাঁর নিকট জবাব চাইলেন। তিনি বললেন ঃ

"আল্লাহ এটা পসন্দ করেন না যে, তুমি নিজের কাজে ব্যস্ত থাকবে আর লোকজন নামাযে তোমার জন্য অপেক্ষা করতে থাকবে।"

হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন মাসউদের চারিত্রিক খনি মূল্যবান মনিমুক্তায় পূর্ণ ছিল। তিনি নিজের প্রতিটি কথা ও কাজে রাসূলে আকরামের (সা) অনুসরণের প্রচেষ্টা চালাতেন। এভাবে তিনি সুন্দর চরিত্রের এক নমুনা হয়ে গিয়েছিলেন। জামে' তিরমিযীতে আবদুর রহমান বিন ইয়াযিদ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, "একবার আমরা সাহিবুস সির হযরত হোযায়ফা (রা) ইবনুল ইয়ামানের খিদমতে হাজির হয়ে আরজ করলাম যে, আমাদেরকে এমন কোন মানুষের সন্ধান দিন যিনি চরিত্র ও হেদায়াতে রাসূলের (সা) সাদৃশ্য রাখেন। যাতে আমরা তাঁর নিকট থেকে ফয়েজ হাসিল করতে পারি। হযরত হোযায়ফা (রা) বললেন ঃ

"আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাসূলের (সা) আদর্শের সবচেয়ে বেশী পাবন্দ।

হযরত ইবনে মাসউদ (রা) ছিলেন জ্ঞানের এক মহাসমুদ্র। তা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন মহান বিনয়ী। কোন মাসয়ালার ব্যাপারে যদি তাঁর জানা না থাকতো তাহলে নির্দ্বিধায় বলে দিতেন যে, তিনি তা জানেন না। কোন সময় যদি কোন ফতওয়া দিয়ে দিতেন এবং পরে তার বিরুদ্ধে প্রমাণ পাওয়া যেত তাহলে অবিলম্বে সেই ফতওয়া বাতিল করে দিতেন। তিনি তাঁর সমকালীন জ্ঞানী-গুণীদের সীমাহীন সম্মান করতেন। তিনি তাঁদের ইলম ও ফজিলতেরই শুধু প্রকাশ্য স্বীকৃতি দিতেন না বরং যে মাসয়ালা সম্পর্কে জানতেন না তা নির্দ্বিধায় তাঁদের নিকট থেকে জেনে নিতেন। তাতে নিজের মর্যাদাহানি মনে করতেন না। এমনকি তিনি নিজের শিষ্যদের জ্ঞানের গভীরতার স্বীকৃতি দিতেও লজ্জা করতেন না। নিজের মশহুর শাগরিদ আলকামা (র) বিন কায়েস নাখয়ীর সম্পর্কে বলতেন, "আলকামার জ্ঞান থেকে আমার জ্ঞান বেশী নয়।" তাবকাতে ইবনে সায়াদে আছে যে, হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু নিজের খিলাফতকালে কুফা পৌঁছে হযরত ইবনে মাসউদের (রা) কয়েকজন একান্ত বন্ধুর নিকট তাঁর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। তাঁরা সর্বসম্মতভাবে আরজ করলেন ঃ

"আমিরুল মু'মিনীন, আমরা আবদুল্লাহ (রা) বিন মাসউদ থেকে বড় কোন পরহেজগার মেহমান নাওয়াজ, সুন্দর প্রকৃতি ও চরিত্র এবং সর্বোত্তম দোস্ত বা বন্ধু দেখিনি।"

হযরত আলী (রা) জিজ্ঞেস করলেন, "একথা কি তোমরা সত্য অন্তরে বলছো।" তারা বললো, "হ্যা, আমিরুল মু'মিনীন, এসব কিছুই সম্পূর্ণ ঠিক।" বললেন, "তোমরা আবদুল্লাহ বিন মাসউদের ব্যাপারে যা কিছু বলেছো আমি তাঁকে তা থেকেও ভাল মনে করে থাকি।"

হযরত ইবনে মাসউদ (রা) মেহমানদেরকে খুব তাজিম ও সম্মান করতেন। তিনি কুফার আর-রুমাদার বাড়ী খালি করিয়ে দিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল সেখানে মেহমান রেখে তাদের বেশী বেশী খিদমত করা। তিনি চরম ধৈর্যশীল ও মুখাপেক্ষীহীন ছিলেন। হযরত উসমান (রা) দুই বছর পর্যন্ত তাঁর ভাতা (বার্ষিক পাঁচ হাজার দিরহাম) বন্ধ রেখেছিলেন। কিন্তু তিনি শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত তা পুনরায় চালুর আবেদন করেননি। এবং অত্যন্ত ধৈর্য ও শুকুরের সঙ্গে নিজের সময় কাটাতে থাকেন। ওফাতের কাছাকাছি সময়ে হযরত উসমান(রা) তাঁর শুশ্রূষার জন্য তাশরীফ আনলেন এবং তার ভাতা পুনর্বহাল করবেন কিনা সে ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি অত্যন্ত বেপরোয়াভাবে তা না করে দিলেন।

তার পারিবারিক জীবন ছিল অত্যন্ত সুন্দর। স্ত্রী ও সন্তানদের সঙ্গে অত্যন্ত স্নেহের আচরণ করতেন। ঘরে প্রবেশের পূর্বে সবসময় গলায় খাঁখারী দিতেন অথবা উচৈস্বরে কিছু বলতেন। যাতে ঘরের মানুষেরা সতর্ক হয়ে যায়। পরিবারের লোকজনের কুরআন ও দ্বীনি মাসয়ালা তালিম দেয়ার বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। সেই সঙ্গে তিনি তাদের দিয়ে দ্বীনের হুকুম আহকামের পাবন্দীও করাতেন। বলতেন যে, "ইনশাআল্লাহ লোকেরা ইবনে উম্মে আবদের সন্তানদেরকে দ্বীন থেকে গাফেল পাবে না।"

সুন্দর চরিত্র ও জ্ঞানের গভীরতার বদৌলতে তিনি হযরত ওমরের (রা) মত মানুষের নিকট এমন মর্যাদার অধিকারী ছিলেন যে, তিনি তার সামান্যতম অপমানও বরদাশত করতে পারতেন না। হাফেজ ইবনে হাজার (র) বর্ণনা করেছেন যে, ফারুকী শাসনামলে একবার হযরত ইবনে মাসউদ (রা) জনৈক ব্যক্তিকে তার তহবন্দ টাখনুর নীচে চলে যাওয়ায় তিরস্কার করলেন। সেই ব্যক্তি জবাবে বললো, "ইবনে মাসউদ (রা) তুমিও তহবন্দ ঠিক করে পর।" তিনি বললেন, "ভাই, আমি মাযুর। কেননা আমার পা খুব পাতলা।" হযরত ওমর (রা) এই ঘটনা শুনে সেই ব্যক্তিকে ডেকে বেত মারলেন। কেননা সে আবদুল্লাহ (রা) বিন মাসউদের মত ব্যক্তিত্বের সঙ্গে তর্ক করেছিল।

হযরত হুজায়ফা (রা) ইবনুল ইয়ামান—"সাহিবুস সির"

সাইয়েদেনা হযরত ওমর ফারুকের (রা) শাসনামল। একদিন তিনি মদীনা মুনাওয়ারা থেকে কিছু দূরে খেজুর গাছের এক ঝোপের মধ্যে বসেছিলেন। এই ঝোপ ছিল সেই রাজপথের নিকটে যে রাজপথ মদীনাকে ইরাক ও ইরানের সঙ্গে মিলিত করতো। খেজুর গাছগুলো এমনভাবে লাগানো হয়েছিল যে ঝোপের মধ্যে বসে কোন ব্যক্তি রাজপথের ওপর দিয়ে যাতায়াতকারীকে দেখতে পেতো। কিন্তু বাইরে থেকে কেউ তাকে দেখতে পেতো না। এটা ছিল সেই যুগ, যখন আরব মুজাহিদদের সামনে ইরানের কিসসার শানশওকত ও মান-মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত হয়েছিল এবং ইরানের বিভিন্ন প্রদেশের আইন-শৃংখলা ও শাসনকাজ মুসলমান গভর্ণরদের হাতে ছিল। হযরত ওমর ফারুক (রা) ঝোপের মধ্যে বসে বারবার রাজপথের দিকে তাকাচ্ছিলেন মনে হচ্ছিল, তিনি যেন কারোর জন্য অপেক্ষা করছেন। অনেকক্ষণ অপেক্ষার পর তিনি দূরে ধূলো উড়তে দেখলেন। একটি সওয়ার মদীনার দিকে আসছিলো। তিনি ছিলেন ইয়েমেনী চেহারার এবং মধ্য আকৃতির একজন হালকা পাতলা মানুষ। তিনি যিন ছাড়া খচ্চরের ওপর সওয়ার ছিলেন। তাঁর দেহে ছিল মোটাসোটা পোশাক। তারও কয়েক স্থানে ছিল তালি। তিনি ঝোপের নিকট পৌছলে হযরত ওমরের (রা) চেহারা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। এই ব্যক্তির জন্যই তিনি এত দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করছিলেন। অস্থির চিত্তে তিনি ঝোপ থেকে বাইরে বেরিয়ে তাঁর সামনে এলেন এবং খচ্চর থেকে নামিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন। তিনি জোরে জোরে নিশ্বাস নিচ্ছিলেন এবং বলছিলেন, "আল্লাহর কসম! তুমি ইসলামের মর্যাদা রেখেছ। তুমি আমার ভাই এবং আমি তোমার ভাই।" আরব ও আজমের খলীফা হযরত ওমর ফারুক যাকে এমন করে সম্মান করছিলেন তিনি ছিলেন ইরানের সাবেক রাজধানী মাদায়েনের গভর্ণর আবু আবদুল্লাহ হুজায়ফা (রা) ইবনুল ইয়ামান।

হযরত হুজায়ফা (রা) ইবনুল ইয়ামান সেসব বুলন্দ মরতবা সম্পন্ন সাহাবীদের মধ্যে পরিগণিত যাদেরকে স্বয়ং সালারে আম্বিয়া এবং ফখরে রাসূল (সা) কিয়ামতের দিন নিজের সঙ্গী হবেন বলে সুসংবাদ দিয়েছেন। তাঁর কুনিয়াত ছিল আবু আবদুল্লাহ এবং লকব ছিল "সাহিবুসসিররি রাসূলিল্লাহ।" হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র) "ইসতিয়াবে" লিখেছেন, এই লকব দানের

কুনিয়াত ছিল আবু আবদুল্লাহ এবং লকব ছিল "সাহিবুসসিররি রাসূলিল্লাহ।" হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র) "ইসতিয়াবে" লিখেছেন, এই লকব দানের কারণ হলো যে, রাসূলে আকরাম (সা) তাঁকে মুনাফিকদের নাম বলে দিয়েছিলেন। তিনি সেসব নাম বিশ্বস্ততার সঙ্গে হিফাজত করতেন।

হযরত হুজায়ফা (রা) বনু গাতফানের আবাস বংশোদ্ভূত ছিলেন। তাঁর পিতা সাধারণভাবে আল ইয়ামান (ইয়ামান) নামে মশহুর। কিন্তু তাঁর আসল নাম ভিন্ন রেওয়ায়াত অনুযায়ী হুসাল অথবা হুসাইল ছিল। তিনি জাহেলী যুগে নিজের গোত্রের এক ব্যক্তিকে হত্যা করে বসেন এবং কিসাসের ভয়ে দেশ ত্যাগ করে মদীনা (ইয়াসরাব) এসে বসবাস শুরু করেন। এখানে তিনি আওসের বনু আবদিল আসহালের সঙ্গে মিত্রতার সম্পর্ক গড়ে তোলেন এবং একজন আসহালি মহিলা রুবাব বিনতে কা'বকে বিয়ে করেন। তারই গর্ভে হযরত হুজায়ফা (রা) জন্মগ্রহণ করেন। আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী(র) বর্ণনা করেছেন যে, আওস ও খাজরাজ মূলত ইয়েমেনী ছিল।

এ জন্য হুসায়েলের নাম তাঁর কওমের লোকেরা ইয়ামান রেখে দেয়। এই নাম তাঁর এত মশহুর হয় যে, লোকজন আসল নাম ভুলেই যায়।

সারওয়ারে আলম (সা) তখনো মদীনা মুনাওয়ারাতে শুভ পদার্পণ করেননি। সেই সময়ই হুসায়েল (রা) এবং হুজায়ফা (রা) হুজুরের (সা) দাওয়াত ও তার ওপর নির্যাতনের কথা শুনেছিলেন। পিতা-পুত্র উভয়েই নেক স্বভাবের মানুষ ছিলেন। তাঁদের অন্তর সাক্ষ্য দিল যে, ইসলামের দায়ী (সা) আল্লাহর সত্য রাসূল এবং তাঁর দাওয়াত কবুলে বিলম্ব করা ক্ষতির অবশ্যই কারণ হবে। সুতরাং সব ধরনের বিপদ ও ভীতি মাথায় নিয়ে তারা সোজা মক্কা গিয়ে পৌঁছলেন এবং হুজুরের (সা) খিদমতে হাজির হয়ে ঈমান আনলেন। পরে হযরত হুজায়ফার (রা) মা রুবাব (রা) এবং এক ভাই সাফওয়ানও (রা) ইসলামের নিয়ামতে পূর্ণ হয়ে গেলেন।

সহীহ মুসলিমের এক রেওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, বদরের যুদ্ধের সময় হযরত হুসায়েল (রা) এবং হুজায়ফা (রা) মক্কায় ছিলেন। যুদ্ধের অবস্থা শুনে তাতে অংশগ্রহণের জন্য মক্কা থেকে রওয়ানা হলেন। রাস্তায় মুশরিকরা বাধা দিয়ে বললো যে, মুহাম্মাদের (সা) নিকট যেতে চাও? তাঁরা বললেন, "আমরা তো নিজের বাড়ী (মদীনা) যাচ্ছি।" মুশরিকরা বললো, "তোমাদের মদীনা গমনে আমাদের কোন আপত্তি নেই। কিন্তু শর্ত হলো যে, তোমরা মুহাম্মাদের (সা) সাহায্যে আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে পারবে না।" উভয়ে ইচ্ছায় হোক

অথবা অনিচ্ছায় হোক মুশরিকদের শর্ত মেনে নিলেন এবং তাদের পাঞ্জা থেকে ছুটে মদীনা পৌঁছলেন। হুজুর (সা) তখনো যুদ্ধের জন্য রওয়ানা হননি। দু'জনে রাসূলের (সা) নিকট উপস্থিত হয়ে ঘটনা বর্ণনা করলেন। যদিও সে সময় একজন মানুষেরও বিশেষ প্রয়োজন ছিল। তবুও সারওয়ারে আলম (সা) বললেন, "তোমরা নিজেদের প্রতিশ্রুতি পূরণ কর এবং ফিরে যাও। আমাদের প্রয়োজন আল্লাহর সাহায্য।" তাঁরা হুজুরের (সা) নির্দেশ পালন করলেন এবং অন্তরের ওপর পাথর রেখে ফিরে গেলেন।

ওহোদের যুদ্ধে পিতা-পুত্র উভয়েই অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে অংশ নিলেন। হুসায়েল (রা) বার্ধক্যের কারণে খুব দুর্বল ছিলেন। এ জন্য হুজুর (সা) যুদ্ধ শুরুর পূর্বে তাঁকে এবং অন্য একজন বয়স্ক বুজুর্গ হযরত রিফায়াহ (রা) বিন ওয়াকাশ আনসারীকে মহিলা ও শিশুদের নিকট এক উঁচু টিলার ওপর(অথবা দুর্গ) পাঠিয়ে দিলেন। যুদ্ধের ময়দান গরম হয়ে উঠলো। এ সময় উভয় বুজুর্গের জোশ এসে গেল। একে অপরকে বললেন, "লা উবালিকা" (তোমার পিতার মৃত্যু হোক) "আমরা এখানে কেন বসে আছি। অথচ আমাদের ভাই ও পুত্ররা হক পথে জীবন কুরবান করছে। আমরা তো শেষ রাতের প্রদীপ। আজ মরি কি কাল মরি। চলো, আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করে শাহাদাতের সৌভাগ্য হাসিল করি।" অন্যজন বললেন, "আল্লাহর কসম! তুমি সত্য কথা বলেছ।" সুতরাং দু'জনেই তরবারী হাতে যুদ্ধের ময়দানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সে সময় ঘটনাক্রমে এক পদস্খলনের কারণে মুসলমানদের মধ্যে চরম বিশৃংখলা দেখা দিয়েছিল। রিফায়াহ (রা) জনৈক মুশরিকের হাতে শহীদ হয়ে গেলেন। কিন্তু হুসায়েলুল ইয়ামানকে (রা) কিছু মুসলমান ভুলবশত মুশরিক মনে করে শহীদ করে ফেললো। হুজায়ফা (রা) চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছিলেন যে, হে আল্লাহর বান্দারা, উনি আমার পিতা। কিন্তু বিশৃংখলার কারণে কেউ তার কথা শুনতে পেলো না। পিতার শাহাদাতে হুজায়ফা (রা) খুব দুঃখিত হলেন ঠিকই কিন্তু ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখলেন। কেননা ভুলবশত মুসলমানরা এ ধরনের কাজ করে ফেলেছিলেন। 'আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন' একথা বলেই তিনি চুপ মেরে গেলেন। রাসূলে আকরাম (সা) এ ঘটনা শুনে হযরত হুজায়ফার (রা) প্রতি হামদরদি বা সহানুভূতি প্রকাশ করলেন এবং তাঁর ক্ষমার আবেগের প্রশংসা করলেন। উপরন্তু ইরশাদ করলেন, হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি উভয়েই ক্ষমাপ্রাপ্ত। একটি রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত হুজায়ফা (রা) দিয়াতের অর্থ মুসলমানদের জন্য সাদকা করে দিয়েছিলেন এবং এক দিরহামও নিজের জন্য খরচ করেননি। কতিপয় চরিতকার ওহোদের যুদ্ধে হযরত হুসায়েলুল ইয়ামানের (রা) বার্ধক্য ও প্রপীড়িত সঙ্গীর নাম রিফায়াহ'র

(রা) পরিবর্তে ছাবিত বিন ওয়াক্কাশের নাম লিখেছেন। কিন্তু অনেক সনদসম্পন্ন রেওয়ায়াত থেকে এই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ছাবিত বিন ওয়াক্কাশ হযরত হুসায়েলের (রা) জামাই ছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে লায়লা বিনতে হুসায়েলুল ইয়ামানের বিয়ে হয়েছিল। এ জন্য তার সম্পর্কে বার্ধক্যের কথা খাটে না। হাঁ, ছাবিত বিন ওয়াক্কাশ এবং লায়লার যুবক পুত্র (অর্থাৎ হুসায়েলুল ইয়ামানের নাতি) সায়রাম আবদুল আশহাল (রা) ওহোদের যুদ্ধে শহীদ হন। তিনি যুদ্ধের ময়দানে অথবা লড়াই শুরু হওয়ার পূর্বে হুজুরের (সা) খিদমতে হাজির হয়ে ইসলাম কবুল করেন। অতপর বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে শাহাদাতের পেয়ালা পান করেন। হুজুর (সা) তাঁর শাহাদাতের খবর শুনে বললেন, সে আমলতো করেছে কম, কিন্তু বদলা পেয়েছে অনেক বেশী।"

খন্দকের যুদ্ধে হযরত হুজায়ফার (রা) এক মহান সৌভাগ্য নসিব হয়েছিল। কাফেরদের বিরাট বাহিনী প্রায় একমাস মদীনা মুনাওয়ারা অবরোধ করে রেখেছিল। এমনি সময় এক রাতে ঘূর্ণিবায়ু শুরু হলো। সাথে আকাশে কালো মেঘ ছেয়ে গেল। বিদ্যুতের চমক এবং মেঘের গর্জনে অন্তর কাঁপছিল। এমন ঘুটঘুটে অন্ধকার পড়েছিল যে, নিজের হাত পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল না। এই ভয়াবহ ঝড়-বৃষ্টির তুফানে মুশরিকদের মারাত্মক ক্ষতিসাধিত হয়েছিল। তাঁদের তাঁবু উপড়ে পড়েছিল এবং হাড়ি-পাতিল চুলা থেকে উল্টে গিয়েছিল। এই আকস্মিক মুসিবতে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে মুশরিকরা মদীনা ত্যাগের ইরাদা করলো। ওদিকে মদীনা মুনাওয়ারাতে বিশ্ব নবী (সা) মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

"কে আছে এমন যে মুশরিক বাহিনীতে যাবে এবং তাদের গতিবিধি ও ইচ্ছার কথা জেনে এসে আমাকে অবহিত করবে। যে ব্যক্তি এই কাজ করবে আমি তাকে বেহেশতে আমার সঙ্গী হওয়ার সুসংবাদ প্রদান করছি।"

সে সময় অত্যন্ত ঠাণ্ডা ও তীব্র বাতাস বইছিল। হুজুর (সা) তিনবার এই বাক্য দোহরালেন। কিন্তু সকলেই পরস্পরের প্রতি চাওয়া চাওয়ি করতে লাগলো এবং কেউই সামনে এগিয়ে এলো না। চতুর্থবার হুজুর (সা) হযরত হুজায়ফার (রা) নাম নিয়ে বললেন, "হুজায়ফা (রা) যাও, এ কাজ তুমি কর। কিন্তু খবরদার কোন মুশরিকের ওপর হামলা করে বসবে না।"

আকায়ে নামদারের (সা) নির্দেশ পালনে হযরত হুজায়ফা (রা) অত্যন্ত দ্রুতগতিতে মুশরিক বাহিনীর দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন। সেখানে পৌঁছে এক আশ্চর্য ধরনের বিশৃংখল অবস্থা দেখতে পেলেন। প্রত্যেকেই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত ছিল। সেই বাহিনীর নেতা আবু সুফিয়ান পিঠে খুব আঘাত পেয়েছিল এবং

তাতে সে সেঁক দিচ্ছিল। ঘটনাক্রমে হযরত হুজায়ফা (রা) তাকে তাক করলেন। মন চাইলো তাকে নিজের তীরের নিশানা বানাবেন। কিন্তু হুজুরের(সা) হেদায়াতের কথা স্মরণে এসে গেলো এবং নিজের হাত গুটিয়ে নিলেন। মুশরিকদের দুরবস্থার খোঁজ-খবর নিয়ে তিনি হুজুরের (সা) খিদমতে ফিরে এলেন এবং সকল ঘটনা তনুমন দিয়ে আরজ করলেন। হুজুর (সা) তার কাজে খুব খুশী হলেন এবং তাঁর শরীরের ওপর নিজের কম্বল দিয়ে ঢেকে দিলেন। সফরের ক্লান্তি এবং ঠাণ্ডায় একদম অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। কম্বল জড়িয়ে সেখানেই বেখবর হয়ে শুয়ে পড়লেন। সকাল হলে সারওয়ারে কায়েনাত (সা) অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গে বললেন, "হে নিদ্রাগমনকারী এখন ওঠো।"

খন্দকের যুদ্ধের পর হযরত হুজায়ফা (রা) খায়বার, বাইয়াতে রেদওয়ান, মক্কা বিজয় এবং অন্যান্য যুদ্ধেও বীরত্বের সঙ্গে অংশ নেন। তিনি চলন, বলন এবং আদাত সকল বিষয়েই প্রিয় নবীর (সা) অনুকরণ করার প্রচেষ্টা চালাতেন। হুজুর (সা) পবিত্রতা অর্জন করতেন। এ সময় তিনি তাঁকে পানি দিতেন। হুজুরের (সা) সঙ্গে খাওয়ার সুযোগ হলে যতক্ষণ হুজুর (সা) শুরু না করতেন ততক্ষণ তিনি খাবারে হাত পর্যন্ত দিতেন না। হুজুরের (সা) খিদমতে হাজির হলে জোহর থেকে এশা পর্যন্ত তাঁর সুহবতে কাটাতেন। মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে আছে যে, একবার নবীয়ে আকরাম (সা) তাঁকে এশার পর নিজের হুজরা মুবারকে থামিয়ে নিজের সঙ্গে দাঁড় করিয়ে নফলের নিয়ত বাঁধলেন। সারারাত দুই রাকায়াতেই কেটে গেল। এমনকি হযরত বিলাল (রা) ফজরের আযান দিলেন এবং হুজুর তাঁকে সঙ্গে নিয়ে ফজরের নামাযের জন্য তাশরীফ নিলেন। সারওয়ারে আলম (সা) হযরত হুজায়ফাকে (রা) খুব ভাল বাসতেন। কোন কোন সময় তিনি তাঁর সঙ্গে একাকীত্বে আলোচনা করতেন। একবার হুজুর (সা) তাঁকে ইযারের সীমা বর্ণনা করলেন। এ সময় তিনি নিজের পবিত্র হাত দিয়ে তাঁর পায়ের গোছা স্পর্শ করেন। অন্য আরো একবার হুজুর (সা) লোকদের সামনে এমনভাবে তাশরীফ রাখলেন যে, হযরত হুজায়ফার (রা) বুকের সঙ্গে তিনি ঠেস দিয়েছিলেন। উম্মে হুজায়ফা (রা) হযরত রুবাবও (রা) অত্যন্ত নেকবখত স্ত্রী ছিলেন। তিনি প্রিয় নবীকে (সা) খুব গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতেন এবং চাইতেন যে, হুজায়ফা (রা) যেন বাকায়দা রাসূলের (সা) দরবারে হাজির হন। একবার ঘটনাক্রমে হযরত হুজায়ফা (রা) কিছু দিন হুজুরের (সা) খিদমতে হাজির হতে পারেননি। হযরত রুবাব (রা) একথা জানতে পেরে খুব অসন্তুষ্ট হলেন এবং তাঁকে তৎক্ষণাৎ হুজুরের (সা) খিদমতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিলেন। সে সময় সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছিলো।

তিনি দৌড়াতে দৌড়াতে গেলেন এবং মাগরিবের নামায হুজুরের (সা) পিছনে পড়লেন। নামায পড়ার পর হুজুর (সা) মসজিদ থেকে বের হলে হুজায়ফাও(রা) মাথা নীচু করে হুজুরের (সা) পিছনে পিছনে চললেন। কয়েক পা গিয়ে হুজুর (সা) পিছনে ফিরে তাকিয়ে দেখলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন কেঃ আরজ করলেন, "আপনার গোলাম হুজায়ফা।" তিনি বললেন, "আল্লাহ তোমাকে এবং তোমার মাকে মাগফিরাত দিন।" তারপর তিনি নবীর দরবারে অব্যাহতভাবে হাজেরী দেয়াটাকে অভ্যাস বানিয়ে নিয়েছিলেন। হুজুর (সা) তাঁকে এত স্নেহ করতেন এবং তাঁর ওপর এত আস্থা রাখতেন যে, অন্যরা তাতে ঈর্ষা করতো এবং তাঁরা তাঁকে "সাহিবুসসির রাসূলুল্লাহ" বলতেন।

মহানবীর (সা) ওফাতের পর হযরত হুজায়ফা (রা) বিদীর্ণ অন্তরে মদীনা মুনাওয়ারা থেকে ইরাক চলে গেলেন এবং সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করলেন। আল্লামা ইবনে আছির (র) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি সেই যুগেই আলজাযিরার নাসিবাইন শহরের জনৈকা মহিলাকে শাদী করেন এবং পুনরায় মাদায়েন চলে যান।

হযরত ওমর ফারুক (রা) তাঁকে খুব মানতেন। সিদ্দীকে আকবারের (রা) ইন্তেকালের পর তিনি যখন খলীফা নির্বাচিত হলেন এবং বিজিত এলাকাসমূহে গভর্ণর নিয়োগ করেন তখন হযরত হুজায়ফাকে (রা) দাজলার আশপাশের ব্যবস্থাপক নিয়োগ করেন। হুজায়ফা (রা) ফকির মানসিকতার মানুষ ছিলেন এবং ইমারতের সৌন্দর্য তাঁকে স্পর্শ পর্যন্ত করেনি। মোটাসোটা কাপড় পরতেন এবং খুব সাদাসিধেভাবে জীবন কাটাতেন। দাজলার আশেপাশের লোকেরা খুব খারাপ প্রকৃতির ও বিশ্বাসঘাতক ছিল। তারা হুজায়ফার (রা) ফকিরী ও মুখাপেক্ষীহীনতার ঠাট্টা-বিদ্রূপ করলো এবং সাহায্য করার পরিবর্তে তাঁর কাজে বিভিন্ন ধরনের বাধা আরোপ করলো। তাদের এই শত্রুতামূলক আচরণ ও নীচতা সত্ত্বেও হযরত হুজায়ফা (রা) তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতে লাগলেন। আল্লাহ পাক তাঁকে ব্যবস্থাপনার সার্বিক গুণাবলীই প্রদান করেছিলেন। তিনি ভূমি এবং উৎপাদন এত সুন্দরভাবে নির্ধারণ করলেন যে, সরকারের রাজস্ব আয় অনেক বেড়ে গেল। হযরত ওমর (রা) তাঁর এই কাজের কথা জানতে পেরে খুব খুশী হলেন এবং হযরত হুজায়ফার (রা) মর্যাদা তাঁর দৃষ্টিতে আরো কয়েকগুণ বেড়ে গেল।

১৮ হিজরীতে মুসলমানরা নাহাওয়ান্দের ওপর সামরিক অভিযানের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। সে সময় হযরত হুজায়ফা (রা) কুফা অবস্থান করছিলেন। হযরত ওমর (রা) তাঁকে কুফা থেকে মুজাহিদ বাহিনীসহ বের হয়ে নু'মান(রা) বিন

মুকরানের সাহায্যের জন্য পৌঁছতে চিঠি লিখলেন। কুজিস্তান বিজয়ী হযরত নু'মান (রা) অত্যন্ত কৌশলী ও জানবাজ সাহাবী ছিলেন এবং হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ ও সায়াদ (রা) বিন আবি ওয়াক্কাসের পাশাপাশি ইরাকের কয়েকটি যুদ্ধে নিজের বাহাদুরী এবং জীবন উৎসর্গের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছিলেন। হযরত ওমর ফারুক (রা) খুব চিন্তা-ভাবনা করে তাঁকে নাহাওয়ান্দ অভিযানের সিপাহসালার নিয়োগ করেছিলেন এবং সাহাবীদের (রা) সাধারণ সমাবেশে তাঁর ব্যাপারে এই ধারণা প্রকাশ করেছিলেন, "আল্লাহর কসম! সেই ব্যক্তির বুক সর্বাগ্রে বর্শার জন্য এগিয়ে দেয়া হবে।" কাদেসিয়ার পর নাহাওয়ান্দের যুদ্ধ ইরানের সকল যুদ্ধের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন যুদ্ধ ছিল। এ যুদ্ধে ইরান নিজের দেড় লাখ (অন্য রেওয়ায়াত অনুযায়ী দু'লাখ) যোদ্ধাকে আরবদের মুকাবিলায় এনে দাঁড় করিয়েছিল এবং এত জোরেশোরে যুদ্ধ প্রস্তুতি নিয়েছিল যে, চারদিকে তুফান সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। আল্লামা তাবারী (র) বর্ণনা করেছেন যে, ইরানীদের জবরদস্ত সমাবেশ এবং যুদ্ধ প্রস্তুতির প্রেক্ষাপটে হযরত ওমর (রা) স্বয়ং তাঁদের মুকাবিলায় গমন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু হযরত আলী কাররামাল্লাহ ওয়াজহাহু তাঁকে বাঁধা দিয়েছিলেন।

হযরত ওমরের (রা) হেদায়াত অনুযায়ী হুজায়ফা (রা) কুফা থেকে একটি নির্বাচিত বাহিনী নিয়ে বের হলেন এবং নু'মান (রা) বিন মুকরানের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হলেন। অন্য কতিপয় স্থান থেকেও সাহায্যকারী বাহিনী এসে উপস্থিত হলো। এমনিভাবে সকল সৈন্য মিলিয়ে ইসলামী বাহিনীর সংখ্যা দেড় লাখ ইরানীর মুকাবিলায় বেশী হলেও ত্রিশ হাজারে পৌঁছলো।

হযরত ওমর (রা) নু'মানকে (রা) এও লিখে পাঠিয়েছিলেন যে, এই যুদ্ধে খোদানাখাস্তা তুমি যদি কোন আকস্মিক দুর্ঘটনার শিকার হও তাহলে হুজায়ফা (রা) বিন ইয়ামান ইসলামী বাহিনীর সিপাহসালার হবেন। এদিকে ইরানীরা নাহাওয়ান্দে নিজেদের দুর্গ বন্ধ করে রেখেছিল। মুসলমানরা নাহাওয়ান্দের দিকে অগ্রসর হলে রাস্তায় কেউ তাদেরকে বাধা দিল না এবং তারা শহর থেকে দুই তিন মাইল দূরে তাঁবু স্থাপন করলো। এখন তারা অপেক্ষা করছিল যে, ইরানীরা কখন বাইরে বেরিয়ে তাঁদের মুকাবিলা করবে। কিন্তু কাদেসিয়া এবং অন্যান্য যুদ্ধে ইরানীদের যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল তাতে তারা প্রকাশ্যে মুসলমানদের মুকাবিলায় সাহস পাচ্ছিল না। অবশ্য কখনো-সখনো তাঁদের কোন দল চুরিচামারি ও গোপনে বাইরে বের হতো এবং মুসলমানদের কোন টহল দলের সাথে সামান্য কিছু সংঘর্ষের পর ফিরে যেতো। এমনিভাবে দুই মাস চলে গেল। এদিকে মুসলমানরা ইরানীদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। অবশেষে তাঁরা ইরানীদেরকে দুর্গের বাইরে আনার এক ফন্দি

আঁটলেন। এই ফন্দি অনুযায়ী একটি দল ছাড়া সকল সৈন্য একদিন তাঁবু উঠিয়ে পিছু হটে গেল। সেই দলটির নেতৃত্ব করছিলেন হযরত কা'কা' (রা) বিন আমর তামিমী। তিনি দলটিসহ শহরের দিকে অগ্রসর হলেন এবং নিকটে পৌঁছে দুর্গের চূড়া ও প্রাচীরের ওপর তীর বর্ষণ শুরু করে দিলেন। ইরানীরা নিজেদের গোয়েন্দা মারফত সব খবর পাচ্ছিল। তারা মনে করলো যে, মুসলমানরা পিছু হটে গেছে এবং শুধুমাত্র কয়েকজন পিছনে পড়ে রয়েছে। সুতরাং তারা শহরের দরজা খুলে বাইরে বের হয়ে এলো এবং কা'কা'র (রা) দলের ওপর হামলা করে বসলো। কা'কা' (রা) পূর্ব নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী কিছুক্ষণ অটলভাবে লড়াই করতে লাগলেন। অতপর আস্তে আস্তে পিছু হটতে শুরু করলেন। ইরানীরা তাঁর পিছু পিছু রওয়ানা হলো। যখন তারা শহর থেকে কিছু দূরে চলে এলো তখন হঠাৎ করে বড় ইসলামী বাহিনী তাদের সামনে আবির্ভূত হলো। বিরাট সংখ্যক ইরানী বাহিনীর জন্য তখন ফিরে যাওয়াও সম্ভব ছিল না। কেননা সারা রাস্তায় তারা নিজেরাই কাঁটা বিছিয়ে এসেছিল। বস্তুত সেই স্থানেই ইতিহাসের সেই রক্তাক্ত যুদ্ধ সংঘটিত হলো, যে যুদ্ধ অগ্নি উপাসক ইরানীদের ভাগ্যের ওপর চিরকালের জন্য মোহর অংকিত করে দিল। ঘোরতর যুদ্ধ চলছিলো। ঠিক এমন সময় যুদ্ধের ময়দানে হযরত নু'মান (রা) বিন মুকরানের ঘোড়া পা ফসকে পড়ে গেল এবং সেই সঙ্গে বৃষ্টির মত তীর এসে তাঁকে আঘাত করলো। এই তীরের আঘাতে তিনি শাহাদাত বরণ করলেন। হযরত ওমরের(রা) হেদায়াত অনুযায়ী তারপর হযরত হুজায়ফা (রা) আমীরে লশকর হলেন। হযরত নাঈম (রা) বিন মুকরান, সুয়াইদ (রা) বিন মুকরান, কা'কা' (রা) বিন আমর তামিমী, জারির (রা) বিন আবদুল্লাহ আল বাজালী, তোলায়হা (রা) বিন খুয়ায়েলদ, আমর (রা) বিন মাদি করব এবং আরো কয়েকজন আরব বাহাদুর স্ব স্ব দলের সঙ্গে তাঁর ডাইনে বাঁয়ে এবং সামনে ও পিছনে ছিলেন। তাঁরা সকলে মিলে ইরানীদের ওপর এত প্রচণ্ড বেগে হামলা চালালেন যে, সূর্য অস্ত যেতে যেতেই তারা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। ত্রিশ হাজার ইরানী যুদ্ধের ময়দানে লাশ হয়ে পড়ে রইলো এবং প্রায় ৮০ হাজার রাতের অন্ধকারে পালাতে গিয়ে পরিখায় পড়ে ধ্বংস হয়ে গেল। এই "ফাতহুল ফাতুহ" অর্থাৎ বিজয়সমূহের বিজয়ের পর হযরত হুজায়ফা (রা) স্ব বাহিনীর সঙ্গে শহরের দিকে অগ্রসর হলেন এবং কোন বাধা ছাড়াই তাতে প্রবেশ করলেন। শহরবাসী ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় শান্তি শান্তি বলে চেঁচাচ্ছিল। হযরত হুজায়ফা (রা) তাদেরকে বললেন, ভয় পেয়ো না। আমরা মুসলমানরা কোন নিরস্ত্র মানুষের ওপর হাত তুলি না। অতপর তিনি বালেগ ব্যক্তিদের ওপর সাধারণ ধরনের জিযিয়া নির্ধারণ করে সকলকে নিরাপত্তা দিয়ে দিলেন এবং

এই প্রতিশ্রুতিও দিলেন যে, তাদের ধন-সম্পদ ও ধর্মের ব্যাপারে কোন অন্তরায় সৃষ্টি করা হবে না। শহরবাসী এই উদার আচরণে এত খুশী হলো যে, শ্রদ্ধায় তাদের মাথা নত হয়ে গেল। হযরত হুজায়ফার (রা) নাহাওয়ান্দ অবস্থানকালে একদিন অগ্নি-পূজারীদের উপাসনাগারের জনৈক ধর্মবেত্তা তাঁর খিদমতে উপস্থিত হলো এবং অত্যন্ত মূল্যবান মণিমুক্তায় ভর্তি দু'টি সিন্দুক তাঁকে দিলেন। হযরত হুজায়ফা (রা) এসব মণিমুক্তা স্পর্শ পর্যন্ত করলেন না এবং তা সব গনিমতের মালের পঞ্চমাংশসহ হযরত ওমর ফারুকের (রা) খিদমতে মদীনা মুনাওয়ারাতে পাঠিয়ে দিলেন। ফারুকে আজম (রা) এসব মণিমুক্তা বাইতুলমালে দাখিল করানো পসন্দ করলেন না এবং তা একটি হেদায়াতসহ হযরত হুজায়ফার(রা) নিকট ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। হেদায়াতে তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে, এসব মণিমুক্তা বিক্রয় করে যে অর্থ পাওয়া যাবে তা মুজাহিদদের মধ্যে বন্টন করে দিতে হবে। হুজায়ফা (রা) মণিমুক্তাসমূহ চার কোটি দিরহামে বিক্রয় করেন এবং সকল অর্থ মুজাহিদদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন।

নাহাওয়ান্দ বিজয়ের পর হযরত হুজায়ফা (রা) আজারবাইজানে সেনা অভিযান চালালেন এবং এক কঠিন যুদ্ধের পর তাকে ইসলামী শাসনাধীনে আনলেন। অতপর তিনি সওকান এবং জিলান পদানত করলেন ও আরো সামনে অগ্রসর হওয়ার চিন্তা করছিলেন ঠিক এই সময় হযরত ওমর (রা) তাঁকে সামরিক দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে মাদায়েনের গভর্ণর নিয়োগ করলেন।

হযরত হুজায়ফা (রা) প্রকৃত অর্থে "আল ফাকরু ফাখরী" অর্থাৎ দারিদ্রতা আমার গৌরব-এর নমুনা ছিলেন। অবশ্য 'আল ফাকরু ফাখরী" উক্তিটি কোন হাদিস নয়। এটা কোন ব্যক্তির মশহুর উক্তি।

তিনি একটি টাট্টু ঘোড়ায় খালি পিঠে সওয়ার হয়ে সাধারণ পোশাক পরে মাদায়েনে প্রবেশ করলেন। শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ নিজেদের নতুন গভর্ণরকে ইসতিকবালের জন্য শহরের বাইরে একত্রিত হয়েছিলেন। কিন্তু হযরত হুজায়ফা (রা) তাদের সামনে দিয়ে অতিক্রম করে গেলো। অথচ তারা তা টেরও পেলো না যে, মাদায়েনের গভর্ণর শহরের মধ্যে পৌঁছে গেছেন। অপেক্ষা করতে করতে যখন অনেক সময় কেটে গেল তখন তারা মুসলমানদেরকে জিজ্ঞেস করলো যে, শহরের নতুন গভর্ণরের আসার কথা ছিল। এখনো তিনি এলেন না কেন? মুসলমানরা বললো, তিনি তো সবেমাত্র তোমাদের সামনে দিয়ে শহরের মধ্যে পৌঁছে গেলেন। একথা শুনে শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ বিস্মিত হলেন।

কিছুক্ষণ পর হযরত হুজায়ফা (রা) সকল মুসলমান ও মাদায়েনবাসীকে একত্রিত করলেন এবং তাদের সামনে আমীরুল মু'মিনীনের ফরমান পাঠ করে শুনালেন। তাতে লিখা ছিল :

"হুজায়ফা (রা) বিন ইয়ামানকে তোমাদের আমীর নিয়োগ করা হলো। তাঁর নির্দেশ শোনো এবং তাঁর আনুগত্য কর এবং তিনি যা কিছু তোমাদের নিকট চান তা তাঁকে দেবে।"

তিনি যখন ফরমান পাঠ শেষ করলেন তখন চার দিক থেকে আওয়াজ উঠলো, "আপনি আপনার প্রয়োজনের কথা বর্ণনা করুন আমরা তা পূরণ করবো।"

হযরত হুজায়ফা (রা) দারিদ্রের শীর্ষদেশে ছিলেন। তিনি বললেন :

"শুধু আমার পেটের জন্য খাদ্য এবং গাধার জন্য খাবার চাই। আমি যতক্ষণ এখানে থাকবো এর অতিরিক্ত তোমাদের নিকট কিছু চাইবো না।" এবং বাস্তবিকই হযরত হুজায়ফা (রা) নিজের কথা পূর্ণ করে দেখিয়ে ছিলেন। যতদিন মাদায়েনে ছিলেন ততদিন তিনি ফকিরী অবস্থাতেই ইমারাত চালিয়েছেন। একটি সাধারণ ছাপ্পরে থাকতেন এবং সওয়ারীর জন্য সবসময় গাধা ব্যবহার করতেন। লোকদেরকে সবসময় ফিতনার স্থান থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দিতেন। একবার লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, "হযরত! ফিতনার স্থান কোনটি?" তিনি বললেন, "আমীর এবং শাসকদের দরজা। লোকেরা আমীরদের নিকট গমন করে। তাদের ভুল কথা সমর্থন করে এবং তাদের অযাচিত প্রশংসা করে। এটাইতো ফিতনা।"

একবার হযরত ওমর (রা) কিছু অর্থ প্রেরণ করলেন। এই অর্থের সবটুকুনই অভাবগ্রস্তদের মধ্যে বন্টন করে দেন। এমনিভাবে যখনই তিনি বেতন পেতেন তখনই পানাহারের বস্তু খরিদ করার জন্য কিছু দিরহাম নিজের কাছে রেখে দিতেন এবং অবশিষ্ট সব আল্লাহর পথে ব্যয় করতেন। সাদাসিধে জীবন ও শরীয়তের আহকাম পালনে তিনি কতখানি একনিষ্ঠ ছিলেন তা এই ঘটনা থেকেই অনুমান করা যায়।

একবার পানের জন্য পানি চাইলেন। একজন সরদার রূপার পাত্রে পানি এনে দিলেন। তিনি বিরক্তি সহকারে তা নিক্ষেপ করলেন এবং বললেন :

"আমি কি তোমাদেরকে বার বার সতর্ক করিনি যে রাসূলুল্লাহ (সা) সোনা ও রূপার পাত্রে পানাহার নিষেধ করেছেন।"

কিছুদিন পর খিলাফতের দরবার থেকে ডেকে পাঠানো হলে নিজের ফকিরী অবস্থাতেই তিনি মদীনা পৌঁছেন। হযরত ওমর (রা) রাস্তায় চুপিসারে বসেছিলেন। তিনি যখন দেখলেন যে তিনি যে অবস্থায় মদীনা থেকে গিয়েছিলেন সেই অবস্থাতেই ফিরে এসেছেন।

তখন তিনি ভালবাসার আতিশয্যে তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন এবং বললেন ঃ

"হুজায়ফা (রা) তুমি আমার ভাই এবং আমি তোমার ভাই।" তারপর তিনি তাকে সেই পদে বহাল রাখলেন। ইমারাত পরিচালনকালীন অবস্থায় হযরত হুজায়ফার (রা) গরীবী অবস্থা হযরত ওমর ফারুকের (রা) খুব পসন্দনীয় ছিল। আল্লামা ইবনে আছির (র) বর্ণনা করেছেন যে, একবার হযরত ওমরের(রা) নিকট কয়েকজন সাহাবী একত্রিত ছিলেন তিনি তাদেরকে স্ব স্ব ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করতে বললেন। সবাই বললেন, কোন অমূল্য ধনাগার যদি পেতাম তাহলে তা আল্লাহর পথে লুটিয়ে দিতাম। হযরত ওমর (রা) বললেনঃ

"আমিতো আবু ওবায়দাহ (রা), মায়াজ (রা) বিন জাবাল ও হুজায়ফা (রা) বিন ইয়ামানের মত মানুষ পেতে চাই এবং তাদেরকে দেশের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত করাতে চাই।

ফারুকে আজমের (রা) পর হযরত উসমান গনিও (রা) হযরত হুজায়ফাকে (রা) মাদায়েনের গভর্ণর পদে বহাল রাখলেন। কিন্তু দীর্ঘদিন যাবত তার অন্তর জিহাদে গমনের জন্য অস্থির হয়ে উঠেছিল। বস্তুত তিনি ৩০ হিজরীতে ইমারাতের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিয়ে খোরাসান পদানত করার জন্য গমনকারী সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। খোরাসান বিজয়ের পর তিনি রে এবং আরমেনিয়ার যুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শন করেন। অতপর ৩১ হিজরীতে খাকানে খিজরের বিরুদ্ধে যে অভিযান প্রেরণ করা হয় তাতে অংশ নেন। এমনিভাবে সেই যুদ্ধে সংঘটিত অন্যান্য যুদ্ধেও একাত্ম হয়ে অংশ নেন। আল্লামা তাবারী বর্ণনা করেছেন যে, হযরত উসমান (রা) বাব পদানত করার জন্য তিনবার সৈন্য প্রেরণ করেন। প্রতিবারই তার নেতৃত্ব দেন হযরত হুজায়ফা (রা)। হযরত উসমানের (রা) খিলাফতের শেষদিকে তিনি পুনরায় মাদায়েনের গভর্ণরী পদে ফিরে আসেন এবং এখানেই ৩৫ হিজরীতে হযরত উসমানের (রা) শাহাদাতের ৪০ দিন পর পরপারে যাত্রা করেন। জীবনের শেষ দিনগুলোতে প্রায়ই ইস্তিগফার ও আল্লাহর নিকট কান্নাকাটিতে মশগুল থাকতেন। লোকজন কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ঃ

'দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্য আমার দুশ্চিন্তা নেই। আমিতো মৃত্যুকে স্বাগত জানাই। আখিরাতের কারণে আমি কেঁদে থাকি। জানি না, সেখানে

আমার সঙ্গে কেমন ধরনের ব্যবহার করা হবে। মৃত্যুকালীন সময়ে তাঁর মুখ দিয়ে উচ্চারিত হচ্ছিল। "হে আল্লাহ। তোমার সঙ্গে আমার মুলাকাত যেন মুবারাক হয়। আমি দুনিয়া ও তার মধ্যকার সব বস্তু থেকে তোমাকে ভালবাসি।"

ওফাতের পূর্বে হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুর বাইয়াত এবং নিজের পুত্রদেরকেও তার আনুগত্য করার ওসিয়ত করেছিলেন। সুতরাং তাঁর দুই পুত্র সিফফিনের যুদ্ধে হযরত আলীর (রা) পক্ষে থেকে লড়াই করে শহীদ হন।

আল্লামা ইবনে সায়াদ (র) বর্ণনা করেছেন, মৃত্যুকালে হযরত হুজায়ফা (রা) চার পুত্র রেখে যান। তাঁরা হলেন, আবু ওবায়দা, বিলাল, সাফওয়ান এবং সাঈদ।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (র) বলেছেন, হযরত হুজায়ফা (রা) মধ্যাকৃতির মানুষ ছিলেন। সামনের সারির দাঁত ছিল খুব চমকদার ও সুন্দর। তা থেকে যেন আলোর বিচ্ছুরণ ঘটতো। দৃষ্টিশক্তি এতো তীব্র ছিল যে অন্ধকার রাতেও তীরের নিশানা দেখে নিতে পারতেন।

হযরত হুজায়ফা (রা) মর্যাদাবান সাহাবীদের অন্যতম ছিলেন এবং মুসলমানদের সকল থটস অব স্কুলই তাঁর মর্যাদা, ইলম, ফজিলত ও যুহদ এবং তাকওয়ার কথা বলে থাকেন। কুরআন, হাদিস এবং ফিকাহ হতে সমুদ্রের গভীরতা রাখতেন। আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ুতী (র) "ইতকানে" ওবায়েদের (রা) কিতাব আল কিরাআতের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যে, "হুজায়ফা (রা) নবী যুগের অন্যতম হাফেজে কুরআন ছিলেন। রাসূলে আকরাম (সা) তাঁকে মুনাফিকদের নাম বিশেষভাবে বলে দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি কখনো কোন মুনাফিকের নাম লোকদেরকে বলেননি। এ জন্য লোকেরা তাঁকে সাহিবে সিররে রসূলুল্লাহ (সা) বলতো।" শারহে ইহইয়াউল উলুমে আছে যে, হুজায়ফা (রা) কোন মুনাফিকের নামতো বলতেন না। অবশ্য এটা বলে দিতেন যে, বর্তমানে এতজন মুনাফিক জীবিত আছে। ইসতিয়াবের লিখক হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ওমর ফারুক (রা) একটি মাপকাঠি ঠিক করেছিলেন। তাহলো যে ব্যক্তির জানাযায় হুজায়ফা (রা) শরীক হতেন তাতে তিনিও শরীক হতেন এবং তিনি যদি কোন ওজর ছাড়া শরীক না হতেন তাহলে হযরত ওমরও (রা) জানাযায় যেতেন না এবং মনে করতেন যে, মৃত ব্যক্তি মুনাফিকদের দলভুক্ত ছিলো।

হযরত হুজায়ফা (রা) থেকে একশ'র কিছু বেশী হাদিস বর্ণিত আছে। শাসনকাজের জন্য তিনি খুব কমই ফুরসত পেতেন। কিন্তু যখনই সুযোগ পেতেন তখনই লোকদেরকে হাদিস শিক্ষা দিতেন। লোকেরা তাঁকে খুবই সম্মান করতো। শিক্ষার মজলিসে উঁচু কণ্ঠে অথবা কানাঘুষা করার মত সাহস কারোরই হতো না। তার হাদিস বর্ণনাকারীদের মধ্যে হযরত জাবের(রা) বিন আবদুল্লাহ আনসারী, আবুত তোফায়েল (রা), আবদুল্লাহ (রা) বিন ইয়াযিদ খাতমী, রাবয়ী (রা) বিন খারাশ, আবু ইদরিস গাওলানী (র), যার বিন হুবায়েশ (র), আবু ওয়ায়েল (র), আবদুর রহমান বিন আবি লায়লা এবং হুমাম (র) ইবনুল হারিছের মত জালিলুল কদর সাহাবী এবং তাবেয়ী অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

একবার রাসূলে আকরাম (সা) সাহাবায়ে কিরামের (রা) এক মাজমাতে কিয়ামত পর্যন্তকার সকল ফিতনার কথা বর্ণনা করলেন। হযরত হুজায়ফাও(রা) সেই মাজমাতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি হুজুরের (সা) এই খুতবা সবসময় স্মরণ রেখেছিলেন এবং এমন এক সময় এলো যে, লোকজন এই বিষয়ে হুজুরের (সা) ইরশাদসমূহের জ্ঞান শুধুমাত্র হযরত হুজায়ফার (রা) মাধ্যমেই পেতো। কেননা সেই মজলিসে উপস্থিত অন্যান্য সাহাবী এক এক করে ওফাত পেয়েছিলেন। সহীহ বুখারীতে আছে যে, অন্যান্য সাহাবীর (রা) উল্টো হযরত হুজায়ফা (রা) রাসূলে আকরামের (সা) নিকট খারাপ বস্তুসমূহের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতেন। এর কারণ হিসেবে তিনি বলতেন যে, হুজুর (সা) যে বস্তুকে খারাপ বলবে আমি তা থেকে চিরকালের জন্য বেঁচে থাকবো।

হযরত হুজায়ফা (রা) সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজ থেকে বিরত রাখার বিশেষ ব্যবস্থা করতেন। একবার এক ব্যক্তিকে খুব তাড়াতাড়ি নামায পড়তে দেখলেন। সে সালাম ফেরালে বললেন, এটা নামায পড়ার পদ্ধতি নয়। যদি এভাবে মারা যাও তাহলে ইসলামের ওপর থেকে মৃত্যুবরণ করবে না। অতপর তাকে নামায পড়ার পদ্ধতি বর্ণনা করলেন এবং রুকূ ও সিজদাতে ভারসাম্য রক্ষা ও ছোট কেরায়াত পড়ার কথা বললেন।

একবার কিছু মানুষকে ফজুল কথা বলতে দেখলেন। বললেন, "এমন কথা থেকে পরহেজ করো। কেননা হুজুরের (সা) যমানায় এ ধরনের আলোচনা নিফাকের মধ্যে পরিগণিত হতো।"

মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বলে (র) আছে, একবার হযরত আবু মূসা আশয়ারী (রা) চূড়ান্ত সতর্কতা অবলম্বনের জন্য শিশিতে পেশাব করা শুরু

করলেন। তাঁর ভয় ছিলো যে, ফোঁটা বাইরে পড়ে না যায়। হযরত হুজায়ফা(রা) একথা জানতে পেরে তাঁকে নিষেধ করলেন এবং বললেন, "এত কঠোরতা ইসলামী চেতনার পরিপন্থী।"

হযরত হুজায়ফার (রা) নামায ও রোযার প্রতি বিশেষ আকর্ষণ ছিল। দারিদ্র ও অভুক্ত থাকাকে খুব পসন্দ করতেন এবং লোকদেরকে আমীরদের নিকট যেতে নিষেধ করতেন। দুনিয়ার ব্যবস্থা খুব অপসন্দ করতেন এবং অনেক সময় বলতেন, মন চায় দরজা বন্ধ করে বসে থাকি ও কারোর সঙ্গে দেখা না করি। আর এই অবস্থাতেই স্রষ্টার নিকট গিয়ে উপস্থিত হই।

হযরত খাব্বাব (রা)

বিন আরাত

সাইয়েদেনা হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু সিফ্‌ফিনের যুদ্ধের পর (৩৭ হিজরীতে) রাজধানী কুফায় ফিরে এলেন। এ সময় শহরের বাইরে সাতটি কবরের ওপর তাঁর দৃষ্টি পড়লো। লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, "এসব কাদের কবর। আমরা যখন কুফা থেকে গিয়েছিলাম তখন তো এখানে কোন কবর ছিল না।"

জওয়াব এলো, "আমীরুল মু'মিনীন এই প্রথম কবর হলো খাব্বাব (রা) বিন আরাতের। তাঁর ওসিয়ত অনুসারেই সর্বপ্রথম এখানে দাফন করা হয়। অবশিষ্ট কবরগুলো অন্যদের। তাঁদের আত্মীয়রা তাঁদেরকে খাব্বাবের (রা) পরে এখানে দাফন করেছেন।"

এই জবাব শুনে শেরে খোদার (রা) চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠলো এবং সমকালীন সময়ের শ্রেষ্ঠ মানুষের মুখ দিয়ে অবলীলাক্রমে বের হয়ে এলো ঃ

"খাব্বাবের ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। তিনি স্বেচ্ছায় ও আনন্দ চিত্তে ইসলাম গ্রহণ করেন। নিজের খুশীতে হিজরত করেন। সারা জীবন জিহাদে কাটান এবং হক পথে প্রচণ্ড মুসিবত সহ্য করেন। আল্লাহ তায়ালা নেক্‌কারদের আমল নষ্ট করেন না।"

একথা বলে তিনি কবরগুলোর খুব নিকটে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত হযরত খাব্বাব (রা) ও অন্যান্য কবরবাসীর জন্য মাগফিরাত কামনা করলেন। এই খাব্বাব (রা) বিন আরাত যার কবর দেখে "আসাদুল্লাহ আল গালিব" অশ্রুসিক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি তো সেই ব্যক্তি ছিলেন যিনি ইতিহাসের পাতায় নিজের দৃঢ় সংকল্প ও অটলতার এমন চিহ্ন এঁকে দিয়েছিলেন যা ঈমানদারদের জন্য পথের মশাল হয়ে রয়েছে। অর্ধশতাব্দী পূর্বে এক গরীবুল ওয়াতান বা উদ্বাস্তু এবং অসহায় গোলাম হওয়া সত্ত্বেও তিনি এমন এক পথ অবলম্বন করেছিলেন যাতে শুধু কাঁটা আর কাঁটাই বিছানো ছিল এবং পদে পদে মানবরূপী নেকড়েরা সেই পথের মুসাফিরদেরকে ছিন্ন- ভিন্ন করে ভক্ষণের জন্য ওঁৎ পেতে বসেছিল। এই পথ ছিল "হক পথ" এবং খাব্বাব (রা) সেই পথে এমন এমন লোমহর্ষক মুসিবত সহ্য করেছিলেন যে, তাঁর

অবস্থা শ্রবণ করে বড় বড় জালিলুল কদর সাহাবীও (রা) অস্থির হয়ে পড়তেন এবং হযরত খাব্বাবের (রা) ঈমানী জোশ ও সবর এবং অটলতার প্রশ্নে ঈর্ষা করতেন। এই খাব্বাবতো (রা) তিনিই ছিলেন যিনি ওমর ফারুকের (রা) খিলাফতকালে একদিন আমীরুল মু'মিনীনের সঙ্গে সাক্ষাত করতে গেলে ফারুকে আজম (রা) সম্মানার্থে তাঁকে নিজের আসনে বসালেন এবং লোকদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

"খাব্বাব ছাড়া আর শুধু এক ব্যক্তিই আছেন যিনি এই আসনে বসার যোগ্য।"

হযরত খাব্বাব (রা) জিজ্ঞেস করলেন, "আমীরুল মু'মিনীন, সেই ব্যক্তি কে?"

বললেন "বিলাল (রা) বিন রাবাহ।"

তিনি আরজ করলেন, "আমীরুল মু'মিনীন, বিলালের (রা) মর্যাদা আমার সমান কি করে হতে পারে। মুশরিকদের মধ্যে কয়েকজন তাঁর সাহায্যকারীও ছিলো। যাদের মাধ্যমে আল্লাহ তাঁকে বাঁচিয়ে নিতেন। কিন্তু আমার তো কোন জিজ্ঞেসকারীও ছিল না। অতপর তিনি নিজের হৃদয়বিদারক মুসিবতের কাহিনী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করলেন। তাতে ফারুকে আজম (রা) এবং মজলিসে উপস্থিত অন্যান্যদের চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠলো। সেই খাব্বাব (রা) আজ মণকে মণ মাটির নীচে স্বপ্নে বিভোর ছিলেন এবং হায়দারে কাররার (রা) তাঁর কবরের পাশে দুঃখ ভারাক্রান্ত চিত্তে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর চোখে ছিল অশ্রু এবং মুখে ছিল হযরত খাব্বাবের (রা) ফজিলত ও প্রশংসা এবং মাগফিরাতের দোয়া। আল্লাহ, ওমর ফারুক (রা) এবং আলী হায়দারের (রা) মত মহান মানুষ যে মরদে মুমিনের ফজিলতের স্বীকৃতিদানকারী ও প্রশংসাকারী হন তাঁর উচ্চ মর্যাদার আন্দাজ কে করতে পারে?

সাইয়্যেদেনা আবু আবদুল্লাহ খাব্বাব (রা) বিন আরাত বনু তামিম গোত্রভুক্ত ছিলেন। তাঁর নসবনামা হলো ঃ খাব্বাব (রা) বিন আরাত বিন জুনদলা বিন সায়াদ বিন খাযিমা বিন কায়াব বিন সায়াদ বিন যায়েদ মানাত বিন তামিম। যদিও কতিপয় রেওয়ায়াতে তাঁকে খাযায়ী বলা হয়েছে কিন্তু তিনি তামিমী গোত্রভুক্ত ছিলেন। এই বক্তব্যই সঠিক। জাহেলী যুগে তাঁর খান্দানের ওপর কি আপদ আপতিত হয়েছিল তা জানা যায়নি। সে সময় তাঁকে গোলাম বানিয়ে মক্কায় বিক্রয় করা হয়। তাঁর মালিকের ব্যাপারে দুই ধরনের রেওয়ায়াত পাওয়া যায়। এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী উতবা (রা) বিন গাযওয়ান তাঁকে ক্রয় করেছিলেন এবং দ্বিতীয় রেওয়ায়াত মতে তিনি উম্মে আনমার বিনতে সাবায়ুল

খাযায়ীয়ার গোলাম ছিলেন। আমাদের অনুসন্ধান অনুযায়ী দ্বিতীয় রেওয়ায়াতই সঠিক। উতবাহ (রা) বিন গাযওয়ানের এক গোলামের নাম নিসন্দেহে খাব্বাব (রা) ছিল। কিন্তু তিনি দ্বিতীয় আরেক ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর কুনিয়াত ছিল আবু ইয়াহিয়া এবং তিনি ১৭ হিজরীতে ওফাত পান। পক্ষান্তরে হযরত খাব্বাব (রা) বিন আরাতের কুনিয়াত ছিল আবু আবদুলাহ এবং তিনি ৩৭ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। উভয়েই জালিলু কদর সাহাবী ছিলেন এবং মহানবীর (সা) সঙ্গে সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এ জন্য কতিপয় নেতৃস্থানীয় চরিতকার হযরত খাব্বাব (রা) বিন আরাত এবং উতবা (রা) বিন গাযওয়ানের মুক্তিদানকৃত গোলাম হযরত খাব্বাবের (রা) মধ্যে পার্থক্য সাধন করতে পারেননি। এ জন্য উভয়কেই একই ব্যক্তিত্ব মনে করেছেন।

মক্কা পৌঁছে হযরত খাব্বাব (রা) বিন আরাত কর্মকারের পেশা গ্রহণ করেন এবং তরবারী বানিয়ে বিক্রয় করতে লাগলেন। এমনিভাবে তিনি বেশ আয় করছিলেন এবং খুব মজার সাথেই জীবন অতিবাহিত করছিলেন। সেই যুগেই কোন মাধ্যমে তাঁর কানে তাওহীদের দাওয়াতের আওয়াজ এসে পৌঁছে। সে সময় পর্যন্ত শুধু মাত্র পাঁচজন সৌভাগ্যবান ব্যক্তিত্ব ইসলাম কবুল করেছিলেন। হযরত খাদিজাতুল কুবরা (রা), হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা), হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু (রা), হযরত যায়েদ (রা) বিন হারিছা এবং হযরত আবু জার গিফারী (রা)। মক্কার পরিস্থিতি তখন খুব ভীতিজনক ছিল এবং মুশরিকরা ইসলামের নামও শুনতে পারতো না। বাস্তবত সে সময় ইসলাম গ্রহণ করাটা ভয়াবহ মুসিবত ডেকে আনার নামান্তর ছিল এবং নামকরা মানুষও তাওহীদের ঝাণ্ডা উড্ডয়নে মুশরিকদের ক্রোধ থেকে বাঁচতে পারতো না। খাব্বাব (রা) ছিলেন একজন উদ্বাস্তু ও বন্ধু-বান্ধবহীন গোলাম। কিন্তু আল্লাহপাক তাঁকে অত্যন্ত পবিত্র স্বভাব ও বাঘের অন্তর দান করেছিলেন। হকের আওয়াজ কানে পৌঁছতেই তিনি পরিণামের কথা চিন্তা না করেই বেপরওয়া হয়ে সেই দাওয়াতে সাড়া দানে কুণ্ঠাবোধ করলেন না। আর এমনিভাবে তিনি সাবিকুনাল আউয়ালুনের পবিত্র দলের "৬ষ্ঠ মুসলমান" হওয়ার মহান মর্যাদা ও লকবের গৌরবে গৌরবান্বিত হন। হযরত খাব্বাবের (রা) নিকট পরিস্থিতির ভয়াবহতা অস্পষ্ট ছিল না। কিন্তু তিনি নিজের ইসলাম গ্রহণের কথা একদিনের জন্যও গোপন করে রাখেননি। যেই তিনি নিজের ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করলেন, তেমনি কাফেরদের ক্রোধাগ্নি তাঁর ওপর আপতিত হলো। তারা অসহায় খাব্বাবের (রা) ওপর এমন পাশবিক নির্যাতন চালালো যে মানবতা ও শরাফত মুখ থুবড়ে পড়লো। তারা তাঁর কাপড় খুলে তপ্ত আগুনের ওপর শুইয়ে দিত এবং বুকের ওপর রাখতো ভারী

পাথর। কখনো আগুনের ওপর শুইয়ে বিরাট বপুর কোন ব্যক্তি তাঁর বুকের ওপর বসে যেতো। যাতে তিনি পাশ ফিরতে না পারেন। খাব্বাব (রা) ধৈর্য ইসতাকামাত বা অটলতার সাথে সেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ওপর কাবাব হতেন। এমনকি ক্ষতস্থানসমূহ থেকে রক্ত পুঁজ গলে গলে সেই আগুনকে ঠাণ্ডা করে দিত। এমন ভয়াবহ নির্যাতন সত্ত্বেও তাঁর সামান্যতম পদস্খলন ঘটেনি। এমনিভাবে নির্যাতন সইতে সইতে কিছু দিন অতিবাহিত হওয়ার পর একদিন ফরিয়াদ নিয়ে প্রিয় নবীর (সা) খিদমতে উপস্থিত হলেন। সহীহ বুখারীতে আছে যে, হুজুর (সা) সে সময় কাবার প্রাচীরের ছায়ায় শুয়ে ছিলেন। খাব্বাব(রা) হুজুরের (সা) নিকট আরজ করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল। আপনি আল্লাহ পাকের নিকট আমাদের জন্য দোয়া করেন না কেন?" একথা শুনে হুজুর (সা) উঠে বসলেন। তাঁর পবিত্র চেহারা লাল হয়ে গেল এবং বললেন ঃ

"তোমাদের পূর্বে অতীতকালে এমন লোকও ছিলেন যাঁদের গোশত লোহার চিরনী দিয়ে আঁচড়িয়ে নেয়া হয়েছে। হাড় ব্যতীত তাদের আর কিছুই রাখা হয়নি। এত কঠোরতা সত্ত্বেও তাদের দীনী ই'তিকাদ বা বিশ্বাস সামান্যতম এদিক ওদিক হয়নি। তাঁদের মাথার ওপর করাত চালানো হয়েছে। করাত দিয়ে মাঝখান দিয়ে চিরে দুইভাগ করে দেয়া হয়েছে। তা সত্ত্বেও তাঁরা দীন পরিত্যাগ করেননি। আল্লাহ এই দীনকে অবশ্যই সফল করবেন এবং তোমরা দেখবে যে সওয়ার একাকী সানায়া (ইয়েমেন) থেকে হাজরা মাওত পর্যন্ত গমন করবে এবং আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করবে না।"

হুজুরের (সা) ইরশাদ শুনে হযরত খাব্বাবের (রা) সাহস কয়েকগুণ বেড়ে গেল এবং চুপচাপ নিজের বাড়ী চলে গেলেন।

হযরত খাব্বাবের (রা) মালিক উম্মে আনমারও খুব কঠোর অন্তরের মহিলা ছিল। আল্লামা ইবনে সায়াদ (র) বর্ণনা করেছেন যে, সে হযরত খাব্বাবের (রা) ইসলাম গ্রহণের শাস্তি স্বরূপ কখনো লোহার যিরাহ পরিধান করিয়ে রোদে শুইয়ে রাখতো এবং কখনো উত্তপ্ত লোহা দিয়ে তাঁর মাথায় দাগ দিতো। রহমতে আলম (সা) উম্মে আনমারের নির্যাতনের অবস্থা শুনে খুব বিষণ্ন বোধ করতেন। তিনি খাব্বাবকে (রা) খুশী করার চেষ্টা করতেন। সেই হতভাগিনী যখন হুজুরের (সা) এই চেষ্টার কথা জানতে পেতো তখন সে খাব্বাবের (রা) ওপর আরো কঠোরভাবে জুলুম-নির্যাতন শুরু করতো। যখন তার জুলুমের আর সীমা পরিসীমা রইলো না, তখন হযরত খাব্বাব (রা) সারওয়ারে আলমের (সা) খিদমতে হাজির হয়ে আবেদন জানালেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল! দোয়া করুন, যাতে আল্লাহ তায়ালা আমাকে এ আজাব থেকে মুক্তি দেন।"

হুজুর (সা) দোয়া করলেন, "হে আল্লাহ! খাব্বাবকে (রা) সাহায্য কর।"

আল্লামা ইবনে আছির লিখেছেন, হুজুরের (সা) দোয়ার পর উম্মে আনমারের মাথায় এমন কঠিন ব্যথা হওয়া শুরু হলো যে, কোনভাবেই তা কমতো না এবং সে কুকুরের মত ডাকতো। লোকজন বললো, যতক্ষণ পর্যন্ত লোহা দিয়ে তোমার মাথায় দাগ দেয়া না হবে ততক্ষণ ব্যথা কমবে না। উম্মে আনমার কঠিন ব্যাথায় ছটফট করছিলো। সে হযরত খাব্বাবকেই (রা) এ দায়িত্ব অর্পণ করলো যে সে যেন গরম লোহা দিয়ে তার মাথায় দাগ দেয়। বস্তুত যে গরম লোহা হযরত খাব্বাবের (রা) ওপর ব্যবহৃত হতো তা তার ওপর ব্যবহৃত হলো। কিন্তু এই চিকিৎসা সত্ত্বেও তার কোন উপকার হলো না এবং কিছু দিন পর সে তড়পাতে তড়পাতে মারা গেল।

মুশরিকরা হযরত খাব্বাবকে (রা) দৈহিক শাস্তি দিয়েই ক্ষান্ত হলো না বরং তার আর্থিক ক্ষতি করার জন্য প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতেও কুণ্ঠিত হলো না। মশহুর মুশরিক আছ বিন ওয়ায়েল হযরত খাব্বাবের (রা) নিকট কিছু অর্থ ধারতো। তিনি যখন সেই ঋণের অর্থ চাইতেন তখন আছ বলতো, "যতক্ষণ তুমি মুহাম্মাদের (সা) দীন ত্যাগ না করবে ততক্ষণ এক কড়িও দেবো না।" খাব্বাব (রা) বলতেন, "যতক্ষণ তুমি দ্বিতীয়বার জীবিত হয়ে এই দুনিয়ায় না আসবে ততক্ষণ আমি মুহাম্মাদের (সা) আঁচল ছাড়তে পারবো না।"

আছ বলতো, "তাহলে অপেক্ষা করতে থাকো। আমি যখন মরে দ্বিতীয়বার জীবিত হবো এবং নিজের সম্পদ সন্তানদের জন্য খরচের পর তোমার ঋণ পরিশোধ করবো।"

আছের এই বক্তব্য মুসলমানদের হাশর, নাশর এবং পরকালের প্রতি, ঈমানের প্রতি এক ধরনের ব্যঙ্গ ছিল। সহীহ বুখারীতে এই ঘটনা সম্পর্কে কুরআনে হাকিমের এই আয়াত নাযিল হয়,

اَفَرَءَيْتَ الَّذِىْ كَفَرَ بِاٰيٰتِنَا وَقَالَ لَاُوْتَيَنَّ مَالاً وَّوَلَدًا – اَطَّلَعَ الْغَيْبَ اَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا – كَلاَّ سَنَكْتُبُ مَا يَقُوْلُ وَنَمُدُّ لَهٗ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا – وَّنَرِثُهٗ مَا يَقُوْلُ وَيَاْتِيْنَا فَرْدًا –

"অতপর তুমি কি দেখেছ সেই ব্যক্তিকে যে আমাদের আয়াতসমূহ মেনে নিতে অস্বীকার করে এবং এই বলে যে, আমাকে তো মাল-সম্পদ ও সন্তান জনবলে ধন্য করা হতে থাকবেই? সে কি গায়েব বিষয়ে জ্ঞান লাভ করতে পেরেছে? কিংবা সে রহমানের নিকট থেকে কোন প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়েছে? কখনও নয়, সে যা বলে তা আমরা লিখে নিব এবং তার জন্য নির্দিষ্ট শাস্তির মাত্রা আমরা আরো বৃদ্ধি করে দিব। যে সাজ-সরঞ্জাম ও জনবলের কথা এই লোক বলে তা সবই শেষ পর্যন্ত আমার নিকটই থেকে যাবে এবং সে একাকীই আমার নিকট হাজির হবে।"

মজলুম খাব্বাব (রা) বছরের পর বছর ধরে দুঃখ-মুসিবতের চাকায় নিস্পেষিত হতে লাগলেন। ইত্যবসরে হিজরতের হুকুম অবতীর্ণ হলো এবং তিনি হিজরত করেন। বরং তাঁর সামনে ছিল শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি। মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে স্বয়ং হযরত খাব্বাব (রা) থেকে বর্ণিত আছে, "আমি শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হিজরত করেছিলাম।" আল্লামা ইবনে আছির (উসুদুল গাব্বাহ গ্রন্থের প্রণেতা) বলেছেন যে, হুজুর (সা) মদীনায় খাব্বাব (রা) এবং খারাশ (রা) বিন ছাম্মার গোলাম তামিমের (রা) মধ্যে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু মুসতাদরাকে হাকিমের রেওয়ায়াত অনুযায়ী তাঁর ভ্রাতৃত্ব জোবায়ের (রা) বিন আতিকের সাথে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যুদ্ধের ধারা শুরু হলে হযরত খাব্বাব (রা) সারওয়ারে কায়েনাতের (সা) নৈকট্যে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকল যুদ্ধে অত্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন। খোলাফায়ে রাশেদীনের (রা) যুগে যখন বিজয়ের দরজা খুললো তখন হযরত খাব্বাব (রা) কিছু কিছু সময় খুব কাঁদতেন এবং বলতেন ঃ

"আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য রাসূলের (সা) সঙ্গে হিজরত করি এবং আমাদের প্রতিদান আল্লাহর জিম্মায় থাকে। অতপর আমাদের মধ্য থেকে কেউ কেউতো এমন ছিলেন যে, তারা মারা গেছেন এবং দুনিয়ায় নিজের প্রতিদানের কোন ফলই খাননি। কিন্তু কারোর কারোর ফল পেকে গেছে এবং সে তা ছিঁড়ে খাচ্ছে। মাসয়াব (রা) ওহোদে শাহাদাত পেলে তাকে কাফনের জন্য একটি ছোট চাদর ছাড়া আমাদের নিকট কিছুই ছিল না। সেই চাদর দিয়ে তার মাথা ঢাকা হলে পা অনাবৃত হয়ে যেতো এবং পা ঢাকলে মাথা আলগা হয়ে যেতো। শেষে হুজুরের (সা) নির্দেশ অনুযায়ী তাঁর মাথা চাদর দিয়ে ঢাকা হলো এবং পায়ের ওপর আজখার (এক ধরনের ঘাস) রাখা হলো। আর আজকের অবস্থা হলো, আল্লাহর ফজিলত আমাদের ওপর বৃষ্টির মত বর্ষিত হচ্ছে। আমি ভয় পাই যে, আল্লাহ তায়ালা আমাদের মুসিবতের বদলা আমাদেরকে দুনিয়াতেই না দিয়ে দেন।"

অনেক রেওয়ায়াত থেকে এটা জানা যায় যে, হযরত খাব্বাব (রা) শেষ বয়সে কুফায় স্থায়ীভাবে বাস করতেন। সেখানে ৩৭ হিজরীতে কঠিন রোগে আক্রান্ত হন। পেটের কোন তাকলীফ ছিল। তার চিকিৎসার জন্য পেটের সাত স্থানে দাগ দেয়া হয়েছিল। তাতে তিনি খুব কষ্ট পেয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেনঃ

"হুজুর (সা) যদি মৃত্যুর আকাংখা করতে নিষেধ না করতেন তাহলে আমি আমার মৃত্যুর দোয়া করতাম।"

সেই নাজুক পরিস্থিতিতে কিছু মানুষ শুশ্রূষার জন্য এলেন এবং আলোচনার সময় বললেন ঃ

"আবু আবদুল্লাহ! খুশী হোন যে, দুনিয়া ত্যাগের পর হাওজে কাওসারের ওপর নিজের পরিত্যক্ত সাথীদের সঙ্গে সাক্ষাত করবেন।"

একথা শুনে তিনি কাঁদতে লাগলেন এবং বললেন ঃ

"আল্লাহর কসম! আমি মৃত্যুকে ভয় পাই না। তোমরা সেসব সাথীর কথা উল্লেখ করেছ যারা দুনিয়ায় কোন প্রতিদান পায়নি।আখিরাতে তাঁরা অবশ্যই নিজেদের প্রতিদান পাবে। কিন্তু আমরা তাদের পর রয়েছি এবং দুনিয়ার নিয়ামতের এত অংশ পেয়েছি যে, ভয় হয় তা আমাদের আমলের সওয়াব হিসেবেই হিসেব না হয়ে যায়।"

ওফাতের কিছুক্ষণ পূর্বে তাঁর সামনে কাফন আনা হলো। তাতে অশ্রুসিক্ত অবস্থায় তিনি বললেন ঃ

"এতো সম্পূর্ণ কাফন। আফসোস! হামযাকে (রা) একটি ছোট ধরনের চাদর দিয়ে কাফন দেয়া হয়েছিল। যা তাঁর সম্পূর্ণ শরীর আবৃত করার মতো ছিল না। পা ঢাকলে মাথা আলগা হয়ে যেতো এবং মাথা ঢাকলে পা খুলে যেতো। শেষে আমরা তাঁর পা আজখার দিয়ে ঢেকে কাফনের কাজ সম্পন্ন করি।"

তিনি পুনরায় ওসিয়ত করলেন যে, কুফাবাসীদের নিয়ম অনুযায়ী তাঁকে যেন শহরের মধ্যে দাফন না করা হয় বরং তাঁর কবর শহরের বাইরে খোলা ময়দানে তৈরীর নির্দেশ দিলেন। এই ওসিয়তের পর তিনি পরপারে যাত্রা করলেন। ওসিয়ত অনুযায়ী শহরের বাইরে তাঁকে দাফন করা হলো। তারপর কুফাবাসীও নিজেদের মৃতদেরকে তাঁর কবরের পাশে দাফন করা শুরু করলো। মুসতাদরাকে হাকিমের রেওয়ায়াত অনুযায়ী হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু তাঁর দাফনের পূর্বে সিফ্‌ফিন থেকে কুফা পৌঁছেছিলেন এবং তিনিই

জানাযার নামায পড়িয়ে ছিলেন। কিন্তু ইবনে আছির বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আলী (রা) হযরত খাব্বাবের (রা) ওফাতের কয়েক দিন পর কুফা পৌঁছেন এবং তাঁর কবরের পাশে দাঁড়িয়ে মাগফিরাত কামনা করেন। ওফাতের সময় হযরত খাব্বাবের (রা) বয়স ৭২ বছরের মত ছিল।

সাইয়েদেনা হযরত খাব্বাব (রা) বিন আরাত অন্যতম জালিলুল কদর সাহাবী হিসেবে পরিগণিত হয়ে থাকেন। তিনি চরম অগ্নিপরীক্ষার যুগে ইসলামের স্থায়ী নিয়ামতে ভূষিত হন এবং দুনিয়ার কোন কঠোরতা ও মুসিবত তাঁকে হকপথ থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। কতিপয় রেওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, তিনি একদম প্রথম যুগেই কুরআন পড়ে নিয়েছিলেন। কিছু রাবী হযরত ওমরের (রা) ইসলাম গ্রহণের ঘটনায় তাঁর নাম স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। তাঁদের বর্ণনা হলো যে, যে যুগে সরওয়ারে আলম (সা) ৩৯ জন জান নিছারসহ হযরত আরকামের (রা) গৃহে আশ্রয় নিয়েছিলেন, সেই যুগে হযরত খাব্বাব (রা), হযরত সাঈদ (রা) বিন যায়েদ এবং তাঁর স্ত্রী ফাতিমা (রা) বিনতে খাত্তাবের [হযরত ওমরের (রা) সহোদরা] বাড়ী তাঁদেরকে কুরআন শরীফ পড়াতে যেতেন। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে হযরত ওমর (রা) বোন ও ভগ্নিপতিকে সতর্ক করার জন্য তাদের বাড়ী গমন করেন। এ সময় খাব্বাবও (রা) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি একটি কুঠরীতে লুকিয়ে ছিলেন এবং হযরত ওমর (রা) বোন ও ভগ্নিপতির সাথে কথা কাটাকাটিতে লেগে গেলেন। এক পর্যায়ে হযরত ওমর (রা) মেরে বসলেন এবং তিনি আহত হলেন। তাতে হযরত ওমর (রা) নরম হয়ে গেলেন এবং তাঁকে কুরআন শুনাতে বললেন। তিনি কেবলমাত্র সূরায়ে ত্বা-হার কতিপয় আয়াত তিলাওয়াত করেছিলেন। এমন সময় হযরত ওমরের (রা) অন্তরের জগৎ পরিবর্তিত হয়ে গেল এবং তিনি তাঁকে মুহাম্মাদের (সা) খিদমতে নিয়ে যাওয়ার কথা বললেন। ঠিক এই সময় হযরত খাব্বাব (রা) কুঠরী থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে আনন্দের আতিশয্যে বলে ফেললো ঃ "হে ওমর! আমি তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছি যে, গতকাল রাতে হুজুর (সা) ওমর অথবা আবু জেহেলের মধ্য থেকে যাকে আল্লাহর পসন্দ হয় তাকে ইসলাম গ্রহণের শক্তি প্রদানের জন্য দোয়া করেছিলেন। মনে হয় হুজুরের (সা) দোয়া তোমার স্বপক্ষে কবুল হয়েছে।"

তারপর হযরত ওমর (রা) আরকামের (রা) গৃহে হুজুরের (সা) খিদমতে হাজির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন।

হযরত ওমর ফারুক (রা) এবং অন্য সকল সাহাবায়ে কেরাম হযরত খাব্বাবকে (রা) অত্যন্ত সম্মান করতেন। হযরত ওমরের (রা) খিলাফতকালে খাব্বাব (রা) তাঁর নিকট তাশরীফ রাখতেন। তিনি তাঁকে নিজের আসনে নিজের সাথে বসাতেন। আল্লামা ইবনে আছির বর্ণনা করেছেন যে, একবার হযরত ওমর (রা) হযরত খাব্বাবের (রা) নিকট নিজের মুসিবতের কাহিনী বর্ণনার অনুরোধ জানালেন। হযরত খাব্বাব (রা) হযরত ওমরকে (রা) কাপড় উঠিয়ে নিজের পিঠ দেখালেন। তাতে তিনি বিস্মিত হয়ে গেলেন। সারা পিঠ এমন সাদা ছিল যেমন কুষ্ঠ রোগীর চামড়া হয়ে থাকে। খাব্বাব (রা) বললেনঃ

"আমীরুল মু'মিনীন, আগুন জ্বালিয়ে তার ওপর আমাকে শুইয়ে দেয়া হতো। এমনকি আমার পিঠের চর্বি সেই আগুন নিভিয়ে দিত।" হযরত খাব্বাব (রা) প্রায়ই রাসূলে আকরামের (সা) খিদমতে হাজির হতেন এবং তাঁর নিকট থেকে দ্বীনের শিক্ষালাভ করতেন। মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে আছে, একরাতে হযরত খাব্বাব (রা) হুজুরের (সা) খিদমতে হাজির হয়ে দেখলেন যে, তিনি সারা রাত নামায পড়ে কাটিয়ে দিয়েছেন। সকাল হলে খাব্বাব (রা) আরজ করলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল! আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। আজ রাতে আপনি যেভাবে নামায পড়লেন এর পূর্বে কখনো সেভাবে পড়েননি।"

হুজুর (সা) বললেন, "আজ রাতের নামাযে আমি আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের দরবারে নিজের উম্মতের জন্য তিনটি প্রার্থনা জানিয়েছি। যার মধ্য থেকে দু'টি মঞ্জুর করা হয়েছে এবং তৃতীয়টি কবুল করা হয়নি। যে দু'টি দোয়া কবুল করা হয়েছে তা হলো, আল্লাহ দুশমনকে আমার ওপর বিজয় দেবেন না এবং আল্লাহ আমার উম্মতকে এমন আজাব দিয়ে ধ্বংস করবেন না। যা দিয়ে পূর্বেকার উম্মতদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল।"

আল্লামা ইবনে কাছির বলেন যে, হযরত খাব্বাব (রা) অত্যন্ত মর্যাদাবান হওয়া সত্ত্বেও খুব বিনয়ী স্বভাবের ছিলেন। একবার তিনি অনেক সাহাবীর মধ্যে উপস্থিত ছিলেন। এসব সাহাবী হযরত খাব্বাবের (রা) নিকট এমন বিষয়ে নির্দেশ দানের আবেদন জানালেন যা তাঁরা আমল করতে পারেন।

তিনি বলেন, "আমি কে, যে কোন ব্যাপারে নির্দেশ দেবো। এমনও হতে পারে যে, আমি লোকদেরকে কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলাম। আর আমি স্বয়ং তার ওপর আমল করি না।

হযরত খাব্বাব (রা) থেকে ৩৩টি হাদিস বর্ণিত আছে। তাঁর থেকে বর্ণনাকারীদের মধ্যে তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ ছাড়া হযরত আবু উমামা বাহেলী(রা), কায়েস (র) বিন আবি হাযেম, মাসরুক (র) বিন আজদা, আলকামা (র) বিন কায়েস এবং ইমাম শা'বীর (র) মত মহান ব্যক্তিত্ব শামিল ছিলেন।

হযরত উতবা (রা) বিন গাযওয়ান

চৌদ্দ হিজরীর শেষের দিকের কথা। আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওমর ফারুকের (রা) নির্দেশে বসরায় নতুন শহর আবাদ হলো। এই শহরের নবনির্মিত জামে মসজিদে প্রথম জুমার নামায পড়ার জন্য সমগ্র শহর ভেঙ্গে পড়লো। সেই দিন মানুষ খুশী ও শুকুরের মিশ্র আবেগে উদ্বেলিত ছিল এবং তাদের তাসবিহ্ ও তাহলিলে মসজিদের প্রাচীর গুঞ্জরিত হয়ে উঠছিল। খুতবা শুরু হলো। লোকজন নীরব হয়ে কান খাড়া করে তা শুনতে লাগলেন। খতিব ছিলেন মনোমুগ্ধকর হেজাজী অবয়ব এবং নূরানী সুরতের এক সুন্দর আকৃতির বুজুর্গ। তাঁর শরীরে সুন্দর সাধারণ পোশাক শোভা পাচ্ছিল। তাঁর মুখমণ্ডল ও চোখ দেখে মনে হচ্ছিল যে, তিনি একজন পবিত্র মানুষ এবং নিশি জাগরণকারী আবেদ। তিনি প্রথমে আল্লাহ্ তায়ালার হামদ ও ছানা বর্ণনা করলেন। মক্কার ইয়াতিম নবীর (সা) অনুসারী হওয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা এবং গৌরব প্রকাশ করলেন। তারপর বললেন ঃ

"হে মানুষেরা! এই দুনিয়া কয়েকদিনের। খুব শীঘ্রই এই দুনিয়াটা আমাদের থেকে পিঠ ফিরিয়ে নেবে। তার বড় অংশ অতীত হয়েছে এবং ছোট অংশ অবশিষ্ট রয়েছে। যেমন কোন পাত্রের পানি ফেলে দেয়ার পর শেষে কিছুক্ষণ পর্যন্ত তা থেকে ফোটা ফোটা পানি পড়ে। অবশ্যই তোমরা এই নশ্বর বিশ্ব থেকে শীঘ্র এমন একস্থানে গমনকারী যা চিরস্থায়ী। অতএব, সেই স্থায়ী ঠিকানার জন্য তোমরা সামান কেন তৈরী করছো না? আর এই সামান হলো নেকী এবং খায়ের। হে মানুষেরা, আমার আকা মুহাম্মাদ (সা) আমাকে বলেছেন যে, জাহান্নাম এত প্রশস্ত ও গভীর যে, তার কিনার থেকে একটি পাথর নিক্ষেপ করা হলে তা ৭০ বছরেও তার তলায় পৌঁছে না এবং আল্লাহর কসম! একদিন এই জাহান্নাম অবশ্যই পূর্ণ হয়ে যাবে। তোমরা কি এতে বিস্মিত হচ্ছো? আল্লাহর কসম! আমাকে হুজুর (সা) এও বলেছেন যে, জান্নাত এত প্রশস্ত হবে যে তার এক দরজা দ্বিতীয় দরজা থেকে ৪০ বছরের দূরত্বে হবে। কিন্তু একদিন এমনও হবে যে, জান্নাতের হকদারদের তাতে প্রচণ্ড ভিড় হবে। হে মানুষেরা একদিন এমন ছিল যে, আমি ছাড়া শুধুমাত্র ৬ ব্যক্তি রাসূলের (সা) সঙ্গে ছিলেন এবং আমাদের দারিদ্র ও অসহায়ত্বের অবস্থা এমন

ছিল যে, বৃক্ষের পাতা ছাড়া খাদ্যদ্রব্য হিসেবে আমরা আর কিছুই পেতাম না। এই খাবার খেতে খেতে এমনকি আমাদের চোয়াল ছিঁড়ে গিয়েছিল এবং আমাদের পোশাক? তার অবস্থা এমন ছিল যে, একদিন আমি একটি চাদর পেলাম। তা ছিঁড়ে দুই ভাগ করলাম। এক ভাগ দিয়ে আমি তহবন্দ বানালাম এবং অপর ভাগ দিয়ে সায়াদ (রা) বিন মালিক (আবিওয়াক্কাস) তহবন্দ বানালেন। আজ আল্লাহ আমাদের ওপর এই রহম করেছেন যে, আমাদের মধ্য থেকে প্রত্যেকেই কোন না কোন শহরের আমীর। আমি আল্লাহর নিকট এই বিষয়ে পানাহ চাই যে, নিজেকে বড় মনে করবো? অথচ তার নিকট আমি এক উপহাসম্পদ সৃষ্টি। হে মানুষেরা! ভালভাবে শুনে নাও যে, নবুওয়াত শেষ হয়ে গেছে এবং আমার তো মনে হয় পরিণামে বাদশাহী কায়েম হবে—তোমরা আমাদের পরে আগমনকারী আমীরদেরকে পরীক্ষা করে নিও।"

এই খুতবা কি ছিল। শিক্ষার জন্য একটি কষাঘাত বা চাবুক। তা শুনে শ্রোতারা রোদন শুরু করে দিল এবং প্রচণ্ড আবেগে অধিকাংশই চিৎকার দিয়ে উঠলো। এই খতিব যিনি বসরাবাসীর সামনে রাসূলের (সা) যুগের প্রথমের হকপন্থীদের হলাহল পূর্ণ মুসিবতের নকশা পেশ করলেন এবং নিজের ঈমানী বিচক্ষণতা দিয়ে ভবিষ্যত ঝলক দেখিয়ে সাচ্চা মুসলমান হওয়ার উপদেশ দিলেন। তিনি কোন সাধারণ মানুষ ছিলেন না। তিনি ছিলেন বসরার আমীর(গভর্ণর) হযরত উতবাহ (রা) বিন গাযওয়ান মাযনী। ত্রিশ হাজার মানুষের শাসক। সৈন্য ও ধনাগারের মালিক। কিন্তু দুনিয়ার প্রতি অনীহা এবং আল্লাহভীতির অবস্থাটা এমন ছিল যে, মোটা কাপড় পরে থাকতেন ও বাইতুলমালের এক পয়সাও ব্যক্তিগত কাজে ব্যয় করাকে হারাম মনে করতেন। তিনি আল ফাকরী ফখরীর সঠিক প্রতিনিধি ছিলেন এবং হাদিয়ে আকরামের (সা) সুহবতের ফয়েজ তাকে একজন উপমামূলক মুসলমান ও শাসক বানিয়ে দিয়েছিল।

আবু আবদুল্লাহ উতবাহ (রা) বিন গাযওয়ানের সম্পর্ক কায়েস আয়লানের শাখা বনু মাযিনের সঙ্গে ছিল। নসবনামা হলো ঃ উতবাহ (রা) বিন গাযওয়ান বিন জাবের বিন ওয়াহাব বিন নাসিব বিন যায়েদ বিন মালিক বিন হারিছ বিন মাযিন বিন মানসুর বিন ইকরামা বিন খাসফা বিন কায়েস বিন আয়লান।

আল্লামা ইবনে আছির বর্ণনা করেছেন যে, জাহেলী যুগে তাঁর খান্দান বনি নওফিল বিন আবদি মানাফের মিত্র ছিল।

হযরত উতবার (রা) বয়স তখন প্রায় ত্রিশ বছর। সে সময় ফারান পর্বতের চূড়া দিয়ে ইসলামের সূর্য উদিত হলো এবং রহমতে আলম (সা) লোকদেরকে

হকের দিকে ডাকতে শুরু করলেন। মক্কার কুরাইশদের ওপর হকের আহবান বিদ্যুতের মত উপস্থিত হলো। কেননা তারা শত শত বছর ধরে যেসব কল্পনা, গোঁড়ামী এবং ভুল কাজে ব্যাপৃত ছিল ইসলাম তার মূল কেটে দিয়েছিল। সুতরাং কুরাইশরা দ্বীনে হকের বিরোধিতা করাকে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হিসেবে বানিয়ে নিয়েছিল। ইসলামের প্রচার ও প্রসারে বাধা দানের জন্য এমন সব তৎপরতা তারা শুরু করলো যে, মানবতা মুখ থুবরে পড়ে রইলো। যারই ইসলাম গ্রহণ করার সৌভাগ্য হতো সেই তাদের নির্যাতনের শিকার হতো এবং তার জীবন হয়ে উঠতো দুর্বিসহ। আল্লাহ তায়ালা হযরত উতবাকে (রা) নেক স্বভাব দান করেছিলেন। যেই দাওয়াতে হকের আওয়াজ তাঁর কানে পৌছলো তখনই তাঁর মন ও অন্তর সাক্ষ্য দিল যে, এ দাওয়াত সম্পূর্ণরূপে কল্যাণকর এবং তাতেই মানবতার কল্যাণ রয়েছে। পক্ষান্তরে তিনি এটাও দেখলেন যে, এই দাওয়াত কবুল করার অর্থ হলো অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ার নামান্তর। যে ব্যক্তি তা গ্রহণ করে সে মক্কার কাফেরদের ভয়াবহ নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকে। কিন্তু তাঁর হিম্মত কাফেরদের জুলুম ও নির্যাতনের ভয়ে ভীত হয়ে হক গ্রহণের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত থাকার ব্যাপারটি কোনক্রমেই বরদাশত করলো না। সুতরাং তিনি কোন চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই অগ্রসর হয়ে তাওহীদের ঝাণ্ডা আঁকড়ে ধরলেন এবং কুরআনে করিমের ভাষায় যাদেরকে 'আসসাবিকুনাল আউয়ালুনে'র মহান উপাধিতে ভূষিত করে স্পষ্ট ভাষায় জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে সেই দলে শামিল হয়ে গেলেন। সেই সময় পর্যন্ত একটি স্বল্পসংখ্যক মানুষই ঈমান আনার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে হযরত উতবাহ (রা) শুধুমাত্র ৬ জন মুসলমানের নামই জানতেন এবং তাঁর ধারণা ছিল যে, তিনি সপ্তম মুসলমান। এ সত্ত্বেও চরিতকারদের অনুমান হলো যে, সে সময় মুসলমানদের সংখ্যা ৬ থেকে বৃদ্ধি পেয়েছিল। কুরাইশরা যখন জানতে পেল যে, উতবা (রা) ইসলাম গ্রহণ করেছে তখন তারা তাঁর খুন পিপাসু হয়ে গেল। তাঁর জীবিকার দরজাই তারা বন্ধ করে দিল না বরং দৈহিক শাস্তি প্রদানেও কুণ্ঠাবোধ করলো না। কিন্তু তাওহীদের নেশা তো এমন বস্তু ছিল না যে, জুলুম নির্যাতন চালিয়ে তা দূর করা যাবে। তিনি বীরত্বের সঙ্গে সব ধরনের দুঃখ মুসিবতের মুকাবিলা করলেন এবং এক মুহূর্তের জন্যও নিজের কদমকে হক পথ থেকে এদিক-ওদিক সরাননি। সেই সময় অন্য সাহাবীর মত তিনিও এমন দরিদ্র ছিলেন যে, কয়েকদিন পর্যন্ত না খেয়ে অতিবাহিত করতেন এবং জঙ্গল ও বৃক্ষের পাতা খেয়ে খেয়ে সময়

কাটাতেন। ফলে তাঁর চোয়াল ফেটে যেতো। এমনিভাবে কাপড় ছিন্নভিন্ন হয়ে যেত এবং অত্যন্ত কষ্টে সতর ঢাকার জন্য কোথাও থেকে কাপড় যোগাড় করতেন। হক পন্থীদের ওপর কুরাইশদের নির্যাতন যখন চরমে উঠলো তখন বিশ্বনবী (সা) মুসলমানদেরকে হাবশা বা আবিসিনিয়া হিজরতের অনুমতি দিলেন। সুতরাং হযরত উতবাহ (রা) বিন গাযওয়ান হাবশায় দ্বিতীয় হিজরতে ৮২ জন পুরুষ এবং ২০ জন মহিলার নির্যাতীত কাফেলায় শামিল হয়ে গেলেন। কাফেররা হিজরতের পথে তাদেরকে প্রচণ্ডভাবে বাধা আরোপ করলো। কিন্তু তবুও তারা হাবশায় পৌছতে সফল হলেন। হাবশায় বাদশাহ নাজ্জাসীর নেক দিল ও সুন্দর আচরণের বদৌলতে হযরত ওতবাহ (রা) এবং অন্যান্য মুহাজির কয়েক বছর পর্যন্ত শান্তি ও নিরাপত্তার সঙ্গে জীবন অতিবাহিত করতে লাগলেন। মক্কার কুরাইশদের বাড়াবাড়ির হাত তখন তাদের থেকে অনেক দূরে ছিল। কিন্তু বিদেশ বিদেশই হয়ে থাকে। মক্কা এবং মক্কায় ইয়াতিম নবীর (সা) স্মরণে তারা সবসময় তড়পাতে থাকতেন। হযরত উতবার (রা) অস্থিরতা এতো বেড়ে গিয়েছিল যে, কয়েক বছর পর তিনি হাবশার দারুল আমান থেকে মক্কা ফিরে আসেন। আল্লামা ইবনে আছির (র) "উসুদুল গাব্বাহ" গ্রন্থে লিখেছেন যে, তখনো মুসলমানরা মদিনায় হিজরত করেননি এবং যথারীতি তারা কাফেরদের নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন। কিন্তু এবার কুরাইশরা হযরত উতবার (রা) ওপর কোন নির্যাতন করলো না। তিনি চুপচাপ মক্কায় দিন কাটাতে লাগলেন। তবে, কিছুদিন পর যখন রহমতে আলম (সা) মদীনা হিজরত করলেন তখন উতবার (রা) নিকট মক্কার একেক দিন শতাব্দীর মত ভারী হয়ে গেল। দিনরাত শুধু একই চিন্তায় মশগুল থাকতেন যে, কি করে মক্কা থেকে বের হয়ে নিজের আকার কদমে পৌছে যাবেন। প্রথম হিজরীর শাওয়াল মাসে আল্লাহ তায়ালা তাঁর ইচ্ছে পূর্ণ করে দিলেন। ইবনে আছির (র) বর্ণনা করেছেন যে, কুরাইশের একটি সৈন্য দল ইকরামা বিন আবি জেহেল অথবা আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে মুসলমানদের তৎপরতার খোঁজ নেয়ার উদ্দেশ্যে মদীনার দিকে রওয়ানা হলো। হযরত উতবা (রা) বিন গাযওয়ান এবং হযরত মিকদাদ (রা) বিন আসওয়াদও সেই দলে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলেন। কুরাইশরা ধারণা করেছিল যে, সম্ভবত তারা জাতীয় জিদের ভিত্তিতে মদীনাবাসীদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে চায়। এ জন্য তারা তাদেরকে এই সৈন্য দলে শামিল হওয়ার অনুমতি দিয়েছিল। রাবিগ নামক স্থানে দলটির সঙ্গে ৬০ অথবা ৮০ জনের সেই মুসলমানদের দলের সঙ্গে

সংঘর্ষ বেধে গেল যে দলটিকে রাসূলে আকরাম (সা) হযরত উবায়দা (রা) বিন হারিছের নেতৃত্বে টহল দানের জন্য প্রেরণরকরেছিলেন। উভয় দিক থেকে কিছুক্ষণ পর্যন্ত একে অপরের ওপর তীর বর্ষণ করলো। অতপর মক্কার কুরাইশরা পিছপা হয়ে মক্কার দিকে রওয়ানা হয়ে গেল। ইত্যবসরে হযরত উতবা (রা) বিন গাযওয়ানরএবং মিকদাদ (রা) বিন আসওয়াদ সুযোগ পেয়ে ইসলামী বাহিনীতে গিয়ে মিলিত হলেন এবং সেই বাহিনীর সাথে মদীনা পৌঁছে মুহাজির ভাইদের সঙ্গে শামিল হলেন। এমনিভাবে তিনি "দুই হিজরতকারী"র মর্যাদা লাভ করলেন। অর্থাৎ এক হিজরত তিনি মক্কা থেকে হাবশায় করেছিলেন এবং দ্বিতীয়টি করেন মক্কা থেকে মদীনায়। হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন সালমা আজলানী মদীনায় তাঁকে নিজের মেহমান বানান।

পরে যখন প্রিয়নবী (সা) মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব কায়েম করেন, কখন হযরত উতবাকে (রা) আনসারের মশহুর বাহাদুর আবু দুজানা সামমাক (রা) বিন খারশার ইসলামী ভাই বানান।

দ্বিতীয় হিজরীতে যুদ্ধের সিলসিলা শুরু হলে হযরত উতবাহ (রা) বিন গাযওয়ান সেই সব যুদ্ধ ও অভিযানে অংশ নেন যেসব যুদ্ধে স্বয়ং রাসূলে করিম (সা) সশরীরে অংশ নিয়েছিলেন। জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর প্রসঙ্গে এমন কোন মর্যাদা ছিল না যা তিনি লাভ করেননি। সর্বপ্রথম তিনি দ্বিতীয় হিজরীর রজব মাসে সংঘটিত সারিয়াতে আবদুল্লাহ বিন জাহাশে বীরত্বের সঙ্গে অংশ নেন। অতপর তাঁর তরবারী বদরের যুদ্ধে চমকে ওঠে। এই যুদ্ধে হকপন্থীদের তিনশ' তেরজন সাজসরঞ্জামহীন হওয়া সত্ত্বেও কাফেরদের ভয়াবহ তাগুতি শক্তির বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এমনিভাবে তাঁর বদরী সাহাবী হওয়ার মহান সৌভাগ্য লাভ ঘটে। তিনি একজন উঁচু শ্রেণীর তীরন্দাজ এবং তীর বিশেষজ্ঞ ছিলেন। বদরের পর ওহোদ, খন্দক, জিকারদ, খায়বার, হুনাইন এবং তায়েফের যুদ্ধে তাঁর নির্ভুল নিশানার তীর দুশমনের বুক ছিদ্র করেছিলো। হুদায়বিয়াতেও তিনি সেই চৌদ্দশ' জীবন উৎসর্গকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাঁরা রহমতে আলমের (সা) পবিত্র হাতে মৃত্যুর বাইয়াত করেছিলেন এবং আল্লাহর নিকট থেকে জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছিলেন। অষ্টম হিজরীর পবিত্র রমযান মাসে তিনি সেই দশ হাজার পবিত্র আত্মার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাঁরা রহমতে আলমের (সা) সঙ্গী হয়ে মক্কা মুয়াজ্জমায় বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করেন।

নবম হিজরীতে তাবুকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। হুজুর (সা) খবর পেলেন যে, রোমের কায়সার এক বিরাট বাহিনীসহ আরবের ওপর হামলার জন্য অগ্রসর হচ্ছে। তিনি সাহাবীদেরকে রোমকদের মুকাবিলার নির্দেশ দিলেন। "শত্রুকে কোনক্রমেই আরব সীমান্তে ঢুকতে দেয়া যাবে না। এ জন্য তোমাদেরকে আমার সঙ্গে সিরিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত আরবের সীমান্তে পৌঁছে শত্রুকে রুখতে হবে।" সে বছর অনাবৃষ্টির কারণে দেশে দুর্ভিক্ষ লেগেছিল এবং কঠিন গরমও পড়েছিল। খেজুর ফসলের ওপরই মুসলমানদের আশা ভরসা ছিল। খেজুর তখন প্রায় পাকে পাকে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও হুজুরের (সা) হুকুম শুনতেই কতিপয় মুনাফিক এবং তিনজন কাহিল মুসলমান ছাড়া সকল মুসলমান মন ও অন্তর দিয়ে জিহাদের প্রস্তুতিতে ব্যাপৃত হয়ে পড়লেন। এই সময় তাঁরা কুরবানীর ইখলাস এবং ফিদাকারীর এমন উদাহরণ পেশ করলেন যে, দুনিয়ার ইতিহাসে তার নজির পাওয়া যায় না। প্রত্যেকেই নিজের সামর্থের চেয়ে বেশী মাল ও সামান পেশ করলেন। মহিলারা নিজেদের গহনা খুলে দিয়ে দিলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) সে সময় নিজের ঘর ঝেড়ে মুছে সকল মাল ও আসবাব এমনকি সুই সুতাও হুজুরের (সা) পায়ের নিকট এনে রেখে দিলেন। মোটকথা সারওয়ারে আলম (সা) ত্রিশ হাজার মুজাহিদসহ মদীনা মুনাওয়ারা থেকে বের হলেন। এই জীবন উৎসর্গকারীদের মধ্যে হযরত উতবা (রা) বিন গাযওয়ানও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। চৌদ্দ মনজিলের কঠোর কষ্টের পথ সফর করে তাবুক পৌঁছে জানা গেল যে, শত্রুরা নিজেদের স্থান থেকে নড়েনি। হুজুর (সা) তাবুকে কয়েকদিন অবস্থান করলেন এবং ইত্যবসরে চারপাশে সৈন্য দল প্রেরণ করে অমুসলিম রইসদেরকে অনুগত করলেন। তারপর জীবন উৎসর্গকারীদেরকে সঙ্গে নিয়ে ভালভাবে মদীনা প্রত্যাবর্তন করলেন। যেহেতু এই যুদ্ধে সৈন্যদের প্রস্তুতি এবং সফরকালে মুসলমানদেরকে সীমাহীন মুসিবত সহ্য করতে হয়েছিল, এ জন্য তাকে "জাইশুল উসরা"ও বলা হয়ে থাকে।

দশম হিজরীতে বিশ্ব নবী (সা) পবিত্র জীবনের শেষ হজ্জ পালন করেন। তাতে কম-বেশী এক লাখ মুসলমানের হুজুরের (সা) সঙ্গী হওয়ার সৌভাগ্য ঘটে। তাদের মধ্যে হযরত উতবা (রা) বিন গাযওয়ানও শামিল ছিলেন। রাসূলে আকরামের (সা) ওফাতের (১১ হিজরী) পর হযরত উতবা (রা) বিন গাযওয়ান ১৪ হিজরীতে (ফারুকী খিলাফতকালে) পুনরায় জনসমক্ষে আত্মপ্রকাশ করেন। ১১ হিজরী থেকে ১৪ হিজরীর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত তিনি কোথায় ছিলেন, ঐতিহাসিকরা তার বিশ্লেষণ করেননি। ইবনে আছির(র) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ওমর ফারুক (রা) হযরত উতবাকে (রা) উবুল্লা, দাসতে মাইসান এবং তার সন্নিহিত এলাকাসমূহ পদানত করার

জন্য মনোনীত করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি দু'টি রেওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন। এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী হযরত ওমর (রা) যখন হযরত সায়াদ (রা) বিন আবি ওয়াক্কাসকে কাদেসিয়ার অভিযানে রওয়ানা করেন, তখন হযরত উতবাকে(রা) ইরাকের দক্ষিণ অংশ পুনরায় জয় করার জন্য প্রেরণ করেন। সিদ্দীকে আকবারের (রা) শেষ যুগে এই অংশ বিদ্রোহী হয়ে গিয়েছিলো। উবুল্লাহ, দাসতে মাইসান প্রভৃতি এই অংশেই অবস্থিত ছিল। এই অভিযানে প্রেরণের সময় হযরত ওমর (রা) হযরত উতবাকে (রা) এই হেদায়াত দিয়েছিলেন।

"আল্লাহর ফজিলত ও রহমতের ওপর ভরসা করে তুমি আরবের চূড়ান্ত শেষ সীমার দিকে সঙ্গীদেরকে সাথে নিয়ে রওয়ানা হয়ে যাও। সেই সীমান্ত এমন সীমান্ত যেখান থেকে আজমী দেশসমূহ শুরু হয়েছে। সকল অবস্থাতেই আল্লাহভীতি ও পরহেজগারীর সঙ্গে কাজ করবে এবং মস্তিষ্কে একথা রাখবে যে, তোমরা এক প্রতারক দুশমনের মাটিতে গমন করছো। আমি আশা করি, আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন।

আমি আ'লা বিন আবদুল্লাহ হাজরামীকে লিখে পাঠিয়েছি। তিনি যেন আরফূজা (রা) বিন হারছুমার নেতৃত্বে তোমাকে সামরিক সাহায্য প্রেরণ করেন। তিনি একজন কৌশলী এবং জানবাজ মানুষ। তুমি তাঁর সঙ্গে সব ব্যাপারে পরামর্শ করবে। তোমার রাস্তায় যেসব আরব গোত্র আবাদ রয়েছে তাদেরকেও জিহাদে যোগদানের জন্য উদ্বুদ্ধ কর এবং সঙ্গে নিয়ে নাও। আজমবাসীদেরকে প্রথমে ইসলামের দাওয়াত দাও। তারা যদি গ্রহণ করে, তাহলে তাদেরকে নিজের ভাই মনে করবে। যদি ইসলাম কবুল না করে তাহলে তাদেরকে জিযিয়া প্রদানে বাধ্য করো। তাতেও যদি প্রস্তুত না হয় তাহলে তরবারী দিয়ে কাজ নেবে। আল্লাহ তোমাদের সাহায্যকারী।"

সুতরাং হযরত উতবা (রা) সেখান থেকে সরাসরি উবুল্লাহ পৌঁছলেন। দ্বিতীয় রেওয়ায়াত অনুযায়ী হযরত উতবা (রা) প্রথমে হযরত আ'লা (রা) বিন আবদুল্লাহ হাজরামীর সাহায্যের জন্য গেলেন। তিনি আসতাখার নামক স্থানে শত্রুর ঘেরের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন। হযরত আ'লা (রা) হাজরামী অত্যন্ত আবেগপ্রবণ মুজাহিদ ছিলেন এবং আবু বকর সিদ্দীকের (রা) খিলাফতকালে ধর্মদ্রোহিতার ফিতনা নির্মূলের ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। খিলাফতে ফারুকীর প্রথম দিকে তিনি "দালতান নাহারাইন" পদানত করার ইচ্ছা করলেন এবং একটি বাহিনীর সঙ্গে সামুদ্রিক নৌকায় সওয়ার হয়ে সেদিকে রওয়ানা হলেন। কোন কারণে তিনি পারস্য উপসাগরের উপকূলে

অবতীর্ণ হতে পারেননি তা জানা যায়নি। বরং বাহরাইন থেকে উপসাগর পার হয়ে আসতাখার গিয়ে পৌঁছেন। পারস্য উপসাগরে ইরানীদের এক মজবুত যুদ্ধ বহর ছিল। তারা আসতাখার অবরোধ করলো এবং মুসলমানদেরকে অভুক্ত মারার সংকল্প করলো। এদিকে হযরত আ'লা (রা) এবং তাঁর সঙ্গীরা মাথায় কাফন বেঁধে ঘোষণা করলো যে, যতক্ষণ দেহে প্রাণ থাকবে ততক্ষণ ইরানীদের নিকট অস্ত্র সমর্পণ করবেন না। কোন উপায়ে হযরত ওমর (রা) হযরত আ'লার (রা) অবরুদ্ধ হওয়ার খবর পেলেন। তিনি আ'লাকে (রা) এই অভিযানে যাওয়ার অনুমতি দেননি। কেননা তিনি নৌযুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে চাননি। কিন্তু এখন হাজার হাজার মুসলমানের জীবন বাঁচানোর প্রশ্ন এসে দাঁড়ালো। সুতরাং আ'লার (রা) এই কাজ অপসন্দ করা সত্ত্বেও তিনি হযরত উতবা (রা) বিন গাযওয়ানকে একটি শক্তিশালী বাহিনীসহ আ'লার (রা) সাহায্যের জন্য পৌঁছার নির্দেশ দিলেন। হযরত উতবা (রা) ১২ হাজার জানবাজসহ আসতাখারের দিকে রওয়ানা হলেন এবং অবরোধকারী ইরানীদের ভবলীলা সাঙ্গ করে দিলেন। এমনিভাবে হযরত আ'লা (রা) এবং তাঁর সঙ্গীরা এক বিরাট মুসিবত থেকে মুক্তি লাভ করলেন। তারপর তাঁরা সকলে মিলে উবুল্লাহ এবং আহওয়াজের ওপর চড়াও হলো। আমাদের অনুসন্ধান অনুযায়ী হযরত উতবা (রা) আ'লা (রা) হাজরামীকে সাহায্যের জন্য বসরা থেকে রওয়ানা হয়েছিলেন। সে সময় বসরা ও কুফা উভয় শহরই আবাদ এবং সেখানে সামরিক ছাউনিও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। হযরত উতবা (রা) বসরার গভর্ণর ছিলেন। তিনি বসরা এবং কুফা থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে হযরত আ'লার (রা) সাহায্যের জন্য পৌঁছেছিলেন।

আবু হানিফা দিনাওয়ারী (র) "আল আখবারুত তাওয়াল" গ্রন্থে এই উভয় রেওয়ায়াত থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন যে, ফারুকী খিলাফতের শুরুতে সুয়াইদ বিন কুতবাতাল আজলী ইরাকের দক্ষিণ এলাকায় ইরানীদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত ছিলেন। তিনি সামরিক দৃষ্টিভঙ্গীতে নিজের পক্ষকে দুর্বল মনে করে হযরত ওমরকে (রা) তাঁকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে সৈন্য প্রেরণের জন্য লিখলেন। হযরত ওমর (রা) সুয়াইদের পত্র পেয়েই হযরত উতবা (রা) বিন গাযওয়ানকে ডাকলেন এবং দুই হাজারের মুজাহিদ বাহিনী দিয়ে তাঁকে সুয়াইদের সাহায্যের জন্য প্রেরণ করলেন। তিনি যখন রওয়ানা হলেন তখন হযরত ওমর (রা) তাঁর পিছু পিছু কিছুদূর গেলেন এবং বললেন, "হে উতবা! তোমার মুসলমান ভাইয়েরা হিরা এবং তৎসংলগ্ন এলাকাসমূহ পদানত করেছে। আর সেইটাই হলো বাবল যা হারুত-মারুতের শহর নামে পরিচিত। আজকাল তাদের ঘোড়া আক্রমণ

করতে করতে মাদায়েনের উপকণ্ঠে পৌঁছে যাবে। আমি তোমাকে এই সৈন্য দিয়ে এ জন্য প্রেরণ করছি যে, তুমি সোজা আহওয়াজ যাবে এবং সেখানকার বাসিন্দাদের ওপর এমন চাপ প্রয়োগ করবে যাতে তারা তোমাদের ভাইদের বিরুদ্ধে কোন সাহায্য করতে না পারে। তাদের সঙ্গে উবুল্লাহর উপকণ্ঠে যুদ্ধ অব্যাহত রাখো।"

হযরত উতবা (রা) মদীনা থেকে রওয়ানা হলে মনযিলের পর মনযিল অতিক্রম করে সেই স্থানে পৌঁছলেন যেখানে আজ বসরা শহর অবস্থিত। সুয়াইদ বিন কুতবাও নিজের লোকজনসহ সেই স্থানে তাঁর বাহিনীতে শামিল হয়ে গেলেন এবং সকলে মিলে উবুল্লাহর ওপর হামলা করলেন।

ঘটনা যাই ঘটুক, এ ব্যাপারে সকল ঐতিহাসিক একমত যে, হযরত উতবার (রা) মনযিলে মকসুদ অথবা তাঁর অভিযানের লক্ষ্য ছিল উবুল্লাহ এবং তার উপকণ্ঠের এলাকাসমূহ পদানত করা। মুহাম্মাদ হোসাইন হাইকাল "আল ফারুকে আজম" গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

"সে যুগে উবুল্লাহ একটি বড় বন্দর ছিল। সেখানে ভারতবর্ষ ও চীন থেকে গমনাগমনকারী জাহাজ নোঙ্গর করতো। তাছাড়া সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে সে সময় বন্দরটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এখানে ভারতের ব্যবসায়ীদের বিরাট একটা সংখ্যা অবস্থান করতেন। উতবার (রা) সঙ্গে নামকরা যোদ্ধা হযরত আরাফজাহ (রা) বিন হারছুমা বারকীও এসে মিলিত হলেন এবং ইসলামের মুজাহিদরা উবুল্লাহ ঘিরে ফেললেন। এই শহর তার পূর্বে হযরত আবু বকরের (রা) শাসনামলেও হযরত খালেদ (রা) বিন ওয়ালিদ জয় করেছিলেন। কিন্তু খালেদের (রা) ইরাক থেকে গমনের পর ইরানীরা পুনরায় তা কবজা করে নিয়েছিল। শহর রক্ষার জন্য ইরানীরা একটি অভিজ্ঞ বাহিনী মোতায়েন করেছিল। তারা অত্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে মুসলমানদের মুকাবিলা করলো এবং কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত মুসলমানদেরকে শহর কবজা করতে দিল না। অবশেষে এক রক্তাক্ত যুদ্ধে মুসলমানরা ইরানীদের নাস্তানাবুদ করে ফেললো এবং তারা নিজেদের হাজার হাজার মানুষ কাটিয়ে পালিয়ে গেল। শহরের অনেক মানুষও হাল্কা-পাতলা সামান নিয়ে তাদের সঙ্গেই বেরিয়ে গেল। তা সত্ত্বেও সেই ঐশ্বর্যমণ্ডিত এবং জনসংখ্যাধিক্য শহরে অনেক কিছুই অবশিষ্ট ছিল। হযরত উতবা (রা) বিজয়ীর বেশে শহরে প্রবেশ করলেন। প্রচুর ধন-সম্পদ তাঁর হাতে এলো। কোন বিলম্ব ছাড়াই তিনি তৎক্ষণাৎ হযরত ওমরকে (রা) বিজয়ের খবর এই ভাষায় দিলেন ঃ

"অতপর আল্লাহ তায়ালার হাজারো শুকুর যে, তিনি উবুল্লাহ পদানত করেছেন। স্থানটি হলো আম্মান, বাহরাইন, পারস্য, ভারত এবং চীন থেকে

আগত জাহাজসমূহের নোঙ্গরস্থল। আমরা প্রচুর গনিমতের মাল লাভ করেছি। আমি ইনশাআল্লাহ তার বিস্তারিত খুব শীঘ্র লিখবো।"

উতবা (রা) এই চিঠি নাফে বিন হারিছ বিন কালদাহ ছাকাফির হাতে দিয়ে রওয়ানা করলেন। যখন তিনি মদীনা পৌঁছলেন তখন হযরত ওমর (রা) এবং অন্য মুসলমানরা বিজয়ের খবর শুনে খুব আনন্দিত হলেন। এদিকে হযরত উতবা (রা) উবুল্লাহর ওপর কবজা মজবুত করে মাযারের ওপর হামলা করলেন। এখানকার বাসিন্দারাও আবু বকর সিদ্দীকের (রা) শাসনামলে মুসলমানদের আনুগত্য কবুল করে পুনরায় বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। তারা জীবন দিয়ে মুসলমানদের মুকাবিলা করলো। কিন্তু উবুল্লাহ বিজয়ের নেশায় মত্ত মুজাহিদরা কয়েক ঘন্টার মধ্যে তাদেরকে শিক্ষণীয়ভাবে পরাজিত করলো এবং শহরের শাসককে গ্রেফতার করে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিল। তার কোমরবন্দে মূল্যবান ইয়াকুত যুমুররাদ জড়ানো ছিল। হযরত উতবাহ (রা) এই কোমরবন্দ বিজয়নামার সঙ্গে হযরত ওমরের (রা) খিদমতে প্রেরণ করলেন। মাযার বিজয়ের পর হযরত উতবা (রা) উপকণ্ঠের এলাকাসমূহ অনুগত বানালেন এবং ফোরাত নদী পার হয়ে দাস্তে মাইসানের দিকে অগ্রসর হলেন। এটা ইরানীদের একটি মজবুত ঘাঁটি ছিল এবং উবুল্লাহ থেকে পালিয়ে আসা ইরানীরাও এখানে একত্রিত হয়েছিল। দাস্তে মাইসানের বাইরে ইরানী ও মুসলমানদের মধ্যে ঘোরতর এবং তীর ও বর্শার পরিবর্তে হাতাহাতি যুদ্ধ সংঘটিত হলো। কঠিন প্রকৃতির আরবরা শীঘ্রই ইরানীদেরকে পরাজিত করলো। দাস্তে মাইসানের ইরানী শাসক জনৈক মুসলমানের হাতে মারা গেল এবং অন্যরা চরম বিশৃংখলার মধ্য দিয়ে শহর খালি করে চলে গেল। হযরত উতবা (রা) নিজের বাহিনীসহ শহরে প্রবেশ করলেন। এ সময় তিনি শহরের বাড়ীঘর ও দোকানপাটসমূহ মূল্যবান সম্পদ ও আসবাবে ঠাসাঠাসি পেলেন। এমনিভাবে প্রত্যেক মুসলমানের অংশে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ গনিমতের মাল এলো। কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে যে; সেই শহরের শাসকের মূল্যবান কোমরবন্দ হযরত ওমরের (রা) খিদমতে পাঠালেন। এরপর তিনি "আবরকাবাদ"-এর গুরুত্বপূর্ণ শহরের ওপর হামলা চালান এবং এক ব্যাপক সংঘর্ষের পর তার ওপরও ইসলামের পতাকা উত্তোলন করেন। এমনিভাবে হযরত ওমর (রা) হযরত উতবাকে (রা) যে অভিযানে নিয়োগ করেছিলেন তা পূর্ণ হয়।

মিসরের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক মুহাম্মাদ হোসাইন হাইকাল বর্ণনা করেছেন যে, যখন হযরত উতবা (রা) বিন গাযওয়ান উবুল্লাহ ও দাজলার সকল উপকূলীয় এলাকা ইসলামের অধীন আনেন তখন তিনি হযরত ওমরকে (রা)

লিখলেন, "মুসলমানদের এমন একটি আবাস প্রয়োজন যেখানে তারা ঠাণ্ডার হাত থেকে হেফাজত থাকতে পারবে এবং যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে অবস্থান করবে।" হযরত ওমর (রা) তাঁকে জবাব দিলেন ঃ "তোমার সঙ্গীদেরকে একস্থানে একত্রিত কর। এই স্থান পানি ও তৃণ শস্যশ্যামল প্রান্তরের নিকটে হওয়া চাই। অতপর আমাকে তার বিস্তারিত অবস্থা লিখো।"

উতবা (রা) যখন সম্পূর্ণ বিস্তারিত লিখে পাঠালেন তখন হযরত ওমর (রা) বসরার অবতরণ স্থলকে পসন্দ করলেন এবং লোকজন সেখানে পৌঁছে বাঁশ দিয়ে ঘর বানালো। এমনিভাবে হযরত উতবা (রা) বাঁশের মসজিদ নির্মাণ করালেন। মুসলমানরা যখন কোথায়ও চড়াও হতেন তখন এসব ঘর ফেলে দিতেন এবং যখন যুদ্ধ থেকে ফিরে আসতেন তখন তা আবার বানিয়ে নিতেন। একবার এসব ঘরে আগুন লেগে গেল। এ সময় হযরত ওমরের (রা) অনুমতিতে লোকজন মজবুত গৃহ বানালো। পরে যখন পারস্য উপসাগরের কূলে ইরাকের সীমান্ত ছাউনি তৈরী হলো তখন পাথরের গৃহ বানানো হলো এবং এক অত্যন্ত শানদার মসজিদ নির্মাণ করানো হলো।

আল্লামা শিবলী নুমানী (র) "আল ফারুক" গ্রন্থে বসরার আবাদী সম্পর্কিত বিভিন্ন রেওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন এবং সম্ভবত তিনি তা "ফতুহুল বুলদান বালাজুরী" থেকে গ্রহণ করেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ

"পারস্য ও ভারতের নৌ হামলা থেকে নিশ্চিন্ত থাকার জন্য হযরত ওমর (রা) উতবা (রা) বিন গাযওয়ানকে উবুল্লাহ বন্দরের নিকট মোতায়েন করেছিলেন। কেননা এখানে পারস্য সাগরের উপসাগর দিয়ে ভারতবর্ষ এবং পারস্যের জাহাজসমূহ নোঙ্গর করতো। এখানেই একটি শহর আবাদ করা হয়েছিল। জমি সম্পর্কিত সকল বিষয় স্বয়ং হযরত ওমর (রা) বলে দিয়েছিলেন। উতবা (রা) ৮শ' মানুষের সঙ্গে রওয়ানা হয়েছিলেন এবং খারিছবা এসেছিলেন। সেখানেই বর্তমানে বসরা আবাদ হয়েছে। প্রথমে এখানে শুধু নীরেট মাটি পড়ে ছিল। আর ভূমিও ছিল প্রস্তরময় এবং আশে পাশে পানি ও চারার সামান ছিল। এই ভূমি ছিল আরব প্রকৃতির সমতুল্য। এ জন্য উতবা(রা) ভিত্তি প্রস্তরের কাজ করে ফেললেন এবং বিভিন্ন গোত্রের জন্য পৃথক পৃথক সীমানা টেনে দিয়ে খুব ছোট ছোট ঘর তৈরী করালেন। যেখানে যে কবিলা আবাদ করা ঠিক হবে তা নির্ণয়ের জন্য আছেম বিন দালফকে নিয়োগ করলেন। বিশেষ করে নির্মিত সরকারী ভবনসমূহ ও জামে মসজিদ খুব প্রসিদ্ধ ছিল।"

আরব ঐতিহাসিকরা লিখেছেন যে, আরবী ভাষায় বসরাকে নরম প্রস্তরময় ভূমি বলা হয়ে থাকে। বস্তুত যেখানে এই শহর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেখানে সেই

ধরনের ভূমি ছিল। এ জন্য তার নাম বসরা নামে খ্যাত হয়ে গেল। আল্লামা বালাজুরী (র) একজন অগ্নি উপাসক আলেমের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, যেখানে এই শহর নির্মিত হয়, আজমীরা তাকে বাসরাহ বলতো। কেননা সেখানে অনেক রাস্তা এসে মিলিত হতো। আরবরা তাকে মুয়াররাব করে বসরা বানিয়ে নেয়। তিনি একথাও লিখেছেন, যে, বসরার জামে মসজিদ নির্মাণের জন্য হযরত উতবা (রা) হযরত মিহজান (রা) ইবনুল আওরাকে নিয়োগ করেছিলেন।

আবু হানিফা দিনাওয়ারী বর্ণনা করেছেন যে, হযরত উতবা (রা) হযরত ওমরের (রা) ইঙ্গিতে সর্বপ্রথম যে ব্যক্তিকে হাভেলী নির্মাণের অনুমতি দিয়েছিলেন এবং ক্ষেত-খামার করার জন্য জমি দিয়েছিলেন তিনি হলেন নাফে বিন হারিছ বিন কালদাহ ছাকাফী।

বসরা নির্মাণের পর হযরত ওমর (রা) হযরত উতবাকে (রা) এই শহরের আমীর (গভর্ণর) নিয়োগ করেন। ৬ মাস পর্যন্ত তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে কাজ করতে থাকেন। তারপর তিনি এই পদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠেন। তার কারণ কি ছিল। এ ব্যাপারে দু'টি রেওয়ায়াত পাওয়া যায়। এক রেওয়ায়াত হলো যে, তিনি অত্যন্ত যাহিদ ও মুখাপেক্ষীহীন স্বভাবের মানুষ ছিলেন। এ জন্য ইমারতের দায়িত্ব পালন করা তাঁর স্বভাব বিরোধী ছিল। দ্বিতীয় রেওয়ায়াত হলো, হযরত ওমর (রা) খবর পেলেন যে, হযরত উতবা (রা) এবং তাঁর সঙ্গীরা দাজলা ও ফোরাতের উপকূলীয় এলাকায় বেহিসাব গনিমতের মাল লাভ করেছেন এবং তারা সোনা ও রূপার মধ্যে গড়াগড়ি যাচ্ছেন। হযরত ওমর (রা) সঠিক অবস্থা জানার জন্য হযরত উতবাকে (রা) ডেকে পাঠালেন। যা হোক, ৬ মাস পর হযরত উতবা (রা) হযরত মাজাশি বিন মাসউদকে (রা) নিজের স্থলাভিষিক্ত বানালেন এবং হযরত মুগিরাহ (রা) বিন শু'বাকে নামাযের ইমাম নিয়োগ করে মক্কা রওয়ানা হয়ে গেলেন। রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে তিনি বসরাবাসীর সামনে এক লম্বা ভাষণ বা খুতবা দিলেন। এই ভাষণের শেষের দিকে তিনি বললেন ঃ

"হে বসরাবাসী! গুনাহর প্রতি বিদ্রোহ ঘোষণা এবং নেক কাজের হিম্মত আল্লাহই প্রদান করেন। আমি এখন চলে যাচ্ছি। আমার পর তোমরা যখন পরবর্তী শাসকদের অধীন আসবে তখন জানতে পারবে।"

খাজা হাসান বসরীর (র) উক্তি হলো, "উতবার (রা) পরবর্তী শাসকদের পালায় আমরা পড়েছি। আমরা দেখেছি যে, উতবা (রা) তাঁদের সকলের চেয়ে আফজাল ছিলেন।"

হযরত উতবা (রা) মক্কা পৌঁছলেন এ সময় হযরত ওমরও (রা) হজ্জের জন্য সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি বসরার বিস্তারিত অবস্থা আমীরুল মু'মিনীনের কর্ণগোচর করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বসরার ইমারাত থেকে নিজের ইস্তাফা পেশ করলেন। হযরত ওমর (রা) তাঁর ইস্তাফা নামঞ্জুর করলেন এবং তাকে নিজের পদে ফিরে যেতে নির্দেশ দিলেন। হযরত উতবা(রা) বাধ্য হয়ে বসরা রওয়ানা হলেন। কিন্তু তাঁর আন্তরিক কামনা ছিল যে, আল্লাহ যেন তাঁকে ইমারাতের দায়িত্ব থেকে বাঁচিয়ে নেন। আল্লাহর কি কুদরত। পথিমধ্যে তিনি উট থেকে পড়ে গেলেন। মারাত্মক আঘাত পেলেন। তার ব্যথায় বসরা পৌঁছার পূর্বেই ওফাত পেলেন এবং ইসলামের এই রত্ন ৫৭ বছর বয়সে চিরদিনের জন্য দুনিয়ার নজর থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

হযরত উসমান (রা)
বিন মাজউন

দ্বিতীয় হিজরীর শেষের দিকের ঘটনা। একদিন জনৈক আহবানকারী ডেকে ডেকে বললেন, হে লোকেরা! আজ আবুস সায়েব দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। একথা শুনে মদীনা মুনাওয়ারার মুমিনরা শোকাভিভূত হয়ে পড়লেন। তাঁদের চোখ অশ্রুশিক্ত হয়ে উঠলো। রহমতে আলমও (সা) এই দুঃখপূর্ণ খবরে খুব বিষন্নিত হলেন। জানাযা প্রস্তুত হলে হুজুর (সা) হযরত উম্মুল আলা আনসারিয়ার (রা) গৃহে তাশরীফ নিলেন। সেখানেই আবুস সায়েব ইন্তেকাল করেছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা সেখানে এক আশ্চর্য দৃশ্য অবলোকন করলেন। জ্বিন ও ইনসানের গৌরব হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সা) মাথা ঝুঁকিয়ে মাইয়্যেতের কপালের ওপর তিনবার চুম্বন করলেন। সে সময় তাঁর চক্ষু দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল। এই অশ্রু আবুস সায়েবের গণ্ডদেশ ভিজিয়ে দিল। অতপর তিনি বললেন ঃ

"আবুস সায়েব, আমি তোমার নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হচ্ছি। তুমি দুনিয়া থেকে এমনভাবে বিদায় নিয়েছ যে, তোমার জামার প্রান্ত তাতে সামান্যও মলিন হয়নি।"

একথা বলতে বলতে হুজুরের (সা) কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এলো। এ সময় উপস্থিত অন্যান্যরাও ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কাঁদছিলেন এবং নিজের বিচ্ছিন্ন সঙ্গীর জন্য অন্তরের অন্তস্থল থেকে মাগফিরাত কামনা করছিলেন। এক ব্যক্তি হুজুরের(সা) নিকট আরজ করলেন ঃ

"ইয়া রাসূলুল্লাহ, আবুস সায়েবকে আমরা কোথায় দাফন করবো।"

তখন পর্যন্ত মদীনায় মুসলমানদের কোন বিশেষ কবরিস্তান ছিল না। বিশ্ব নবী (সা) কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন এবং বললেন ঃ

"মাকামে বাকী'তে তাঁর কবর খোঁড়ো।"

সাহাবীরা (রা) নির্দেশ পালন করলেন। এ সময় হুজুর (সা) জানাযার সঙ্গে বাকীতে তাশরীফ নিলেন এবং জানাযার নামায পড়িয়ে দাফন তত্ত্বাবধান করার জন্য কবরের ওপর দাঁড়িয়ে গেলেন। দাফন সম্পন্ন হলে তিনি কবরের মাথায় একটি পাথর রেখে বললেন ঃ

"আজ থেকে আমি বাকী'কে মুসলমানদের কবরস্তানে পরিণত করলাম। ভবিষ্যতে যে মুসলমান মদীনায় শেষ সফরে যাত্রা করবেন তাকে এখানেই দাফন করা হবে।"

এই "আবুস সায়েব" যাঁর মৃত্যু সাইয়েদুল মুরসালিন খাইরুল বাশার (সা) সমেত সকল মুমিনকে কাঁদিয়েছিল এবং জান্নাতুল বাকী'র মাটি যাঁকে সর্বপ্রথম নিজের কোলে স্থান দিয়েছিল, তিনি ছিলেন হযরত উসমান (রা) বিন মাজউন।

আবুস সায়েব হযরত উসমান (রা) বিন মাজউন বিন হাবিব কুরাইশ খান্দানের বনু জামুহ'র সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। আল্লাহ্ তায়ালা তাকে নেক ও সুন্দর স্বভাব দান করেছিলেন। জাহেলী যুগেও তিনি খেল-তামাশা থেকে বিরত থাকতেন। উপরন্তু আরবরা সাধারণত যেসব নীতিহীন কাজে ব্যাপৃত থাকতো তা থেকেও তিনি পবিত্র ছিলেন। আল্লামা ইবনে সায়াদ বর্ণনা করেছেন যে, জাহেলী যুগে আরবে শিশুরা পর্যন্ত শরাব বা মদে অভ্যস্ত ছিল। কিন্তু উসমান (রা) বিন মাজউন সেই যুগেও শরাবকে ঘৃণা করতেন এবং বলতেন ঃ

"মদ পানে মানুষের জ্ঞান ও বিবেক লোপ পায়। তাতে মা-বোনের পার্থক্য থাকে না এবং উঁচু-নীচু সকলের বিদ্রূপের পাত্র হতে হয়। অতএব, কোন শরীফ ব্যক্তি এ ধরনের অপবিত্র বস্তু কেন ব্যবহার করবে।"

রহমতে আলম (সা) দাওয়াতে হক প্রদানের কাজ শুরু করলেন। এ সময় উসমানের (রা) মত নেক স্বভাবের মানুষ তাতে প্রভাবিত না হয়ে কি করে থাকতে পারতেন। তখন কেবলমাত্র ১৩ ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। একদিন হযরত উসমান (রা) বিন মাজউন ও হযরত আবু উবায়দা (রা) ইবনুল জাররাহ, হযরত আবদুর রহমান (রা) বিন আওফ, হযরত উবায়দা (রা) ইবনুল হারিছ এবং হযরত আবু সালমা (রা) ইবনুল আসাদের সঙ্গে সাকিয়ে কাউসারের (সা) খিদমতে হাজির হলেন এবং তাঁর পবিত্র হাত থেকে তাওহীদের পেয়ালা পান করে মুসলমানদের কাতারে শামিল হয়ে গেলেন। তারপর তিনিও অন্যান্য হকপন্থীর মত মুশরিকদের জুলুম-নির্যাতন, ঠাট্টা, বিদ্রূপ ও অর্থনৈতিক চাপের শিকার হলেন। পরিস্থিতি যখন সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেল তখন নবুওয়াতের পঞ্চম বছরে প্রিয় নবী (সা) মুসলমানদেরকে পরামর্শ দিয়ে বললেন, "বর্তমানে তোমরা এখান থেকে বের হয়ে হাবশা চলে যাও। সেখানে একজন নেকদিল এবং ন্যায় স্বভাবের বাদশাহ্‌র রাজত্ব রয়েছে। সে তোমাদেরকে আশ্রয় দেবে। যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ তায়ালা এই পরিস্থিতি

পরিবর্তনের কোন ব্যবস্থা করে না দেন ততক্ষণ তোমরা সেখানেই অবস্থান করবে।"

হুজুরের (সা) ইঙ্গিত পেয়ে মুসলমানদের এক বিরাট সংখ্যা হিজরতের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন। কিন্তু একই সময়ে বেশী সংখ্যায় হিজরত করা সম্ভব ছিল না। কেননা মুসলমানরা এভাবে জীবন নিয়ে বাইরে চলে যাবে, তা কুরাইশদের সহ্যের বাইরের ব্যাপার ছিল। সুতরাং সর্বপ্রথম ১২ জন পুরুষ এবং চার জন মহিলা সমন্বয়ে গঠিত একটি ছোট দলের কাফেলা হাবশা বা আবিসিনিয়া রওয়ানা হলো। এই কাফেলায় হযরত উসমান (রা) বিন মাজউন ছাড়া হযরত উসমান জুন্নুরাইন (রা), হযরত যোবায়ের (রা) ইবনুল আওয়াম, হযরত আবদুর রহমান (রা) বিন আওফ এবং হযরত মুসয়াব (রা) বিন উমায়েরের মত জালিলুল কদর সাহাবীও শামিল ছিলেন। ইবনে হিশাম বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর পথে হিজরতকারী এই প্রথম কাফেলার আমীর নিয়োজিত হয়েছিলেন হযরত উসমান (রা) বিন মাজউন। এই ব্যক্তিবর্গ লুকিয়ে ছাপিয়ে শুয়াইবিয়া বন্দর পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন এবং হাবশা গমনকারী দুই বাণিজ্যিক জাহাজে চেপে বসলেন। ইত্যবসরে কুরাইশদের কানে তাঁদের চলে যাওয়ার খবর পৌঁছলো। খবর শুনে তারা বিদ্যুৎবেগে তাঁদের পশ্চাদ্ধাবন করে উপকূল পর্যন্ত পৌঁছে গেল। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে কুরাইশদের পৌঁছার পূর্বেই উভয় জাহাজই বন্দর থেকে রওয়ানা হয়ে গিয়েছিল। হক পথের এই মুসাফিররা হাবশা পৌঁছে অত্যন্ত শান্তি ও নিরাপত্তার সঙ্গে দিন অতিবাহিত করতে লাগলেন। এই অবস্থায় সেখানে তিন মাসই কেবল কেটেছিল। এমন সময় তাঁরা এক উড়ন্ত খবর পেলেন যে, মক্কায় সকল মুশরিক ইসলাম গ্রহণ করেছেন [অথবা রাসূলে আকরাম (সা) এবং কুরাইশদের মধ্যে আপোস হয়ে গেছে এবং কুরাইশরা হুজুরের (সা) বিরোধিতা পরিত্যাগ করেছে।] এ খবর শুনে তাঁরা খুব খুশী হলেন এবং সকলেই মক্কা মুয়াজ্জামার দিকে যাত্রা করলেন। মক্কার নিকট পৌঁছে তাঁরা জানতে পেলেন যে, খবরটি ছিল ভিত্তিহীন। এখন এই ছিন্নমূল দল একদম ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন। ভাবতে লাগলেন যে, হাবশা ফিরে যাবেন, না মক্কায় প্রবেশ করে পুনরায় কাফেরদের নির্যাতনের শিকার হবেন। অনেক চিন্তা-ভাবনার পর শেষে তাঁরা সিদ্ধান্ত নিলেন যে, নিজেদের অমুসলিম আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব অথবা কুরাইশের কতিপয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সাহায্য (আশ্রয়) নিয়ে শহরে প্রবেশ করবেন। সুতরাং সকলেই কারো না কারোর আশ্রয় নিয়ে শহরে প্রবেশ করলেন। হযরত উসমান (রা) বিন মাজউনকে বনু মাখযুমের সরদার ওয়ালিদ বিন মুগিরা [হযরত খালিদ সাইফুল্লাহর (রা) পিতা] আশ্রয় দিল এবং তিনি মক্কায়

শান্তি ও নিরাপত্তার সঙ্গে থাকতে লাগলেন। কিন্তু বেশী দিন না যেতেই তিনি মানসিক দিক দিয়ে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে গেলেন। তিনি যখন দেখতেন যে, মক্কার মুশরিকরা বিশ্ব নবী (সা) ও অন্যান্য হকপন্থীর ওপর চরম নির্যাতন চালাচ্ছে এবং তিনি ওয়ালিদের আশ্রয়ে আরামের সঙ্গে দিন অতিবাহিত করছেন তখন চরম লজ্জাবোধ করতেন। তিনি মনে মনে ভাবতেন যে, আফসোস! আমার আকা ও মাওলা এবং আমার দীনি ভাইয়েরা বিভিন্ন ধরনের মুসিবতে লিপ্ত রয়েছেন। আর আমি এক মুশরিকের সহযোগিতায় সুখ ও আরামের জীবন অতিবাহিত করছি। আল্লাহর কসম! এটা তো শুধুমাত্র নফস পূজা। অতএব, একদিন তিনি অত্যন্ত বেচাইন হয়ে ওয়ালিদের নিকট পৌঁছলেন এবং তাঁকে বললেন ঃ

"হে আবা আবদি শামস, তুমি তোমার সহযোগিতার হক আদায় করেছ। এখন আর আমি তোমার আশ্রয়ে থাকতে চাই না। আমার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা) এবং তাঁর সাহাবীদের নমুনাই যথেষ্ট।"

ওয়ালিদ বললো, "পুত্র, বলোতো কি হয়েছে! তোমাকে কি কেউ কোন কষ্ট দিয়েছে?"

হযরত উসমান (রা) বললেন ঃ

"না এমন কিছু হয়নি। ব্যাস, আমি এখন শুধু আল্লাহ তায়ালার আশ্রয় চাই। অন্য কারো সহযোগিতা আমার প্রয়োজন নেই।"

ওয়ালিদ বললো, "তুমি যদি তাই চাও, তাহলে হেরেম শরীফে গিয়ে সবার সামনে আমার আশ্রয় থেকে বের হয়ে যাওয়ার ঘোষণা দাও। কেননা আমিও এমনিভাবে তোমাকে আমার আশ্রয়ে নিয়েছিলাম।"

হযরত উসমান (রা) সেজন্য তৎক্ষণাৎ তৈরী হয়ে গেলেন। ওয়ালিদ তাঁকে সঙ্গে নিয়ে হেরেমে গেলেন এবং সাধারণ মানুষের সামনে তাঁর ইচ্ছার কথা প্রকাশ করলেন। হযরত উসমান (রা) দাঁড়িয়ে তার সত্যতা স্বীকার করলেন এবং বললেন ঃ

"হে মক্কাবাসী! আমি ওয়ালিদকে একজন প্রতিশ্রুতি পূরণকারী এবং শরীফ মানুষ হিসেবে পেয়েছি। সে আমার সহযোগিতার সম্পূর্ণ হক আদায় করেছে। কিন্তু আল্লাহর আশ্রয় ছাড়া অন্য কারোর আশ্রয়ে থাকা আমার পসন্দ নয়। এ জন্য ওয়ালিদের আশ্রয় আমি ফিরিয়ে দিয়েছি।"

ওয়ালিদ বিন মুগিরার আশ্রয় পরিত্যাগ করা জুলুম-নির্যাতনের অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ারই নামান্তর ছিল। মুশরিকরা হকপন্থীদের জন্য এই অগ্নিকুণ্ড

প্রজ্বলিত করে রেখেছিল। কিন্তু হযরত উসমান (রা) বিন মাজউন নিজের আকা ও মাওলা (সা) এবং অন্যান্য হকপন্থীদের অনুসরণে প্রত্যেক ধরনের আরাম-আয়েশ থেকে মুখাপেক্ষীহীন হয়ে বীরত্বের সঙ্গে সেই অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

সেই যামানায় জাহেল আরবের মশহুর কবি লবিদ বিন রবিয়ার মক্কায় আগমন ঘটে। আবু আকিল লবিদ (রা) বিন রবিয়া আমেরী আরবের জাহেলী যুগে অন্যতম মহান কবি ছিলেন। তিনি ইমরুল কায়েস, নাবেগা জুবিয়ানী, জোহায়ের বিন আবি সালমা, আমর বিন কুলছুম, আ'শা বিন কায়েস এবং তারাফা ইবনুল আবদের সমকক্ষ কবি ছিলেন। তিনি আস-সাবউল মুয়াল্লাকাতের অন্যতম ছিলেন। একবার নিজের চাচাদের সঙ্গে নু'মান আবু কাবুসের দরবারে গেলেন। সেখানে মহান জাহেলী কবি নাবেগা জুবিয়ানীর সঙ্গে সাক্ষাত হলো। তিনি তাঁর কবিতা শুনে খুব প্রশংসা করলেন এবং বললেন যে, তুমি বনি আমের ও বনু কায়েসের সকল কবি থেকে সামনে অগ্রসর হয়ে গেছ। অতপর সে ধীরে ধীরে আরবের জাহেলী যুগের কবিদের প্রথম কাতারে এসে গেলেন। নবম হিজরীতে বনি জাফর বিন কিলাব গোত্রের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে নবীর (সা) দরবারে হাজির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। কথিত আছে যে, ইসলাম গ্রহণের সময় তাঁর বয়স ছিল ৯০ বছর। কিন্তু সাধারণ বুদ্ধি অনুযায়ী এই রেওয়ায়াতের বক্তব্য অসম্ভব বলে মনে হয়। কেননা, ইবনে আছিরের বর্ণনা অনুযায়ী তিনি ১ হিজরীতে ওফাত পেয়েছিলেন। এ সময় তাঁর বয়স ছিল ১৪৫ বছর। এই হিসেব অনুযায়ী ইসলাম গ্রহণের সময় তাঁর বয়স প্রায় ১১৩ বছর ছিল।

সুতরাং ইসাবা ও আগানির এই রেওয়ায়াতও সঠিক নয় যে, লবিদ (রা) ইসলামী অবস্থায় ৫৫ বছর জীবিত ছিলেন। ঈমান আনার পর লবিদ (রা) কবিতা রচনা ত্যাগ করেন এবং আমৃত্যু একটি অথবা দু'টি ছাড়া কোন কবিতা বলেননি। তিনি বলতেন যে, আল্লাহ্ কবিতার বিনিময়ে আমাকে সূরায়ে বাকারা এবং আলে ইমরান প্রদান করেছেন।

চরিতকাররা লিখেছেন যে, লবিদ (রা) জাহেলিয়াত এবং ইসলাম উভয় যুগেই অত্যন্ত উদার, বাহাদুর, সত্যবাদী, ঘোড়সওয়ার এবং শরীফ মানুষ ছিলেন। হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র) লিখেছেন যে, স্বয়ং বিশ্বনবী (সা) লবিদের (রা) কতিপয় কবিতা পসন্দ করতেন।

তিনি তখনো ইসলাম গ্রহণ করেননি। মক্কার মুশরিকরা তাঁকে ধরাধরি করে নিয়ে গেল এবং তিনি নিজের কাব্যের মাহফিল গরম করতে লাগলেন।

একবার তিনি কুরাইশের এক মজলিসে নিজের কাসিদা শুনাচ্ছিলেন। তিনি যখন এই পংক্তি শুনালেন ঃ

আলা কুল্লু শাইয়িন মা খালাল্লাহ বাতিলুন—

(সতর্ক থেকো, আল্লাহ ছাড়া প্রত্যেক বস্তুই বাতিল) এ সময় সেই মজলিসে উপস্থিত হযরত উসমান (রা) বিন মাজউন নির্দ্বিধায় বলে উঠলেন ঃ "সম্পূর্ণ ঠিক কথা, তুমি সত্যি কথা বলেছ।"

কিন্তু যখন তিনি দ্বিতীয় পংক্তি আবৃত্তি করলেন ঃ

ওয়া কুল্লু নায়িমুন লা মাহালাহু যায়েলু-

(এবং প্রত্যেক নিয়ামত নিসন্দেহে ধ্বংস হয়ে যাবে) এই পংক্তি শুনে উসমান (রা) বলে উঠলেন ঃ "এটা ভুল কথা। জান্নাতের নিয়ামতসমূহ চিরস্থায়ী এবং কখনো ধ্বংস হবে না।" এই কথায় সারা মাজমায় চেঁচামেচি শুরু হলো। লোকজন হযরত উসমানকে (রা) গালমন্দ দিতে লাগলো এবং লবিদের নিকট এই কবিতা দ্বিতীয়বার পড়ার ফরমায়েশ করলো। তিনি তাঁর কবিতার পুনরুক্তি করলেন। হযরত উসমানও (রা) নিজের কথা পুনর্ব্যক্ত করলেন। তাতে লবিদ অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হলেন এবং কুরাইশদের সম্বোধন করে বললেন ঃ

"হে কুরাইশ ভইয়েরা! খোদার কসম, পূর্বে তোমাদের মজলিসসমূহের এই অবস্থা ছিল না। কারোর জন্য তা লজ্জারও ছিল না এবং কেউ তাতে বদতমিজীও করতে পারতো না। এই ব্যক্তি যদি আমাকে এভাবে বাধা দান করে তাহলে আমার কবিতা শুনানো হয়ে গেছে।"

লবিদের কথা শুনে মুশরিকরা জ্বলে উঠলো এবং বনু মুগিরার এক ব্যক্তি উঠে হযরত উসমানের (রা) মুখের ওপর এমন জোরে থাপ্পড় মারলো যে, তাঁর চোখ নীল হয়ে গেল। ওয়ালিদ বিন মুগিরা পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন। বলতে লাগলেন, "বেটা, তুমি যদি আমার আশ্রয়ে থাকতে, তাহলে কার সাহস ছিল যে, তোমার গায়ে হাত দেয়। হযরত উসমান তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন, 'হে আবা শামস, আমার দ্বিতীয় চোখও হক পথে এই ধরনের আঘাত খাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে আছে।"

ওয়ালিদ বললো, 'উসমান, তুমি পুনরায় আমার আশ্রয়ে এসে যাও। এটাই ভাল।' তিনি কোন চিন্তা-ভাবনা না করেই জবাব দিলেন, "আমার জন্য শুধু আল্লাহর আশ্রয়ই যথেষ্ট।"

এক রেওয়ায়াতে আছে যে, আল্লাহ তায়ালা সেই মজলিসেই ওয়ালিদের এক ভ্রাতুষ্পুত্র আবদুল্লাহ বিন আবি উমাইয়াকে হযরত উসমানের (রা) পক্ষে দাঁড় করিয়ে দিলেন এবং সে ঘুষি মেরে গালি দানকারীর নাক ভেঙ্গে দিলেন। এই ঘটনার পর মক্কার মুশরিকরা পূর্বের থেকে আরো কয়েকগুণ শক্তিতে মুসলমানদের ওপর জুলুম-নির্যাতন শুরু করে দিল। এই নির্যাতন যখন সীমা ছাড়িয়ে গেল, তখন বিশ্ব নবী (সা) হকপন্থীদেরকে পুনরায় হাবশা গমনের অনুমতি দিলেন। কিন্তু এবার মক্কা থেকে বের হওয়া খুব কঠিন ব্যাপার ছিল। তা সত্ত্বেও ৮৩ জন পুরুষ ও ২০ জন মহিলা হাবশা গমনে সফল হন। এই দলে হযরত উসমান (রা) বিন মাজউন, তাঁর অল্পবয়স্ক পুত্র সায়েব (রা) এবং দুই ভাই কুদামা (রা) বিন মাজউন এবং আবদুল্লাহ (রা) বিন মাজউনও শামিল ছিলেন।

মক্কার মুশরিকরা যখন জানতে পেলো যে, এত বেশী সংখ্যক মুসলমান হাবশা গমন করে শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে দিন কাটাচ্ছে, তখন তারা ছটফট করে উঠলো এবং আবদুল্লাহ বিন রবিয়া (আবু জেহেলের বৈমাত্রেয় ভাই) ও আমর ইবনুল আছকে অনেক মূল্যবান উপঢৌকনসহ হাবশার বাদশাহ নাজ্জাশীর (যার নাম আসমাহা বলে বলা হয়ে থাকে) নিকট প্রেরণ করে। প্রতিনিধি দল প্রেরণের উদ্দেশ্য ছিল যাতে তারা কোন না কোন উপায়ে মুহাজিরদেরকে হাবশা থেকে বের করে দেয়ার জন্য নাজ্জাশীকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। কিন্তু দুই সদস্যের এই প্রতিনিধি দলের মিশন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।(পক্ষান্তরে এই মিশনের উল্টো ফল ফলে। স্বয়ং নাজ্জাশী ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন।)

হাবশায় এসব মুহাজিরের চার-পাঁচ বছর কেটে গেল। একদিন তাঁরা খবর পেলেন যে, রহমতে আলম (সা) মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনা তাশরীফ নিয়ে গেছেন। এ খবর পেয়ে তারাও হুজুরের (সা) খিদমতে হাজির হওয়ার জন্য অস্থির হয়ে গেলেন। কিন্তু অসহায়ত্ব এবং মদীনা মুনাওয়ারার দীর্ঘ জল ও স্থলের সফর তাদের পথের প্রধান অন্তরায় ছিল। তা সত্ত্বেও ৩৩ জন পুরুষ এবং ৮ জন মহিলা মক্কা মুয়াজ্জামার পথে মদীনা মুনাওয়ারা গমনের জন্য যাত্রা করলেন। কিছুদিন পর তারা ভালভাবে মক্কা মুয়াজ্জামা পৌঁছলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন হযরত উসমান (রা) বিন মাজউন, তাঁর পুত্র সায়েব (রা) এবং দুই সহোদর। মক্কা মুয়াজ্জমায় কিছু দিন অতিবাহিত করার পর হযরত উসমান (রা) নিজের পরিবার-পরিজন ও খান্দান সমেত মদীনা হিজরত করেন। আল্লামা ইবনে সায়াদ (র) বর্ণনা করেছেন যে, "হযরত উসমান (রা)

বিন মাজউন মক্কা থেকে এমনভাবে বিদায় হন যে, তার খান্দানের কেউই আর সেখানে রইলেন না এবং তার গৃহসমূহে তালা পড়ে গেল।"

মদীনা পৌঁছে এসব সাহাবী (রা) হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন সালমা আজলানীর গৃহে অবস্থান করলেন। হুজুর (সা) তাঁদের আগমনের খবর পেয়ে খুব খুশী হলেন এবং হযরত উসমান (রা) ও তাঁর ভাইদের গৃহ নির্মাণের জন্য কয়েক খণ্ড প্রশস্ত জমি দান করলেন। কয়েক মাস পর রাসূলে আকরাম (সা) মুহাজির এবং আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেন। এ সময় হযরত উসমান (রা) বিন মাজউনকে জালিলুল কদর সাহাবী হযরত আবুল হাছিম (রা) বিন তিহান আনসারীর দ্বীনি ভাই বানালেন। দ্বিতীয় হিজরীর মুবারক রমযান মাসে হযরত উসমান (রা) বিন মাজউন হক ও বাতিলের প্রথম যুদ্ধ বদরের যুদ্ধে অংশ নেয়ার মহান মর্যাদা লাভ করেন। এই যুদ্ধে তিনি খুব বীরত্ব প্রদর্শন করেন। কুরাইশের এক যুদ্ধবাজ আউসুল মা'বায় বিন সুবান মুসলমানদের ওপর খুব বেশী বেশী হামলা করছিলো। হযরত উসমান (রা) তরবারী হাতে তার দিকে অগ্রসর হলেন। ইত্যবসরে হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুও সেখানে পৌঁছে গেলেন এবং উভয় জানবাজ মুহূর্তের মধ্যে তাকে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দিলেন।

অন্য আরেকজন মুশরিক হানজালা বিন কাবিসাকে হযরত উসমান (রা) পরাজিত করে জীবিত গ্রেফতার করে নিলেন। যুদ্ধের ময়দান থেকে ফিরে আসার পর অসুস্থ হয়ে পড়লেন। আনসারী ভাই এবং তাঁর পরিবার পরিজনেরা অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে সেবা শুশ্রূষা করলেন। কিন্তু তার অসুস্থতার মেয়াদ বৃদ্ধিই পেতে থাকলো। এমনকি দ্বিতীয় হিজরীর শেষের দিকে স্রষ্টার তরফ থেকে ডাক এলো। তাঁর ওফাতে মদীনা মুনাওয়ারাতে কান্নার রোল পড়ে গেল। যিনিই তাঁর মৃত্যুর খবর শুনলেন তিনিই মাথা ধরে বসে পড়লেন। হযরত উসমান (রা) অসুস্থতার পূর্ণ সময়টাই হযরত উম্মুল আ'লা আনসারীয়ার (রা) গৃহে কাটিয়েছিলেন এবং সেখানেই ইন্তেকাল করেন। রহমতে আলম (সা) স্বয়ং দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে উম্মুল আ'লার গৃহে তাশরীফ নিলেন এবং মাইয়্যেতের কপালে তিনবার চুমু দিলেন। উম্মুল আ'লা হুজুরের (সা) সামনে মাইয়্যেতকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

"আবুস সায়েব তোমার ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তোমাকে সম্মানিত করেছেন।"

হুজুর (সা) যদিও স্বয়ং হযরত উসমানকে (রা) খুব ভালবাসতেন তবুও তিনি বললেন, "উম্মুল আ'লা তুমি তা কি করে জানলে?" তিনি আরজ

করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল, আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। আল্লাহ তায়ালা আবুস সায়েবের মত মানুষকে ইজ্জত না দিলে আর কাকে দেবেন।"

হুজুর (সা) ফরমালেন ঃ

"নিসন্দেহে উসমান ইসলামের চরম পর্যায়ে আসীন ছিলেন এবং আমি তার জন্য আল্লাহর নিকট কল্যাণের আশা করি। কিন্তু আল্লাহর কসম, আমি আল্লাহর রাসূল হয়েও (স্বয়ং) জানি না যে, আমার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করা হবে।" (সহীহ বুখারী)

(হাদিস ব্যাখ্যাকারীরা লিখেছেন যে, হুজুরের (সা) এই ইরশাদ লোকদেরকে একথা বোঝানোর জন্য ছিল যে, মুসলমানের মৃত্যুতে তার আখিরাত সম্পর্কে ইয়াকিনীভাবে বা স্থির চিত্তে কিছু বলো না। হতে পারে যে, একব্যক্তি বাহ্যিকভাবে খুব নেক ছিলেন। আল্লাহ তায়ালা তার কোন কাজে পাকড়াও করে নেবেন যা আমাদের দৃষ্টির আড়ালে ছিল। এমনিভাবে এও হতে পারে যে, কোন ব্যক্তি বাহ্যিকভাবে খুব বদকার ছিল। আল্লাহ তায়ালা তার কোন বিশেষ নেকীকে কবুল করে ক্ষমা করে দিতে পারেন। এ জন্য আমাদেরকে স্বয়ং কোন ব্যক্তির বেহেশতী ও দোযখী হওয়ার "স্বাক্ষ্য" দেয়া উচিত নয়।)

হযরত উসমান (রা) বিন মাজউন মৃত্যুকালে দু'পুত্র রেখে যান। তাঁরা হলেন, আবদুর রহমান এবং সায়েব (রা)। আবদুর রহমানের জীবনী চরিত গ্রন্থে পাওয়া যায় না। অবশ্য হযরত সায়েব ইতিহাসে খুব প্রসিদ্ধি লাভ করেন এবং জালিলুল কদর সাহাবী হিসেবে পরিগণিত হন। তিনি পিতার সঙ্গে দুই হিজরতের মর্যাদা লাভ করেন এবং রাসূলের (সা) যুগের সকল যুদ্ধে অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে অংশ নেন। তিনি অত্যন্ত সম্মানিত মানুষ ছিলেন এবং রাসূলে আকরামও (সা) তাঁকে খুব সম্মান করতেন। তিনি বুয়াতের যুদ্ধে তাশরীফ নেয়ার সময় হযরত সায়েবকে (রা) মদীনা মুনাওয়ারাতে নিজের স্থলাভিষিক্ত করে যান। হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) শাসনামলে হযরত সায়েব (রা) ইয়ামামার যুদ্ধে অংশ নেন এবং পূর্ণ জানবাজীর সঙ্গে লড়াই করেন। সেই যুদ্ধে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন এবং কিছুদিন পর সেই ব্যথাতেই ওফাত পান। সে সময় তাঁর বয়স ছিল ৩০ বছরের কিছু বেশী।

হযরত উসমান (রা) বিন মাজউনের স্ত্রীর নাম ছিল খাওলা বিনতে হাকিম। তিনি সুলাইম গোত্রের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন এবং মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলের রেওয়ায়াত অনুযায়ী আত্মীয়তার দিক থেকে রাসূলে আকরামের

(সা) খালা হতেন। তিনি জালিলুল কদর মহিলা সাহাবীদের মধ্যে পরিগণিত ছিলেন। অত্যন্ত ইবাদাত গুজার ও নেক সিরতের মহিলা ছিলেন। তাঁর থেকে ১৫টি হাদিস বর্ণিত আছে। হযরত উসমান (রা) বিন মাজউনের ওফাতের পর তিনি জীবনে আর দ্বিতীয় বিয়ে করেননি। হযরত সায়েব (রা) এবং আবদুর রহমান তাঁরই গর্ভজাত ছিলেন।)

হযরত উসমান (রা) বিন মাজউনের চারিত্রিক বৈশিষ্টের মধ্যে ছিল নেক স্বভাব, দ্বীনে অটলতা, রাসূল প্রেম, বীরত্ব ও বাহাদুরী, শরম ও হায়া এবং প্রচণ্ড খোদাভীতি। এমনিতে জাহেলী যুগেই তাঁর পবিত্রতার খ্যাতি ছিল। কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পর এই রং আরও উজ্জ্বল হয়। আল্লাহর ইবাদাতের প্রতি সীমাহীন আকর্ষণ ছিল। প্রায় দিনই অব্যাহতভাবে রোযা রাখতেন এবং রাতের পর রাত জেগে ইবাদাত করতেন। মুসনাদে আবু দাউদে আছে যে, রাসূলে আকরাম (সা) অব্যাহত রাত্রি জাগরণ এবং ইবাদাতের অবস্থা জানতে পেয়ে তাঁকে ডেকে পাঠান। তিনি যখন হাজির হলেন তখন হুজুর (সা) বললেন ঃ

"উসমান! তুমি কি আমার সুন্নাতের প্রতি বিরক্ত?"

তিনি আরজ করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল। আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। খোদার কসম, এমন কথা নয়। আপনার সুন্নাত তো আমার জন্য পথের মশাল স্বরূপ।"

হুজুর (সা) বললেন, "তাহলে শোনো, আমি ঘুমাই এবং নামাযও পড়ি। রোযাও রাখি এবং ইফতারও করি এবং মহিলাদের বিয়েও করি। উসমান, আল্লাহকে ভয় কর। তোমার ওপর তোমার স্ত্রীরও হক রয়েছে। তোমার মেহমানেরও তোমার ওপর হক আছে এবং তোমার নফসেরও তোমার ওপর হক আছে। এজন্য তুমি রোযাও রাখো এবং ইফতারও কর। নামাযও পড় এবং শয়নও করো।"

আল্লামা ইবনে সায়াদ (র) এই ঘটনা অন্যভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন যে, ইবাদাতে হযরত উসমান (রা) বিন মাজউনের ব্যস্ততা এতো বৃদ্ধি পেয়েছিল যে তিনি বিবি বাচ্চাদের থেকেও মুখাপেক্ষীহীন হয়ে পড়েছিলেন। ফলে তাঁর স্ত্রী সাজ-সজ্জা ও প্রসাধন করাও পরিত্যাগ করেছিলেন এবং খুব সাদাসিধে ও খারাপ অবস্থায় থাকতে লাগলেন। একদিন তিনি ঘটনাক্রমে নবীর (সা) হেরেমে এলেন। এ সময় উম্মুহাতুল মু'মিনীন তাঁকে এই অবস্থায় দেখে খুব বিস্মিত হলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, "খাওলা, তোমার অবস্থা কেন এমন করে রেখেছ। তোমার স্বামী তো কুরাইশের সুখী মানুষদের

মধ্যে পরিগণিত।" তিনি বললেন, "তাঁর সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক। সে তো সারা দিন রোযা রাখে আর সারারাত নামায পড়ে।"

উম্মুহাতুল মু'মিনীন কথার গভীরে পৌঁছে গেলেন এবং সারওয়ারে আলমের (সা) নিকট হযরত উসমানের (রা) ব্যবহারের কথা উল্লেখ করলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ হযরত উসমানের (রা) গৃহে তাশরীফ নিলেন এবং তাঁকে বললেন, "উসমান, আমি কি তোমার জন্য নমুনা বা আদর্শ নই?"

তিনি আরজ করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। কি ব্যাপার ঘটেছে।"

ফরমালেন : "তুমি কি অব্যাহতভাবে রোযা রাখো এবং সারারাত ইবাদাতে মশগুল থাকো?" আরজ করলেন, "হ্যাঁ, আল্লাহর রাসূল।" বললেন, "এমন করো না। তোমার ওপর তোমার চোখের, তোমার শরীরের এবং তোমার বিবি-বাচ্চারও হক আছে। নামাযও পড় এবং আরামও কর। রোযাও রাখো এবং ইফতারও করো।" হযরত উসমান (রা) আরজ করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! ভবিষ্যতে এমনি করব।"

এই ঘটনার কিছুদিন পর হযরত উসমানের (রা) স্ত্রীর পুনরায় নবীর হেরেমে যাওয়ার সুযোগ ঘটলো। সে সময় তিনি সেজেগুজে অত্যন্ত আনন্দচিত্তে ছিলেন।

সহীহ বুখারীতে আছে যে, একবার হযরত উসমান (রা) দুনিয়া থেকে খুব বেজার হয়ে গিয়েছিলেন এবং কামশক্তিকে ধ্বংস করে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করতে এবং দুনিয়ার নেয়ামত পরিত্যাগ করতে চেয়েছিলেন। হুজুর (সা) তাঁর ইচ্ছার কথা জানতে পেরে তাঁকে ডেকে বুঝিয়ে বললেন যে, "যে ব্যক্তি জেনে বুঝে নিজের কামশক্তিকে ধ্বংস করবে (খাসি হবে অথবা খাসি করাবে) সে আমার উম্মত বলে পরিগণিত হবে না। তোমাদের উচিত আমাকে আদর্শের নমুনা বানানো। আমি গোশতও খাই এবং নিজের স্ত্রীর নিকটও গমন করি, রোযাও রাখি এবং ইফতারও করি।"

হুজুরের (সা) উপদেশে হযরত উসমান (রা) নিজের ইচ্ছা পরিত্যাগ করেন।

হযরত উসমানের (রা) স্বভাবে লজ্জা-শরমের উপাদানও প্রচুর পরিমাণে ছিল। এমনকি তিনি একাকীও উলঙ্গ হওয়াটা পসন্দ করতেন না। একদিন প্রিয় নবীর (সা) সামনে নিজের স্বভাবের এই দিকটির কথা উল্লেখ করলে তিনি ফরমালেন : "উসমান, আল্লাহ তায়ালা তোমার স্ত্রীকে তোমার জন্য এবং তোমাকে তার জন্য পর্দাহীন বানিয়েছেন"।

তিনি যখন নবীর (সা) মজলিস থেকে বিদায় নিলেন তখন হুজুর (সা) প্রশংসার সুরে বললেন : "উসমান বিন মাজউনের লজ্জা ও পর্দাপুশীদা চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে।"

হযরত উসমান (রা) শুধু আবিদই ছিলেন না, বরং জিহাদের ময়দানের বাঘও ছিলেন। বস্তুত বদরের যুদ্ধে তিনি খুব বীরত্ব প্রদর্শন করেন। এই যুদ্ধের কিছুদিন পরই তিনি ওফাত পান। এসত্ত্বেও তাঁর জানবাজ পুত্র সায়েব (রা) পিতার প্রতিনিধিত্বের হক আদায় করেন এবং নবীযুগের সকল যুদ্ধে জীবনবাজি রেখে অংশগ্রহণ করেন।

হযরত সোহায়েব রুমী (রা)

রহমতে আলম (সা) হিজরতের পর কিছুদিন কুবাতে অবস্থান করলেন। কুবায় অবস্থানকালে হুজুর (সা) একদিন কতিপয় সাহাবীর সাথে বসে খেজুর খাচ্ছিলেন। ইতিমধ্যে মধ্য আকৃতি, ঘন দাড়ি এবং খুব লাল চেহারার মুশকিলে পড়া এক ব্যক্তি নবীর (সা) মজলিসে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর পোশাক ছিল ধূলায় ধূসরিত। চেহারায় ছিল ক্লান্তির ছাপ এবং একচোখে পট্টি বাঁধা ছিল। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল যে, তিনি এক লম্বা সফর থেকে আসছেন এবং তার চোখে ছিল ব্যথা। সেই ব্যক্তি মহানবী (সা) ও উপস্থিত অন্যদেরকে সালাম করলেন এবং কোন কিছু না বলেই খেজুর খেতে শুরু করলেন। খাওয়ার ধরন থেকে মনে হচ্ছিল যে, তিনি ক্ষুধার্ত ছিলেন। হযরত ওমর ফারুকও (রা) সে সময় উপস্থিত ছিলেন। তিনি হয়রান হয়ে জিজ্ঞেস করলেনঃ

"হে আল্লাহর রাসূল! দেখুন, তাঁর চোখ ব্যথা করছে। অথচ কি গোগ্রাসে খেজুর সাবাড় করছে।"

বস্তুত চোখের অসুখের সময় খেজুর খাওয়াটা ক্ষতিকর হয়। এ জন্য হুজুরও (সা) সেই ব্যক্তিকে সম্বোধন করে বললেন ঃ "সুবহানাল্লাহ! তোমার চোখে অসুখ হয়েছে। আর তুমি খেজুর খাচ্ছ!"

সেই ব্যক্তি আরজ করলেন ঃ "ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি ভাল চোখটির পক্ষ থেকে খাচ্ছি।"

তাঁর জবাব শুনে সারওয়ারে আলম (সা) এভাবে হাসলেন যে, পবিত্র দাঁত থেকে আলো বিচ্ছুরিত হতে লাগলো। খেজুর খাওয়া শেষ করে সেই ব্যক্তি হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) প্রতি ফিরে বললেন ঃ "জনাব, আপনিতো স্বয়ং রাসূলের (সা) সঙ্গে এসে গেলেন। অথচ আমাকে সঙ্গে আনলেন না।"

অতপর হুজুরের (সা) খিদমতে আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। আপনিও এই অক্ষমের কথা খেয়াল করেননি। আমি মক্কায় একাকী রয়ে গেলাম। আর কুরাইশরা আমার ওপর চড়ে বসলো। নিজের ধন-সম্পদ ও আসবাবপত্র সবকিছু তাদেরকে দিয়ে অতি কষ্টে জীবন বাঁচিয়ে আপনার নিকট পৌঁছেছি।"

হুজুর (সা) মুচকি হেসে বললেন ঃ "আবু ইয়াহইয়া, তুমি বড় লাভজনক ব্যবসা করেছ।" আবু ইয়াহইয়া, তুমি বড় লাভজনক ব্যবসা করেছ।"

সেই সঙ্গেই আল্লাহর ওহির এই বাক্যাবলী নবীর (সা) যবানে জারি হয়ে গেল ঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِىْ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ -

"অপরদিকে মানুষের মধ্যেই এমন লোক রয়েছে যে কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যেই নিজের জীবন প্রাণ উৎসর্গ করে, বস্তুত আল্লাহ এসব বান্দাহর প্রতি খুবই অনুগ্রহশীল।" (আল বাকারাহ, ২০৭)

এই ব্যক্তি যাঁর অটলতা এবং কুরবানী আল্লাহর দরবারে স্পষ্ট ভাষায় গৃহীত হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছিল এবং যাঁর ত্যাগের আবেগকে সৃষ্টির সেরা ও গৌরব মাহবুবে খোদা (সা) প্রশংসা করেছিলেন তিনি ছিলেন হযরত সোহায়েব (রা) বিন সিনান রুমী।

সাইয়েদেনা হযরত সোহায়েব (রা) বিন সিনান, হযরত বলাল হাবশী (রা), আম্মার (রা) বিন ইয়াসির (রা), আমের (রা) বিন ফাহিরাহ, খাব্বাব (রা) বিন আরাত এবং আবু ফাকিহার (রা) মত মহান মর্যাদা সম্পন্ন সাহাবী হিসেবে পরিগণিত হতেন। আল্লাহর এই পবিত্র বান্দা মক্কায় উদ্বাস্তু ছিলেন এবং ইসলামের শত্রুদের গৃহে গোলামীর যিন্দেগী যাপন করতেন। কিন্তু যেই তাঁর কানে হকের পয়গাম পৌঁছলো তক্ষণি তিনি তা কবুল করতে এক মুহূর্তও চিন্তা করলেন না। এমনিভাবে তিনি সাবিকুনাল আউওয়ালুনের পবিত্র দলের শামিল হয়ে গেলেন। এটা ছিল দাওয়াতে হকের প্রারম্ভিক কাল। যে ব্যক্তিই ইসলামের নিয়ামত গ্রহণ করে নিজেকে সৌভাগ্যমণ্ডিত করতেন সে-ই কাফেরদের চরম জুলুম-নির্যাতনের শিকার হয়ে যেতেন। তিনি বিদেশী হওয়ার কারণে বন্ধু-বান্ধবহীন ছিলেন। এ জন্য পাষাণ হৃদয় কাফেররা তাঁর ওপর নির্মমভাবে নির্যাতন চালাতো। হযরত সোহায়েব রুমী (রা) বেশ কিছুদিন যাবত তাদের নির্যাতনের শিকার হয়ে রইলেন। তিনি ইরাকের কোন এক গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। পিতার নাম ছিল সিনান বিন মালিক এবং মাতার নাম সালমা বিনতে কায়িদ। স্ব এলাকায় খান্দানটি খুব সম্ভ্রান্ত ছিল। সিনান অথবা তাঁর ভাই লবিদ ইরানের পক্ষ থেকে উবুল্লাহর শাসক ছিলেন। সোহায়েব তখন অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছিলেন। রোমকবাসীরা উবুল্লাহর ওপর হামলা

করে বসলো এবং অন্য মাল আসবাবের মত সোহায়েবকেও ধরে নিজেদের সঙ্গে নিয়ে গেল। সুতরাং তিনি শৈশবকাল থেকে যৌবনকাল পর্যন্ত রোমকদের গোলামীতে অতিবাহিত করেন। এ জন্য তিনি রুমী হিসেবে প্রসিদ্ধ হন। একবার বনু কালাবের কিছু ব্যবসায়ী সোহায়েব (রা) যে এলাকাতে গোলামীর জীবন কাটাচ্ছিলেন সেই এলাকায় গেলেন। কালাবী ব্যবসায়ীরা সোহায়েবকে (রা) রোমকদের নিকট থেকে কিনে নিলো এবং নিজেদের সঙ্গে মক্কা নিয়ে এলো। মক্কায় আবদুল্লাহ বিন জাদয়ান তাঁকে কালাবীদের নিকট থেকে কিনে নিলো।

মুসতাদরাকে হাকিমে আছে যে, ইবনে জাদয়ান তাঁকে কিনে আযাদ করে দিলেন। কিন্তু ইবনে সায়াদ (র) বর্ণনা করেছেন যে, সোহায়েব (রা) পালিয়ে মক্কা পৌছলেন এবং আবদুল্লাহ বিন জাদয়ানের সঙ্গে মিত্রতার সম্পর্ক স্থাপন করলেন। বিভিন্ন কার্যকারণে মনে হয় যে, সোহায়েব (রা) একজন কৌশলী ও পরিশ্রমী মানুষ ছিলেন। তিনি যখন মক্কা আসেন তখন সম্পূর্ণরূপে কপর্দকশূন্য ছিলেন। কিন্তু এত অর্থ উপার্জন করেন যে, কয়েক বছরের মধ্যে তিনি মক্কার অন্যতম বিত্তবান হিসেবে পরিগণিত হতে লাগলেন। সেই যুগেই বিশ্বনবী (সা) দাওয়াতে হকের কাজ শুরু করলেন। আল্লাহ তায়ালা সোহায়েবকে (রা) সুন্দর স্বভাব দান করেছিলেন। তিনি দাওয়াতে হকের কথা শুনে একদিন হযরত আরকাম (রা) বিন আবিল আরকামের বাড়ী গেলেন। রাসূলে আকরাম (সা) সেখানে কতিপয় জান-নিছারের সঙ্গে আশ্রয় নিয়েছিলেন। হযরত সোহায়েব (রা) রাসূলের (সা) নিকট পৌঁছে কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করলেন। তাতে তিনি খুব খুশী হলেন।

নবী করিম (সা) বলতেন, সোহায়েব রোমের প্রথম ফল। আল্লামা ইবনে আছির (র) বর্ণনা করেছেন, হযরত সোহায়েব (রা) এবং হযরত আমার বিন ইয়াসির (রা) উভয়েই একই দিনে এক সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করেন। সে সময় পর্যন্ত প্রায় ৩০ ব্যক্তি ইসলামের সীমানায় প্রবেশ করেছিলেন।

হযরত সোহায়েব (রা) একজন বন্ধু-বান্ধবহীন বিদেশী ছিলেন। মুশরিকদের অনিষ্ট থেকে হেফাজত থাকার জন্য নিজের ইসলামকে অন্যান্যদের মত লুকিয়ে রাখতে পারতেন। কিন্তু তাঁর ঈমানী আবেগ একদিনের জন্যও ইসলামকে লুকিয়ে রাখার ব্যাপারটি সহ্য করতে পারলো না। মুশরিকদের সামনে প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করে যেন ভিমরুলের চাকে হাত দিয়ে ফেললেন। এই হতভাগারা তাঁর ওপর সকল শয়তানী অস্ত্রসহ ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং তাঁকে নিত্য নতুন নির্যাতন চালানো ও

নিজেদের আমোদ প্রমোদের বিষয় বানিয়ে নিল। কখনো গরম বালির ওপর শুইয়ে দিত। কখনো পানির মধ্যে চুবিয়ে ধরে রাখতো। কখনো মেরে মেরে রক্তাক্ত করে দিত। কিন্তু তিনি এক মুহূর্তের জন্যও হক থেকে বিচ্যুত হননি। মোটকথা এই ধরনের নির্যাতন সইতে সইতে বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হলো। ইত্যবসরে বিশ্ব নবী (সা) সাহাবায়ে কিরামকে (রা) মদীনায় হিজরতের অনুমতি দিলেন। সুতরাং অধিকাংশ সাহাবায়ে কিরাম (রা) নবীর (সা) হিজরতের কিছুদিন পূর্বেই মদীনা চলে গেলেন। কিন্তু সোহায়েব (রা) মক্কাতেই রয়ে গেলেন।

বায়হাকীর রেওয়ায়াত অনুযায়ী প্রিয় নবী (সা) একবার হযরত সোহায়েবের (রা) সামনে বলেছিলেন যে, তোমরা একদিন হিজর অথবা মদীনায় হিজরত করবে। সেইদিন থেকে হযরত সোহায়েব (রা) ইচ্ছা করে রেখেছিলেন যে, তিনি হিজরতের সময় বিশ্ব নবীর (সা) সঙ্গে থাকার মর্যাদা লাভ করবেন। কিন্তু পরবর্তীকালে পরিস্থিতি এমন রূপ ধারণ করলো যে, হুজুর (সা) হযরত আবু বকরের (রা) সঙ্গে গোপনভাবে হিজরত করলেন এবং হযরত সোহায়েব (রা) তাঁর সফর সঙ্গী হওয়া থেকে মাহরুম হয়ে গেলেন। তিনি যখন বিশ্ব নবীর (সা) হিজরতের কথা জানতে পেলেন তখন মক্কায় একদিন অতিবাহিত করাও তার জন্য কঠিন হয়ে পড়লো এবং মদীনা গমনের জন্য অস্থির হয়ে পড়লেন। সুতরাং কিছুদিন পর তিনি সফরে রওয়ানা হলেন। কুরাইশ মুশরিকরা তাঁর ইচ্ছা সম্পর্কে জানতে পেরে (ইবনে সায়াদের রেওয়ায়াত অনুযায়ী) চারদিক থেকে হযরত সোহায়েবকে (রা) ঘিরে ধরলো এবং তাঁকে সেখান থেকে যেতে দেবে না বলে জানিয়ে দিল। হযরত সোহায়েব (রা) ধনুকের ওপর তীর রেখে হুংকার দিয়ে বললেন ঃ

"হে মক্কাবাসী তোমরা খুব ভালভাবেই অবগত আছো যে, আমার তীরের নিশানা কখনো ভুল হয় না। আল্লাহর কসম, আমার তুনিরের সকল তীর শেষ না হওয়া পর্যন্ত তোমরা আমার নিকট পৌঁছতে পারবে না। তারপরও যদি তোমাদের মধ্যে কেউ বেঁচে যায়, তাহলেও আমি তরবারী বের করবো এবং যতক্ষণ পর্যন্ত আমার জীবন থাকবে ততক্ষণ তোমাদের সঙ্গে লড়াই করবো। যদি নিস্তার পেতে চাও, তাহলে আমার পিছু নেয়া ছেড়ে দাও এবং নিজেদের বাড়ী ফিরে যাও।"

মুশরিকরা বললো, "তুমি যখন মক্কা এসেছিলে তখন খুব দরিদ্র ও কপদর্কশূন্য ছিলে। কিন্তু এখন তুমি এখান থেকে এত পরিমাণ ধন-সম্পদ নিয়ে যাচ্ছো, এই সম্পদ আমাদের। আমাদেরকে তা দিয়ে দাও এবং যেখানে

ইচ্ছা সেখানে চলে যাও।" হযরত সোহায়েব (রা) সকল ধন-সম্পদ তাদের সামনে ফেলে দিলেন এবং খালি হাতে মদীনা রওয়ানা হয়ে গেলেন।

অন্য কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত সোহায়েব (রা) নিজের সকল ধন-সম্পদ গৃহের কোন এক স্থানে লুকিয়ে রেখেছিলেন। মুশরিকরা তাঁর পিছনে ধাওয়া করলে তিনি তাঁদেরকে বললেন, তোমরা যদি আমার পথে বাধা না দাও, তাহলে আমি তোমাদেরকে আমার সকল সম্পদের সন্ধান দেব। মুশরিকরা তাঁর একথা মঞ্জুর করলো এবং হযরত সোহায়েব (রা) নিজের সকল পুঁজি তাদের হাওয়ালা করে দিলেন। এমনকি বাদী দু'টিও মুশরিকদেরকে দিয়ে দিলেন।

মক্কাকে এমনিভাবে বিদায় জানিয়ে হযরত সোহায়েব (রা) সোজা রহমতে আলমের (সা) খিদমতে কুবা পৌঁছলেন। সেখানেই খেজুরের মজার ঘটনা সংঘটিত হলো এবং অন্যান্য কথা হলো।

হাফেজ ইবনে কাছির (র) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলে আকরাম (সা) হযরত সোহায়েবকে (রা) দেখেই বললেন ঃ "ব্যবসায়ে সোহায়েব অনেক লাভ করেছে, ব্যবসায়ে সোহায়েব অনেক লাভ করেছে।" বস্তুত হযরত সোহায়েব (রা) কুবা পৌঁছার পূর্বেই বিশ্ব নবী (সা) ওহীর মাধ্যমে তাঁর কুরবানী ও অটলতার খবর পেয়েছিলেন "আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া" গ্রন্থে স্বয়ং হযরত সোহায়েব (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, "আমি কুবায় রাসূলের(সা) খিদমতে পৌঁছলে তিনি আমাকে দেখেই বললেন, হে আবু ইয়াহইয়া তোমার এই বাণিজ্য খুব লাভজনক হয়েছে।"

আমি আরজ করলাম, "হে আল্লাহর রাসূল, এখন আমার পূর্বে আপনার নিকট আর কেউ আসেনি। এই ঘটনার খবর আপনাকে নিশ্চয়ই হযরত জিবরাইল (আ) দিয়েছেন।"

হযরত সোহায়েব (রা) কুবাতে হযরত সায়াদ (রা) বিন খাইছুমা আউসীর বাড়ীতে অবস্থান করলেন। রাসূলে করিম (সা) হযরত সোহায়েবকে (রা) জালিলুল কদর সাহাবী হযরত আবু সাঈদ হারিছ (রা) বিন ছুম্মা নাজারী খাজরাজীর ইসলামী ভাই বানিয়ে দেন। যুদ্ধের সিলসিলা শুরু হলে হযরত সোহায়েব (রা) বদর থেকে তাবুক পর্যন্ত সকল যুদ্ধেই রহমতে আলমের (সা) সঙ্গী হওয়ার মর্যাদা লাভ করেন। তীর ও তরবারী পরিচালনায় তিনি খুব নিপুণ ছিলেন। প্রতিটি যুদ্ধে নিজের বীরত্বের যথার্থতা প্রদর্শন করেছেন। আপাদমস্তক যিরাহ পরিধানকারী এমন কোন দুশমন যদি তাঁর সামনে আসতো তাহলে

তাক করে তার চোখে এমনভাবে তীর মারতেন যে, সে পিছনে উল্টে গিয়ে পড়তো। হক পথে তাঁর যুদ্ধের বড় গৌরব ছিল। বার্ধক্যকালে লোকদেরকে চারপাশে একত্রিত করে খুব মজা করে নিজের যুদ্ধের কৃতিত্বের ঘটনাবলী শোনাতেন। রহমতে আলমও (সা) হযরত সোহায়েবের (রা) ইসতিকামাত,. ইখলাস এবং জানবাজির অত্যন্ত কদর করতেন। একবার তিনি বলেছিলেন ঃ

"সোহায়েব ভাল মানুষ। সে যদি আল্লাহকে ভয় নাও করতো তাহলেও তার নাফরমানী করতো না।"

রহমতে আলম (সা) হযরত সোহায়েব (রা) এবং তাঁর মত অন্য বুজর্গদেরকে মন যোগানোর খুব খেয়াল রাখতেন। সহীহ মুসলিমের এক রেওয়ায়াতে আছে যে, একবার হযরত সোহায়েব (রা) হযরত সালমান ফারসী (রা) এবং হযরত বিলাল (রা) বিন রাবাহ কোথায়ও একত্রিত হয়ে বসেছিলেন। এমন সময় আবু সুফিয়ান (ইসলাম গ্রহণের পূর্বে) সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনজন তাঁকে দেখে বললেন ঃ

"আল্লাহর তরবারী এখন পর্যন্ত আল্লাহর এই দুশমনের মাথা উড়িয়ে দেয়নি।"

হযরত আবু বকর সিদ্দীকও (রা) পাশেই কোথাও ছিলেন। তিনি বললেন ঃ

"এই ব্যক্তি কুরাইশের সরদার। তার ব্যাপারে এমন কঠিন কথা মুখ দিয়ে বের করো না।" তারপর তিনি হুজুরের (সা) খিদমতে হাজির হয়ে এই ঘটনা বর্ণনা করলেন। হুজুর (সা) বললেন ঃ

"তোমার বাধাদানের জন্য সম্ভবত তারা খারাপ মনে করেছেন। তাদেরকে অসন্তুষ্ট করা যেন আল্লাহকেই অসন্তুষ্ট করা।" হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) প্রিয় নবীর (সা) ইরশাদ শুনে কেঁপে উঠলেন। সেই সময়ই তিনি তিন বান্দার নিকট ফিরে এসে বললেন ঃ "প্রিয় ভাইয়েরা ! আমার কথায় তোমরা অসন্তুষ্ট তো হওনি।"

তাঁরা বললেন, "না, হে আবু বকর ! আমাদের অন্তরে তোমার বিরুদ্ধে কোন অসন্তোষ নেই। আল্লাহ্ তায়ালা তোমাকে ক্ষমা করুন।"

রহমতে আলম (সা) হযরত সোহায়েব (রা) ওপর এত মেহেরবান ছিলেন যে, তিনি স্বয়ং তাঁর কুনিয়াত আবু ইয়াহিয়া প্রস্তাব করেন। অথচ হযরত সোহায়েবের (রা) "ইয়াহিয়া" নামক কোন পুত্র ছিল না।

হযরত সোহায়েব (রা) যদিও বছরের পর বছর পর্যন্ত রাসূলের (সা) সুহবতের ফয়েজ হাসিল করেছিলেন, কিন্তু হাদিস বর্ণনায় তিনি সীমাহীন

সতর্ক ছিলেন। এ জন্য তাঁর থেকে বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা খুব কম। তা সত্ত্বেও মর্যাদার দিক দিয়ে তিনি অন্যতম মহান সাহাবী ছিলেন। ন্যায়ের প্রতি ভালবাসা, কঠিন অবস্থায় ধৈর্যধারণ, অটলতা, বীরত্ব, জিহাদের প্রতি উৎসাহ, সুন্দর মেজায, মেহমানদারী এবং দরিদ্র প্রতিপালন ছিল তাঁর গুণাবলী। হযরত ওমর ফারুককে (রা) তিনি সীমাহীন ভালবাসতেন এবং তিনি তাঁকে খুব সম্মান ও শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর খিলাফতকালে হযরত সোহায়েব (রা) বিন আমর এবং কুরাইশের কতিপয় নেতা হযরত ওমর ফারুকের (রা) সঙ্গে মুলাকাতের জন্য গেলেন। ঘটনাক্রমে সেই সময় হযরত সোহায়েব (রা) হযরত বিলাল (রা) এবং হযরত আম্মার (রা) বিন ইয়াসিরও সেই উদ্দেশ্যে সেখানে পৌঁছলেন। হযরত ওমর (রা) বাড়ীর ভেতর ছিলেন তাঁকে মুলাকাতের জন্য আগমনকারীদের নাম বলা হলো। তিনি সর্বপ্রথম হযরত সোহায়েব (রা), বিলাল (রা) এবং আম্মারকে (রা) ডেকে পাঠালেন। হযরত আবু সুফিয়ানের(রা) আর সহ্য হলো না। বলতে লাগলেন ঃ

"বিস্ময়ের ব্যাপার হলো যে, এসব গোলাম কালবিলম্ব না করে, সাক্ষাতের অনুমতি লাভ করে। আর আমরা অপেক্ষা করতে থাকি।"

হযরত সোহায়েল (রা) তাঁর কথায় বাধা দিয়ে বললেন ঃ

"ভাই এ জন্য তো আমরা নিজেরাই দায়ী। তাওহীদের দাওয়াত তো আমরা সকলে একই সঙ্গে পেয়েছিলাম। কিন্তু তারা তা কবুলে আগে এগিয়ে এসেছিলেন।"

এজন্য আমীরুল মু'মিনীন যদি তাদেরকে আমাদের ওপর অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন, তাতে দোষের কি রয়েছে?"

হযরত ওমর ফারুক (রা) একবার হযরত সোহায়েবকে (রা) বললেন ঃ "সোহায়েব (রা) তুমি আমার প্রিয়। কিন্তু তোমার তিনটি জিনিস আমার পসন্দনীয় নয়। প্রথমত, তোমার ভাষায় আজমী ছাপ বেশী। অথচ তুমি আরবী হওয়ার দাবী করে থাকো। দ্বিতীয়ত, তুমি দয়া মায়াহীনভাবে তোমার ধন-সম্পদ ব্যয় করো। তৃতীয়ত, তুমি নিজের কুনিয়ত এক পয়গম্বরের নামে রেখেছ। প্রকৃতপক্ষে ইয়াহইয়া নামের কোন পুত্র তোমার নেই।"

তিনি বললেন ঃ আমীরুল মু'মিনীন, বাস্তবিকই আমি আরব। শৈশবকালে রোমকরা ধরে নিয়ে গিয়েছিল এবং তাদের মধ্যেই লালিতপালিত হয়েছি। এ জন্য আমার ভাষায় আজমী ছাপ বেশী। তাতে আমার কোন কসুর নেই। রইলো অপব্যয়ের কথা। আসল ব্যাপার হলো, আমি অপব্যয় করি না। বরং

আমার আমলের বুনিয়াদ নবী করিমের (সা) একটি ফরমান। এই ফরমানে তিনি বলেছিলেন, তোমাদের মধ্যে সেই সর্বোত্তম ব্যক্তি, যে লোকদেরকে খাবার খাওয়ায় এবং সালামের জবাব দান করে। সর্বশেষ রইলো কুনিয়তের ব্যাপার। তা আমি নিজে গ্রহণ করিনি, বরং রাসূলে করিম (সা) প্রস্তাব করেছিলেন।"

তাঁর জবাব শুনে হযরত ওমর ফারুক (রা) চুপ মেরে গেলেন এবং আর কখনো এ প্রসঙ্গে কোন কথা বলেননি। হযরত সোহায়েবের (রা) যুক্তিযুক্ত জবাব হযরত ওমর ফারুককে (রা) মুতমায়েন করে দিলো।

হযরত ওমরের (রা) দৃষ্টিতে হযরত সোহায়েব (রা) অত্যন্ত মর্যাদাবান ও সম্মানিত মানুষ ছিলেন। নিজের ওফাতের পূর্বে তিনি ওসিয়ত করে ছিলেন যে, যতক্ষণ নতুন খলিফা নির্বাচিত না হবে ততক্ষণ সোহায়েব (রা) মুসলমানদের ইমামতের দায়িত্ব আঞ্জাম দেবেন এবং তিনিই তাঁর জানাযার নামায পড়াবেন। সুতরাং হযরত সোহায়েব (রা) তাঁর নামাযে জানাযা পড়ালেন এবং তিনদিন পর্যন্ত মুসলমানদের ইমামত করেন।

৩৮ হিজরীর শাওয়াল মাসে হযরত সোহায়েব (রা) মদীনা মুনাওয়ারাতে ওফাত পান এবং বাকী' গোরস্তানে তাঁকে দাফন করা হয়। সে সময় তাঁর বয়স ছিল ৭০ অথবা ৭২ বছর।

হযরত আবু আবদুল্লাহ সালেম (রা)

রহমতে আলম (সা) মদীনায় শুভ পদার্পণ করলেন। তারপর মদীনা মুনাওয়ারা হয়ে গেল ঈর্ষার শহর। মদীনাতুন নবী (সা) নবুওয়াতের নূরে জ্বল জ্বল করছিলো এবং তার গলি উপগলি রিসালাতের সুঘ্রাণে সুবাসিত হয়ে উঠেছিল। সেই যুগে একদিন প্রিয় নবী (সা) পবিত্র বাড়ীতে অবস্থান করছিলেন এবং উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) কোন কাজে বাইরে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর ফিরতে অস্বাভাবিক দেরী হচ্ছিল। ফলে প্রিয় নবী (সা) খুব বিচলিত হয়ে পড়লেন। তিনি এ ব্যাপারে কিছু চিন্তা করছিলেন ঠিক এমন সময় উম্মুল মু'মিনীন (রা) ফিরে এলেন। হুজুর (সা) জিজ্ঞাসা করলেন ঃ

"আয়েশা, কোথায় এত দেরী করলে?"

উম্মুল মু'মিনীন (রা) আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। আমি ফিরে আসছিলাম। এমন সময় রাস্তায় একজন কারীর তিলাওয়াতে কুরআনের আওয়াজ আমার কানে এলো। সেই আওয়াজে এমন হৃদয়োত্তাপ ও প্রভাব ছিল যে, আমি তাতে মোহাবিষ্ট হয়ে পড়েছিলাম এবং মাটি আমার পা সেঁটে ধরেছিল। এ কারণেই আমার ফিরতে দেরী হয়ে গেল।"

রাসূলে আকরাম (সা) ঃ "তুমি সেই কারীকে কি অবস্থায় রেখে এসেছো?"

উম্মুল মু'মিনীন ঃ "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার আসা পর্যন্ত সে তিলাওয়াতে মশগুল ছিল।"

হুজুর (সা) একথা শুনেই সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন এবং বাইরে চলে গেলেন। গিয়ে দেখলেন যে, সত্যি সত্যি সেই কারীর সুন্দর কিরাআত শুনে লোকজন ঠায় দাঁড়িয়ে আছে এবং গভীরভাবে মোহাবিষ্ট হয়ে তা শুনছে। এমন মনে হচ্ছিল যে, সকল সৃষ্টি যেন নিশ্চুপ হয়ে গেছে। এই অবস্থা দেখে হুজুরের (সা) পবিত্র চেহারা খুশীতে ঝলমল করতে লাগলো এবং তাঁর যবান দিয়ে বের হলে গেল ঃ "সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি আমার উম্মতের মধ্যে তোমার মত লোক সৃষ্টি করেছেন।"

এই ভাগ্যবান এবং মহান মার্যাদা সম্পন্ন কুরআনের কারী, যাঁর জন্য জ্বিন ও ইনসানের গৌরব (সা) গর্ব প্রকাশ করেছিলেন, তিনি ছিলেন হযরত আবু আবদুল্লাহ সালেম (রা)।

হযরত আবু আবদুল্লাহ সালেম (রা) সেই অন্যতম মহান সাহাবী ছিলেন, যাঁরা ছিলেন কুরআনে হাকিমের হাফেজ, গভীর জ্ঞান সম্পন্ন আলেম এবং কিরাআতের ইমাম। রাসূলে আকরাম (সা) বলতেন ঃ

"কুরআন শিখতে চাইলে আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) আবু হোযায়ফার (রা) আযাদকৃত গোলাম সালেম (রা), উবাই (রা) বিন কা'ব এবং মায়াজ (রা) বিন জাবালের নিকট থেকে শিখো।"

চারজনের মধ্যেও হযরত সালেমের (রা) এই বিশেষ মর্যাদা ছিল। অথচ তিনি আরবী বংশোদ্ভূত ছিলেন না। বরং তিনি ইরানী ছিলেন। তা সত্ত্বেও আল্লাহ তায়ালা তাকে কুরআন অনুধাবনে এমন যোগ্যতা দান করেছিলেন যে, স্বয়ং রাসূলে আকরাম (সা) লোকদেরকে তাঁর নিকট থেকে কুরআন শিক্ষার উপদেশ দিয়েছিলেন।

হযরত সালেমের (রা) পিতা ও পিতামহ তথা পূর্ব পুরুষরা ইরানের আসতাখার শহরের বাসিন্দা ছিলেন। ভিন্ন মত অনুযায়ী পিতার নাম ছিল মা'কাল অথবা ওবায়েদ। সালেম (রা) মক্কা মুয়াজ্জামায় কখন এবং কিভাবে পৌঁছেছিলেন, এ ব্যাপারেও বিভিন্ন রেওয়ায়াত রয়েছে। এসব রেওয়ায়াতের সামঞ্জস্য বিধান খুব কঠিন ব্যাপার।

আল্লামা ইবনে আছির (র) "উসুদুল গাব্বাহ"তে বর্ণনা করেছেন যে, সালেম (রা) ইয়াছরাবের এক মহিলা ছবিতা (রা) বিনতে ইয়া'র আনসারীয়ার (রা) গোলামীতে মদীনা পৌঁছেন। তিনি স্বাধীন করে দিলে হযরত আবু হোযায়ফা(রা) বিন উতবা তাঁকে নিজের পুত্র বানিয়ে নেন। এমনিভাবে তার মধ্যে আনসারী ও মুহাজির দুই মর্যাদাই স্থান পায়। কিন্তু ইবনে আছির (র) এটা পরিষ্কার করেননি যে, ছবিতার গোলামী থেকে আযাদী লাভের পর হযরত সালেমের (রা) সম্পর্ক হযরত আবু হোযায়ফার (রা) সঙ্গে কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তিনি তো মক্কার সরদার উতবা বিন রবিয়ার পুত্র ছিলেন এবং সেখানেই তাঁর স্থায়ী আবাস ছিল। হিজরতের পূর্বে তাঁর মদীনা আগমনের কোন প্রমাণ নেই।

অন্যদিকে ইবনে সায়াদ (র) বর্ণনা করেছেন যে, ছবিতা বিনতে ইয়ার আনসারীয়া (রা) হযরত আবু হোযায়ফার (রা) স্ত্রী ছিলেন। কিন্তু তিনিও এটা

বিশ্লেষণ করেননি যে, ছবিতার (রা) সঙ্গে হযরত আবু হোযায়ফার (রা) বিয়ে কবে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেই সঙ্গেই ইবনে সায়াদ (র), ইমাম বুখারী (র), আবু দাউদ (র), হাফেজ ইবনে হাজার (র) এবং আরো কয়েকজন মুহাদ্দিসের রেওয়ায়াত থেকে একথা নিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, হযরত সালেম (রা) শৈশবকালেই হযরত আবু হোযায়ফার (রা) ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং তাঁর নিকটই তিনি মক্কায় বয়োপ্রাপ্ত হন। এই প্রসঙ্গে সহীহ বুখারী এবং সুনানে আবু দাউদে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে এই বর্ণনা দেয়া হয়েছে যে, "হযরত সালেম (রা) নিজের মুখে ডাকা পিতা হযরত আবু হোযায়ফার (রা) গৃহে স্বাধীনভাবে গমনাগমন করতেন। কিন্তু তিনি যখন জওয়ান হন এবং 'উদ'য়ুহুম লী আবায়িহিম' অর্থাৎ তাঁদেরকে তাদের পিতাদের নিসবতে ডাকো—এই নির্দেশ নাযিল হয় তখন হযরত আবু হোযায়ফার (রা) সন্দেহ জাগলো যে সালেমের (রা) স্বাধীনভাবে গমনাগমন আল্লাহর নির্দেশ বিরোধী নয়তো। সুতরাং তিনি স্ত্রী সাহলা (রা) বিনতে সোহায়েলের সামনে এই সন্দেহের কথা প্রকাশ করলেন। তিনি রাসূলে আকরামের (সা) খিদমতে হাজির হলেন এবং আরজ করলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল! সালেমকে আমরা নিজেদের পুত্র মনে করতাম এবং শৈশবকাল থেকেই সে আমাদের গৃহে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতো। কিন্তু এখন আবু হোযায়ফার (রা) নিকট তার গমনাগমন খুব কঠিন ব্যাপার বলে মনে হয়।"

হুজুর (সা) বললেন, তাঁকে নিজের দুধ খাইয়ে দাও, তাহলে সে তোমাদের জন্য মুহরিম হয়ে যাবে।" এমনিভাবে সে হযরত আবু হোযায়ফা (রা) ও সাহলার (রা) দুধ পুত্র হয়ে গেল। কিন্তু উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালমা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, এই অনুমতি শুধুমাত্র সালেমের (রা) জন্য মাখসুস ছিল। নচেৎ বয়োপ্রাপ্ত অবস্থায় রিদায়াত বা দুধ খাওয়ানোর হুকুম প্রতিষ্ঠিত হয় না।

ইবনে আছিরের সেই রেওয়ায়াত যদি সঠিক বলে মেনে নেয়া হয়, যে রেওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত সালেম (রা) ছবিতা (রা) আনসারিয়ার গোলাম হয়ে মদীনা এসেছিলেন এবং আযাদ হওয়ার পর হযরত আবু হোযায়ফার (রা) অভিভাবকত্বে আসেন তাহলে এটা মানতে হয় যে, জাহেলী যুগেই ছবিতার (রা) বিয়ে হযরত হোযায়ফার সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং তিনি অপ্রাপ্তবয়স্ক গোলাম সালেমকে (রা) সঙ্গে নিয়ে নবীর (সা) হিজরতের কয়েক বছর পূর্বেই ইয়াসরাব থেকে মক্কা এসেছিলেন অথবা ছবিতা (রা)

তাকে আযাদ করে দিয়েছিলেন। তিনি স্বয়ং কোনভাবে মক্কা পৌঁছেন এবং সেখানে হযরত আবু হোযায়ফার (রা) অভিভাবকত্বে আসেন। আর যদি মনে করা হয় যে, হযরত আবু হোযায়ফা (রা) মদীনায় হিজরতের পর হযরত ছবিতাকে (রা) বিয়ে করেন এবং সেখানেই হযরত সালেমকে (রা) নিজের অভিভাবকত্বে নেন তাহলে অন্যান্য নেতৃস্থানীয় চরিতকারের বর্ণনা সন্দেহে পর্যবসিত হয়। [মুসতাদরাকে হাকেমের এক বর্ণনা থেকে একটি ভিন্নধর্মী অবস্থা সামনে আসে। সে অনুযায়ী হযরত সালেমের (রা) শাহাদাতের পর তাঁর সম্পত্তি ছবিতা (রা) বিনতে ইয়ারের নিকট প্রেরণ করা হয়। এ সময় তিনি তা এই বলে ফেরত পাঠান যে, সালেমকে সায়েবা আযাদ করেছিল। সায়েবার নিকট সম্পত্তি প্রেরণ করা হলে তা তিনি এই বলে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান যে, আমি সালেমকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আযাদ করেছিলাম।]

হযরত সালেম (রা) কিভাবে মক্কা পৌঁছেছিলেন সে দিকে দৃষ্টি না দিয়ে আমরা বলতে চাই যে, তিনি শৈশবকাল থেকে যৌবনকাল পর্যন্ত এবং যৌবনকাল থেকে হিজরত পর্যন্ত সম্পূর্ণ সময় মক্কায় হযরত আবু হোযায়ফার (রা) নিকটই অতিবাহিত করেন। হযরত আবু হোযায়ফা (রা) তাঁকে অত্যধিক স্নেহ করতেন। এমনকি তাঁকে নিজের পোষ্যপুত্র আখ্যায়িত করেছিলেন। এ জন্য তিনি জনসাধারণ্যে সালেম বিন আবু হোযায়ফা (রা) নামে প্রসিদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। সালেমও (রা) আবু হোযায়ফার (রা) জন্য জীবন বাজী রাখতেন। উভয়ের মধ্যে গভীর সম্পর্কের কারণেই হযরত আবু হোযায়ফা (রা) নিজের আপন ভ্রাতুষ্পুত্রী ফাতিমা বিনতে ওয়ালিদের সঙ্গে হযরত সালেমের (রা) বিয়ে দিয়েছিলেন। আল্লাহ তায়ালার নিকট থেকে যখন হুকুম নাযিল হলো যে, মুখে ডাকা পুত্র আপন পুত্র হয় না এবং তাদেরকে আসল পিতার সঙ্গেই সম্বন্ধযুক্ত করো তখন লোকজন তাঁকে সালেম বিন আবু হোযায়ফার (রা) পরিবর্তে মাওলায়ে (আযাদকৃত গোলাম) আবু হোযায়ফা (রা) বলতে লাগলো।

কেবলমাত্র হযরত সালেমের (রা) গোঁফ গজাচ্ছিল ঠিক এমনি সময় ফারান গিরিপথ দিয়ে রিসালাত সূর্য উদয় হলো। যেসব হতভাগার চোখের ওপর পরদা পড়ে গিয়েছিল এবং অন্তরের ওপর কুফর এবং শিরকের তালা লেগে গিয়েছিল তারাই সেই নূরে মুবিন বা স্পষ্ট আলো থেকে চোখ বন্ধ রেখেছিল। কিন্তু ভাগ্যবান স্বভাবের ব্যক্তিত্বর্গ আস্তে আস্তে হক দাওয়াত কবুল করতে লাগলেন।

হযরত সালেম (রা) এবং তাঁর মুরুব্বী বা অভিভাবক হযরত আবু হোযায়ফাও (রা) এসব ভাগ্যবানের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁরা নির্ভাবনায় হকের ঝাণ্ডা মজবুতভাবে আকড়ে ধরলেন। আর এমনিভাবে তাঁরা সাবিকুনাল আউওয়ালুনের পবিত্র জামায়াতের সদস্য হয়ে গেলেন। বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (সা) মক্কা মুয়াজ্জামায় হযরত সালেমের (রা) ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করলেন আমিনুল উম্মাহ হযরত আবু উবায়দা (রা) ইবনুল জারাহর সঙ্গে। মদীনায় হিজরতের নির্দেশ হলে তিনি হযরত আবু হোযায়ফা(রা) এবং অন্যান্য সাহাবায়ে কিরামের সঙ্গে নবীর (সা) হিজরতের পূর্বেই মদীনা পৌঁছে গেলেন। মক্কায় অবস্থানকালে তিনি সকল ধরনের বাধা-বিপত্তি এবং দুঃখ মুসিবত ও নির্যাতন সত্ত্বেও নবীর (সা) ফয়েজ লাভের কোন সুযোগই হাতছাড়া হতে দেননি। সুতরাং দ্বীনী ইলমে তিনি সমুদ্রের গভীরতা লাভ করেছিলেন। ফজিলত ও কামালিয়াত, হিফজে কুরআন এবং সুন্দর কিরআতের বদৌলতে সকল সাহাবায়ে কিরামের (রা) মধ্যে তাঁকে অত্যন্ত সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হতো। বিশ্ব নবীর (সা) কুবাতে শুভাগমনের পূর্বে হযরত সালেম (রা) প্রথম মুহাজিরদের ইমামতের মার্যাদা লাভ করেছিলেন। হুজুর (সা) কুবা থেকে মদীনা তাশরীফ রাখলেন। এসময় হযরত সালেম (রা) মসজিদে কুবাতে স্থায়ীভাবে ইমামতের দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে লাগলেন। সহীহ বুখারীতে আছে যে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা), হযরত ওমর ফারুক(রা), হযরত উসমান জুন্নুরাইন (রা), হযরত আবদুর রহমান (রা) বিন আওফ, হযরত সায়াদ (রা) বিন আবি ওয়াক্কাস এবং অসংখ্য অন্যান্য জালিলুল কদর সাহাবী (রা) বহুবার হযরত সালেমের (রা) ইকতিদাতে নামায পড়েছেন। আল্লাহ তায়ালা হযরত সালেমকে (রা) দাউদী কণ্ঠস্বর দান করেছিলেন। তিনি যখন খোশ লাহানে কুরআনে করিম তিলাওয়াত করতেন তখন শ্রবণকারীরা মোহাবিষ্ট হয়ে পড়তেন। স্বয়ং রাসূলে আকরাম (সা) তাঁর সুন্দর কিরআতে গৌরব প্রকাশ করতেন এবং তিনি লোকদেরকে তাঁর নিকট থেকে কুরআন শিখার উপদেশ দিতেন।

মদীনায় রাসূলে আকরাম (সা) হযরত মায়াজ (রা) বিন মায়িজ আনসারীকে হযরত সালেমের দ্বীনী ভাই বানিয়েছিলেন। তিনি হযরত সালেমের (রা) উদ্দেশ্যে সব রকমের ত্যাগের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু তাঁর মধ্যে যুহদ, তাকওয়া এবং মুখাপেক্ষীহীনতার অবস্থাটা এমন ছিলো যে, কখনো কোন ব্যাপারে হযরত মায়াজকে (রা) কষ্ট দেননি। বরং যা কিছু কামাই করতেন তা হক পথে খরচ করে দিতেন এবং নিজে অত্যন্ত আনন্দচিত্তে দারিদ্র ও বুভুক্ষার জীবন কাটাতেন।

হযরত সালেম (রা) ইলম ও ফজিলতের ময়দানেই শুধু নেতা ছিলেন না বরং জিহাদের ময়দানেরও বাঘ ছিলেন। বদর, ওহোদ, খন্দক এবং অন্যান্য সকল গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধেও নবী করিমের (সা) সফরসঙ্গী ছিলেন এবং পূর্ণ বীরত্ব প্রদর্শন করে হুজুরের (সা) বন্ধুত্বের হক আদায় করেন। সিদ্দীকে আকবরের (রা) খিলাফতকালে তিনি মুখে ডাকা পিতা হযরত হোযায়ফার (রা) সঙ্গে ইয়ামামার ভয়াবহ যুদ্ধে শরীক হন। কতিপয় ঐতিহাসিকের মতে মুসলমানরা যত লড়াইয়ে অংশ নিয়েছিলেন তার মধ্যে এটা ছিল কঠিনতম যুদ্ধ। তাতে লোহায় লোহায় টক্কর ছিল। এক পক্ষে ছিলেন সেই আরব মুজাহিদবৃন্দ যারা আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের জন্য লড়াই করছিলেন। বিপক্ষে ছিল সেই বিরাট সংখ্যক আরব মুরতাদ যারা গোত্রগত গোড়ামী এবং মুসায়লামা কাজ্জাবের নেতৃত্বে লড়াই করছিলো। (এরাই যখন দ্বিতীয়বার ইসলামের সীমায় এলো তখন প্রথমে উল্লেখিত মুজাহিদদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে কায়সার ও কিসরার সিংহাসন উল্টে দিয়েছিল।) এই রক্তাক্ত যুদ্ধে মুহাজিরদের ঝাণ্ডা হযরত সালেমের (রা) নিকট ছিল। একবার যখন মুরতাদদের সীমাহীন চাপে বাধ্য হয়ে মুসলমানদের পা টলটলায়মান হয়ে উঠলো তখন সালেম (রা) একটি গর্ত খুঁড়ে তাতে পা মজবুত করে দাঁড়িয়ে গলেন রবং হুংকার ছেঁড়ে বললেন ঃ

"হে মুসলমানরা! আফসোস যে, রাসূলের (সা) সঙ্গে যুদ্ধের ময়দানে আমরা এভাবে ময়দান ছেঁড়ে দিতাম না।" তাঁর হুংকারে মুসলমানদের টলটলায়মান পা পুনরায় মজবুত হলো। জনৈক মুজাহিদ ভুল বশত বলে ফেলেছিলেন যে, "আমরা তোমার ব্যাপারে সন্দেহ করি। তুমি এই ঝাণ্ডা অন্য কাউকে দিয়ে দাও।" একথা শুনে তাঁর আবেগ উথলে উঠলো এবং বললেন, "আমি যদি নিজেকে মুসলমানদের ঝাণ্ডা বহনকারীর যোগ্য প্রমাণিত করতে না পারি তাহলে আমার থেকে বড় বদবখত কুরআন বহনকারী আর কেউ নেই।" একথা তাঁর মুখেই ছিল ঠিক তক্ষুণি মুরতাদরা বিরাট এক হামলা করে বসলো। হযরত সালেম (রা) এত উৎসাহের সঙ্গে লড়াই করছিলেন যে, তাদের হামলার যথার্থ জবাব দিলেন। কিন্তু মুরতাদদের হামলা কোন ক্রমেই কম ছিল না। এক হতভাগা ডান হাতের ওপর পূর্ণ শক্তিতে তরবারীর আঘাত হানলো। ফলে তা কেটে দূরে গিয়ে পড়লো। তিনি ইসলামের ঝাণ্ডা বাম হাতে ধারণ করলেন। তাও কেটে গেলো। এ সময় তিনি কর্তিত হাতের দুইবাহু এক যায়গায় করে ইসলামের ঝাণ্ডা বুক দিয়ে উঁচু করে ধরলেন এবং অবলীলাক্রমে কুরআনের এই আয়াত মুখ দিয়ে বের হয়ে পড়লো ঃ

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلاَّ رَسُوْلٌ ۔ وَكَاَيِّنْ مِّنْ نَّبِيٍّ قٰتَلَ ۔ مَعَهٗ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ ۔

"এবং মুহাম্মাদ শুধুমাত্র একজন রাসূল এবং অনেক নবী এমন ছিলেন যে, যাঁদের পক্ষে অনেক আল্লাহওয়ালা জিহাদ করেছেন।" (আলে ইমরান-১৪৪, ১৪৬)

অবশেষে তিনি মুরতাদদের তীর, তরবারী এবং বর্শার আঘাতে ঝাঁঝরা হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। অন্তিম মুহূর্তে লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "আবু হোযায়ফার (রা) অবস্থা কি?" জবাব পেলেন ঃ "তিনি শাহাদাতের পেয়লা পান করেছেন।" পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন ঃ "আমার সেই মুসলমান ভাই কোথায়, যে আমার ব্যাপারে অভিযোগ করেছিল।" লোকেরা বললো, "সে ও শাহাদাতের মর্যাদায় আসীন হয়েছে।" হযরত সালেম বললেন ঃ "আমাকে তাদের দু'জনের মধ্যে দাফন করবে।"

একথা বলার পর তার প্রাণ পাখী দেহের খাঁচা থেকে উড়ে গেল। আল্লামা ইবনে আছির (র) এই রেওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন। ইবনে সায়াদ (র) বর্ণনা করেছেন যে, যখন তিনি শহীদ হন তখন তাঁর মাথা মুখে ডাকা পিতা হযরত আবু হোযায়ফার (রা) পায়ের ওপর ছিল।

হযরত সালেম (রা) শাহাদাতের সময় পরিত্যক্ত সম্পদের মধ্যে একটি ঘোড়া, অস্ত্র এবং সাধারণ ধরনের মাল ও আসবাব ছাড়া কিছুই রেখে যাননি। কেননা সারা জীবন একটি নিয়মই পালন করতেন তাহলো, যা কামাই করতেন তা আল্লাহর পথে খরচ করে দিতেন। কোন সন্তান ছিল না এবং কেউই তাঁর সম্পদের দাবী করেনি। এ জন্য হযরত ওমর (রা) তা পরে বাইতুল মালে জমা করান।

হযরত সালেমের (রা) ফজিলত ও কামালিয়াত এবং সুন্দর চরিত্র হযরত ওমরের (রা) ওপর খুব প্রভাব বিস্তার করেছিল। তিনি যখন দুনিয়া থেকে বিদায় নিচ্ছিলেন তখন বলেছিলেন ঃ

"আজ যদি সালেম (রা) জীবিত থাকতো তাহলে খিলাফতের জন্য আমি তাকে মনোনীত করতাম। মজলিসে শুরার প্রয়োজন হতো না।"

ফারুকে আজমের (রা) ইরশাদ থেকে হযরত সালেমের (রা) মর্যাদা ও যোগ্যতা সম্পর্কে ভালভাবেই আন্দাজ করা যায়।

হযরত তোফায়েল জুন্নুর (রা)

নবুওয়াত প্রাপ্তির প্রথম তিন বছর রহমতে আলম (সা) অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে তাবলীগের দায়িত্ব আঞ্জাম দিচ্ছিলেন। কিন্তু চতুর্থ বছরের শুরুতে যখন (فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ - حجر ٩٤) অর্থাৎ "তোমাকে , নির্দেশ দেয়া হয় তা প্রকাশ্যে বর্ণনা করো এবং মুশরিকদের তরফ থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও"—আল্লাহর এই ফরমান নাযিল হলো তখন তিনি প্রকাশ্যে হকের দাওয়াত প্রদান এবং শিরক ও জাহেলিয়াতের নিন্দা করা শুরু করলেন। ফলে কুরাইশ মুশরিকদের ক্ষোভ ও ক্রোধ পূর্ণ শক্তিতে ফেটে পড়লো। সেসব মানুষ যারা বছরের পর বছর ধরে হুজুরের (সা) মহান সৃষ্টি হওয়াতে দিয়ানত, আমানত, সত্যবাদিতা ও পবিত্র নফসের প্রশংসাকারী ছিল, তারাই এখন তাঁর খুন পিপাসু হয়ে গেল। এমন কোন দুঃখ ও কষ্ট ছিল না যে তারা মানবতার কল্যাণকামী প্রিয় নবী (সা) ও তাঁর দাওয়াত গ্রহণকারীদেরকে দেয়নি। কিন্তু সকল জুলুম-নির্যাতন সত্ত্বেও যখন তারা দেখলো যে হকপন্থীদের সংখ্যা দিনে দিনে বৃদ্ধিই পেয়ে চলেছে তখন সেই হতভাগারা নবী করিমকে (সা) জাদুকর বলা শুরু করলো। অন্তরে অন্তরে অবশ্য তারা জানতো যে এটা মিথ্যা কথা। কিন্তু অজ্ঞ ও অপরিচিত মানুষ তদের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করতো। আর এমনিভাবে হক কবুলের সৌভাগ্য থেকে মাহরুম থাকতো। সেই যুগে মক্কার মুশরিকরা শুনতে পেলো যে, দাওসের নেতা তোফায়েল বিন আমর (বিন তোরায়েফ বিন আদ বিন ছালাবা বিন সুলায়েম বিন ফাহম বিন গানাম বিন দাওস) মক্কা আসছেন। তোফায়েল তার পূর্বেও মক্কা গমনাগমন করতেন। কিন্তু এবার তার আগমনের খবরে মুশরিকদেরকে এক আশ্চর্য ধরনের পরেশানীতে নিক্ষেপ করলো।

দাউস ছিল আরবের একটি শক্তিশালী গোত্র। ইয়েমেনের এক কোণায় একটি পাহাড়ের পাশে গোত্রটি বসবাস করতো। গোত্রবাসীরা ছিলেন সাহসী ও সচ্ছল। তারা নিজেদের বসতির পাশে একটি মজবুত দুর্গও নির্মাণ করেছিল। এ জন্য পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহে তাদের খ্যাতি ছড়িয়েছিল। তোফায়েল বিন আমর দাউসী একজন সুন্দর কবি এবং মর্যাদাবান মানুষ ছিলেন। এই সঙ্গে তিনি দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ও সঠিক মত প্রকাশের যোগ্যতাও রাখতেন। এই সব গুণের কারণে দাউস গোত্রে তার খুব মান-মর্যাদা ছিল। কুরাইশের মুশরিকরা যখন তার মক্কা রওয়ানার খবর শুনলেন তখন তাদের সন্দেহ হলো যে, দাউস গোত্রের এই প্রভাবশালী ও মর্যাদাবান ব্যক্তি দায়িয়ে হকের (সা) দাওয়াতে

যখন তার মক্কা রওয়ানার খবর শুনলেন তখন তাদের সন্দেহ হলো যে, দাউস গোত্রের এই প্রভাবশালী ও মর্যাদাবান ব্যক্তি দায়িয়ে হকের (সা) দাওয়াতে প্রভাবান্বিত না হয়ে যান। ব্যাপারটি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার জন্য তারা সকলেই একস্থানে বৈঠক করলো। বৈঠকে তোফায়েলকে উষ্ণ সম্বর্ধনা প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়া হলো এবং তাঁর খাতির-যত্নের ব্যাপারে কোন ত্রুটি তাতে না হয় সেদিকেও খেয়াল রাখার কথা বলা হলো। সেই সঙ্গে তাঁকে সারওয়ারে আলমের (সা) বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার সিদ্ধান্তও গৃহীত হলো। তারা চাইছিলো যে, তোফায়েলের নিকট রাসূলের (সা) বিরুদ্ধে এমন সব কথা বলা হবে যাতে তিনি তাঁর প্রতি ঘৃণা পোষণকারী ও তাঁর কথা শুনতে নারাজ হয়ে যান।

তোফায়েল যেই মক্কায় আবির্ভূত হলেন, তেমনি মুশরিকরা নিজেদের পরিকল্পনা মুতাবিক বুকে জড়িয়ে ধরলো। অতপর তারা বিশ্ব নবীর (সা) বিরুদ্ধে তার কান ভারী করা শুরু করলো। স্বয়ং তোফায়েল (রা) বর্ণনা করেছেন, কুরাইশের যে ব্যক্তিই আমার সঙ্গে মিলিত হতো সেই আমাকে বিশ্বাস করানোর চেষ্টা করতো যে, "তুমি আমাদের সম্মানিত মেহমান এবং এখানকার স্থানীয় অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নও। আমরা কল্যাণ কামনার্থে তোমাকে বলে দিচ্ছি যে, আমাদের কবিলার এক ব্যক্তি মুহাম্মাদ (সা) বিন আবদুল্লাহ কিছুদিন থেকে আমাদেরকে বেকায়দায় ফেলে রেখেছে। সে আমাদেরকে ব্যাকুল করে রেখেছে এবং আমাদের সকল কাজ বিশৃংখল করে দিয়েছে। তার কথা জাদুর মত প্রভাব বিস্তার করে। সে তার বক্তব্যের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রী ও ভাই ভাইয়ের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করেছে। আমাদের ভয় হলো যে, তুমি আবার সেই জালে ফেঁসে না যাও। বস্তুত আমাদের বন্ধুত্বপূর্ণ পরামর্শ হলো, তুমি তার কোন কথা শুনো না এবং তার সঙ্গে কথাও বলো না।" কুরাইশদের কথাবার্তা আমাকে ভীত সন্ত্রস্ত করে তুললো। আমি আমার কানে তুলো দিয়ে রাখলাম। যাতে, হঠাৎ করে কোথায়ও যদি তাঁর (সা) সঙ্গে সাক্ষাত হয়ে যায় তাহলে তাঁর মুখ নিসৃত কোন বাণী যেন আমার কানে প্রবেশ না করে বসে।

তোফায়েল একদিন খুব ভোরে কা'বার হেরেম শরীফে গেলেন। সেখানে গিয়ে তিনি দেখলেন যে, রহমতে আলম (সা) কা'বার পাশে নামায পড়ছেন। এটা জানা যায়নি যে, সেদিন তিনি কানে তুলো দিতে ভুলে গিয়েছিলেন কি না অথবা কান থেকে তুলো পড়ে গিয়েছিল কি না। নামাযে যে আয়াত হুজুর (সা) তিলাওয়াত করছিলেন তিনি তা শুনে ফেললেন। কালাম ছিল আসমান ও যমীনের স্রষ্টার। আর তা উচ্চারিত হচ্ছিল রাসূলের (সা) যবানে।

তোফায়েলের মত ভদ্র প্রকৃতির মানুষ তাতে প্রভাবিত না হয়ে কি করে থাকতে পারেন। তিনি দিল ও আত্মায় প্রশান্তি অনুভব করলেন। তিনি মনকে জিজ্ঞেস করলেন যে, "হে তোফায়েল, তুমি কেমন আহমক যে, কুরাইশের প্রতারণায় পড়ে গেছ। তোমার নিজের কি কোন জ্ঞান ও বিবেক নেই। আল্লাহ তোমাকে কবিত্বের যোগ্যতা দিয়েছেন এবং তুমি নিজে কারোর কাজের ভুল-ক্রটি ধরতে পারো। তা হলে এমন কি জটিলতা আছে যার ফায়সালা তুমি নিজে করতে পারোনি। সেই ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাত করে জেনেতো নিতে পারো যে, সে কি বলে। যদি তাঁর কথা গ্রহণযাগ্য হয় তাহলে তোমাকে তা মেনে নেয়া উচিত। তা যদি না হয়, তাহলে যবরদস্তি তো নেই।"

প্রিয় নবী (সা) যখন নামায থেকে ফারেগ হয়ে ফিরে যাচ্ছিলেন তখন তোফায়েলও পিছু পিছু চললেন। যখন তাঁর (সা) আবাসস্থলে পৌঁছলেন তখন তোফায়েল তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আরজ করলেন ঃ

"জনাব! আপনার কওম বা জাতি আমার নিকট আপনার ও আপনার দাওয়াত সম্পর্কে এই এই কথা বলেছে। তাদের কথায় প্রভাবিত হয়ে নিজের কানে তুলো দিয়ে রাখি। যাতে আপনার আওয়াজ শুনতে না পাই। কিন্তু কিছুক্ষণ আগে হারাম শরীফে আল্লাহ আমাকে আপনার আওয়াজ শুনিয়ে দিয়েছেন। আপনি যা কিছু পড়ছিলেন তা আমার নিকট খুব ভাল মনে হয়েছে। এখন আপনি কি চান তা যদি আমাকে একটু ব্যাখ্যা করে বলতেন।"

বিশ্ব নবী (সা) তাঁর সামনে ইসলামের সৌন্দর্যাবলী বর্ণনা করলেন এবং পুনরায় কুরআনে হাকিমের কিছু অংশ শুনালেন। আবুল ফারাজ ইস্পাহানী ইবনে কালবীর উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যে, "এ সময় হুজুর (সা) সুরায়ে ইখলাস এবং মুয়াব্বি জাতাইন (সুরা ফালাক ও সুরা নাস) তিলাওয়াত করেছিলেন।"

প্রিয় নবীর (সা) পবিত্র মুখে এই মিষ্টি কালাম শুনে তোফায়েল মোহাবিষ্ট হয়ে পড়লেন এবং তাঁর অন্তর স্বাক্ষ্য দিল যে, এটা মানব রচিত কালাম নয়। অযাচিতভাবে তিনি বলে উঠলেন ঃ

"খোদার কসম, আজ পর্যন্ত আমি এ থেকে বেহতর কালাম শুনিনি। এবং তাঁর (সা) কথা থেকে ভাল হিকমত সম্বলিত ইনসাফের কথাও শুনিনি। আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহর সত্য রাসূল এবং তাঁর দাওয়াত আমি মন ও অন্তর দিয়ে গ্রহণ করছি।"

এমনিভাবে হযরত তোফায়েল (রা) মুহূর্তের মধ্যে ইসলামের নিয়ামতে পূর্ণ হয়ে গেলেন এবং কুরাইশ মুশরিকরা তাঁকে ঈমানের সৌভাগ্য থেকে

বঞ্চিত রাখার জন্য যেসব মন্ত্রণা দিয়েছিলো তা সম্পূর্ণরূপেই অকেজো হয়ে গেল।

তোফায়েল (রা) মক্কা থেকে রওয়ানা হওয়ার সময় প্রিয় নবীর (সা) খিদমতে হাজির হয়ে আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার কওমের সরদার। তারা আমাকে খুব মান্য করে। আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে দেশে ফিরে গিয়ে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিব।"

হুজুর (সা) বললেন ঃ "হাঁ, তুমি নিজের কবিলাকে হকের দিকে আহবান জানাতে পার।"

তিনি পুনরায় আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! দোয়া করুন, আল্লাহ পাক আমাকে এমন কোন চিহ্ন দান করেন যাতে দাওয়াতের কাজ আমার জন্য সহজ হয়ে যায়।

মাহবুবে কিবরিয়ার (সা) দোয়া নিয়ে তোফায়েল (রা) স্বদেশ অভিমুখে রওয়ানা হয়ে গেলেন। দীর্ঘ সফরের পর যেদিন তিনি নিজের বস্তির নিকট পৌঁছলেন তখন সূর্য ডুবে গিয়েছিল এবং সকল উপত্যকা অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। রাস্তার দুই পাহাড়ের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে উঁচু থেকে ঢালুর দিকে গিয়ে দাউস বসতির সঙ্গে মিলিত হয়েছে। গাঢ় অন্ধকারে অনুপযোগী পাহাড়ী রাস্তায় নীচের দিকে উট নিয়ে যাওয়া খুব কঠিন কাজ ছিল। সে সময় এক আশ্চর্য ধরনের ঘটনা সংঘটিত হলো। তোফায়েল (রা) যেই নীচের দিকে রুখ করলেন তাঁর মুখমণ্ডল জ্যোতিস্মানের মত আলোকিত হয়ে উঠলো এবং তা থেকে বিচ্ছুরিত আলোকমালা চারপাশের ময়দান আলোকিত করে ফেললো। "ইসতিয়াব" গ্রন্থের প্রণেতা হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র) লিখেছেন যে, তোফায়েল (রা) সে সময় স্বগ্রোত্রের প্রত্যেক বাড়ী দেখছিলেন। এ ছিল রহমতে আলমের (সা) দোয়ার প্রভাব। জানা যায়নি যে, সে সময় তোফায়েলের (রা) অন্তরে কি খেয়াল এসেছিল। তিনি অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে দোয়ার হাত উঠালেন এবং আকাশের দিকে মুখ করে বললেন ঃ

"হে আল্লাহ! মুখমণ্ডলে নয়, অন্য কোন স্থানে এই চিহ্নকে স্থানান্তর করে দিন।"

একথা তাঁর মুখেই উচ্চারিত হচ্ছিল ঠিক এমন সময় আলো সেই লাঠিতে স্থানান্তরিত হয়ে গেল যা তাঁর হাতে ছিল। তারপর যখন তিনি রাস্তা অতিক্রম করছিলেন তখন সেই লাঠি মশালের কাজ দিচ্ছিল। এটা ছিল সেই চিহ্ন যার কারণে তিনি ইতিহাসে "জুন্নূর" উপাধিতে মশহুর হয়েছিলেন।

শ্রান্ত ও ক্লান্ত অবস্থায় বাড়ী পৌঁছে কারোর সঙ্গে কথাবার্তা না বলে তৎক্ষণাৎ শুয়ে পড়লেন। সকাল হলে তাঁর বৃদ্ধ পিতা সাক্ষাতের জন্য এলেন। তোফায়েল (রা) তাঁকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

"পিতা আমার! আমার থেকে দূরে থাকুন। আপনার সাথে এখন আমার কোন সম্পর্ক নেই।

পিতা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "কেন পুত্র, কি হয়েছে?" তিনি জবাব দিলেন "আমি ইসলাম কবুল করেছি। এবং মুহাম্মাদের (সা) দ্বীনের আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছি।"

পিতাও খুব নেক স্বভাবের মানুষ ছিলেন। তিনি কোন কঠিন জবাব না দিয়ে কাল বিলম্ব না করে বললেন ঃ "যে দ্বীন তোমার, আমারও সেই একই দ্বীন।"

আনন্দে তোফায়েলের (রা) চেহারা আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তিনি বললেন ঃ "ঠিক আছে, আপনি তাহলে গোসল করে পবিত্র কাপড় পরিধান করুন এবং আমার নিকট আসুন।"

তিনি যখন গোসল করে এবং কাপড় পরিবর্তন করে দ্বিতীয়বার পুত্রের নিকট এলেন তখন তোফায়েল (রা) তাঁকে ইসলামের তালকিন দিলেন এবং মক্কায় তার অবস্থান ও হুজুরের (সা) সঙ্গে তার মুলাকাতের বিবরণ দিলেন। তিনি প্রথমেই পুত্রের সমর্থনের ইকরার করেছিলেন। এখন তিনি নির্ভাবনায় কালেমায়ে শাহাদাত পড়ে নিলেন এবং দ্বীনে হকের ঝাণ্ডাবাহীদের মধ্যে শামিল হয়ে গেলেন। তারপর স্ত্রীর পালা এলো। তোফায়েল (রা) তাঁকেও সেই একই কথা বললেন যা পিতাকে বলেছিলেন। তিনি বললেন ঃ "প্রাণাধিকে, আমি কি অপরাধ করেছি যে, তুমি আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ।"

তিনি বললেন, "ইসলাম আমার এবং তোমার মধ্যে বিচ্ছিন্নতার যোজন সৃষ্টি করে দিয়েছে। আমি হলাম মুসলমান আর তুমি মুশরিক। আমার ও তোমার সম্পর্ক কি করে থাকতে পারে।"

স্ত্রীও ভাগ্যবতী ছিলেন। তৎক্ষণাৎ বললেন ঃ "আমিও তোমার দ্বীন গ্রহণ করছি। কিন্তু আমাকে একটু বলো যে, তা কি।"

তোফায়েল (রা) বললেন ঃ "প্রথমে মা'বাদে জুশ শারাতে (দাউস গোত্রের মূর্তির নাম) গমন কর। তার পুকুরে গোসল কর এবং পবিত্র কাপড় পড়ে আমার নিকট এসো।" গোত্রের প্রথা অনুযায়ী সেই ইবাদাতখানায় ঢোকার অর্থই হলো নিজের ধ্বংস ডেকে আনার নামান্তর। স্বামীর আজগুবী কথা শুনে স্ত্রী ভয় পেয়ে গেলেন এবং বলতে লাগলেন ঃ "আমি তোমার কথা অনুযায়ী

কাজ করলে যদি জুশ শারা আমাকে এবং আমাদের সন্তানদেরকে ক্রোধ ও ক্ষোভের নিশানা বানিয়ে নেয়।"

তোফায়েল (রা) উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন ঃ "ভাল, মূর্তি কি আবার কোনদিন কাউকে লাভ-লোকসান বা ক্ষতি করতে পারে। সে তো নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কেই কিছু জানে না। তুমি যাও। কোন খটকা ছাড়াই গোসল কর। পরিণামের দায়িত্ব আমি নিচ্ছি।"

তিনি গেলেন এবং গোসল করে এলেন। তখন তোফায়েল (রা) তাঁকে বিস্তারিতভাবে ইসলামের তালকিন দিলেন এবং তিনিও ইসলাম গ্রহণ করলেন। এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী তোফায়েলের (রা) মাতাও একইভাবে ইসলামের সীমানায় প্রবেশ করার সৌভাগ্য লাভ করেন।

অতপর হযরত তোফায়েল (রা) নিজের কবিলাকে দ্বীনে হকের দিকে আহ্বান জানানো শুরু করলেন। কিন্তু তার অব্যাহত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও দাউসবাসী তাঁর দাওয়াত গ্রহণের জন্য এগিয়ে এলো না। ইবনে কালবী বর্ণনা করেছেন, তাঁর রাত-দিন প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে দাউসের শুধুমাত্র এক ব্যক্তি মুসলমান হলো। তিনি তার নামের কথা উল্লেখ করেননি। কিন্তু কতিপয় আলেম মত প্রকাশ করেছেন যে, ইসলাম গ্রহণকারী এই ব্যক্তি ছিলেন হযরত আবু হুরায়রা (রা)।

এক রেওয়ায়াতে আছে যে, দাউস গোত্রে যিনা বা অবৈধ যৌন সঙ্গমের বহুল প্রচলন ছিল। পক্ষান্তরে ইসলাম যিনাকে খুব কঠোরভাবে হারাম করেছে। এ জন্য তারা ইসলামের প্রতি আগ্রহী হতো না। কয়েক মাসের জীবনপাত চেষ্টা সত্ত্বেও যখন কোন ফল হলো না তখন হযরত তোফায়েল (রা) খুব মনঃকষ্ট পেলেন এবং মক্কা গিয়ে রহমতে আলমের (সা) খিদমতে আরজ করলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল! আমার কওম খুব নীচ এবং লম্পট। আমি সব ধরনের চেষ্টা করেছি। কিন্তু তারা হক গ্রহণে এগিয়ে আসেনি। আপনি তাদের হেদায়াতের জন্য দোয়া করুন।" অপর এক রেওয়ায়াতে আছে যে, তোফায়েল (রা) হুজুরের (সা) নিকট দাউস গোত্রের জন্য বদ দোয়ার আবেদন জানালেন।

প্রিয় নবী (সা) ছিলেন সৃষ্টির সেরা। তোফায়েলের (রা) কথা শুনে তিনি হাত উঠালেন এবং দোয়া করলেন ঃ আল্লাহুম্মা ইহদি দাউসান "হে আল্লাহ, দাউসকে হেদায়াত দাও।" অন্য এক রেওয়ায়াতে আছে যে, তিনি এ সময় "এবং তাদের ওপর রহমত বর্ষণ কর" একথাও বলেছিলেন।

তারপর তিনি তোফায়েলকে (রা) বললেন ঃ "যাও এবার গিয়ে নিজের কবিলাকে খুব নরম ও মুহাব্বাতের সঙ্গে পুনরায় হকের দাওয়াত দাও।"

একথার পর তোফায়েল (রা) স্বগোত্রে ফিরে গেলেন এবং তাবলিগ শুরু করলেন। লোকজন তাঁর কথা অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে শুনলো। ধীরে ধীরে তারা খারাপ ও ফাহেশা কাজের প্রতি ঘৃণা পোষণ করে ইসলামের প্রতি আগ্রহী হতে লাগলেন। অতপর হাদিয়ে আকরামের (সা) দোয়ার প্রভাব এই হলো যে, কিছু দিনের মধ্যেই দাউসের বেশ কিছু পরিবার ইসলাম গ্রহণের মর্যাদায় অভিষিক্ত হলেন।

সহীহ্ মুসলিমে আছে যে, যে সময় দাউস গোত্র ইসলামের মহান নিয়ামতে অভিষিক্ত হচ্ছিলেন সে সময় মক্কায় হকপন্থীদের ওপর কাফেরদের নির্যাতন চরম আকার ধারণ করেছিল। জুলুম-নির্যাতন ও পরীক্ষা-নীরিক্ষার এই যুগে হযরত তোফায়েল (রা) মক্কা এলেন এবং সারওয়ারে আকরামের(সা) খিদমতে হাজির হয়ে তাঁকে তাদের দুর্গে তাশরীফ নেয়ার জন্য দরখাস্ত করলেন। দাউসের প্রতিটি শিশু জীবন দেবে তবুও আপনার ওপর কোন আঁচর লাগতে দেবে না। হুজুর (সা) হযরত তোফায়েলের (রা) নিষ্ঠাপূর্ণ আবেগের প্রশংসা করলেন। কিন্তু কিছু বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি সে সময় মক্কা ত্যাগ করা পসন্দ করলেন না। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর ইচ্ছাই তাই ছিল। কেননা রাসূলের (সা) মেযবানীর মর্যাদা আল্লাহ পাক আনসারদের তকদিরে লিখে রেখেছিলেন। হুজুরের (সা) জবাব শুনে তোফায়েল (রা) স্ব গোত্রে ফিরে গেলেন এবং আগের মতই সার্বিকভাবে তাবলিগ ও ইসলাহ'র কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। এমনিভাবে কয়েক বছর অতিবাহিত হলো।

ইত্যবসরে হুজুর (সা) হিজরত করে মদীনা তাশরীফ নিলেন এবং বদর, ওহোদ ও খন্দকের যুদ্ধও অতীত হলো।

সম্ভবত মাতা-পিতার খিদমতের কারণে অথবা অন্য কোন কারণে তোফায়েল (রা) সপ্তম হিজরীর পূর্বে মদীনা যেতে পারেননি। সেবছর প্রিয় নবী (সা) খায়বার যুদ্ধে তাশরীফ নিলেন। এ সময় তোফায়েল (রা) দাউসের ৭০-৮০টি পরিবারসহ তাঁর খিদমতে হাজির হলেন এবং নিজের সঙ্গীদেরসহ অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে যুদ্ধে অংশ নিলেন। আল্লামা ইবনে সায়াদ (র) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত তোফায়েলের (রা) ইচ্ছানুযায়ী হুজুর (সা) দাউসী মুজাহিদদেরকে খায়বারের ওপর হামলাকারী সৈন্যের দক্ষিণ দিকে মোতায়েন করলেন। তোফায়েল (রা) এবং তাঁর সঙ্গীরা মক্কা বিজয় পর্যন্ত হুজুরের (সা)

সঙ্গে ছিলেন। হযরত তোফায়েল (রা) বর্ণনা করেছেন যে, "এই সময় হুজুর (সা) আমাদের ওপর খুব দয়া প্রদর্শন করেছিলেন।"

মক্কা বিজয়ের পর তিনি মহানবীর (সা) নিকট থেকে অনুমতি নিয়ে স্বগোত্রে ফিরে গেলেন এবং পুনরায় তাবলীগে মশগুল হয়ে পড়লেন। মক্কা বিজয় সকল আরববাসীকে ইসলামের প্রতি আসক্ত করে তুললো। এবার কয়েক দিনের মধ্যেই চারশ' ব্যক্তি হযরত তোফায়েলের (রা) হাতে ইসলাম কবুল করলেন। তোফায়েল (রা) তাদের সবাইকে নিয়ে তায়েফের যুদ্ধে রাসূলে আকরামের (সা) খিদমতে হাজির হলেন এবং খুব তৎপরতার সঙ্গে যুদ্ধে অংশ নিলেন। তারপর তিনি হুজুরের (সা) ওফাত পর্যন্ত মদীনায় অবস্থান করলেন এবং রাসূলের (সা) নিকট থেকে সামর্থ অনুযায়ী ফয়েজ লাভ করলেন।

আল্লামা ইবনে সায়াদ (র) তাবকাতে লিখেছেন যে, মক্কা বিজয়ের পর হযরত তোফায়েল (রা) রাসূলে আকরামের (সা) খিদমতে আরজ করলেন যে, "তাঁর গোত্রে তখন পর্যন্ত একটি মূর্তিখানা রয়েছে। তাতে জুল কাফফাইন নামক একটি মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। দাউসের যারা ঈমানের নিয়ামত থেকে বঞ্চিত রয়েছে তারা খুব উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে মূর্তিটির পূজা করে থাকে। হুজুর (সা) যদি অনুমতি দেন তাহলে সেই ভূতখানা মিসমার করে দিতে পারি।"

হুজুর (সা) বললেন ঃ "হ্যাঁ, ভূতখানাটি ধ্বংস করে দাও।"

সুতরাং হযরত তোফায়েল (রা) নিজের গোত্রের কতিপয় মুসলমানের সঙ্গে গেলেন এবং ভূতখানা বা মন্দিরটি ধ্বংস করে মূর্তিটিতে আগুন লাগিয়ে দিলেন। সে সময় তিনি একটি কবিতা পাঠ করছিলেন। তার ভাবার্থ হলো ঃ

"হে জুলকাফফাইন! আমি তোমার পূজারী নই। তোমার জন্মের পূর্বে আমার জন্ম। আমি তোমার অন্তরে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছি।"

তায়েফের যুদ্ধের সময় তিনি হুজুরের (সা) খিদমতে উপস্থিত হয়ে জুলকাফফাইন ধ্বংসের কাহিনী বর্ণনা করলেন। তা শুনে তিনি খুব খুশী হলেন।

মহানবীর (সা) ওফাতের পর আরবে ধর্মদ্রোহিতার ফিতনার আগুন জ্বলে উঠলো। এ সময় হযরত তোফায়েল (রা) পূর্ণ অটলতা ও দৃঢ়তা প্রদর্শন করলেন এবং এই ফিতনা নির্মূলে খুব তৎপরতা প্রদর্শন করলেন। মুসায়লামা কাজ্জাবের বিরুদ্ধে যখন অভিযান প্রেরণ করা হলো তখন তিনি তাতে খুব উৎসাহের সঙ্গে

অংশ নিলেন এবং ইয়ামামার যুদ্ধে বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে হক পথে নিজের জীবন কুরবান করে দিলেন।

চরিত গ্রন্থসমূহে হযরত তোফায়েলের (রা) জীবনী সম্পর্কে আর কিছু পাওয়া যায় না। সন্তানদের মধ্যে শুধুমাত্র একপুত্র আমরের (রা) নাম জানা যায়। তিনিও মুরতাদদের উৎখাতের জন্য অত্যন্ত তৎপর ছিলেন। ধর্মদ্রোহিতার ফিতনা যখন শেষ হলো তখন সিরিয়া গমনকারী মুজাহিদদের দলে শামিল হয়ে গেলেন এবং ইয়ার মুকের যুদ্ধে যথার্থ বীরত্ব প্রদর্শন পূর্বক শাহাদাতের মর্যাদায় অভিষিক্ত হন।

হযরত সায়াদ (রা) বিন মুয়াজ

খন্দকের যুদ্ধে (পঞ্চম হিজরী) সমগ্র আরবের ইসলামের শত্রুরা ঐক্যবদ্ধভাবে ইসলামের কেন্দ্রের ওপর চড়াও হয়েছিল। বিশেষ করে মদীনা মুনাওয়ারার অভ্যন্তরে বনু কোরায়জার ইহুদীরা আস্তিনের সাপ বা কপটবন্ধুর ভূমিকা পালনের জন্য কোমর বেঁধে ছিল। হকপন্থীদের জন্য এটা ছিল বিরাট এক পরীক্ষার ব্যাপার। কিন্তু তাদের অন্তরে হক পথে জীবন বিলিয়ে দেয়ার আকাংখা উদ্বেলিত হচ্ছিল। অবস্থাটা এমন ছিল যে, কারোর ধৈর্যে বা স্থৈর্যে সামান্যতম পদস্খলনও ঘটেনি এবং আল্লাহর সাহায্য ও সহযোগিতায় তারা এই পরীক্ষায় সম্পূর্ণরূপে উত্তীর্ণ হন ঃ

وَرَدَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوْا خَيْرًا ط

"আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের মুখ ফিরিয়ে দিলেন, তারা কোন স্বার্থ লাভ না করেই মনে জ্বালা-যন্ত্রণা নিয়ে ফিরে গেল।" (আল আহযাব- ২৫)

হকের শত্রুদের ভীত সন্ত্রস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় তাওহীদ পন্থীরা ন্যায়-সঙ্গতভাবেই খুব খুশী হলেন। কিন্তু কার জানা ছিল যে, এক মাস পরই তাদের ওপর দুঃখের পাহাড় ভেঙ্গে পড়বে। আর এই দুঃখও এমন যে, "ইয়াওমে ওহুদের" ক্ষতও হেরে যাবে। কিন্তু যা ঘটার তা ঘটেই থাকে। সেটা ছিল পঞ্চম হিজরীর জিলকদ মাসের এক শোকার্ত দিন। শোক বিহবল চোখগুলো দেখতে পেল যে, মসজিদে নববীতে সারওয়ারে আলম (সা) বসে রয়েছেন এবং নুরানী চেহারা, দোহারা ও লম্বাদেহী এক ব্যক্তি তাঁর পবিত্র উরুর ওপর মাথা রেখে স্থায়ী নিদ্রায় শায়িত রয়েছেন। হুজুরের (সা) চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে। ইতিমধ্যে সিদ্দীকে আকবার (রা) এলেন এবং এ হৃদয় বিদারক দৃশ্য দেখে চীৎকার দিয়ে ওঠেন। সঙ্গে সঙ্গে অবলীলাক্রমে তাঁর মুখ দিয়ে বের হয়ে যায় "হায়, আমার কোমর ভেঙ্গে গেছে।" হুজুর (সা) বলেন, "আবু বকর, এ ধরনের বলো না।" ওদিকে হযরত ওমর ফারুকও উপস্থিত ছিলেন। প্রচুর কান্নাকাটির কারণে তাঁর গলাও ধরে এসেছিল এবং তিনি বার বার "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন" পাঠ করছিলেন। অন্য সাহাবীরাও (রা) কঠিন দুঃখে অস্থির ছিলেন। সেই স্থায়ী নিদ্রায় শায়িত ব্যক্তির জানাযায় এমন মর্যাদার সাথে রওয়ানা হয় যে, তাতে স্বয়ং রহমতে আলম(সা)

সহ আল্লাহর হাজার হাজার পবিত্র বান্দাহ শামিল ছিলেন। তারা পালাক্রমে জানাযা কাঁধে নিচ্ছিলেন। একদিক থেকে আওয়াজ আসছিল যে, লাশ তো একদম হাল্কা। হুজুর (সা) বলছিলেন, "হ্যাঁ, জানাযা ফেরেশতারা বহন করছে।" ওদিকে বাকী' গোরস্তানে আবু সাঈদ খুদরী (রা) কবর খুড়ছিলেন এবং বলছিলেন ঃ

"আল্লাহর কসম, আমি কবর থেকে মিশকের সুঘ্রাণ পাচ্ছি।"

লাশ দাফন শেষে হুজুর (সা) ফিরে এলে প্রত্যক্ষদর্শীরা হতভম্ব হয়ে দেখলো যে মুহসিনে ইনসানিয়াত হাদিয়ে বরহক (সা) যেন দুঃখ ও শোকের এক প্রতিচ্ছবি হয়ে গেছেন। দাড়ি মুবারক হাতে ধরা অবস্থায় রয়েছেন এবং চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে গড়িয়ে তা ভিজিয়ে দিচ্ছে।

অতপর প্রিয় নবীর (সা) মুখ দিয়ে উচ্চারিত হলো ঃ "মৃত ব্যক্তির মৃত্যুতে আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠলো। আকাশের দরজা তার রূহের জন্য প্রশস্ত করে দেয়া হলো এবং সত্তর হাজার ফেরেশতা তার জানাযায় শরীক হলেন।" এ সময় আখিরাতের পথে রওয়ানাকারী রাসূলের সেই সাহাবীর আত্মীয়-স্বজনও গোত্রবাসীরা অনুভব করলেন যে, তাদের ক্ষতের ওপর আরামদায়ক পট্টি বেঁধে দেয়া হয়েছে—নিসন্দেহে মৃত ব্যক্তির ওপর ছোট্ট কেয়ামত নেমে এসেছে। কিন্তু এ সময় তিনি যে অক্ষয় মর্যাদায় বিভূষিত হলেন তা তুলনাহীন।

সেই মহান মর্যাদার রাসূলের সাহাবী, যাঁর মৃত্যুতে আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠেছিল, তিনি কে ছিলেন? তিনি ছিলেন আউস সরদার হযরত সায়াদ (রা) বিন মুয়াজ আনসারী। তাঁর সৌভাগ্য ও মহান মর্যাদার জন্য তার গোত্রের লোকজন এই ভাষায় গর্ব প্রকাশ করতেন ঃ "কোন মৃত ব্যক্তির মৃত্যুতে আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠেনি। কিন্তু সায়াদ আবি আমরের মৃত্যুতে তা হয়েছিল।"

মদীনার আউস গোত্রের শাখা বনু আবদুল আশহালের সরদার—এই আবি আমর সায়াদ (রা) বিন মুয়াজ (বিন নু'মান বিন ইমরাউল কায়েস বিন যায়েদ বিন আবদুল আশহাল) তিনিই তো ছিলেন যিনি এই কয়েক বছর আগেও নিজের গোত্র সমেত কুফর ও শিরকের অন্ধকারে পথভ্রষ্ট ছিলেন। ফারান পর্বত শীর্ষে রিসালাত সূর্য উদিত হয়েছিল এবং তার আলোকচ্ছটা মদীনার কতিপয় স্থানেও আলোকোজ্জ্বল করেছিল। কিন্তু সায়াদের (রা) অন্তরপ্রদেশ তখনো গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত। প্রিয় নবীর (সা) মদীনায় শুভাগমনের দেড় বছর পূর্বে একদিন তিনি শুনলেন যে, মক্কার এক কুরাইশ (রাসূলে আকরাম(সা))

নিজের এক ব্যক্তিকে মদীনা প্রেরণ করেছে। আর সেই ব্যক্তি তার খালাতো ভাই আসয়াদ (রা) বিন যুরারাহ খাজরাজীর বাড়ীতে অবস্থান করছে এবং মদীনার গোত্রসমূহকে নিজের পৈত্রিক ধর্ম থেকে বিচ্যুত করে কুরাইশ ব্যক্তিটির দ্বীন গ্রহণের দাওয়াত প্রদানে ব্যস্ত রয়েছেন। একথা শুনে সায়াদের(রা) রক্ত টগবগিয়ে উঠলো। কিন্তু আসয়াদ (রা) বিন যুরারাহর প্রতি সম্মান প্রদর্শন পূর্বক চুপ মেরে রইলেন।

রাসূলে করিমের (সা) এই দায়ী ছিলেন হযরত মুসায়াব (রা) বিন উমায়ের। হুজুর (সা) তাঁকে ইসলামের শিক্ষা প্রদান ও প্রচারের জন্য সেসব নেকবখত ইয়াছরাবীর আবেদনে মদীনা প্রেরণ করেছিলেন যাঁরা বাইয়াতে উকবায়ে উলায় ইসলামের মহান নিয়ামতে অভিষিক্ত হয়েছিলেন। পুনরায় যখন একদিন এক ব্যক্তি এসে সায়াদ (রা) বিন মুয়াজকে খবর দিল যে, মুসয়াব (রা) এবং আসয়াদ (রা) স্বয়ং তাঁর কবিলা বনু আশহালের একটি বাগানে বসে লোকদেরকে পথভ্রষ্ট করছে তখন তাঁর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল। নিজের চাচার পুত্র উসায়েদ (রা) বিন হুজায়েরকে ডেকে বললেন ঃ

"উসায়েদ, তুমি কেমন অলসতায় ভুগছো। দেখ, এই দুই ব্যক্তি আমাদের ঘরে ঢুকে লোকদেরকে বিপথগামী করছে। তুমি যাও এবং তাদেরকে খুব কঠোরভাবে নিষেধ করো যে, তারা যেন ভবিষ্যতে আর আওসের মহল্লায় না আসেন।"

উসায়েদ (রা) খুব বড় একজন বাহাদুর ছিলেন। তিনি ক্রোধান্বিত হয়ে বর্শা উঠালেন এবং একাকী মারক কূপের দিকে অগ্রসর হলেন। সেখানেই মুসয়াব (রা) এবং আসয়াদ (রা) বসেছিলেন। আসয়াদ (রা) উসায়েদকে সে দিকে আসতে দেখে মুসয়াবের (রা) কানে বললো, "ইনি হলেন আবদুল আশহালের দুই বড় সরদারের একজন। তিনি যদি দ্বীনে হক কবুল করে নেন তাহলে আমরা খুব শক্তিশালী হবো। খুব ভালভাবে চেষ্টা করে দেখ, তিনি কুফুরীর পাঁক থেকে বের হয়ে আসেন কিনা।"

উসায়েদ (রা) নিকটে এসেই হকের প্রতি আহবানকারীদের ওপর গর্জে উঠলো। তাঁর কণ্ঠস্বরে ছিল কর্কশতা। হযরত মুসয়াবকে (রা) সম্বোধন করে বললেন ঃ

"তোমরা আমাদের লোকদেরকে বেওকুফ বানাচ্ছো। যদি নিজেদের ভাল চাও, তাহলে কাল বিলম্ব না করে এখান থেকে ফিরে যাও এবং আর কখনো আমাদের মহল্লার দিকে আসবে না।"

হযরত মুসয়াব (রা) তাঁর ক্রোধোন্মত্ত কথাবার্তা খুব ধৈর্যের সঙ্গে শুনলেন এবং অত্যন্ত নরম স্বরে বললেন ঃ

"প্রিয় ভাই! আপনি কিছুক্ষণ বসে আরামের সাথে আমার কথা শুনুন। যদি পসন্দ হয় তাহলে কবুল করে নিন। নচেত প্রত্যাখ্যান করুন।"

হযরত মুসয়াবের (রা) ধৈর্যপূর্ণ কথাবার্তা উসায়েদের (রা) ক্রোধের ওপর পানির ছিটার কাজে এলো এবং তিনি বর্শা মাটিতে গেড়ে একথা বলতে বলতে বসে পড়লেন ঃ "ঠিক আছে, কি বলার আছে তা বলো।" হযরত মুসয়াব (রা) খুব হৃদয়গ্রাহীভাবে ইসলামের নীতিমালা বর্ণনা করলেন এবং পুনরায় কুরআনে করিমের কতিপয় আয়াত পাঠ করলেন। উসায়েদ (রা) এই আয়াত শুনে চেঁচিয়ে বলে উঠলেন ঃ

"এই দ্বীন কত সুন্দর এবং এই কালাম কত উঁচু ধরনের। ভাই, আমাকেও তোমাদের দ্বীনে ঢুকিয়ে নাও।"

হযরত মুসয়াব (রা) তাঁকে গোসল করা এবং পবিত্র কাপড় পরিধানের নসিহত করলেন এবং অতপর তাঁকে কালেমায়ে শাহাদাত পড়ালেন। যা তাঁর ইসলাম গ্রহণের প্রকাশ্য ঘোষণা ছিল। মুসলমান হওয়ার পর উসায়েদ (রা) বললেন ঃ

"আরো এক ব্যক্তি রয়েছেন। তিনি যদি ইসলাম গ্রহণ করেন তাহলে সমগ্র কবিলা তার অনুসরণ করবে। আমি তাকে তোমার নিকট প্রেরণ করছি।"

উসায়েদ (রা) সোজা সায়াদ (রা) বিন মুয়াজের নিকট পৌঁছলেন এবং সায়াদকে সম্বোধন করে বললেন ঃ "সেখানে তো আরো কথা হয়ে থাকে। আপনার স্বয়ং সেখানে যাওয়া প্রয়োজন।"

সায়াদ (রা) উসায়েদের (রা) চেহারা দেখে এবং তাঁর কথা শুনে বলে উঠলো ঃ "আল্লাহর কসম, এতো সেই চেহারা নয়। যা এখান থেকে যাওয়ার সময় ছিল।"

তিনি খুব ক্রোধান্বিত হলেন এবং নিযাহ উঠিয়ে খুব দ্রুততার সঙ্গে রওয়ানা হলেন। বাগানে পৌঁছে মুসয়াব (রা) এবং আসয়াদকে (রা) খুব ইতমিনানের সঙ্গে বসা অবস্থায় পেলেন। তিনি একদম হঠাৎ করে তাঁকে গালি দিয়ে বলতে লাগলেন ঃ "উসায়েদের দিয়েতো কিছু হলো না। কিন্তু তোমরা প্রকাশ্যে আমাদের মহল্লাতে এ ধরনের আকীদা-বিশ্বাসের কথা প্রচার করবে তা আমি কোন ক্রমেই সহ্য করতে পারি না। আবু উমামা [হযরত আসয়াদের (রা)

কুনিয়ত। আত্মীয় না হলে আমি তোমার সঙ্গে খুব কঠোর ব্যবহার করতাম। তুমি এই সাহস পেলে কোথায়?"

আসয়াদ (রা) বিন যুরারাহ সায়াদের খালাতো ভাই এবং খাজরাজ গোত্রের নাজ্জার খান্দানের সরদার ছিলেন এবং সায়াদের (রা) কথায় দমে যাওয়ার পাত্র ছিলেন না। কিন্তু তিনি এ সময় অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে এবং খুব শান্ত ও নরম স্বরে বললেন, "ভাই, একটু বসে শোনোতো এই ব্যক্তি কি বলেন। তাঁর কথা যদি তোমার পসন্দ হয় তা হলে ভাল কথা । নচেত তোমার স্বাধীনতা রয়েছে।"

তাঁর কথায় সায়াদ (রা) বসে পড়লেন। হযরত মুসয়াব (রা) তাঁর নিকটও ইসলামের সৌন্দর্যাবলী বর্ণনা করলেন এবং পুনরায় কুরআনে করিম শুনালেন। আল্লাহ তায়ালা উসায়েদের মত তাঁকেও নেক স্বভাব দান করেছিলেন। তাঁর পরিষ্কার অন্তর কুরআনে করিম শুনতেই ঈমানের নূরে প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠলো এবং তৎক্ষণাৎ মুসলমান হয়ে গেলেন। নিজের কবিলাতে ফিরে সমগ্র বনু আবদুল আশহালকে একত্রিত করে বলতে লাগলেন ঃ

"তোমাদের নিকট আমি কেমন মানুষ?"

জবাব এলো, "আপনি আমাদের সরদার এবং আমাদের সকলের চেয়ে বুদ্ধিমান ও বেশী সমঝদার।" সায়াদ (রা) বললেন ঃ "তাহলে তোমরা পুনরায় শুনে নাও যে, আমি দ্বীনে হক কবুল করেছি এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরাও একক আল্লাহ এবং তার বাছাইকৃত রাসূলের (সা) ওপর ঈমান না আনবে ততক্ষণ তোমাদের সঙ্গে আমার কথা বলা হারাম।"

নিজের খান্দানে হযরত সায়াদের (রা) সীমাহীন প্রভাব এবং প্রতিপত্তি ছিল। তাঁর ঘোষণা শুনেই বনু আবদুল আশহালের বেশীর ভাগ সদস্যই তক্ষুণি ইসলামের নিয়ামত গ্রহণ করলেন এবং যারা অবশিষ্ট রইল তারা সন্ধ্যা হতে হতেই মুসলমান হয়ে গেলেন এবং দীনার গলিকুচা তাকবির ধ্বনিতে গুঞ্জরিত হয়ে উঠলো। ইসলাম গ্রহণের পর হযরত সায়াদ (রা) বিন মুয়াজ হযরত মুসয়াবকে (রা) নিজের মেহমান বানিয়ে নিলেন। নিজের প্রভাব-প্রতিপত্তিকে কাজে লাগিয়ে সমগ্র কবিলাকে একই দিনে ইসলামের সীমানাভুক্ত করে নেয়া হযরত সায়াদ (রা) বিন মুয়াজের এক অনন্য কৃতিত্ব ও মর্যাদা। এই কৃতিত্ব ও মর্যাদার সমকক্ষ আর কেউ নেই। এমনিভাবে হযরত সায়াদের (রা) ইসলাম গ্রহণ ইসলামের ইতিহাসে এক অসাধারণ ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। হযরত সায়াদের (রা) এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে রাসূলে আকরাম (সা) তাঁর খান্দান বনু আবদুল আশহালকে আনসারের দু'টি সর্বোত্তম পরিবারের

মধ্যে একটি পরিবার হিসেবে আখ্যায়িত করতেন। অন্য পরিবার ছিল বনু নাজ্জারের। তার মর্যাদা ছিল প্রথম।

নবীর (সা) হিজরতের পর হযরত সায়াদ (রা) বিন মুয়াজ রাসূলে করিম(রা) এবং মুহাজির সাহাবীদের (রা) খিদমত ও সহযোগিতা প্রশ্নে কোন ত্রুটি করেননি। তিনি প্রায়ই রহমতে আলমের (সা) খিদমতে হাজির হতেন এবং সামর্থ অনুযায়ী নবীর (সা) ফয়েজ লাভ করতেন। ইবনে ইসহাক (র) বর্ণনা করেছেন যে, হুজুর (সা) আমিনুল উম্মাত হযরত আবু উবায়দা (রা) ইবনুল জাররাহ'র সঙ্গে তাঁর ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু সহীহ মুসলিমে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবু ওবায়দার(রা) ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক হযরত আবু তালহা আনসারীর (রা) সঙ্গে স্থাপিত হয়েছিল। অন্য এক রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত সায়াদ (রা) বিন মুয়াজের ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক হযরত সায়াদ (রা) বিন আবি ওয়াক্কাসের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু এই রেওয়ায়াতও খুব শক্তিশালী নয়। প্রকৃতপক্ষে হযরত সায়াদ (রা) বিন মুয়াজের ভ্রাতৃত্বের সম্পর্কের ব্যাপারে নিশ্চিতরূপে কিছু বলা যায় না। অবশ্য এটা প্রমাণিত যে, তিনি নিজের কবিলা সমেত মুহাজিরদের খিদমতে সবসময় অগ্রগামী ছিলেন। একদিন রাসূলে আকরামের (সা) খিদমতে হাজির ছিলেন। এমন সময় ইসলামের মশহুর দুশমন মক্কার সরদার উমাইয়া বিন খালফের আলোচনা শুরু হলো। হুজুর (সা) বললেন যে, এই ব্যক্তি একদিন সেসব মজলুম মুসলমানের হাতে মারা যাবে যাদেরকে সে রাতদিন নির্যাতন চালাতো। উমাইয়ার সঙ্গে হযরত সায়াদের (রা) খুব দূরের সম্পর্ক ছিল। সে যদি কখনো মদীনা আসতো তাহলে তাঁর নিকটই অবস্থান করতো। সুতরাং তিনি তার সম্পর্কে হুজুরের (সা) ইরশাদকে নিজের মস্তিষ্কে হেফাজত করে রাখলেন। কিছুদিন পর তিনি ওমরার জন্য মক্কা গেলেন। এসময় জানা-শোনা থাকার কারণে তিনি উমাইয়ার বাড়ীতেই অবস্থান নিলেন। তিনি উমাইয়াকে বললেন যে, তাওয়াফকারীদের ভিড় থেকে হেরেম যখন খালি হবে তখন যেন তাঁকে খবর দেয়া হয়। সুতরাং একদিন দুপুরের সময় খানায়ে কা'বা যখন মূর্তিপূজারীশূন্য দৃষ্টিগোচর হলো তখন উমাইয়া তাঁকে খবর দিল এবং সে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে তাওয়াফের জন্য চললো। পথিমধ্যে আবু জেহেলের সামনাসামনি হয়ে গেলো। নতুন চেহারা দেখে উমাইয়াকে জিজ্ঞেস করলো, "তোমার সাথে লোকটি কে?" সে জবাব দিল, সায়াদ (রা) বিন মায়াজ। আওসের সরদার।"

আবু জেহেলের জাহেলী ধমনি নেচে উঠলো এবং সে হযরত সায়াদকে(রা) সম্বোধন করে বললো, "আশ্চর্য যে, তোমরা নিজেদের নিকট

বিধর্মীদের (মুসলমান) আশ্রয় দিয়ে রেখেছ। অথচ তুমি এখানে মক্কায় নির্ভয়ে চলা ফেরা করছো। তোমার সঙ্গে যদি উমাইয়া না থাকতো তাহলে আমি দেখে নিতাম যে তুমি কি করে এখান থেকে বেঁচে ফিরে যাও।"

হযরত সায়াদ (রা) বিন মুয়াজের দ্বীনী সম্ভ্রমবোধ উদ্বেলিত হয়ে উঠলো। গর্জন করে বললেন ঃ "হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমাকে একটু বাধা দিয়েই দেখো। আমি যদি তোমার মদীনার রাস্তা বন্ধ না করে দিই তাহলে আমার নাম সায়াদ নয়।" কথা বেড়ে যাচ্ছিল দেখে উমাইয়া মাঝখানে বলে উঠলেন, "এই সায়াদ! কি বলছো। এতো আবুল হাকাম। মক্কার সরদার। তার সঙ্গে নরম স্বরে কথা বলো।"

হযরত সায়াদ (রা) কখন চুপ মেরে থাকার লোক ছিলেন। তিনি বললেন, "যাও, বসো। আমি রাসূলে সাদেক ও আমিনের (সা) নিকট থেকে শুনেছি যে, একদিন মুসলমানরা তোমাকে হত্যা করবে।" উমাইয়া একথা শুনে কেঁপে উঠলো এবং বললো, "মক্কা এসে মারবে কি?" তিনি বললেন, "আমি তা জানি না।"

এই কথোপকথনের পর কেউই আর তাঁর সঙ্গে বাদানুবাদ করেনি এবং তিনি ওমরা করে ভালভাবেই মদীনা ফিরে এলেন।

দ্বিতীয় হিজরীর রমযান মাসে বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে পরামর্শের জন্য হুজুর (সা) সকল মুহাজির (রা) ও আনসারকে(রা) একত্রিত করলেন এবং সকল অবস্থা তাদের সামনে রাখলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা), হযরত ওমর ফারুক (রা) এবং হযরত মিকদাদ(রা) বিন আমর (রা) এ সময় অত্যন্ত উদ্দীপনাময় বক্তৃতা দিলেন এবং তাঁরা হক পথে নিজেদের জীবন বিলিয়ে দেবেন বলে রাসূলকে (সা) আশ্বাস দিলেন। এই তিনজনই ছিলেন জানবাজ মুহাজির। রাসূলে করিম (সা) আনসারদের ইচ্ছাও জানতে চাইছিলেন। কেননা বাইয়াতের সময় তাঁরা মদীনার বাইরে গিয়েও দুশমনের বিরুদ্ধে লড়াই করবেন এমন প্রতিশ্রুতি দেননি। মুহাজিরদের বক্তৃতার পর (অন্য এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী বললেন, এখন অন্যরাও পরামর্শ দিন) আওসের সরদার হযরত সায়াদ (রা) বিন মুয়াজ হুজুরের ইঙ্গিত বুঝে সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন এবং অত্যন্ত উদ্দীপনাময় কণ্ঠে আরজ করলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল—আমরা আপনার ওপর ঈমান এনেছি এবং আপনার রিসালাতের সত্যতা স্বীকার করে নিয়েছি। আপনার আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। অতএব, আপনার যা ইচ্ছা তাই করুন। সর্বশ্রেষ্ঠ রবের কসম, যিনি আপনাকে রাসূল বানিয়ে প্রেরণ করেছেন। আপনি যদি আমাদেরকে সমুদ্রে

লাফিয়ে পড়ার নির্দেশ দেন তাহলে আমরা লাফিয়ে পড়বো। এ ব্যাপারে আমাদের একজনও পিছিয়ে থাকবে না। ইনশাল্লাহ আপনি আমাদেরকে যুদ্ধের ময়দানে অটল পাবেন। আল্লাহ তায়ালা আমাদের পক্ষ থেকে আপনার চোখকে ঠাণ্ডা করুন।"

হযরত সায়াদের (রা) জিহাদের উৎসাহ এবং আত্মোৎসর্গের আবেগ দেখে হুজুরের (সা) পবিত্র চেহারা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। যখন সৈন্য সাজানো হলো তখন হুজুর (সা) আউসের ঝাণ্ডা হযরত সায়াদ (রা) বিন মুয়াজকে নিজের পবিত্র হাত দিয়ে প্রদান করলেন।

বদরের যুদ্ধে হযরত সায়াদ (রা) বিন মুয়াজ উমাইয়া বিন খালফের ব্যাপারে রাসূলে আকরামের (সা) ভবিষ্যদ্বাণীকে নিজের চোখ দিয়ে পূর্ণ হতে দেখেছিলেন। পরাজয়ের পর মুশরিকদের মধ্যে চরম বিশৃংখলা দেখা দিল। এ সময় উমাইয়া এবং তার পুত্র আলী হযরত আবদুর রহমান (রা) বিন আওফের হাতে গ্রেফতার হয়ে গেল। তিনি তাদেরকে নিয়ে যাচ্ছিলেন। হযরত বিলাল(রা) বিন রাবাহ তা দেখে ফেললেন। তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, "হে মুসলমানরা! এ হলো মুশরিকদের দলপতি উমাইয়া বিন খালফ। দেখো, বেঁচে যেন না যায়।" তাঁর আওয়াজ শুনে মুসলমানরা উমাইয়া এবং আলী বিন উমাইয়ার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং মুহূর্তের মধ্যে উভয়কেই জাহান্নামে প্রেরণ করলো।

ওহোদের যুদ্ধের পরামর্শ বৈঠকে হুজুর (সা) নিজের মত প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন, মদীনার সীমায় থেকেই শত্রুকে প্রতিহত করা হোক। কিন্তু ইসলামের যুবকদের অন্তরে শাহাদাতের আকাংখা ধিকি ধিকি জ্বলছিল। তাদের অধিকাংশই মদীনা থেকে বাইরে বেরিয়ে মুকাবিলা করার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। হুজুর (সা) তাদের কথা মেনে নিলেন এবং অস্ত্র পরিধানের জন্য পবিত্র ঘরের মধ্যে তাশরীফ নিলেন। হযরত সায়াদ (রা) বিন মুয়াজ এবং উসায়েদ (রা) হুজায়ের লোকদেরকে লজ্জা দিলেন। তাঁরা বললেন, তোমরা অন্যায়ভাবে হুজুরের (সা) মতের বিরোধিতা এবং তাঁকে বাইরে যাওয়ার জন্য বাধ্য করেছ। হতে পারে হুজুরের (সা) রায় ছিল ওহির ভিত্তিতে। উচিত হবে হুজুর (সা) বাইরে বেরিয়ে এলে তোমাদের কথা ফিরিয়ে নেয়া।

হুজুর (সা) যখন যিরাহ পরিধান করে তরবারী এবং ঢাল লাগিয়ে পবিত্র ঘর থেকে বাইরে তাশরীফ আনলেন, তখন সকলেই লজ্জা প্রকাশ করে আরজ করলেন ঃ

"কোন অবস্থাতেই আমরা হুজুরের (সা) বিরোধিতা করাকে অনুমোদন করবো না। আপনি মদীনার বাইরে যাবেন না। আমরা এখানেই আপনার বন্ধুত্বের হক আদায় করবো।"

হুজুর (সা) বললেন, "নবী যখন কোন কাজের ইরাদা করে ফেলেন তখন তা পূরণ করে ছাড়েন। এখন অস্ত্র খুলতে পারেন না।"

এই যুদ্ধে হযরত সায়াদ (রা) বিন মুয়াজ নবীর (সা) বাসস্থান রক্ষার দায়িত্ব পেলেন। তার চেয়েও বড় সৌভাগ্য তিনি লাভ করেছিলেন। পরাজয় ও বিশৃংখলার সময় তিনি সেই কতিপয় সাহাবীর (রা) একজন ছিলেন যারা যুদ্ধের ময়দানে শেষ পর্যন্ত অটল থেকে বীরত্ব প্রদর্শন করেছিলেন। এই যুদ্ধে তাঁর সহোদর আমর (রা) বিন মুয়াজ শাহাদাতের পেয়ালা পান করেন।

ওহোদের যুদ্ধের সময় এক আশ্চর্য ধরনের ঘটনা সংঘটিত হয়। এই ঘটনা সায়াদ (রা) বিন মুয়াজের জন্য সুন্দর বিস্ময় এবং আবদুল আশহাল খান্দানের মান-মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ হয়। এই ঘটনা প্রায় সকল মুহাদ্দিসই বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। ওপরে বর্ণনা করা হয়েছে যে, হযরত সায়াদ(রা) বিন মুয়াজের অনুসরণে তাঁর গোত্র একই দিনে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। কিন্তু তাঁর খান্দানের এক ব্যক্তি আমর বিন ছাবিত আশহালী হযরত সায়াদের (রা) কথা অস্বীকার করলো এবং নিজের পিতৃ পুরুষের ধর্মের ওপর কঠোরভাবে অটল থাকে। হযরত সায়াদ (রা), হযরত উসাইদ (রা) এবং খান্দানের অন্যান্য সদস্য তাঁকে ইসলাম গ্রহণের জন্য খুব উৎসাহ দেন। কিন্তু তিনি তা মানেননি। ওহোদের যুদ্ধে রাসূলে আকরাম (সা) সাহাবীদের সঙ্গে মদীনা থেকে বাইরে তাশরীফ নিলেন। সে সময় আমর বিন ছাবিত বাইরে কোথায়ও ছিলেন। বাড়ী ফিরে দেখতে পেলেন যে, মহল্লা সুনসান পড়ে রয়েছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন যে, লোকজন কোথায় গেছে? জবাব এলো, "রাসূলের (সা) সঙ্গে ওহোদ গেছে।" একথা শুনে মনে খুব উৎসাহ সৃষ্টি হলো। যিরাহ পরলেন। শিরস্ত্রান মাথার ওপর রাখলেন। অস্ত্র দিয়ে দেহ সুসজ্জিত করলেন এবং ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে ওহোদের দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন। নবীর (সা) নিকট হাজির হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "যুদ্ধ মনে হয় লেগে গেছে। বলুন, প্রথমে ইসলাম কবুল করবো না আপনার সমর্থনে লড়াই করবো?"

হুজুর (সা) বললেন ঃ "উভয় কাজই করো। প্রথমে ইসলাম গ্রহণ কর, এবং অতপর আল্লাহর পথে লড়াই কর।"

আরজ করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমি এক রাকায়াত নামাযও পড়িনি। যুদ্ধে যদি শেষ হয়ে যাই তাহলে কি আমার মাগফিরাত হবে?"

হুজুর (সা) বললেন ঃ "হ্যাঁ, ইসলাম গ্রহণের পূর্বেকার সকল গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। আল্লাহ তায়ালা বড়ই গাফুরুর রাহীম।" একথা শুনে সে সময়ই তিনি কালেমায়ে শাহাদাত পড়ে মুসলমান হয়ে গেলেন। এদিকে যুদ্ধের ময়দান

গরম হয়ে উঠলে তিনি তরবারী হাতে যুদ্ধের ময়দানে পৌঁছলেন। বনু আবদুল আশহাল তাঁর কঠোর অন্তর সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিলেন। তাঁকে নিজেদের ব্যুহে দেখে তারা উত্তেজিত হয়ে উঠলো এবং তাঁকে সেখান থেকে চলে যেতে বললো। তারা বললো যে, তাদের কাফেরের সাহায্যের প্রয়োজন নেই। আমর (রা) কাঁদতে লাগলেন এবং বললেন যে, "আমি মুসলমান হয়ে গেছি। অতপর তিনি কাফেরদের ব্যুহে ঢুকে পড়লেন এবং এমন বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করলেন যে, কাফেরদের মুখ ভোঁতা হয়ে গেল। শেষে বহু সংখ্যক মুশরিক ভীড় করে ধরে তাঁকে গুরুতর ভাবে আহত করলো। এবং তিনি অস্থির হয়ে মাটির ওপর পড়ে গেলেন। লড়াইয়ের পর বনু আবদুল আশহালের লোকজন নিজেদের শহীদ ও আহতদের উঠাতে লাগলেন। এ সময় তাঁর ওপরও নজর পড়লো। তখনো কোন রকম শ্বাস প্রশ্বাস চলছিলো। তারা জিজ্ঞাসা করলো, "জাতীয় মর্যাদা কি তোমাকে এখানে টেনে এনেছে? তিনি বললেন, "না, আমি মুসলমান হয়ে আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের জন্য লড়াই করেছি।" এই অবস্থাতেই তাকে উঠিয়ে ঘরে আনা হলো। সমগ্র বনু আবদুল আশহালেই এই খবর ছড়িয়ে পড়লো। এ সময় আমরের (রা) (আসিরমের) ঈমান গ্রহণের সৌভাগ্য লাভের খবরে হযরত সায়াদ (রা) বিন মুয়াজের বিস্ময় মিশ্রিত আনন্দ অনুভব হতে লাগলো। তৎক্ষণাৎ তাঁর বাড়ী তাশরীফ নিলেন এবং আসিরমের (রা) সহোদরার নিকট থেকে সকল ঘটনা শুনলেন। ইত্যবসরে আসিরম (রা) আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে পরপারের দিকে যাত্রা করেছেন। হুজুর (সা) যখন এই খবর শুনলেন তখন বললেন ঃ "সে আমল খুব কমই করেছে। কিন্তু ছওয়াব বা প্রতিদান বেশী পেয়েছে।"

এই ঘটনা হযরত সায়াদের (রা) খান্দান আবদুল আশহালের মান-মর্যাদা আরও তুঙ্গে তুলে দিল। সাহাবায়ে কিরামের (রা) যখনই এই ঘটনা স্মরণ হতো তখন পরস্পরকে জিজ্ঞেস করতেন, সেই ব্যক্তি কে ছিলেন যিনি এক ওয়াক্ত নামাযও পড়েননি অথচ সোজা জান্নাতে গিয়েছেন? এই প্রশ্নের জবাব মিলতো, "তিনি হলেন, আসিরাম (রা) আবদুল আশহাল।"

খন্দকের যুদ্ধও এমন এক পরীক্ষামূলক যুদ্ধ ছিল যে, তাতে মু'মিন ও মুনাফিক, দোস্ত এবং দুশমনের মধ্যে স্পষ্ট ভেদ রেখা টেনে দিয়েছিল। মুনাফিকরা মুসলমানদেরকে হিম্মতহারা করে দেয়ার জন্য কোমর বেঁধে লেগেছিল। অন্যদিকে মু'মিনরা কবিতা পাঠ করতে করতে খন্দক বা পরিখা খননের কাজে মশগুল হয়ে গিয়েছিল।

হুজুর (সা) এই নাযুক সময়ে বনু গাতফানের লুটেরাদেরকে অন্য মুশরিকদের নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন করার মানসে তাদের সরদারদেরকে ডেকে সন্ধির আলোচনা শুরু করে দিল। তারা ফিরে যাওয়ার জন্য শর্ত আরোপ করে বললো যে, মদীনাবাসী যদি তাদের উৎপাদিত ফলের এক-তৃতীয়াংশ দিয়ে দেয় তাহলে তারা ফিরে যেতে পারে। হুজুরের (সা) ধারণা ছিল যে, যদি এই শর্তে সিদ্ধান্ত হয়ে যায় তাহলে মদীনাবাসী নিজেদের গাতফানী প্রতিবেশীর লুট তরাজ থেকে মাহফুজ হয়ে যাবে। তা সত্ত্বেও সিদ্ধান্ত মূলক কথা বলার পূর্বে তিনি এই শর্ত সম্পর্কে আনসারদের সঙ্গে পরামর্শ করা প্রয়োজন বলে মনে করলেন। আউস সরদার হযরত সায়াদ (রা) বিন মায়াজ এবং খাজরাজ সরদার হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদা উভয়েই আরজ করলেন। "হে আল্লাহর রাসূল আপনি যা বলছেন তা আল্লাহর নির্দেশ। এই নির্দেশ পালনে আমরা বাধ্য, না হুজুর (সা) আমাদেরকে বাঁচানোর জন্য এই প্রস্তাব দিচ্ছেন।"

হুজুর (সা) বললেন, "এটা আল্লাহর নির্দেশ নয়, বরং তোমাদের ওপর মুশরিকদের চাপ কমানোর জন্য এ ধরনের করছি। কেননা সমগ্র আরব ঐক্যবদ্ধ হয়ে তোমাদের ওপর হামলা করে বসেছে।"

একথার পর উভয় সরদারই এক বাক্যে আরজ করলেন "হে আল্লাহর রাসূল। আপনি যদি শুধু আমাদেরকে বাঁচানোর জন্য এই চুক্তি করতে চান তাহলে আমাদের নিবেদন হলো যে, এই শর্ত আপনি কোনক্রমেই মেনে নিবেন না। বনু গাতফান আমাদের নিকট থেকে সেই সময়ও খেজুরের একটি আঁটি পর্যন্ত খিরাজ হিসেবে নিতে পারেনি । তখন তো আমরা মুশরিক ছিলাম। এখন আমরা যখন আল্লাহ্ ও আল্লাহর রাসূলের ওপর ঈমান আনার মর্যাদা লাভ করেছি তখন তারা আমাদের নিকট থেকে কি খিরাজ নেবে! আমাদের ও তাদের মধ্যে এখন শুধু তরবারীই সিদ্ধান্ত নেবে।

হুজুর (সা) তাঁদের ঈমানী জযবায় এত প্রভাবিত হলেন যে, বনু গাতফানের সরদারদেরকে পরিষ্কার জবাব দিয়ে দিলেন। যুদ্ধের সময় একদিন হযরত সায়াদ (রা) বিন মুয়াজ যিরাহ পরিধান করে হাতে বর্শা নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে রওয়ানা হলেন। রাস্তায় বনু হারিছার গর্তের মধ্যে তাঁর মাতা কাবশা (রা) বিনতে রাফে' এবং উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) পাশা পাশি বসে ছিলেন। সে সময় তিনি যুদ্ধ গাথা পড়তে পড়তে তাঁদের সামনে দিয়ে অতিক্রম করলেন যুদ্ধ গাথাটির মর্মার্থ হলো ঃ "সামান্য সময়ের জন্য দাঁড়াও, যুদ্ধের ময়দানে আমার সওয়ারীকে পৌঁছতে দাও। যখন মৃত্যুর সময় এসে যাবে তখন মৃত্যু যে কত ভাল তা জানা যায়।" এই গাথা শুনে তাঁর মা

উচ্চৈস্বরে বললেন "পুত্র, দৌড়ে যাও, তুমি অনেক দেরী করে ফেলেছ।" ঘটনাক্রমে যে হাতে বর্শা ছিল তা যিরাহর বাইরে বেরিয়ে ছিল। উম্মুল মু'মিনীন (রা) বললেন, "সায়াদের মা, হায়! সায়াদের যিরাহ যদি একটু লম্বা হতো। তাঁর হাত বাইরে বের হয়ে আছে।" উম্মুল মু'মিনীনের (রা) আশংকা সঠিক বলে প্রমাণিত হলো। হযরত সায়াদ (রা) যখন যুদ্ধের ময়দানে পৌঁছলেন তখন হাব্বান বিন আবদি মান্নাফ নামক একজন মুশরিক যে ইবনুল আরকা নামে মশহুর ছিলো তাক করে তাঁর খোলা হাতের ওপর তীর নিক্ষেপ করলো। এই তীর হযরত সায়াদের (রা) একটি শিরা কেটে গেল। ফলে প্রচণ্ডভাবে রক্তপাত হতে লাগলো।

হুজুরের (সা) পবিত্র কানে ইবনে আরকার কথা পৌঁছলো এবং তিনি হযরত সায়াদের আহত হওয়ার কথা শুনে বললেন, "আল্লাহ তোর অর্থাৎ ইবনে আরকার চেহারা আগুনে ঝলসে দেবেন।" যুদ্ধের পর হুজুরে আকরাম(সা) হযরত সায়াদের (রা) জন্য মসজিদে নববীর চত্বরে একদিকে তাঁবু স্থাপন করালেন এবং চিকিৎসক হযরত রাফিদা আসলামিয়াকে তাঁর সেবা ও চিকিৎসার জন্য নিয়োগ করলেন। হুজুর (সা) স্বয়ং প্রতিদিন তার শুশ্রূষার জন্য তাশরীফ আনতেন। রহমতে আলম (সা) নিজের পবিত্র হাত দিয়ে তাঁর ক্ষতস্থানে দাগ দিলেন। ফলে রক্ত বেরোনো বন্ধ হয়ে গেল। তা সত্ত্বেও তিনি সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হলেন না। অসুস্থ থাকা অবস্থাতেই তিনি একদিন আল্লাহর দরবারে দোয়া করলেন ঃ "হে আল্লাহ! কুরাইশদের সঙ্গে যুদ্ধের সিলসিলা যদি অব্যাহত থাকে তাহলে আমাকে আরো সময় দিন। আমি তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার আকাংখা পোষণ করি। এসব কুরাইশই তো তোমার রাসূল বরহকের ওপর নির্যাতন চালিয়েছে, মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এবং স্বদেশ থেকে বহিষ্কার করেছে। আর যদি যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে থাকে তাহলে এই ক্ষত থেকেই আমাকে শাহাদাত নসিব করুন। অবশ্য আমাকে সে সময় পর্যন্ত জীবিত রাখুন, যে সময় পর্যন্ত বনু কোরাজার ব্যাপারে আমার মন মুতমায়িন না হয়ে যায়।" আল্লাহ তায়ালা তাঁর দোয়ার শেষ অংশ কবুল করলেন। বনু কোরায়জার ইহুদীরা যুদ্ধকালে চরম গাদ্দারী করেছিল। তারা মুসলমানদের সঙ্গে কৃত মিত্রতার চুক্তি "আমাদের ও মুহাম্মাদের (সা) মধ্যে কোন চুক্তি নেই" এই বলে ভেঙ্গে ফেলেছিল। তারা মুসলমানদের পিঠে খঞ্জর ঢুকিয়ে দেয়ার জন্য দুই হাজার নিযাহ, দেড় হাজার তরবারী, দেড় হাজার ঢাল এবং তিনশ' যিরাহ জমা করে রেখেছিল। আল্লাহ তায়ালা যদি তাদের এই অপকর্ম সময়মত বন্ধ করে না দিতেন তাহলে তারা মুসলমানদের অপূরণীয় ক্ষতি করতে পারতো। খন্দকের যুদ্ধের পর হুজুরে আকরাম (সা) আল্লাহর নির্দে

অনুযায়ী বনি কোরায়জার মহল্লা অবরোধ করে নিলেন এবং তাতে এত কঠোরতা অবলম্বন করলেন যে, কিছুদিন পরই তারা একটি শর্তে অস্ত্র সমর্পণ করলো। শর্তটি ছিল যে, তাদের ব্যাপারে আউস সরদার সায়াদ (রা) বিন মুয়াজ যে সিদ্ধান্ত দেবে তা উভয় পক্ষই মেনে নেবে। এই গাদ্দাররা হযরত সায়াদকে (রা) এই আশায় সালিশ মেনে ছিল যে, তিনি তাদেরকে সম্মান করবেন। কেননা আউস ও বনু কোরায়জা গোত্র দীর্ঘ দিন যাবত পারস্পরিক মিত্রতার সম্পর্ক বজায় রেখেছিল। হুজুর (সা) হযরত সায়াদকে(রা) ডেকে পাঠালেন। তিনি অসুস্থ অবস্থাতেই গাধা অথবা খচ্চরের ওপর সওয়ার হয়ে ঘটনাস্থলে পৌছলেন। হুজুর (সা) তাঁকে দেখে আনসারদেরকে সম্বোধন করে বললেন, "নিজেদের সরদারের সম্মানের জন্য উঠে দাঁড়াও।" অতপর হুজুর (সা) ইহুদীদের প্রতি ইঙ্গিত করে হযরত সায়াদকে (রা) বললেন, এরা তোমার সিদ্ধান্তের অপেক্ষা করছে। তিনি আরজ করলেন" তাহলে আমি এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি যে, তাদের লড়াইকারী সকল পুরুষকে হত্যা করতে হবে। মহিলা এবং শিশুদেরকে গোলাম বানিয়ে নিতে হবে এবং তাদের সহায় সম্পদ মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করে দিতে হবে।"

হুজুর (সা) বললেন, "সায়াদ তুমি আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক ফায়সালা করেছ।"

সুতরাং এই ফায়সালার ওপর আমল করা হলো বনু কোরায়জার এক একজন যুদ্ধবাজ গাদ্দারকে তাঁর সামনে হত্যার পর তিনি সেখান থেকে ফিরে এলেন। এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের কিছুদিন পর হযরত সায়াদের (রা) অসুস্থতা গুরুতর রূপ নিলো। দাগ দেয়ার পর তাঁর হাতের ক্ষত থেকে রক্ত প্রবাহিত হওয়াতো বন্ধ হয়ে গিয়েছিল কিন্তু হাত ফুলে গিয়েছিল। একদিন তার সে ক্ষত (নিজে নিজেই অথবা একটি ছাগলের খুর লাগার ফলে) এমনভাবে ফেটে গেল যে তা দিয়ে অঝোর ধারায় রক্ত প্রবাহিত হতে লাগলো। এ কারণে তাঁর মৃত্যু কষ্ট শুরু হয়ে গেল। হুজুর (সা) এই খবর পেয়ে অস্থির হয়ে মসজিদে পৌঁছলেন। সে সময় হযরত সায়াদের (রা) পবিত্র রূহ এই নশ্বর জগৎ ছেড়ে চলে গিয়েছিল। হুজুর (সা) হযরত সায়াদের (রা) মৃত্যুতে খুব দুঃখ পেলেন এবং নিজের জান নিছার ও মাহবুব সাহাবীর লাশ পবিত্র কোলে নিয়ে বসে গেলেন। অন্য এক রেওয়ায়াতে আছে যে, রহমতে আলম (সা) যখন হযরত সায়াদের (রা) তাঁবুতে পৌঁছলেন তখনো তার শ্বাস-প্রশ্বাস চলছিল। হুজুর (সা) তাঁর মাথা নিজের পবিত্র উরুর ওপর রেখে বললেন। "হে আল্লাহ! সায়াদ (রা) তোমার রাস্তায় অনেক কষ্ট স্বীকার করেছে। সে তোমার রাসূলকে

(সা) সত্য রাসূল হিসেবে মেনে নিয়েছিল এবং ইসলামের হকসমূহ আদায় করে নিয়েছে। হে আল্লাহ! তার রূহের সঙ্গে সেই ধরনের ব্যবহার করো যেমন ব্যবহার নিজের বন্ধুদের রূহের সঙ্গে করে থাকো।"

হযরত সায়াদ (রা) হুজুরের (সা) আওয়াজ শুনে চোখ খুললেন এবং আস্সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ্ বলে নিজের মাথা রাসূলের (সা) উরু থেকে সরিয়ে নিলেন [সে সময়ও হুজুরের (সা) আদব খেয়াল ছিল।] এরপর হুজুর (সা) তাঁকে মসজিদ থেকে তাঁর বাড়ীতে স্থানান্তর করিয়ে দিলেন। কয়েক মুহূর্ত পর সেখানেই তিনি ওফাত পেলেন। হযরত সায়াদের (রা) মৃত্যুতে মদীনা মুনাওয়ারাতে শোকের ছায়া নেমে এলো। যেই শুনলো সেই মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লো। এমনকি বড় বড় জালিলুল কদর সাহাবীও নিজেদেরকে আয়ত্তে রাখতে পারলেন না এবং অসহায়ভাবে কাঁদতে লাগলেন। হযরত সায়াদের (রা) মা হযরত কাবশা (রা) সে সময় কেঁদে কেঁদে বিলাপমূলক কবিতা পড়ছিলেন। এই কবিতা নিজের পুত্রের সীমাহীন প্রশংসা বাক্য ছিল। হুজুর (সা) বললেন! "ক্রন্দনকারী (বিলাপকারী) যত মহিলা আছে তারা মিথ্যা বলে থাকে, কিন্তু উম্মে সায়াদ (রা) সত্য বলে থাকেন।" জানাযা এবং দাফনের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত সায়াদের (রা) প্রতি বনু আবদুল আশহালের কেমন গভীর ভালবাসা ছিল তার আন্দাজ একটি ঘটনা থেকে অনুমান করা যায়। হযরত সায়াদের (রা) ওফাতের বেশ কিছু দিন পর একবার রাসূলে আকরাম (সা) সাহাবায়ে কিরামের (রা) সঙ্গে সফর করছিলেন। হযরত উসায়েদ (রা) বিন আশহালীও তার সফর সঙ্গী ছিলেন। পথিমধ্যে তিনি খবর পেলেন যে, তাঁর স্ত্রী ওফাত পেয়েছেন। এই খবরে এত কষ্ট পেলেন যে, মুখের ওপর কাপড় দিয়ে কাঁদতে লাগলেন। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বললেন, "আপনি একজন জালিলুল কদর সাহাবী হয়ে একজন মহিলার জন্য এভাবে কাঁদছেন।" একথা শুনে তিনি তৎক্ষণাৎ চুপ মেরে গেলেন এবং মুখের ওপর থেকে কাপড় সরিয়ে বললেন, "উম্মুল মু'মিনীন, আপনি সত্যি বলেছেন। আমাদের শুধু সায়াদ (রা) বিন মুয়াজের জন্য কাঁদা উচিত।" প্রিয় নবী (সা) এই সকল কথা শুনছিলেন।

হযরত সায়াদ (রা) মৃত্যুকালে দুই পুত্র রেখে যান। আমর (রা) এবং আবদুল্লাহ্ (রা) উভয়েই সাহাবী ছিলেন এবং দু'জনেরই বাইয়াতে রিদওয়ানে শরীক হওয়ার সৌভাগ্য লাভ ঘটেছিল।

হযরত সায়াদের (রা) পিতা মুয়াজ আইয়ামে জাহেলিয়াতে মারা গিয়েছিলেন। মা কাবশা বিনতে রাফে নবীর (সা) হিজরতের কিছুদিন পূর্বে

ইসলাম গ্রহণপূর্বক সাহাবিয়া হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছিলেন। তিনি আনসারদের ফকিহ হযরত আবু সাঈদ খুদরীর (রা) চাচাতো বোন ছিলেন । হযরত সায়াদ (রা) বিন মুয়াজের ওফাতের পর তিনি অনেকদিন জীবিত ছিলেন।

হযরত সায়াদ (রা) বিন মুয়াজ শুধুমাত্র পাঁচ বছর রাসূলে আকরামের (সা) বরকতপূর্ণ সাহচর্যে থাকার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে তিনি নিজের দ্বীনী খিদমত, কুরবানী এবং রাসূল প্রেমের বদৌলতে এত উঁচু মর্যাদা লাভ করেছিলেন যে, বড় বড় জালিলুল কদর সাহাবী তাঁর প্রতি ঈর্ষা করতেন । সকল নেতৃস্থানীয় চরিতকার এ ব্যাপারে একমত যে, হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) মত বিশ্ব নবীর (সা) প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা ইশকের দরজা পর্যন্ত পৌছেছিল। তিনি হুজুরের (সা) নিকট থেকে যে হাদিস শুনতেন তা আল্লাহর তরফ থেকে আসার ব্যাপারে স্থির বিশ্বাস রাখতেন। এ জন্য তাঁকে আনসারের সিদ্দীকে আকবার মনে করা হতো। হুজুরও (সা) হযরত সায়াদকে (রা) সীমাহীন ভালবাসতেন এবং তাঁকে সম্মানও করতেন।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলে আকরামের (সা) পর বনু আবদুল আশহালে সায়াদ (রা) বিন মুয়াজ, উসায়েদ (রা) বিন হুজায়ের এবং উবাদ (রা) বিন বাশারের যে মর্যাদা লাভ ঘটেছিল অন্য কেউই তার সমকক্ষ হতে পারেননি।

হযরত সায়াদের (রা) ওফাতের পর একবার হুজুরের (সা) নিকট কোথাও থেকে রেশমের একটি জুববা এলো। লোকজন এত নরম রেশম দেখে বিস্মিত হচ্ছিলেন। হুজুর (সা) বললেন, "তোমরা এই নরম দেখেই বিস্মিত হচ্ছো। অথচ জান্নাতে সায়াদ (রা) বিন মুয়াজের রুমাল তার থেকেও বেশী নরম এবং মোলায়েম।"

আরো একবার হুজুর (সা) বলেছিলেন, "কবরের অপ্রশস্ততা থেকে যদি কেউ নাজাত বা পরিত্রাণ পেতো তাহলে সে সায়াদ (রা) বিন মায়াজ হতো।" স্বয়ং হযরত সায়াদ (রা) একবার নিয়ামত বর্ণনা হিসেবে বলেছিলেন যে, "এমনিতে আমি একজন সাধারণ মানুষ। কিন্তু তিনটি ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা আমাকে নিজের বিশেষ ফজিলতে ভূষিত করেছেন। প্রথম কথা হলো, হুজুরের (সা) প্রতিটি হাদিসকে আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে বলে মনে করি। দ্বিতীয় ঃ নামাযে কোন ওয়াসওয়াসা সৃষ্টি হয় না। তৃতীয় ঃ জানাযার সঙ্গে যখন গমন করি তখন মুনকার নাকিরের সওয়ালের প্রতি খেয়াল থাকে।"

পাঁচ বছরের কম সময়ে সত্যবাদিতা ও ইয়াকিনের এই দরজায় পৌঁছানো এবং পয়গাম্বরীর আখলাকে উত্তরণ নিসন্দেহে আল্লাহ্ তায়ালার বিশেষ ফজিলতের কারণেই সম্ভব হয়েছিল। সত্য কথা হলো, হযরত সায়াদের (রা) পবিত্র জীবনের যে কোন দিকেই যদি দৃষ্টি দেয়া যায় তাহলে তা আলোকোজ্জ্বল বলেই দৃষ্টিগোচর হবে।

হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা)

নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বছরের রবিউল আউয়াল মাসে ফখরে মওজুদাত খাইরুল আনাম রহমতে আলম (সা) মক্কা থেকে হিজরত করে কুবাতে শুভ পদার্পণ করলেন। এ সময় কুবাবাসী চোখ ও অন্তর রাস্তার বিছানা বানিয়ে ছাঁড়লো। আমর বিন আওফ কবিলা এমন নিষ্ঠা ও উষ্ণতার সঙ্গে মক্কার দূররে ইয়াতিমকে (সা) মেযবানী করেছিল যে, তার কাহিনী শুনলে মৃত অন্তরেও জীবনের স্পন্দন অনুভূত হয়। সারওয়ারে আলম প্রিয় নবী (সা) কুবাতে ১৪ দিন অবস্থান করেন। তারপর পুনরায় জুময়ার দিন তিনি ইয়াসরাবের অভ্যন্তরে তাশরীফ নেয়ার জন্য নিজের উটনী কাসওয়াকে তলব করলেন। মদীনার আনসাররা হুজুরের (সা) বিচ্ছিন্নতার ধারণায় মনমরা হয়ে গেলেন এবং বনি আমর বিন আওফের নেতৃবৃন্দ হুজুরের (সা) উটনীর সামনে দাঁড়িয়ে আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কোন কাজ আপনার মেজাজ বিরোধী হয়ে যায়নিতো। অথবা হুজুর (সা) আমাদের গরীবখানা থেকে উত্তম অবস্থানস্থলে তাশরীফ নিতে চাইছেন।"

হুজুর (সা) বললেন ঃ "আমি যেখানে যাচ্ছি সেখানেই আমার যাওয়ার নির্দেশ রয়েছে।" তার পূর্বে রহমতে আলম (সা) বনু নাজ্জারকে নিজের ইচ্ছা সম্পর্কে জানিয়ে দিয়েছিলেন। সুতরাং তারা অত্যন্ত খুশী ও আনন্দে অস্ত্র সাজিয়ে হুজুরকে (সা) নিয়ে যাওয়ার জন্য ইয়াসরাব থেকে কুবা এসে পৌঁছলো। নবী করিম (সা) কুবা থেকে রওয়ানা হলেন। এ সময় সামনে ও পেছনে, ডাইনে ও বাঁয়ে আনসার এবং মুহাজিরদের সশস্ত্র দল চলছিলো এবং আনসারের সকল গোত্র রাহমাতুল্লিল আলামীনের অপেক্ষায় কুবা থেকে ইয়াসরাব পর্যন্ত অস্ত্র সজ্জিত হয়ে দুই কাতারে দাঁড়িয়েছিলেন। রোদে তাদের অস্ত্রের চমক দৃষ্টি শক্তিকে ক্ষীয়মাণ করে দিচ্ছিল এবং পরিবেশ তাকবির ও আহলান সাহলান ওয়া মারহাবার ধ্বনিতে গুঞ্জরিত হচ্ছিল।

প্রিয় নবী (সা) বনু সালেমের মহল্লায় পৌঁছলে নামাযের সময় হয়ে গেল। হুজুর (সা) উটনীর ওপর থেকে নেমে পড়লেন এবং লোকদেরকে জুময়ার নামাযের প্রস্তুতির নির্দেশ দিলেন। অতপর তিনি খুতবা দিলেন। খুতবায় রাব্বুল ইজ্জাতের হামদ ও প্রশংসা বর্ণনা করলেন এবং মুসলমানদেরকে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের (সা) আনুগত্যের হেদায়াত দিলেন এবং তাদেরকে বললেন যে, একদিন আমাদের সবাইকে আহকামুল হাকেমীনের সামনে উপস্থিত হয়ে নিজের আমলের হিসেব দিতে হবে। এ জন্য প্রত্যেক

মুসলমানের আখিরাতের জন্য নেক আমল করা ফরজ এবং তাকওয়া ও তাহারাতকে জীবনের অভ্যাসে পরিণত করতে হবে।

খুতবার পর সকল সাহাবীর সঙ্গে তিনি জুময়ার নামায পড়লেন। এটা ছিল তাঁর সর্বপ্রথম জুময়ার নামায এবং এই খুতবা তাঁর সর্বপ্রথম নামাযের খুতবা ছিল।

জুময়ার নামায থেকে ফারেগ হওয়ার পর হাদিয়ে আকরাম (সা) ইয়াসরাবের দক্ষিণ দিক দিয়ে শহরে প্রবেশ করলেন। হুজুরের (সা) ইয়াসরাব প্রবেশ উৎসাহের দুনিয়া এবং ইশকের ইতিহাসে অতুলনীয় ঘটনা। যে শ্রদ্ধাপূর্ণ উৎসাহ্-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ইয়াসরাববাসী রহমতে আলমকে (সা) স্বাগত জানিয়েছিল পৃথিবীর ইতিহাস তার উদাহরণ পেশ করতে পারেনি। সেদিন ইয়াসরাব "মদীনাতুন নবী" হয়ে গেল এবং তার ভূমি আকাশের ঈর্ষার বস্তুতে পরিণত হলো। আনসাররা এতো খুশী হয়েছিল যে, কুবা থেকে নিয়ে মদীনা পর্যন্ত তিন মাইল রাস্তা রাসূল দর্শকদের দ্বারা পূর্ণ ছিল। মদীনার ইতিহাসে এটা ছিল সবচেয়ে বড় খুশীর দিন। ইয়াছরাবের মাটির প্রতিটি ধূলিকণা খুশীতে বাগবাগ হয়ে গিয়েছিল যে, আজ তাদের সেই রহমতে আলমের (সা) পবিত্র পদ চুম্বনের সৌভাগ্য লাভ ঘটবে, যিনি আসমান ও যমীনের সকল সৃষ্টির গৌরবের বস্তু ছিল। সমগ্র শহর খুশীর আবেগ এবং শ্রদ্ধার আধিক্যে বসন্তের দোলনা হিসেবে মনে হচ্ছিলো এবং সমগ্র পরিবেশ আল্লাহর প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনায় মুখরিত ছিল। মদীনার হাবশী গোলাম আনন্দের আতিশয্যে নিজের সামরিক নৈপুণ্য দেখাচ্ছিল এবং শিশুরা "রাসূল এসেছেন, রাসূল এসেছেন" এই না'রা দিতে দিতে খুশীতে লাফালাফি করছিল। আনন্দের উচ্ছ্বাসে পর্দানশীন মহিলারাও ঘরের ছাদের ওপর এসে দাঁড়িয়েছিলেন। কুমারী মেয়েরা কামরার মধ্য থেকে উঁকি মারছিলো। রাস্তায় আনসারের প্রতিটি গোত্র আবেদনের স্বরে রাসূলে আকরামের (সা) সামনে আসছিলেন এবং আরজ করছিলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের বাড়ী হাজির, জীবন হাজির, মাল হাজির।"

হুজুর (সা) প্রত্যেক কবিলার ইহসানের স্বীকৃতি দিচ্ছিলেন এবং তার জন্য কল্যাণ কামনা করছিলেন।

যে সময় প্রিয় নবী (সা) কোন গলিতে প্রবেশ করছিলেন তখনই তার উভয় দিকের বাড়ীর ছাদ থেকে আনসারের পর্দানশীন মহিলাদের মুখ দিয়ে আনন্দ ও উৎসাহে এই সঙ্গীত উচ্চারিত হচ্ছিল ঃ

طلع البدر علينا - من ثنيات الوداع

وجب الشكر علينا - مادعى لله داع

ايها المبعوث فينا - جئت بالامر المطاع

"ওদা' পর্বতের গিরিপথ দিয়ে আমাদের ওপর পূর্ণিমার চাঁদ উদিত হয়েছে। যতক্ষণ দোয়া প্রার্থনাকারী দোয়া করবে ততক্ষণ আমাদের ওপর আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন ওয়াজিব। আমাদের মধ্যে প্রেরিত হে মহাপুরুষ! আপনি এমন নির্দেশ নিয়ে এসেছেন যার আনুগত্য আমাদের ওপর ফরজ।"

বনু নাজ্জারের আনন্দ উচ্ছ্বাসের সীমা পরিসীমা ছিল না। কেননা হুজুরের(সা) মাতামহির আত্মীয়তা সূত্রে তাদের বিশ্বাস ছিল যে, বিশ্ব নবী (সা) তাদেরকেই মেযবানীর মর্যাদা দান করবেন। আর এমনিভাবে তারা মাহবুবে কিবরিয়ার (সা) প্রতিবেশী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করবেন। বনু নাজ্জারের মাছুম শিশুরা দফ বাজিয়ে বাজিয়ে এই গীত গাইছিল ঃ

نحن جوار من بنى نجار

ياحبزا محمد من جار

"আমরা হলাম বনু নাজ্জারের মেয়ে
মুহাম্মাদ (সা) কতইনা ভাল প্রতিবেশী"

সারওয়ারে কায়েনাত (সা) এসব শিশু মেয়েদের পাশ দিয়ে অতিক্রমের সময় মুচকি হেসে বললেন ঃ

"শিশুরা! তোমরা কি আমাকে ভালবাসো?"

তারা একবাক্যে বললো, "হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল।"

হুজুর (সা) বললেন ঃ "তোমরাও আমার নিকট খুব প্রিয়।"

প্রিয় নবীর (সা) খাস খাদেম হযরত আনাস (রা) বিন মালিক থেকে বর্ণিত আছে যে, আমি সেদিন থেকে বেশী মুবারক এবং আনন্দপূর্ণ দিন আর দেখিনি। যেদিন রাসূলে আকরাম (সা) মদীনায় শুভ পদার্পণ করেছিলেন। সেদিন মদীনার দরজা ও প্রাচীর মহানবীর শুভাগমনে প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল।

বিশ্ব নবী (সা) যতই সামনে অগ্রসর হচ্ছিলেন আনসারদের আশা আকাংখার অস্থিরতা ততই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। আনসারের প্রত্যেকটি গোত্র এবং

ব্যক্তি আপাদমস্তক আকাংখায় ডুবে ছিল। প্রত্যেকেই রহমতে আলমের (সা) মেযবানীর মর্যাদা প্রাপ্তির আশা করছিলেন। সকলেই জানতেন যে, রহমতের এই বাদশাহ, শান্তির শাহজাদা এবং লুতফ ও করমের এই সুদর্শন মুখমণ্ডল যার গৃহে নিজের পবিত্র পা রাখবেন রহমতের ফেরেশতা তার দহলিজ পাহারা দেবে। আল্লাহর নেয়ামতসমূহ তার গৃহে অবতীর্ণ হবে এবং দ্বীন ও দুনিয়ার সকল বরকত তার নিকট আসবে। এ জন্য হুজুরের (সা) মেযবান হওয়ার জন্য আনসারদের মধ্যে প্রচণ্ড টানাটানি ছিল। গোত্রসমূহের নেতৃবৃন্দ যেমন হযরত উতবান (রা) বিন মালিক, সায়াদ (রা) বিন উবাদাহ, আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহা, আব্বাস (রা) বিন উবাদাহ, খারেজাহ (রা) বিন যায়েদ, যিয়াদ (রা) বিন লবিদ, ফারদাহ (রা) বিন আমর, সায়াদ (রা) বিন রবি, সলিত (রা) বিন কায়েস, মানযার (রা) বিন আমর এবং আবু সালিত আসিরাহ (রা) বিন আবি খারেজা ব্যক্তিগতভাবে হুজুরের (সা) খিদমতে হাজির হয়ে আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের গরীবখানা হাজির। তাতে শুভ পদার্পণ করুন।"

মহানবীর (সা) ওপর তখন ওহি নাযিলের অবস্থা বর্তমান ছিল। তিনি তাঁর আশা পোষণকারীর পক্ষে দোয়া করছিলেন এবং বলছিলেন ঃ "এই উটের রাস্তা ছেড়ে দাও তার রাস্তা বন্ধ করো না। সে আল্লাহর তরফ থেকে নিয়োজিত রয়েছে।"

হুজুর (সা) সে সময় উটনীর রশি ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর নির্দেশের অপেক্ষায় ছিলেন। হাদিয়ে আকরামের (সা) ইরশাদ শুনে সব মানুষ চুপ মেরে গেলেন এবং কম্পিত হৃদয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো যে, দেখা যাক, সৌভাগ্যবান ব্যক্তি কে যিনি রাহমাতুল লিল আলামীনের (সা) মেযবানীর মহান সৌভাগ্য লাভ করেন।

কাসওয়া [বিশ্ব নবীর (সা) উটনী] যেতে যেতে বনু নাজ্জারের মহল্লায় পৌঁছলো এবং সেখানে গিয়ে বসে পড়লো যেখানে আজকাল মসজিদে নববীর (সা) বড় দরজা রয়েছে। হুজুর (সা) তার ওপর থেকে নামলেন না। কাসওয়া পুনরায় উঠে দাঁড়ালো ও কিছুদূর গিয়ে ফিরে এলো এবং প্রথম যেস্থানে বসেছিল সেই স্থানেই এসে দু'পা একত্রিত করে বসে পড়লো। সেই স্থানের সম্পূর্ণ নিকটে একটি দ্বিতল বাড়ী ছিল। বাড়ীটির মালিক হুজুরকে ইসতিকবাল করার জন্য দহলিজে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি কাসওয়াকে নিজের বাড়ীর নিকটে এভাবে বসতে দেখে আনন্দের আতিশয্যে আত্মহারা হয়ে পড়লেন। দৌড়ে গিয়ে রহমতে আলমকে (সা) উষ্ণ সম্বর্ধনা জানালেন। ইত্যবসরে বনু

নাজ্জারের অন্যান্যরাও সেখানে পৌঁছে গেলেন এবং প্রত্যেকেই পীড়াপীড়ি করে বলতে লাগলেন যে, হে আল্লাহর রাসূল! আমার গরীব খানায় শুভ পদার্পণ করুন। এদিকে সেই ব্যক্তি আরজ করলেন ঃ

"ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা এই মিসকিনের বাড়ী। অনুমতি দিলে হুজুরের (সা) সামান নামিয়ে দি।"

রহমতে আলম (সা) কারোরই মনে আঘাত দিতে চাইছিলেন না। বললেন, "লটারী করে নাও।" আল্লাহর কি শান! লটারী করা হলো। কিন্তু লটারীতেও তার নামই উঠলো। রাব্বুল ইজ্জত যেন তাঁর তকদিরেই ফখরে দোজাহানের (সা) মেযবানীর মর্যাদা লিখে দিয়েছিলেন। তিনি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে বিশ্ব নবীর (সা) সামান উটনীর ওপর থেকে নামালেন এবং তাঁর গৃহ রিসালাত (সা) সূর্যের আলোকচ্ছটায় ঝলমল করে উঠলো।

এই ব্যক্তি যিনি মদীনা মুনাওয়ারাতে বিশ্ব নবীর (সা) মেযবানীর মহান সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন এবং যার সৌভাগ্যে জ্বীন ও ইনসান ঈর্ষা করেছিল তিনি ছিলেন বনু নাজ্জারের সরদার হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা)।

হযরত আবু আইয়ুব আনসারীর (রা) প্রকৃত নাম ছিল খালেদ বিন যায়েদ। কিন্তু তাঁর কুনিয়ত "আবু আইয়ুব" এত মশহুর হয়ে গিয়েছিল যে, খুব কম মানুষই তাঁর আসল নাম জানতো। আল্লামা ইবনে আছির (র) বর্ণনা করেছেন যে, যে ভয়াবহ যুগে বিদ্রোহীরা হযরত উসমানের (রা) গৃহ অবরোধ করে রেখেছিল এবং তিনি নামাযের জন্য ঘর থেকেও বের হতে পারতেন না। এ সময় কতিপয় সাহাবী (রা) হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুর নিকট মসজিদে নববীতে এসে নামায পড়ানোর আবেদন জানান। হযরত আলী (রা) স্বয়ং নামায পড়ানোর ব্যাপারে ক্ষমা চাইলেন। অবশ্য বললেন যে, খালিদ (রা) বিন যায়েদকে নামায পড়াতে বলো।

লোকেরা জিজ্ঞেস করলো ঃ "কোন খালিদ বিন যায়েদ?"

তিনি বললেন ঃ "আবু আইয়ুব" সেদিন সাধারণ মানুষ হযরত আবু আইয়ুবের (রা) আসল নাম জানতে পেলো।

হযরত আবু আইয়ুব (রা) খাজরাজের বনু নাজ্জারের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। রাসূলে করিমের (সা) মাতামহীর সাথে আত্মীয়তা ছিল বনু নাজ্জারের। মালিক বিন নাজ্জারের সন্তানদের মধ্য থেকে হওয়ার ভিত্তিতে আল মালেকী এবং আনসারের ইযদী হওয়ার কারণে আল ইযদীও লিখা হয়। নসবনামা নিম্নরূপ ঃ

খালেদ (আবু আইয়ুব) বিন যায়েদ বিন কুলায়েব বিন ছালাবা বিন আবদি আওফ খাযরাজী।

হযরত আবু আইয়ুবের মাতার নাম ছিল হিন্দ (অন্য এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী যাহরা) বিনতে সায়াদ খাযরাজী। তিনি হযরত আবু আইয়ুবের পিতা যায়েদ বিন কুলাইবের মামাতো বোন ছিলেন।

হযরত আবু আইয়ুব (রা) নবীর হিজরতের ৩১ বছর পূর্বে ইয়াসরাবে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আনসারের সাবিকুনাল আউয়ালুনের মধ্যে পরিগণিত হয়ে থাকেন। তিনি হুজুরের (সা) মদীনা মুওনাওয়ারাতে শুভাগমনের পূর্বেই হযরত মুসয়াব (রা) বিন উমায়েরের তাবলিগী প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তারপর তার বাইয়াতে উকবায়ে কবিরাতে শামিল হওয়ার মহান সৌভাগ্য লাভ করেন। সে সময় তিনি ৭৪ জন সাথীর সঙ্গে হাদিয়ে আকরামের (সা) নিকট এই পবিত্র প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল! আপনি ইয়াসরাবে শুভ পদার্পণ করলে আল্লাহর কসম, আমরা সবসময় নিজের জীবন এবং মাল দিয়ে আপনার হেফাজত ও সাহায্য করবো।"

রহমতে আলম (সা) মদীনা মুনাওয়ারাতে তাশরীফ নিলেন। এ সময় হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা) রাসূলের (সা) মেযবানীর সেই মহান মর্যাদা লাভ করলেন যাতে অন্যান্য সাহাবী সবসময় ঈর্ষা করতেন। সারওয়ারে আলম (সা) হযরত আবু আইয়ুবের (রা) বাড়ীতে অবস্থানের লক্ষ্যে কিভাবে নির্বাচিত হলেছিলেন? ঘটনার একটি দিক ওপরে বর্ণিত হয়েছে। অন্য এক রেওয়ায়াতে আছে, কাসওয়াকে নিজের বাড়ীর পাশে বসতে দেখে হযরত আবু আইয়ুব (রা) দৌড়ে এগিয়ে এলেন এবং হুজুরকে (সা) আহলান সাহলান বলে স্বাগতঃ জানালেন। হুজুর (সা) নীচে নামলেন। এ সময় হযরত আবু আইয়ুব(রা) উটনীর ওপর থেকে হাওদা নামিয়ে তৎক্ষণাৎ নিজের বাড়ীর মধ্যে নিয়ে গেলেন। অন্যান্যরা রাসূলকে (সা) নিজেদের বাড়ী নিয়ে যেতে চাইলেন। তাতে রাসূল (সা) বললেন, "মানুষ সেখানেই অবস্থান করে যেখানে তাঁর হাওদা থাকে।"

অন্য আরেক রেওয়ায়াতে আছে যে, বিশ্ব নবী (সা) ইচ্ছাকৃতভাবে হযরত আইয়ুবের (রা) নিকট অবস্থান করেন। কেননা তিনি বনু নাজ্জারের সরদার ছিলেন এবং বনু নাজ্জারের সঙ্গে হুজুরের (সা) আত্মীয়তা ছিল। কিন্তু এই রেওয়ায়াতে একথার ব্যাখ্যা করা হয়নি যে, বনু নাজ্জারের অন্য কোন নেতার বাড়ীতে রাসূলে আকরাম (সা) কেন অবস্থান করেননি এবং এই সৌভাগ্য

হযরত আবু আইয়ুব আনসারীরই (রা) কেন হয়েছিল। প্রকৃত কথা হলো এসব কিছু আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ীই হয়েছিল। হযরত আবু আইয়ুবকে (রা) রাব্বুল ইজ্জতের পক্ষ থেকেই হুজুরের (সা) মেযবানীর জন্য নির্বাচিত করা হয়েছিল।

হযরত আবু আইয়ুবের (রা) বাড়ী ছিল দোতলা বিশিষ্ট। এক কামরা ছিল নীচে এবং অপরটি ছিল ওপরে। তিনি রাসূলের (সা) নিকট আরজ করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আপনি গরীবখানার ওপর তলায় অবস্থান করুন।" হুজুর (সা) বললেন, "না, লোকজন আমার নিকট যাতায়াত করবে। এ জন্য নীচের তলাই আমার অবস্থানের জন্য উপযোগী হবে। সুতরাং হুজুরের (সা) ইচ্ছানুযায়ী হযরত আবু আইয়ুব (রা) ঘরের নীচের তলা খালি করে দিলেন এবং নিজে ওপর তলায় চলে গেলেন। কিন্তু তিনি ও তার স্ত্রী সবসময় এই ভেবে অস্থির থাকতেন যে, তিনি ওপর তলায় রয়েছেন এবং আল্লাহর নবী (সা) নীচের তলায় অবস্থান করছেন।

আল্লামা ইবনে হিসাম বর্ণনা করেছেন, একদিন ওপর তলায় পানি ভর্তি পাত্র ফেটে গেল। হযরত আবু আইয়ুব (রা) এই ভেবে অস্থির হয়ে পড়লেন যে, পানি বয়ে নীচে যাবে এবং বিশ্ব নবীর (সা) তাকলিফ হবে। ঘরে গায়ে দেয়ার মত একটি লেপই ছিল। হযরত আবু আইয়ুব (রা) তৎক্ষণাৎ লেপটি টেনে পানির ওপর নিক্ষেপ করলো। যাতে প্রবাহিত পানি তুলা শোষণ করে নেয়। পানি যখন নীচে প্রবাহিত হওয়ার আশংকা তিরোহিত হলো তখন স্বামী-স্ত্রী শান্তির নিঃশ্বাস নিলেন।

মহানবী (সা) যদিও নিজের ইচ্ছানুযায়ী নীচের তলায় অবস্থান করছিলেন। কিন্তু হযরত আবু আইয়ুব (রা) এবং তাঁর স্ত্রীর ওপর তলায় থাকাটা খুবই অপসন্দনীয় ব্যাপার ছিল। ফখরে মওজুদাত, খাইরুল বাশার, সাইয়েদুর রাসূল এবং সারওয়ারে কায়েনাত (সা) নীচের তলায় অবস্থান করবেন, আর নগণ্যতম খাদেম থাকবে ওপর তলায় এটা ছিল তাঁর হৃদয়বিদারক ব্যাপার। এই মানসিক কষ্ট এক রাতে এমন প্রচণ্ড আকার ধারণ করলো যে, স্বামী-স্ত্রী উভয়েই ছাদের এক কোণে গুটিশুটি মেরে বসে রইলেন এবং সমগ্র রাত এই অবস্থায় জেগে কাটিয়ে দিলেন। ভোর হলে হযরত আবু আইয়ুব (রা) প্রিয় নবীর (সা) খিদমতে হাজির হয়ে'আরজ করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমরা সারা রাত ছাদের এক কোণায় বসে জেগে ছিলাম। হুজুর (সা) কারণ জিজ্ঞেস করলেন। এ সময় তিনি বললেন ঃ "আমাদের মাতা-পিতা আপনার উপর কুরবান হোক। আমরা সবসময়ই আপনার সঙ্গে বেআদবীর ভয়ে অস্থির থাকি। রাতে এই ভীতি এত বৃদ্ধি পেল যে, হে আল্লাহর রাসূল আমাদের ওপর রহম

করুন এবং ওপর তলায় তাশরীফ রাখুন। হুজুরের (সা) গোলামদের জন্য পদতলে থাকাটাই গৌরবের বিষয় হবে।"

বিশ্ব নবী (সা) হযরত আবু আইয়ুবের (রা) আবেদন কবুল করলেন এবং তিনি ওপরের তলায় স্থানান্তর হয়ে গেলেন। হযরত আবু আইয়ুব (রা) এবং তাঁর স্ত্রী পূর্ণ খুশীতে নীচের তলায় থাকা শুরু করলেন।

মহানবী (সা) ছ' অথবা সাত মাস হযরত আবু আইয়ুবের (রা) বাড়ী অবস্থান করেন। এই সময় হযরত আবু আইয়ুব (রা) গভীর শ্রদ্ধার সাথে রহমতে দো আলমের (সা) খিদমত করেছিলেন। হযরত আবু আইয়ুব (রা) দু'বেলাই হাদিয়ে আকরামের (সা) খিদমতে খাবার পেশ করতেন। কোন কোন সময় অন্য আনসারের নিকট থেকেও খাবার এসে যেতো। খাওয়ার পর যা কিছু অবশিষ্ট থাকতো হুজুর (সা) তা হযরত আবু আইয়ুবের (রা) নিকট প্রেরণ করতেন। তার শ্রদ্ধাবোধ এবং রাসূল প্রেম এত গভীর ছিল যে, খাবারের মধ্যে যেখানে যেখানে রাসূলে করিমের (সা) আঙ্গুলের ছাপ দেখতে পেতেন বরকত ও রাসূলের (সা) আনুগত্য হিসেবে সেখানে নিজের আঙ্গুল রেখে খাবার খেতেন। একবার খাবার যেমন পাঠানো হয়েছিল তেমনি ফিরে এলো। হযরত আবু আইয়ুব (রা) ব্যাকুল হয়ে হুজুরের (সা) খিদমতে হাজির হয়ে আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান। আপনি আজ খাবার গ্রহণ করেননি।"

হুজুর (সা) বললেন ঃ "হ্যাঁ, আজকের খাবারে রসুন ছিল। রসুন আমার পসন্দনীয় নয়।"

হযরত আবু আইয়ুব (রা) আরজ করলেন ঃ "হুজুর (সা) যা পসন্দ করেন না, আমিও তা পসন্দ করি না।" [রসুন ইসলামী শরীয়তে হারাম নয়। যেহেতু তা খাওয়ায় মুখে এক ধরনের গন্ধ হয় সে জন্য রাসূলে আকরাম (সা) তা অপসন্দ করতেন]।

আবু আইয়ুবের (রা) বাড়ীতে অবস্থানের পর প্রিয় নবী (সা) মদীনা মুনাওয়ারাতে আল্লাহর ঘর বানানোর ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। এই উদ্দেশ্যে হুজুর (সা) হযরত আবু আইয়ুবের (রা) বাড়ীর সামনের সেই জমি নির্বাচিত করলেন যেখানে তাঁর উটনী এসে বসেছিল। এই জমির মালিক ছিলেন বনু নাজ্জারের দুই ইয়াতিম শিশু, সোহায়েল (রা) এবং সাহাল (রা)। প্রিয় নবী (সা) আনসারদেরকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, "আমি মূল্য দিয়ে এই জমি নিতে চাই। যাতে সেখানেই আল্লাহর ঘর নির্মাণ করতে পারি।"

আনসাররা আরজ করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! এই জমির মালিকদেরকে আমরা মূল্য দিয়ে দিব এবং তা নিজেদের পক্ষ থেকে আপনাকে দান করছি। তার প্রতিদান আমরা আল্লাহর থেকে গ্রহণ করবো।" হুজুর (সা) আনসারদের(রা) কুরবানীর আবেগের প্রশংসা করলেন কিন্তু জমির মূল্য দানে পীড়াপীড়ি করলেন এবং জমির মালিক সাহাল (রা) ও সোহায়েলকে (রা) ডেকে পাঠালেন। উভয় ভাগ্যবান শিশুই আরজ করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! এই জমি আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আপনাকে দান করছি।" শিশু দু'টির মা-ও তাদেরকে সমর্থন জানালো। হুজুর (সা) বললেন, "আল্লাহ তোমাদেরকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। আমি এই জমি মূল্য ছাড়া নিব না।"

অতপর তিনি অভিজ্ঞ লোকদের পরামর্শ অনুযায়ী জমির মূল্য দশ মিছকাল (পৌণে চার তোলা) স্বর্ণ নির্ধারণ করলেন। এই মূল্য হুজুরের (সা) পক্ষ থেকে কেউ আদায় করলেন। এ সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের রেওয়ায়াত আছে, "ফাতহুল বারির" রেওয়ায়াত অনুযায়ী হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা) এই জমির মূল্য দিয়ে দিয়েছিলেন।

হিজরতের ৬ষ্ঠ মাসে হুজুর (সা) মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেন। এ সময় মদীনায় ইসলামের প্রথম শিক্ষক হযরত মুসয়াব (রা) বিন উমায়েরকে হযরত আবু আইয়ুবের (রা) ভাই বানালেন। ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার কিছু দিন পর মসজিদ এবং তৎসংলগ্ন দু'টি হুজরা বা কামরার নির্মাণ কাজ শেষ হলো। তখন বিশ্ব নবী (সা) হযরত আবু আইয়ুবের (রা) বাড়ী থেকে সেই হুজরায় স্থানান্তর হয়ে গেলেন।

হিজরতের অব্যবহিত পরেই মদীনার মুনাফিক এবং ইহুদীরা তাওহীদবাদীদের বিরুদ্ধে শত্রুতা শুরু করে দিল। হুজুর (সা) তাদের ষড়যন্ত্রের কথা অবহিত হয়ে সাহাবায়ে কিরামকে (রা) হিদায়াত দিলেন। হিদায়াতে তিনি রাতে অস্ত্র বেঁধে শোয়ার এবং কিছু লোককে জেগে পাহারা দানের নির্দেশ দিলেন। যাতে মক্কার কুরাইশ এবং অন্য শত্রুর আকস্মিক হামলার তদারক করা যায়। এক সময় হযরত আবু আইয়ুব (রা) সারা রাত জেগে নবীর (সা) বাড়ী পাহারা দিলেন। সকাল হলে বিশ্ব নবী (সা) তাঁর জন্য দোয়া করলেন ঃ

"হে আবু আইয়ুব, আল্লাহ তোমাকে হেফাজত করুন ও নিরাপত্তা দিন। তুমি তার নবীর (সা) রক্ষকের কাজ করেছ।"

হুজুরের (সা) এই দোয়ার প্রভাবেই হযরত আবু আইয়ুব (রা) আজীবন দুঃখ-মুসিবত থেকে মাহফুজ ছিলেন এবং ওফাতের পরও শতাব্দীর পর

শতাব্দী কাল পর্যন্ত নাসারারা তাঁর কবরের হিফাজত ও তত্ত্বাবধান করতে থাকে। এমনকি তাঁর দাফনের স্থানই অর্থাৎ কাসতানতুনিয়াও মুসলমানদের অধীনে চলে আসে। আজও তুর্কী সরকার তাঁর কবরের তত্ত্বাবধান করে চলেছেন এবং সেখানে আশেকানের ভিড় লেগেই থাকে।

দ্বিতীয় হিজরীতে যুদ্ধের সিলসিলা শুরু হলে বদর থেকে বাইয়াতে বিদওয়ান পর্যন্ত এবং বাইয়াতে রিদওয়ান থেকে হুনাইন পর্যন্ত এমন কোন যুদ্ধ বা সমর ছিল না যাতে হযরত আবু আইয়ুব (রা) রহমতে আলমের (সা) সঙ্গে ছিলেন না। একদিকে তিনি তিন শ' তেরজন বদরী সাহাবীর দলে শামিল ছিলেন। তেমনি তাঁকে সেই চৌদ্দশ' জীবন উৎসর্গকারীর দলে দেখা যায় যাদেরকে আল্লাহ তায়ালা আসহাবুশ শাজারাহ বলে অভিহিত করেছিলেন এবং স্পষ্ট ভাষায় জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। মক্কা বিজয়ের সময় তিনি সেই ১০ হাজার পবিত্র আত্মার একজন ছিলেন যাঁদের সম্পর্কে হাজার হাজার বছর পূর্বে কিতাবে ইসতিসনাতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল।

একাদশ হিজরীতে মহানবীর (সা) ইন্তেকালের পর খিলাফতের সমস্যা দেখা দিলে হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা) সেই কতিপয় সাহাবীর অন্যতম ছিলেন যাঁরা হযরত আলীকে (রা) খিলাফতের মুসতাহিক বলে মনে করতেন। সুতরাং তিনি হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) বাইয়াত প্রশ্নে কিছু দিন অপেক্ষা করলেন। হযরত আলী (রা) যখন সিদ্দীকে আকবারের (রা) বাইয়াত করলেন তখন তাঁরাও নিজের হাম খেয়াল সাথীদেরসহ তাঁর অনুসরণ করলেন এবং অতপর কারোর মনে তাঁর বিরুদ্ধে মলিনতার লেশমাত্রও রইলো না।

সিদ্দীকে আকবারের (রা) সংক্ষিপ্ত খিলাফতকালে মুসলমানরা আরবের সীমানার বাইরে বেরিয়ে জিহাদ শুরু করে দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই যুগের যুদ্ধসমূহে হযরত আবু আইয়ুব আনসারীর (রা) নাম পাওয়া যায় না। হযরত ওমর ফারুক (রা) খিলাফতের মসনদে সমাসীন হলেন। তাঁর শাসনামলে ইসলামের মুজাহিদদের ঘোড়ার খুর এশিয়া ও আফ্রিকার লাখ লাখ বর্গ মাইল এলাকা চষে ফেললো এবং তার ওপর ইসলামের পতাকা উড্ডীন করে দিল। আল্লামা ওয়াকেদী ও অন্য কতিপয় ঐতিহাসিক ফারুকী শাসনামলের কোন কোন যুদ্ধে হযরত আবু আইয়ুব আনসারীর (রা) নাম স্পষ্ট করেই উল্লেখ করেছেন এবং লিখেছেন যে, ভানসার যুদ্ধে তিনি অংশ নিয়েছিলেন। মিসর বিজয়ের পর হযরত আমর (রা) ইবনুল আছ একটি বাহিনী পশ্চিমকে (উত্তর আফ্রিকা) পদানত করার জন্য প্রেরণ করেছিলেন। এই বাহিনী অগ্রসর হয়ে

বারকাহ্ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছলো এবং সেখানে ইসলামের পতাকা উড্ডীন করে ফিরে এলো। এই বাহিনীতে আবু আইয়ুব আনসারীও (রা) শামিল ছিলেন। সাধারণভাবে ঐতিহাসিকরা সেই যুগে হযরত আবু আইয়ুবের (রা) কর্মতৎপরতার বিস্তারিত বিবরণ দেননি। তবে, এতটুকুন অবশ্যই জানা যায় যে, তিনি ফারুকী শাসনামলের কয়েকটি যুদ্ধে এক উদ্দীপ্ত মুজাহিদ হিসেবে অংশগ্রহণ করেন এবং জিহাদের জন্য লম্বা সফর করেন।

হযরত উসমান জুন্নুরাইনের (রা) খিলাফতকালে হযরত আবু আইয়ুব (রা) অধিকাংশ সময় মদীনাতেই অবস্থান করেছিলেন। কতিপয় ব্যাপারে আমীরুল মু'মিনীনের (রা) সঙ্গে তাঁর চরম মতবিরোধ ছিল। কিন্তু তিনি কোন গোলমালে অংশ নেননি। যে দিনগুলোতে বিদ্রোহীরা আমীরুল মু'মিনীনের (রা) বাড়ী অবরোধ করে রেখেছিল হযরত আবু আইয়ুব (রা) মসজিদে নববীতে সেই দিনগুলোতে মুসলমানদের ইমামতি করেছিলেন। হযরত উসমান জুন্নারাইনের (রা) শাহাদাতের পর হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু খলিফা নির্বাচিত হলেন। তিনি হযরত আবু আইয়ুবকে (রা) অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সম্মান করতেন। তিনি হযরত আবু আইয়ুবের (রা) বার্ষিক বৃত্তি পাঁচ হাজার দিরহাম থেকে বৃদ্ধি করে বিশ হাজার করে দেন এবং খিলাফতের নিকট হতে প্রাপ্ত গোলামের সংখ্যা ৮ থেকে বাড়িয়ে ৪০ করা হয়।

হযরত আলী মুরতাজার (রা) খিলাফতের শুরুতে হযরত সাহাল (রা) বিন হানিফ আনসারী মদীনার আমীর ছিলেন। ৩৬ হিজরীতে হযরত আলী মুরতাজা তাঁকে কুফা ডেকে নেন এবং মদীনার আমীর হিসেবে হযরত আবু আইয়ুবকে (রা) নিয়োগ করেন। বেশীর ভাগ রেওয়ায়াতে আছে যে, উষ্ট্রের ও সিফ্ফিনের যুদ্ধের সময় তিনি মদীনার আমীর ছিলেন। কিন্তু আল্লামা ইবনে আবদুল বার(র) ইসতিয়াব গ্রন্থে লিখেছেন যে, হযরত আবু আইয়ুব (রা) উষ্ট্র ও সিফ্ফিনের যুদ্ধে হযরত আলীর (রা) পক্ষে অংশগ্রহণ করেন।

৩৭ হিজরীতে সংঘটিত খারেজীদের বিরুদ্ধে নাহরওয়ানের প্রসিদ্ধ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে হযরত আবু আইয়ুব (রা) হযরত আলীর বাহিনীর মুকাদ্দামাতুল জায়েশ বা অগ্রবর্তী দলের সেনাপতি ছিলেন। এই যুদ্ধে তিনি অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করেন।

এক রেওয়ায়াতে আছে যে, নাহরওয়ানের যুদ্ধে হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু নিজের মশহুর ঝাণ্ডা "রাইয়াতুল ঈমান" হযরত আবু আইয়ুবের (রা) হাতে সোপর্দ করেন। এটা একটা বিরাট সম্মানের ব্যাপার ছিল। হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা) জানবাজী এবং ত্যাগের মাধ্যমে নিজেকে সেই

সম্মান বা মর্যাদার যোগ্য করেছিলেন এবং শেরে খোদা (রা) তাঁর বীরত্বের প্রশংসা করেছিলেন।

হযরত আলী মুরতাজার (রা) শাহাদাতের পর হযরত আবু আইয়ুব (রা) রাজনৈতিক বিশৃংখলা থেকে দূরে থেকে নির্জনত্ব অবলম্বন করেন। কিন্তু জিহাদের উৎসাহ তাঁর অন্তরে সবসময়েই তুড়ি দিয়ে উঠতো।

৪৮-৪৯ অথবা ৫০-৫১ অথবা ৫২ হিজরীতে আমীরে মুয়াবিয়া (রা) একটি ইসলামী বাহিনী কাসতানতুনিয়া পদানত করার জন্যে প্রেরণ করলেন। এ সময় হযরত আবু আইয়ুব (রা) নিজের বার্দ্ধক্য সত্ত্বেও সেই বাহিনীতে একজন সাধারণ মুজাহিদ (সিপাহী) হিসেবে অংশ নেন। কতিপয় ঐতিহাসিকের বর্ণনা অনুযায়ী সেই বাহিনীর নেতৃত্বের দায়িত্ব ছিল সুফিয়ান বিন আওফের ওপর। কিন্তু অধিকাংশ মজবুত রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে যে, সেই বাহিনীর আমীর ছিলেন ইয়াযিদ বিন মুয়াবিয়া (রা)। ইয়াযিদ ইসলামের ইতিহাসে একজন কুখ্যাত ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত। এ জন্য তার নেতৃত্বে হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা) এবং অন্য কতিপয় জালিলুল কদর সাহাবীর (রা) কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করাটা কতিপয় মানুষের জন্য বিস্ময়ের ব্যাপার ছিল। কিন্তু সেই জটিলতার গ্রন্থি মোচন বা সমস্যার সমাধান মশহুর শিয়া আলেম সাইয়েদ আলী নকী সাহেব বর্তমান যুগের মুজতাহিদ স্বরচিত কিতাব "তাজকিরায়ে হুফ্ফাজে শিয়া"-তে এভাবে পেশ করেছেন ঃ

"কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধ করার ব্যাপারটা তাঁর অর্থাৎ হযরত আবু আইয়ুব আনসারীর নিকট বিশেষ উৎসাহের বিষয় ছিল। এমনকি এই প্রসঙ্গে ইয়াযিদ বিন মুয়াবিয়ার সেনাপতিত্বে যুদ্ধ করা পর্যন্ত তিনি খারাপ মনে করেননি। তাঁর ইজতিহাদী ধারণা ছিল যে, কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ যদি ফাসিক ও ফাজিরের অধীন হলেও তাতে সঠিক নিয়তে অংশগ্রহণে ধর্মের সাহায্য হয়। এ জন্য মুয়াবিয়ার নির্দেশে ইয়াযিদের অধীনে রোমের যুদ্ধে আবু আইয়ুব আনসারী (রা) উপস্থিত ছিলেন।" (তাজকিরায়ে হুফ্ফাজে শিয়া-১৩৫৩ হিঃ প্রকাশকাল)

কাসতানতুনিয়া অভিযানের সময় হযরত আবু আইয়ুবের (রা) বয়স ৮০ বছরের বেশী ছিল। কিন্তু তিনি জিহাদে এত উৎসাহী ছিলেন যে, এই বৃদ্ধ বয়সেও মদীনা মুনাওয়ারা থেকে সিরিয়া পর্যন্ত শুধুমাত্র জিহাদে অংশগ্রহণের জন্য সফর করেন। অতপর একজন সাধারণ মুজাহিদ হিসেবে ইসলামী বাহিনীতে শামিল হন। অথচ সেই বাহিনীর নেতৃবৃন্দ এবং অফিসারবৃন্দের মধ্য থেকে কোন ব্যক্তিই কোন দিক থেকেই তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিল না। বাস্তবে তিনি

"সাহিবে বদর" এবং "সাহিবে শাজারাহ" হওয়ার কারণে ইসলামী বাহিনীতে বিশেষ মর্যাদা রাখতেন। তাঁর উপস্থিতি ইসলামী বাহিনীর জন্য বরকতের কারণ ছিল এবং তাতে তাদের সাহস কয়েকগুণ বেড়ে গিয়েছিল। আমীর মুয়াবিয়া (রা) ইসলামী নৌবাহিনীকে সব ধরনের সাজ সরঞ্জাম দিয়ে সুসজ্জিত করেছিলেন। অতপর একদিন এই বাহিনী শাহাদাতের উৎসাহে উদ্দীপিত হাজার হাজার মুজাহিদকে নিয়ে সিরিয়ার উপকূল থেকে কাসতানতুনিয়া রওয়ানা হয়ে গেল। কিছুদিন পর ইসলামী নৌবাহিনী রোম সাগর অতিক্রম করে বসফরাস প্রণালীতে প্রবেশ করলো এবং কাসতানতুনিয়ার সামনে একটি উপযুক্ত স্থানে নোঙ্গর করে মুজাহিদদেরকে শুকনো স্থানে নামিয়ে দিল। রোমক বাদশাহ চতুর্থ কাসতানতিন প্রচুর সাজ-সরঞ্জামসহ মুসলমানদের সামনা-সামনি হলো। মুসলমানরা ভালভাবে বিশ্রামও নিতে পারেনি এমন সময় রোমকরা তাদের ওপর হামলা করে বসলো। মুসলমানরা অত্যন্ত ধৈর্য ও সাহসের সঙ্গে রোমকদের হামলায় বাধা দিল এবং রক্তাক্ত যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। মুসলমানদের এত প্রচণ্ড উৎসাহ ছিল যে, তারা দুশমনের ব্যূহে ঢুকে পড়তো। আবদুল আজীজ (রা) বিন যারারাহ নামক এক মুজাহিদ একবার একাকী রোমকদের ব্যূহ মাড়িয়ে অনেক দূরে চলে গেলেন। মুসলমানরা তাকে এভাবে নিজের জীবনকে বিপদের সম্মুখীন করে তুলতে দেখে চেঁচিয়ে উঠলো যে, এ ধরনের করা আল্লাহর সেই ফরমান বিরোধী।

وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ

"তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করে না।"

(আল বাকারাহ-১৯৫)

এ সময় হযরত আবু আইয়ুব (রা) এগিয়ে গিয়ে ইসলামী বাহিনীকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

"হে মুসলমানরা! তোমরা এই আয়াতের অর্থ এই বুঝেছ? অথচ তার প্রকৃত অর্থ এর উল্টো। আনসাররা যুদ্ধের সময় ব্যস্ত থাকার কারণে তাদের কারবার ও বাণিজ্যে যে ক্ষতি হয়েছিলো শান্তির সময় তা পুষিয়ে নেয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। সে সময় এই আয়াত নাযিল হয় যে, জিহাদে কোন লোকসান বা ধ্বংস নেই বরং জিহাদ থেকে দূরে থাকাটাই নিজেকে ধ্বংসের নামান্তর হয়ে থাকে।"

হযরত আবু আইয়ুবের (রা) ইরশাদ শুনে মুসলমানরা রোমকদের ওপর মরণপণ ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং খুব শীঘ্র তাদেরকে হটে যেতে বাধ্য করলো।

রোমকরা শহরের মধ্যে গিয়ে আশ্রয় নিলো এবং প্রাচীরের দরজা বন্ধ করে দিল। মুসলমানরা শহর অবরোধ করে নিল এবং তা পদানত করার জন্য উপযুক্ত সুযোগ তালাশ করতে লাগলো।

ইসলামী বাহিনী যে সময় কাসতানতুনিয়া অবরোধ করে রেখেছিল সে সময় ইউরোপের আবহাওয়া মুসলমানদের স্বাস্থ্যের ওপর খুব খারাপ প্রভাব ফেলছিল। এমনকি এক বিরাট সংখ্যক মুসলমান অসুস্থ হয়ে পড়লো। ঐতিহাসিকরা এই রোগকে প্লেগ বা মহামারী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এটা অন্ত্রের কোন অসুখ ছিল। অনেক মুজাহিদ এই রোগ থেকে বাঁচতে পরেননি। হযরত আবু আইয়ুবও (রা) সে সময় কঠিনভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। যখন তাঁর আর বাঁচার কোন আশা রইলো না তখন সেনাবাহিনীর আমীর ইয়াযিদ তাঁর খিদমতে হাজির হলো এবং বললো ঃ "আপনার কোন ওসিয়ত থাকলে তা বলুন।"

হযরত আবু আইয়ুব (রা) বললেন ঃ "আমি যখন মারা যাবো তখন মুসলমানদেরকে আমার সালাম পৌঁছে দেবে এবং তাদেরকে বলতে হবে যে, আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) এই বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি একক আল্লাহর সাথে কাউকেই অংশীদার না জানা অবস্থায় ইন্তেকাল করবে—আল্লাহ তায়ালা তাকে জান্নাত নসিব করবেন। এবং আমার জানাযাহ দুশমনের ভূমি থেকে যতদূর পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারো, নিয়ে গিয়ে দাফন করবে।"

ইয়াযিদ তাঁর ওসিয়ত পূরণ করার প্রতিশ্রুতি দিল এবং হযরত আবু আইয়ুব (রা) আল্লাহর নিকট নিজের জীবন সোপর্দ করে দিলেন। তাঁর ওফাতে মুসলমানদের ওপর শোক ও দুঃখের পাহাড় ভেঙ্গে পড়লো। সেনাবাহিনীর আমীর স্বয়ং নামাযে জানাযাহ পড়ালেন। অতপর সকল সৈন্য অস্ত্র সাজিয়ে তাঁর লাশ কাসতানতুনিয়ার প্রাচীরের নীচে নিয়ে গেলেন এবং ইসলামের এই জালিলুল কদর বীরের দাফন কাজ সমাপ্ত করলেন। আকদুল ফরিদের লিখক বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আবু আইয়ুবের (রা) দাফন কাজ রাতে সম্পন্ন করা হয়। কাসতানতিনের কায়সার রাতের বেলায় মুসলমানদের তৎপরতার খবর পেলো। ফলে সে দূত প্রেরণ করে তার কারণ জিজ্ঞেস করলো। মুসলমানরা তাকে বললো যে, রাতে আমাদের পেশওয়ায়ে আজম মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহর (সা) একজন সাহাবীর ইন্তেকাল হয়। আমরা তাঁর দাফন কাজে ব্যস্ত ছিলাম। কায়সার বলে পাঠালো যে, তোমরা এখান থেকে চলে যাওয়ার পর আমরা কবর খুঁড়ে তাঁর হাড় বাইরে নিক্ষেপ করবো।

কায়সারের এই অভদ্রোচিত কথায় মুসলমানদের রক্ত গরম হয়ে উঠলো। ইয়াযিদ কায়সারকে বলে পাঠালো যে, "তোমরা যদি এ ধরনের তৎপরতা দেখাও তাহলে আল্লাহর কসম স্মরণ রেখো যে, মুসলমানদের বিশাল সাম্রাজ্যে যত গীর্জা আছে তা সব ধ্বংস করা হবে এবং খৃস্টানদের কবর উঠিয়ে ফেলা হবে।"

ইয়াযিদের এই সতর্কবাণীর যথেষ্ট প্রভাব হলো। কায়সার জবাবে বলে পাঠালো যে, "আমি তোমাদের দ্বীনী মর্যাদার পরীক্ষা নিচ্ছিলাম। কুমারী মরিয়মের কসম, আমরা তোমাদের নবীর (সা) সাহাবীর কবরের সম্মান ও তার রক্ষণাবেক্ষণ করবো।"

ঐতিহাসিকরা বর্ণনা করেছেন যে, রোমকরা বাস্তবিকই নিজেদের প্রতিশ্রুতির মর্যাদা রেখেছিল। একটি রেওয়ায়াতে তো এতটুকুনও বর্ণনা করা হয়েছে যে, রোমের কায়সার স্বয়ং হযরত আবু আইয়ুবের কবরের ওপর কুব্বা নির্মাণ করিয়েছিল।

তাবকাতে ইবনে সায়াদে আছে যে, দুর্ভিক্ষের সময় রোমক খৃস্টানরা হযরত আবু আইয়ুবের (রা) মাজারে উপস্থিত হতো এবং তাঁর ওসিলা দিয়ে বৃষ্টির জন্য দোয়া করতো। আল্লাহ তায়ালা রাসূলের (সা) মেযবানের সম্মান রাখতেন এবং তাদের আশা পূরণ করতেন।

হযরত আবু আইয়ুবের (রা) ওফাতের পর মুসলমানরা কাসতানতুনিয়ার অবরোধ তুলে নিয়ে ফিরে এলো। কাসতানতুনিয়া বিজয়ের সৌভাগ্য হয়েছিল তার প্রায় ৮শ' বছর পর। সুলতান মুহাম্মাদের নেতৃত্বে এই বিজয় ঘটেছিল। কালের ব্যবধানে হযরত আবু আইয়ুবের (রা) মাযার মাটিতে ঢেকে গিয়েছিল এবং দীর্ঘ দিন যাবত কেউই জানতো না যে, রাসূলের (সা) মেযবানের পবিত্র দেহ কোথায় দাফন করা হয় ৫৭ হিজরীতে যখন বিজয়ী বীর সুলতান মুহাম্মাদ (র) কাসতানতুনিয়ার ওপর ইসলামের ঝাণ্ডা উড্ডীন করেন তখন অত্যন্ত চেষ্টা চরিত্র ও অনুসন্ধানের পর মাটি খুঁড়ে মাযার উদ্ধার করা হয়। সুলতান (র) সেই স্থানে এক বিরাট গম্বুজ নির্মাণ করান এবং তার নিকট একটি শান শওকতপূর্ণ জামে মসজিদ নির্মাণের নির্দেশ দিলেন। যখন এই মসজিদ নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হলো সুলতান তখন সেখানে গেলেন এবং নামায আদায় করলেন। নামাযের পর শেখুল আছর আকা শামসুদ্দীন (র) সুলতানের হাতে তরবারী দিলেন এবং তার জন্য দোয়া খায়ের করলেন। তারপর শত শত বছর যাবত এই প্রথা ছিল যে, তুরস্কের যে সুলতানই ক্ষমতাসীন হতেন তিনি প্রথমে জামে আবু আইয়ুবে হাজির হতেন এবং শেখুল আছর শামসুদ্দীন (র) প্রদত্ত

তরবারী নিজের কোমরে বাঁধতেন। তারপর নিয়ম অনুযায়ী তার ক্ষমতাসীন হওয়ার কথা ঘোষণা করা হতো। এটা যেন তুর্কী বাদশাহদের করোনেশন (Coronation) অর্থাৎ রাজমুকুট পরিধানের নামান্তর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মুস্তফা কামাল পাশার তুরস্কে খিলাফতের সমাপ্তি ঘটিয়ে পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের ভিত্তি রাখার ফলে সেই প্রথারও পরিসমাপ্তি ঘটে।

বিভিন্ন রেওয়ায়াত অনুযায়ী হযরত আবু আইয়ুব (রা) দু'টি বিয়ে করেছিলেন। এক স্ত্রীর নাম ছিল উম্মে হাসান বিনতে যায়েদ (রা) বিন ছাবিত। তার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন আবদুর রহমান। যৌবনকালেই তিনি ইন্তেকাল করেন। দ্বিতীয় স্ত্রী ছিলেন মুহতারামা উম্মে আইয়ুব। এই মহিলা মশহুর সাহাবিয়া ছিলেন এবং তার থেকে কয়েকটি হাদিসও বর্ণিত আছে। নিজের শ্রদ্ধেয় স্বামীর সঙ্গে সারওয়ারে আলমের (সা) মেযবানীর মর্যাদা তিনিও লাভ করেছিলেন। তিনিই হুজুরের (সা) জন্য খাবার তৈরী করতেন। তার গর্ভে জন্মগ্রহণকারী সন্তানদের মধ্যে আইয়ুব, খালেদ এবং মুহাম্মাদ তিনপুত্র এবং এক কন্যা উমরার নাম জানা যায়। হযরত আবু আইয়ুবের (রা) সন্তানদেরকে আল্লাহ তায়ালা খুব আধিক্য এবং উন্নতি প্রদান করেছিলেন। তাসাউফের দুনিয়ার নামকরা বুজুর্গ শেখুল ইসলাম হিরাতের পীর খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র) (৪৮১ হিজরীতে মৃত্যু) হযরত আবু আইয়ুবেরই (রা) বংশধর ছিলেন। তার সন্তান-সন্ততি হিরাতের চার পাশে এবং আফগানিস্তানের এলাকাসমূহে আজও রয়েছেন। হযরত আবু আইয়ুব (রা) আনসারীর বংশধরদের মধ্য থেকে দুই বুজর্গ হযরত ইউসুফ আনসারী (র) এবং হযরত আলাউদ্দিন আনসারী (র) ভারতে তাশরীফ এনেছিলেন। এই উপমহাদেশের আনসারীদের উর্ধ্বতন পুরুষ এই দুই বুজর্গ।

হযরত আবু আইয়ুব (রা) বনু নাজ্জারের সচ্ছল ব্যক্তিদের মধ্যে পরিগণিত হতেন। তিনি একটি দ্বিতল বাড়ী এবং তার সন্নিহিত খেজুরের একটি বাগানের মালিক ছিলেন। তার আসল পেশা ছিল কৃষি কাজ। কিন্তু কতিপয় রেওয়ায়াত অনুযায়ী তিনি অর্থনৈতিক সচ্ছলতার জন্য টুকরো কাপড়ের ব্যবসাও করতেন। নবীর (সা) হিজরতের পর ইসলামের বিজয় যতই বাড়তে লাগলো মুসলমানদের অর্থনৈতিক অবস্থাও ততই উন্নত হতে লাগলো। হযরত আবু আইয়ুবও (রা) পূর্ব থেকে সচ্ছল হয়ে গেলেন এবং ধারণা করা হয়ে থাকে যে, নবীর (সা) হিজরতের কিছুদিন পর তিনি টুকরো কাপড়ের ব্যবসা ছেড়ে দিয়েছিলেন। বদরী সাহাবী হওয়ার কারণে হযরত ওমর ফারুক (রা) তার বার্ষিক বৃত্তি পাঁচ হাজার দিরহাম নির্ধারণ করেছিলেন। হযরত আলী (রা)

নিজের খিলাফতকালে তার বৃত্তির পরিমাণ বিশ হাজার দিরহাম করে দেন। এমনিভাবে তিনি ধনীদের কাতারে শামিল হয়ে গেলেন।

হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা) বিভিন্ন ধরনের গুণাবলী ও সুন্দর চরিত্রের এক বাস্তব প্রতিচ্ছবি ছিলেন। মুসলমানদের সকল মাযহাবই তার মহান মর্যাদার স্বীকৃতি দিয়েছেন। ইসলাম গ্রহণের অগ্রগামিতা, রাসূল (সা) প্রেম, জিহাদের উৎসাহ, তাফাককুহ ফিদ দ্বীন, হক কথন ও নির্ভীকতা, সংশোধনের আবেগ এবং কুরআন শরীফ ও হাদিসের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক হযরত আবু আইয়ুবের (রা) চরিত্রের উল্লেখযোগ্য দিক। এসব গুণের কারণে তিনি রাসূলের (সা) নৈকট্য লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। হিজরতের পর তিনি যে উৎসাহ এবং উদ্দীপনার সঙ্গে প্রিয় নবীর (সা) মেযবানী করেছিলেন তা তার রাসূল (সা) প্রেমেরই প্রমাণ। মসজিদে নববীর (সা) নির্মাণের পর হুজুর (সা) তৎসংলগ্ন হুজরাতে স্থানান্তর হয়ে গেলেন। কিন্তু তারপরও হুজুর(সা) কখনো কখনো হযরত আবু আইয়ুবের গৃহে তাশরীফ নিতেন। একদিন বিশ্ব নবী (সা) অভুক্ত অবস্থায় পবিত্র হুজরা থেকে বাইরে বেরুলেন। রাস্তায় হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) ও হযরত ওমর ফারুকের (রা) সঙ্গে সাক্ষাত হলো। ঘটনাক্রমে তারাও সেদিন অভুক্ত ছিলেন। হুজুর (সা) উভয়কে সঙ্গে নিয়ে হযরত আবু আইয়ুবের (রা) বাড়ী তশরীফ নিলেন। সে সময় হযরত আবু আইয়ুব (রা) নিজের খেজুর বাগানে ছিলেন এবং বাড়ীতে খাবার কোন বস্তু ছিল না। হযরত আবু আইয়ুবের (রা) স্ত্রী হুজুরকে (সা) স্বাগত জানালেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "আবু আইয়ুব কোথায়?"

হযরত আবু আইয়ুবের (রা) বাগান বাড়ীর একদম নিকটেই ছিল। তিনি হুজুরের (সা) কণ্ঠস্বর শুনে খেজুরের একটা কাঁধি ছিঁড়ে নিয়ে দৌড়ে বাড়ী এলেন এবং কাঁধিটি প্রিয় মেহমানের খিদমতে পেশ করলেন। সেই সাথে একটি বকরীও জবেহ করলেন। অর্ধেক গোশতের সালন পাকালেন এবং অবশিষ্ট অংশ দিয়ে কাবাব বানালেন এবং হুজুরের (সা) খিদমতে খাবার পেশ করলেন। হুজুর (সা) একটি রুটির ওপর কিছু গোশত রেখে বললেন ঃ

"এটা ফাতিমার (রা) নিকট পাঠিয়ে দাও। সেও কয়েকদিন অভুক্ত রয়েছে।"

হযরত আবু আইয়ুব (রা) হুকুম তামিল করলেন এবং হুজুর (সা) নিজের সঙ্গীদের সাথে মিলে খাবার খেলেন। এই লৌকিক খাবার খেতে গিয়ে তিনি ভাবাবেশে পড়ে গেলেন এবং বললেন ঃ

"আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, কিয়ামতের দিন বান্দাদেরকে পার্থিব নিয়ামতসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।" (অর্থাৎ এসব নেয়ামতের হক তোমরা কিভাবে আদায় করেছ)

হযরত আবু আইয়ুব (রা) শুধু রাসূলে করিমের (সা) সত্য আশেকই ছিলেন না বরং তিনি নবীর (সা) খান্দানের সকল সদস্যকেই সীমাহীন ভালোবাসতেন। এই ভিত্তিতেই হযরত আলী মুরতাজা (রা) ও হুজুরের (সা) অন্যান্য নিকটাত্মীয়দের দৃষ্টিতে হযরত আবু আইয়ুবের (রা) সীমাহীন মর্যাদা ছিল। যে যুগে হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) (হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুর তরফ থেকে) বসরার গভর্ণর ছিলেন। হযরত আবু আইয়ুব (রা) তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য বসরা তাশরীফ নিলেন। হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) পূর্ণ আনন্দের সাথে তাঁকে ইসতিকবাল করলেন এবং বসরার নিজের বাড়ী ও সাজসরঞ্জামসহ তাঁকে দিয়ে দিলেন। দেয়ার সময় তিনি বললেন, যেভাবে আপনি রাসূলে করিমের (সা) মেযবানী করার জন্য নিজের ঘর খালি করে দিয়েছিলেন তেমনি আমিও আপনার মেযবানীর জন্য নিজের ঘর, মাল, আসবাবসহ আপনাকে দিয়ে দিলাম।

ইফকের ঘটনায় যখন মুনাফিকরা হযরত আয়েশা সিদ্দীকার (রা) ওপর তোহমত বা মিথ্যা অপবাদ আরোপ করলো তখন আবু আইয়ুবের (রা) স্ত্রী উম্মে আইয়ুব (রা) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "লোকজন যা কিছু বলছে আপনি তা শুনেছেন।" তিনি বললেন, "হ্যাঁ, কিন্তু তা সবই মিথ্যা।" আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করি লোকজন যে কথায় উম্মুল মু'মিনীনকে দোষারোপ করছে, তুমি কি তা করতে পরো।"

উম্মে আইয়ুব (রা) বললেন ঃ "আল্লাহর কসম, অবশ্যই নয়।"

তিনি বললেন ঃ "তুমি যদি এ রকম করতে না পারো তাহলে আয়েশা সিদ্দীকার (রা) মর্যাদা ও কৃতিত্ব তো তোমার চেয়ে অনেক বেশী।"

হযরত আবু আইয়ুব (রা) হক কথক ছিলেন। একবার মিসরের গভর্ণর হযরত উকবা (রা) বিন আমের জাহনী মাগরিবের নামাযে কোন কারণে দেরী করলেন। ঘটনাক্রমে হযরত আবু আইয়ুবও (রা) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি প্রকাশ্যে বললেন, "উকবা এটা কেমন নামায?" হযরত উকবা (রা) জবাব দিলেন যে, এক কাজের জন্য ঘটনাক্রমে দেরী হয়ে গেছে। হযরত আবু আইয়ুব (রা) বললেন ঃ

"তাতো ঠিক। কিন্তু এটা ভুলে যেও না যে, তুমি রাসূলের (সা) সাহাবী। তোমার কথা এবং কাজ মানুষের জন্য দলিল হয়ে যেতে পারে। হুজুর (সা)

মাগরিবের নামায তাড়াতাড়ি পড়তে বলেছেন। তুমি যদি এই নামাযে বিলম্ব কর তাহলে জনগণ মনে করবে যে, হুজুরও (সা) এই সময়ে নামায আদায় করে থাকবেন। স্মরণ রেখো যে, কোন সাহাবীর কোন কাজ নবীয়ে আকরামের (সা) সুন্নাতের খিলাফ যেন না হয়।"

হযরত উকবা (রা) ভবিষ্যতে সতর্ক থাকার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

একবার মদীনার শাসক মারওয়ান ইবনুল হাকাম শুধুমাত্র নিজের দুর্বলতার কারণে মসজিদের ইমামদেরকে ডেকে নামায একটু বিলম্বে পড়ার তাকিদ দিলেন। যাতে তিনি জামায়াতে শামিল হতে পারেন। হযরত আবু আইয়ুব (রা) এই ঘটনা জানতে পেরে অবিলম্বে মারওয়ানের নিকট গেলেন এবং বললেন, "নামায বিলম্ব করানোর কোন অধিকার তোমার নেই। তুমি যদি এ ব্যাপারে রাসূলের (সা) অনুসরণ না কর তাহলে আমরা তোমার বিরোধিতা করবো। আর যদি হুজুরের (সা) আমলকে পথ চলার মশাল বানাও তাহলে আমরা তোমার সঙ্গে থাকবো।"

এক যুদ্ধে সেনাপতি আবদুর রহমান বিন খালিদ (রা) (বিন ওয়ালিদ) চারজন বন্দীকে হাত-পা বেঁধে হত্যা করালেন। হযরত আবু আইয়ুব (রা) এই ঘটনার খবর পেয়ে খুব অসন্তুষ্ট হলেন এবং বললেন ঃ

"এ তো শোনিতপাত এবং বর্বরতামূলক কাজ। রাসূলুল্লাহ (সা) বন্দীদের সঙ্গে এ ধরনের বর্বরতামূলক আচরণ নিষেধ করে দিয়েছেন। আমিতো এভাবে একটি মুরগীও জবেহ করা পসন্দ করি না।"

হযরত আবু আইয়ুব (রা) হক কথনের সঙ্গে সঙ্গে সীমাহীন শরীফ এবং নরম অন্তরের মানুষ ছিলেন। রোমের যুদ্ধে অনেক রোমক মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়। তাদেরকে জাহাজে চড়ানো হলো। ঘটনাক্রমে হযরত আবু আইয়ুব(রা) সেই কয়েদীদের নিকট গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে গিয়ে দেখলেন যে একজন মহিলা কয়েদী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। তাকে এভাবে কাঁদতে দেখে তিনি অস্থির হয়ে পড়লেন। তার এই অসহায়ভাবে কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করে জানতে পেলেন যে, তার শিশু সন্তানকে কেড়ে নিয়ে জাহাজের অন্য কোথায়ও রাখা হয়েছে। হযরত আবু আইয়ুব (রা) তক্ষুণি সেই শিশুকে তালাশ করে নিয়ে এলেন এবং তার মা'র হাওয়ালা করে দিলেন। কয়েদীদের তত্ত্বাবধায়ক অফিসারের নিকট হযরত আবু আইয়ুবের (রা) এই কাজ খুবই অসহনীয় মনে হলো। সে সেনাপতির নিকট এ ব্যাপারে অভিযোগ করলো। সেনাপতি যখন তাঁর নিকট এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন ঃ

"রাসূলুল্লাহ (সা) এই ধরনের জুলুম বা নির্যাতনমূলক আচরণ থেকে বিরত থাকতে বলেছেন। এখন তুমি বুঝে নাও যে, আমি এ ধরনের জুলুম নির্যাতন নিজের চোখের সামনে কিভাবে দেখতে পারি।"

হযরত আবু আইয়ুব (রা) সুন্নাতের খিলাফ কোন কিছু দেখলেই অস্থির হয়ে পড়তেন এবং হকের আওয়াজ বুলন্দ করতে কখনো দ্বিধা করতেন না। একবার সিরিয়া এবং মিসর তাশরীফ নিলেন। সেখানে গিয়ে মুসলমানদের বাড়ীতে পায়খানা কিবলামুখী দেখতে পেলেন। এটা দেখে তাঁর খুব খারাপ লাগলো। বারবার বলতেন, "হে মুসলমানরা! কিবলামুখী করে পায়খানা বানানো খুবই খারাপ কাজ। আমি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট থেকে শুনেছি যে, তোমরা যখন প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে যাও তখন কিবলার দিকে মুখ করো না এবং সেদিকে পিছনও দিও না।"

হযরত আবু আইয়ুব (রা) থেকে বর্ণিত এই হাদিসের এত ব্যাপক প্রচার হয় যে, বর্তমানে মুসলমানদের প্রতিটি শিশু সন্তানও কিবলামুখী হয়ে পেশাব-পায়খানা করাকে গুনাহ হিসেবে মনে করে থাকে।

একবার হযরত সালেম (রা) বিন আবদুল্লাহ আনসারী হযরত আবু আইয়ুবকে (রা) ওয়ালিমার দাওয়াতে ডাকলেন। তিনি তাঁর বাড়ী গেলেন। সেখানে গিয়ে দরজাতে চিত্র সম্বলিত ঝুলন্ত পর্দা দেখতে পেলেন। হযরত আবু আইয়ুব (রা) তা দেখে মনে খুব ব্যথা পেলেন। তিনি হযরত সালেমকে (রা) খুব তামবিহ করলেন এবং যতক্ষণ এই পর্দা সরিয়ে না নেয়া হলো ততক্ষণ তিনি ঘরে প্রবেশ করলেন না। হযরত আবু আইয়ুবের (রা) খুবই লজ্জা শরম ছিল। তিনি যখন ঘরের বাইরে কূপের ওপর ঘটনাক্রমে গোসল করতে যেতেন তখন চারদিকে কাপড় টাঙ্গিয়ে নিতেন।

হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা) সেসব জালিলুল কদর সাহাবীর মধ্যে পরিগণিত হতেন যাঁরা রাসূলে আকরামের (সা) আমলেই সম্পূর্ণ কুরআন হেফজ করে নিয়েছিলেন। তাছাড়া তিনি ইলম ও ফজিলতের দিক থেকে জ্ঞানের সমুদ্র ছিলেন এবং এক বিশ্ব তাঁর ইলমের কামালিয়াতের স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। যেসব জালিলুল কদর সাহাবী এবং তাবেয়ী তার ইলমের কামালিয়াত থেকে ফয়েজ প্রাপ্ত হয়েছিলেন তাদের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা), হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রা), হযরত আনাস (রা) বিন মালিক, হযরত আবু উমামাহ বাহেলী (রা), হযরত বারা' (রা) বিন আযিব, হযরত উরওয়া বিন যোবায়ের (রা), হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়্যিব (র),

হযরত আতা' বিন ইয়াসার (র) এবং হযরত আবদুর রহমান বিন আবি লায়লার (র) মত উম্মাহর ফকিহদের নাম দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে।

হযরত আবু আইয়ুব (রা) "তাফাক্কুহ ফিদদ্বীনে" এমন কামালিয়াত রাখতেন যে, খুব জটিল জটিল বিষয় এক মুহূর্তের মধ্যে সমাধান করে দিতেন। একবার হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) এবং হযরত মিসওয়ার(রা) বিন মাখরামার মধ্যে একটি মাসয়ালাতে মতবিরোধ হলো। মাসয়ালাটি ছিল যে, এক ব্যক্তি ইহরাম অবস্থায় জানাবতের গোসলের সময় নিজের হাত দিয়ে মাথা ডলতে পারে কি না। হযরত মিসওয়ারের (রা) নিকট মাথা ধোয়া জায়েজ ছিল না। কিন্তু ইবনে আব্বাস (রা) তা জায়েজের পক্ষে ছিলেন। উভয় বুজুর্গই হযরত আবদুল্লাহ বিন হোসাইনকে (রা) হযরত আবু আইয়ুবের (রা) নিকট এই মাসয়ালায় তাঁর মত কি তা জানার জন্য প্রেরণ করলেন। আবদুল্লাহ হযরত আবু আইয়ুবের বাড়ী পৌঁছলেন। সে সময় তিনি ঘটনাক্রমে গোসল করছিলেন। আবদুল্লাহ (রা) উচ্চৈস্বরে এই মাসায়ালা জিজ্ঞেস করলেন। হযরত আবু আইয়ুব (রা) কাপড়ের অন্তরাল থেকে নিজের মাথা বাইরে বের করলেন এবং হাত দিয়ে মাথা ডলতে শুরু করলেন। অতপর বললেন ঃ "রাসূলুল্লাহ(সা) এভাবে গোসল করতেন।"

আসেম বিন সুফিয়ান ছাকাফী সালাসিলের যুদ্ধে অংশ নেয়ার জন্য রওয়ানা হলেন। তিনি রাস্তাতেই ছিলেন। এমন সময় যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার খবর পেলেন। জিহাদ থেকে মাহরুম হওয়ার জন্য তিনি খুব দুঃখীত হলেন। দুঃখ ও হতাশ অবস্থায় তিনি আমীরে মুয়াবিয়ার (রা) নিকট গেলেন। সে সময় তাঁর নিকট হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা) এবং হযরত উকবা (রা) বিন আমের জুহানীও উপস্থিত ছিলেন। তিনজনই সাহাবী এবং জ্ঞানের পূর্ণতায় সুশোভিত ছিলেন। আসেম সরাসরি হযরত আবু আইয়ুবের (রা) নিকট মাসয়ালা জিজ্ঞেস করলেন এবং আমীরে মুয়াবিয়া (রা) ও হযরত উকবার (রা) প্রতি দৃষ্টি দিলেন না। হযরত আবু আইয়ুব (রা) তাঁর মাসয়ালার জবাব দিলেন। কিন্তু অন্য বুজুর্গদের প্রতি তাঁর অনীহাকে পসন্দ করলেন না। আসেমের কথার জবাব দিয়ে তিনি স্বয়ং হযরত উকবার (রা) প্রতি মনোযোগী হলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন ঃ "উকবা! আমি কি সঠিক জবাব দিয়েছি।" হযরত উকবা (রা) তাঁর জবাবের সত্যতা স্বীকার করলেন। এই ঘটনা থেকে হযরত আবু আইয়ুবের (রা) জ্ঞানের ব্যাপকতার সন্ধান মেলে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি যে বিনয়ী ছিলেন তারও প্রমাণ পাওয়া যায়।

হযরত আবু আইয়ুব (রা) থেকে ১৫০টি হাদিস বর্ণিত আছে। হাদিস শ্রবণেও তাঁর খুব উৎসাহ ছিলো। আমীরে মুয়াবিয়ার (রা) শাসনামলে মশহুর

সাহাবী হযরত উকবা (রা) বিন আমের জুহনী মিসরে অবস্থানরত ছিলেন। হযরত আবু আইয়ুব (রা) জানতে পেলেন যে, তিনি একটি বিশেষ হাদিসের বর্ণনাকারী। সেই হাদিস শোনার সুযোগ তাঁর হয়নি। তিনি তা শোনার জন্য অস্থির হয়ে পড়লেন এবং বার্দ্ধক্য অবস্থায় শুধুমাত্র একটি হাদিস শোনার জন্য তিনি মদীনা মুনাওয়ারা থেকে মিসরের কষ্টকর ও দীর্ঘ সফরে যান। মিসর পৌঁছে হযরত মুসলিমা (রা) বিন মুখাল্লাদের বাড়ী তাশরীফ নিলেন। তিনি রাসূলের (সা) মেযবানের সাথে স্বাক্ষাত করে খুব খুশী হলেন এবং মিসর সফরের কষ্ট কেন সহ্য করেছেন তা জিজ্ঞেস করলেন। হযরত আবু আইয়ুব (রা) বললেন, তিনি উকবার নিকট থেকে একটি হাদিস শুনতে এসেছেন। কেননা ইসলামী জাহানে এ সময় সেই হাদিস জাননে ওয়ালা আর কেউ নেই। তিনি বললেন, আমাকে উকবার বাড়ীর ঠিকানা বলে দিন। মোটকথা, তিনি মুসলিমা (রা) থেকে বিদায় নিয়ে হযরত উকবার (রা) বাড়ী পৌঁছলেন এবং তাঁর নিকট সেই বিশেষ হাদিস জিজ্ঞেস করলেন। হাদিসটি শুনালে তিনি তাঁকে শুকরিয়া জানিয়ে নিজের উটে সওয়ার হয়ে মদীনা রওয়ানা হয়ে গেলেন। হযরত আবু আইয়ুবের (রা) হাদিস প্রেমের আন্দাজ এই ঘটনা থেকেই করা যায়। মৃত্যু শয্যায় শায়িত অবস্থাতেও হাদিস প্রচারে ব্যস্ত ছিলেন।

হযরত খুবায়েব আনসারী (রা)

ওহোদের যুদ্ধের কয়েক মাস পরের ঘটনা। একদিন রহমতে আলম (সা) মদীনা মুনাওয়ারার কোন এক স্থানে সাহাবায়ে কিরামের (রা) একটি দলের মধ্যে বসেছিলেন। দ্বীন ও দুনিয়ার কথাবার্তা হচ্ছিল এবং রাসূল প্রদীপের পতঙ্গরা হুজুরের (সা) ইরশাদসমূহ থেকে ফায়দা উঠানোর জন্য একাগ্রচিত্তে বসেছিলেন। হঠাৎ করে মহানবীর (সা) ওপর ওহী নাযিলের অবস্থা সৃষ্টি হলো এবং রাসূলের (সা) যবান দিয়ে এই বাক্য উচ্চারিত হলো ঃ

আলাইকাস সালাম ইয়া খুবাইবা—আলাইকাস সালাম ইয়া খুবাইবা অর্থাৎ "হে খুবায়েব! তোমার ওপর সালাম—হে খুবায়েব! তোমার ওপর সালাম।"

সাহাবায়ে কিরাম (রা) বিস্ময়ের সঙ্গে হুজুরের (সা) দিকে তাকালেন এবং তিনি কি বলছেন তা শুনলেন। সারওয়ারে আলম (সা) তাঁদের বিস্ময়ের ব্যাপারটি বুঝে নিলেন এবং তাঁদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

"খুবায়েবকে আল্লাহর দুশমনরা হত্যা করে ফেলেছে। ইনি জিবরাইল (আ) আমাকে তার সালাম পৌঁছাচ্ছেন।"

হক পথের এই শহীদ যাঁর সালাম—তিনশ' মাইল দূরের তাঁর হত্যার স্থান থেকে—রুহুল আমীন (আ) প্রিয় নবীকে (সা) পৌঁছালেন এবং যাঁর ওপর স্বয়ং সাইয়েদুল আনাম খায়রুল খালায়েক ইমামুল মুরসালীন (সা) সালাম প্রেরণ করলেন। তিনি ছিলেন আওস গোত্রের আশা-আকাংখার কেন্দ্রবিন্দু হযরত খুবায়েব (রা) বিন আদি আনসারী। তিনি মদীনা মুনাওয়ারার সেসব সৌভাগ্যবানদের অন্যতম ছিলেন যারা নবীর (সা) হিজরতের পূর্বে ইসলাম গ্রহণের সুযোগ লাভ করেছিলেন। রহমতে আলমের (সা) মদীনা মুনাওয়ারাতে শুভ পদার্পণের পর তিনি নবীর (সা) অনেক অনেক ফয়েজ হাসিল করেছিলেন। এমনকি খুব শীঘ্র তিনি মর্যাদাবান সাহাবীদের মধ্যে পরিগণিত হতে লাগলেন। বদরের যুদ্ধে তিনি তিনশ' তেরজন পবিত্র আত্মার সেই দলে শামিল হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছিলেন, যাঁদের ত্যাগ ও কুরবানী এবং নিষ্ঠা ও বাহাদুরীর কাহিনী ইসলামের ইতিহাসের পাতায় স্থায়ীভাবে প্রোজ্জল হয়ে রয়েছে। এই যুদ্ধে হুজুর (সা) হযরত খুবায়েবকে (রা) মুজাহিদদের আসবাব-পত্রের তত্ত্বাবধান কাজে নিয়োগ করেছিলেন। তা সত্ত্বেও তিনি যুদ্ধের ময়দানে তরবারীর চমক দেখানোর সুযোগও পেয়েছিলেন। তিনি কুরাইশ মুশরিকের

এক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব হারেছ বিন আমের বিন নওফিলকে জাহান্নামে প্রেরণ করেছিলেন। বিভিন্ন রেওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, হযরত খুবায়েবকে (রা) রাসূলে আকরাম (সা) গভীরভাবে ভালবাসতেন এবং তাঁর অন্তরে দ্বীনে হকের জন্য জীবন কুরবানী করার আবেগ সবসময় বিরাজিত ছিল। হুজুরও (সা) তাঁকে খুব স্নেহ করতেন এবং নবীর সেই সীমাহীন ভালবাসা ও স্নেহ তাঁকে এক অনুকরণীয় মরদে মু'মিন বানিয়ে দিয়েছিল।

ওহোদের যুদ্ধে মুসলমান তীরন্দাজদের বিচ্যুতির কারণে হকপন্থীদের প্রচণ্ড ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছিল। কাফেরদের সাহস গিয়েছিল বেড়ে। তারপর থেকে তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে নিত্যনতুন ষড়যন্ত্র আঁটতো। মক্কা এবং আসফানের মধ্যে বনু লাহইয়ান নামক এক মুশরিক কবিলার আবাদ ছিল। তারা ছিল কুরাইশের মিত্র গোত্র বনু হাযিলের শাখা। চতুর্থ হিজরীর সফর মাসে বনু লাহইয়ানের সরদার সুফিয়ান বিন খালিদ মুসলমানদের বিরুদ্ধে এক হীন ষড়যন্ত্র আঁটলো। (কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে যে, সুফিয়ান বিন খালিদ লাহইয়ানি হাযলী এক যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে নিহত হয়েছিল। এ জন্য বনু লাহইয়ান তার হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য মুসলমানদের বিরুদ্ধে এই পরিকল্পনা তৈরী করে)।

ঘটনা হলো এই যে, ওহোদের যুদ্ধের পর মক্কার এক বনী কারাশিয়া সালাফা বিনতে সায়াদ ঘোষণা করলো যে, যে ব্যক্তি ইয়াসরাবের আছেম (রা) বিন ছাবিতকে জীবিত ধরে আনবে অথবা তার মাথা কেটে আমার নিকট পৌঁছাবে আমি তাকে উন্নত জাতের একশ উট পুরস্কার দেব। এই ঘোষণার পটভূমি এই ছিল যে, সালাফার দুই পুত্র মাসাফি বিন তালহা এবং হারিছ বিন তালহা (অথবা অন্য রেওয়ায়াত অনুযায়ী কালাব বিন তালহা) ওহোদের যুদ্ধে হযরত আছেম (রা) বিন ছাবিত আনসারীর হাতে নিহত হয়েছিল। সুতরাং সে ওয়াদা করেছিল যে, যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের স্বামী এবং পুত্রদের হত্যার প্রতিশোধে আছেমের (রা) মাথা কেটে আনা না হবে ততক্ষণ শান্তির সঙ্গে বসবে না। সুফিয়ান বিন খালেদ লাহইয়ানি কিছুটা এই পুরস্কারের লোভে এবং কিছুটা মুসলমানদেরকে কষ্ট দানের ধারণায় আদাল ও কারাহ গোত্রের কতিপয় মানুষ হাত করলো। সে তাদেরকে মুসলমানের বেশে মদীনা গমনের পরামর্শ দিলো। সেখানে গিয়ে তারা বলবে যে, তাদের কবিলার সকলেই ইসলাম গ্রহণে আগ্রহী। কিন্তু শর্ত হলো, কিছু মুসলমান তাদের নিকট গিয়ে তাদেরকে ভালভাবে ইসলামের শিক্ষা দেবে। এই শর্ত যদি মুহাম্মাদ (সা) মেনে নেন তাহলে মুয়াল্লিম বা শিক্ষকদের মধ্যে আছেম (রা) বিন ছাবিতকেও অন্তর্ভুক্ত

করার চেষ্টা করতে হবে। আদল ও কারাহ'র সাতজন হতভাগা সুফিয়ান বিন খালিদের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করলো এবং মদীনা পৌঁছে নবীয়ে আকরামের (সা) নিকট কতিপয় শিক্ষক তাদের সঙ্গে দেয়ার আবেদন জানালো। যাতে তারা তাদের গোত্রসমূহে তাবলীগ করতে পারে এবং ইসলামের আহকাম শিখাতে পারে। ধোঁকা হিসেবে তারা হযরত আছেম (রা) বিন ছাবিতের নিকট নিজেদের গোত্রসমূহের বেশীর ভাগ মানুষের তার প্রতি ভালবাসার অনেক কথাই বললো। [ইবনে আছিরের বর্ণনানুযায়ী এসব মানুষ মদীনায় হযরত আছেমের (রা) পিতা ছাবিতের গৃহে বাস করেছিল] রহমতে আলম (সা) তাদের দরখাস্ত কবুল করলেন এবং ৬ জন (অন্য রেওয়ায়াত মতে ১০ জন) সাহাবীকে হযরত আছেম (রা) বিন ছাবিতের নেতৃত্বে তাদের সঙ্গে প্রেরণ করলেন। দায়ীয়ে হকের এই পবিত্র দলে হযরত খুবায়েব (রা) বিন আদিও শামিল ছিলেন।

[হযরত আছেম (রা) এবং খুবায়েব (রা) ছাড়া যেসব সাহাবী এই দলে শামিল ছিলেন তাদের চার জনের নাম চরিতকাররা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। সেই চারজন সাহাবী হলেন ঃ মারছাদ (রা) বিন আবি মারছাদ, খালিদ (রা) বিন আল বাকির, আবদুল্লাহ (রা) বিন তারেক এবং যায়েদ (রা) বিন আদ দাছনা। এক রেওয়ায়াতে আছে যে, হুজুর (সা) সেই জামায়াতের আমীর হিসেবে হযরত মুরছাদকে (রা) নিয়োগ করেন। বস্তুত আল্লামা ইবনে সায়াদ এই ঘটনাকে "সারিয়ায়ে মারছাদ" নাম দিয়েছেন। কিন্তু অধিকাংশ চরিতকারই হযরত আছেমই (রা) এই দলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বলে মত প্রকাশ করেছেন এবং তাঁরা এই ঘটনাকে "গাযওয়াতুর রাজি" নাম দিয়েছেন। রাজি'র যুদ্ধের কারণ সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়। বুখারীতে হযরত আবু হুরায়রার (রা) এক রেওয়ায়াত থেকে এটাও প্রকাশ পায় যে, হুজুর (সা) এই দলকে স্বয়ং গোয়েন্দাগিরির জন্য প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু অন্যান্য সব রেওয়ায়াতে ষড়যন্ত্রের কথা সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।]

এই পবিত্র দল যখন রাজি'তে পৌঁছলেন তখন আদল এবং কারাহ'র প্রতিনিধিদল পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র অনুযায়ী প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ এবং গাদ্দারী করলো এবং বনু লাহইয়ানকে খবর দিল যে, তোমাদের শিকার এসে গেছে। সুতরাং দুইশ' লাহইয়ানি যোদ্ধা হকপন্থীদের এই ছোট্ট দলের ওপর হামলা করে বসলো। তাদের মধ্যের একশ' খুবই শক্তিশালী ছিল। মুসলমানরা তাদের ভাবভঙ্গী দেখে দৌড়ে নিকটের একটি টিলার ওপর উঠে গেলেন এবং বনু লাহইয়ানকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

"হে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারীরা! আরবের চিরাচরিত প্রথা পদদলিত করছো কেন? মেহমানদেরকে এভাবে ধোঁকা দিয়ে ঘরে ডেকে এনে হত্যা করা কি বৈধ? তোমরা যদি তাই চাও তাহলে শুনে নাও যে, আমরা শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তোমাদের মোকাবিলা করবো। যেই আমাদের নিকট আসবে সে জীবন নিয়ে ফিরে যেতে পারবে না।"

লাহইয়ানীরা বললো ঃ

"আমরা তোমাদেরকে ধ্বংস করতে চাই না। আমরা তো শুধুমাত্র মক্কার কুরাইশদের নিকট থেকে তোমাদের মাধ্যমে কিছু সম্পদ হাসিল করতে চাই। আমরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, তোমরা যদি নীচে নেমে আসো তাহলে আমাদের আশ্রয়ে থাকবে।"

হযরত আছেম (রা) বললেন ঃ

"আল্লাহর কসম! আমরা মুশরিকদের কোন প্রতিশ্রুতিকে বিশ্বাস করি না। আমরা কোনক্রমেই তোমাদের আশ্রয় নিতে চাই না।"

অতপর কাফেররা চারদিক থেকে এসব অসহায় মুসলমানদের ওপর তীর এবং বর্শা দিয়ে হামলা করে বসলো। মুসলমানরা অত্যন্ত দৃঢ় এবং অটলতার সঙ্গে মুকাবিলা করলেন। হযরত আছেম (রা) সঙ্গীদেরকে বললেন ঃ

"ভাইয়েরা! আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করা হয়েছে। তবে, তাতে কিছু আসে যায় না। শাহাদাতের মনযিল তোমাদের সামনে এবং বেহেশতের হুররা তোমাদেরকে কোলে নেয়ার জন্য অস্থির হয়ে আছে।"

মুসলমানরা নিজেদের তীর বের করলেন এবং কাফেরদের তীরের জবাব তীর দিয়েই দিলেন। তীর যখন শেষ হয়ে গেল তখন নিযা দিয়ে মুকাবিলা করলেন। হযরত আছেম (রা) দোয়া করলেন ঃ

"হে আল্লাহ! তোমার পথে আমরা নির্যাতিত অবস্থায় মারা যাচ্ছি। আমরা প্রথম দিন থেকে তোমার দ্বীনের সমর্থন করেছি। এখন তোমার সাহায্য প্রার্থনা করছি। আমি তোমার সঙ্গে ওয়াদা করেছিলাম যে, আমি নিজে কখনো কোন মুশরিককে স্পর্শ করবো না এবং কোন মুশরিককে আমার দেহ স্পর্শ করতে দেব না। মৃত্যুর পর আমার লাশ হেফাজতের দায়িত্ব তোমার ওপর থাকবে।"

এই দোয়ার পর তিনি যুদ্ধ গাথা পড়তে পড়তে শত্রুদের মধ্যে ঢুকে পড়লেন এবং দু'জন (৬ জন) সাথীকে সঙ্গে নিয়ে শাহাদাতের মর্যাদায় সমাসীন হলেন। (তাবকাতে ইবনে সায়াদে আছে যে, হযরত আছেম (রা) সে

সময় এই গাথা পড়েছিলেন ঃ "আমি দুর্বল নই। শক্তিশালী এবং সামর্থবান এবং আমার ধনুর ছিলা খুবই মজবুত। প্রশস্ত তীর ধনুর ওপর দিয়ে উড়ে যায়। মৃত্যু অবধারিত এবং জীবন বাতিল বস্তু এবং মানুষের তকদিরে যা আছে তা ঘটবেই এবং মানুষ নিজের রবের দিকে অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করবে। আমি যদি তোমাদের সাথে লড়াই না করি তাহলে আমার মা আমাকে নিখোঁজ করে ফেলবেন।"

আল্লামা ইবনে দুরাইদ "জামহারাতে" হযরত আছেমের (রা) সঙ্গে এই গাথা সংশ্লিষ্ট করেছেন ঃ "আমি হলাম আবু সোলায়মান এবং আমার নিকট মুকয়াদের মত নামকরা তীর প্রস্তুতকারীর তীর রয়েছে এবং এই তীর অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত। এবং যখন লড়াইয়ের ময়দান গরম হয় তখন আমি কেঁপে উঠি না। এবং আমার নিকট গরুর চামড়ার উত্তম ঢাল রয়েছে। আমি হলাম আবু সোলায়মান এবং আমার মত বাহাদুর এখন যুদ্ধে। আমার কওমও সম্মানিত এবং আমার খান্দানও। এবং আমি সেসব বস্তুর ওপর ঈমান এনেছি যার ওপর (আমার আকা) মুহাম্মাদ (সা) ঈমান এনেছেন।" তিন সাহাবী হযরত খুবায়েব (রা) বিন আদী, হযরত যায়েদ (রা) ইবনুদ দাছনা এবং হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন তারেককে মুশরিকরা জীবিত গ্রেফতার করে নিয়ে গেল। হযরত আছেমের (রা) দোয়া যা একজন বেদনাভারাক্রান্তের অন্তর থেকে বের হয়েছিল তা সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর নিকট কবুল হয়ে গেল। মুশরিকরা যখন তাঁর মাথা কাটতে চাইলো তখন আল্লাহ তায়ালা তাঁর পবিত্র দেহের চারপাশে মৌমাছির (এবং কতিপয় রেওয়ায়াত অনুযায়ী নেকড়ে) ঝাঁক প্রেরণ করলেন। কোন মুশরিক সেদিকে অগ্রসর হলে তাকে মারাত্মকভাবে হুল ফুটিয়ে দেয়। শেষে তারা লাশ সেখানেই রেখে গেল। তাদের ধারণা ছিল যে, মৌমাছির এই ঝাঁক কিছুক্ষণ পরই উড়ে যাবে, সে সময় তার মাথা কেটে নেবে। আল্লাহর অপার কুদরত যে, রাতে প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত ঘটলো। ফলে বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হলো। হযরত আছেমের (রা) পবিত্র দেহ সেই বৃষ্টির পানিতে ভেসে গেল এবং হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁর লাশ কাফেরদের হস্তগত হলো না। এমনিভাবে আল্লাহ পাক তার দেহকে অমর্যাদা করার হাত থেকে রক্ষা করলেন। জীবদ্দশাতেও কোন কাফের তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি এবং শাহাদাতের পরও কেউ তা করতে সক্ষম হয়নি। [হযরত আছেম (রা) বিন ছাবিত আনসারী অন্যতম জালিলুল কদর সাহাবী ছিলেন। তিনি আউস গোত্রভুক্ত ছিলেন। হিজরতের পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেন। বড় বাহাদুর মানুষ ছিলেন এবং তীর, তরবারী ও বর্শার যুদ্ধে পূর্ণ পারদর্শী ছিলেন। বদরের যুদ্ধে তিনি ইসলামের মশহুর দুশমন উকবা বিন আবি মুঈতকে হত্যা করেন এবং

ওহোদের যুদ্ধে বনু আবদিদ দারের দুই অশ্বারোহী মাসাকে ও হারিছ অথবা তালহা বিন আবি তালহার পুত্র কিলাব ও সালাফা বিনতে সায়াদকে নিজের তীরের নিশানা বানিয়েছিলেন। তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্ম মর্যাদাবোধ সম্পন্ন মানুষ ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর ওয়াদা করেছিলেন যে, তিনি কখনো কোন মুশরিককে স্পর্শ করবেন না এবং নিজের দেহকেও কোন মুশরিককে স্পর্শ করতে দেবেন না। আল্লাহ তায়ালা শাহাদাতের পরও তাঁর দেহকে মুশরিকদের অপবিত্র হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন। হযরত ওমর ফারুক (রা) এই ঘটনা শুনে বললেন, "এটা আল্লাহর মেহেরবানী। তিনি নিজের মু'মিন বান্দাকে এমনিভাবে হেফাজত করেছিলেন।" হযরত আছেমের (রা) কন্যা জামিলা (রা) হযরত ওমর ফারুকের (রা) বাগদত্তা ছিলেন। আছেম বিন ওমর (রা) তাঁর গর্ভেই জন্মগ্রহণ করেন।]

হযরত খুবায়েব (রা) যায়েদ (রা) এবং আবদুল্লাহ (রা) বিন তারেককে কাফিররা ধনুকের ছিলা দিয়ে বাঁধতে লাগলো। এ সময় হযরত আবদুল্লাহ (রা) প্রচণ্ডভাবে বাধা দিলেন। তা সত্ত্বেও মুশরিকরা তাঁকে কোন না কোনভাবে বেঁধে মক্কা রওয়ানা হয়ে গেল। তারা মাররে জাহরান পৌঁছলে আবদুল্লাহ (রা) নিজের হাতকে কয়েদের রশি থেকে বের করে নিলেন এবং একজন মুশরিকের তরবারী ছিনিয়ে নিতে চাইলেন। তা দেখে মুশরিকরা ক্রোধান্বিত হলো এবং পিছু হটে তাঁর ওপর পাথর নিক্ষেপ শুরু করলো। এই অবস্থাতেই তিনি শাহাদাত বরণ করলেন। মুশরিকরা সেখানেই তাঁকে দাফন করে সামনে অগ্রসর হলো। [কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে যে, মুশরিকরা আবদুল্লাহকে (রা) রাজী' নামক স্থানেই শহীদ করে ফেলেছিল।] এতক্ষণে তাদের কব্জায় মাত্র দুই আশেকানে হক অবশিষ্ট ছিল। হযরত খুবায়ের (রা) বিন আদী এবং হযরত যায়েদ (রা) বিন আদ দাছনাকে মক্কার বাজারে নিয়ে আসা হলো। সে যুগে সেখানে পশুর মত মানুষ কেনা-বেচা হতো। কুরাইশরা যখন জানতে পেলো যে, বনু লাহইয়ান মুহাম্মাদের (সা) দুই সঙ্গীকে গ্রেফতার করে মক্কা নিয়ে এসেছে তখন তারা খুব খুশী হলো এবং দেখার জন্য বাজারের দিকে ছুটলো। তারা দেখতে চাইছিলো যে, কয়েদীদ্বয়ের কেউ তাদের কোন প্রিয় ব্যক্তির হত্যাকারী কিনা। হযরত খুবায়েব (রা) বদরের যুদ্ধে হারিছ বিন আমের বিন নওফিলকে হত্যা করেছিলেন। হারিছের আত্মীয়রা যখন খুবায়েবকে (রা) দেখলো তখন তারা আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়লো। কারণ, তারা হারিছের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য খুব সহজ সুযোগ পেয়ে গিয়েছিল। সুতরাং হারিছের পুত্র (অথবা অন্য এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী যয়নব বিনতে হারিছ) হযরত খুবায়েবকে (রা) একশ' উটের বিনিময়ে কিনে নিল।

অন্য এক রেওয়ায়াতে আছে যে, নিহত হারিছ বিন আমেরের মিত্র হাজার বিন আবি আহাব তামিমী খুবায়েবকে (রা) ৮০ দিনার অথবা ৫০টি উটের বিনিময়ে কিনে নেয়। যাতে তার ভ্রাতুষ্পুত্র উকবা বিন হারিছ তাঁকে হত্যা করে নিজের পিতার রক্তের প্রতিশোধ নিতে পারে। [হাফিজ ইবনে হাজার (র) "ইসাবাতে" লিখেছেন, ৬-৭ জন মিলে হযরত খুবায়েবকে (রা) কিনেছিল। তারা সকলেই ছিল বদরের যুদ্ধে নিহতদের আত্মীয়-স্বজন।]

এমনিভাবে হযরত যায়েদ (রা) বিন আদ দাছনাকে সাফওয়ান বিন উমাইয়া ৫০টি উটের বিনিময়ে কিনে নেয়। যাতে তাঁকে বদরের যুদ্ধে নিহত নিজের পিতা উমাইয়া বিন খালফের বদলায় হত্যা করতে পারে। আল্লাহর দুই পবিত্র বান্দা লাহইয়ানি বিশ্বাসঘাতকদের নির্যাতনের পাঞ্জা থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে কাঠোর প্রাণ মুশরিকদের হাতে এসে পড়ে।

মক্কার কুরাইশরা কুফুরী অবস্থাতেও নিষিদ্ধ মাসগুলোতে (অর্থাৎ চার নিষিদ্ধ মাসে রজব, জিলকদ, জিলহজ্জ এবং মহররম) যুদ্ধ বিগ্রহ থেকে দূরে সরে থাকতো। হযরত খুবায়েবকে (রা) যে সময় কেনা হয়েছিল সে সময়টা ছিল জিলকদ মাস। এ জন্য বনু হারিছ নিষিদ্ধ মাসে তাঁকে হত্যার কাজ মুলতবী রাখলো এবং জিঞ্জিরাবদ্ধ করে একটি কুঠরীতে বন্দী করে রাখলো। তাবকাতে ইবনে সায়াদে বর্ণিত আছে যে, বনু হারিছ খুবায়েবের (রা) তত্ত্বাবধানের জন্য তাদের প্রিয় একজন ভয়ংকর মানুষকে নিয়োগ করে। ইবনে ইসহাক (র) বলেছেন, বনু হারিছরা খুবায়েবকে (রা) খরিদ করে হুজায়ের বিন আবি আহাবের দাসী মাদদীয়ার (অথবা মারিয়া) গৃহে বন্দী করে রাখা হয় এবং তাঁর তত্ত্বাবধানের জন্য যয়নব বিনতে হারিছকে নিয়োগ করা হয়। পরবর্তী কালে এই মাদদীয়া ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি বলেন ঃ

"আল্লাহর কসম! আমি খুবায়েব (রা) বিন আদী থেকে উত্তম কোন কয়েদী দেখিনি। সে রাতের শেষাংশে এমন হৃদয়গ্রাহী কণ্ঠস্বরে কুরআন তিলাওয়াত করতেন যে, কুরাইশের মহিলারা তা শুনে অবলীলাক্রমে ক্রন্দন করতো। একদিন আমি তাঁর কুঠরীর প্রবেশ পথে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলাম। আমি দেখে হয়রান হয়ে গেলাম যে, জিঞ্জিরাবদ্ধ খুবায়েব (রা) বিরাট ছড়া (মানুষের মাথার সমান) থেকে আঙ্গুর খাচ্ছেন। অথচ সেটা আঙ্গুরের মওসুম ছিল না। এটা ছিল আল্লাহ প্রদত্ত রিযক। তিনি তাঁকে তা প্রদান করেছিলেন।"

"আমি একদিন খুবায়েবকে (রা) বললাম, তোমার কোন জিনিসের প্রয়োজন থাকলে আমাকে বলো। খুবায়েব (রা) বললো, আমার কোন জিনিসের প্রয়োজন নেই। অবশ্য আমি তোমাকে তিনটি ব্যাপারে অনুরোধ

করবো ঃ (১) আমাকে মিষ্টি পানি পান করাবে (২) মূর্তির আস্তানায় যেসব পশু জবেহ হয় তার গোশত আমাকে খাওয়াবে না (৩) কুরাইশরা যখন আমাকে হত্যা করতে চাইবে আগেই আমাকে তা অবহিত করবে।"

"আমি এই তিনটি বিষয় পূরণের জন্য কৃত সংকল্প হলাম। যখন নিষিদ্ধ মাসগুলো অতিক্রান্ত হলো তখন কুরাইশরা খুবায়েবকে (রা) হত্যার জন্য একত্রিত হলো। আমি খুবায়েবকে (রা) কুরাইশ অভিসন্দি সম্পর্কে অবহিত করলাম। আল্লাহর কসম! এ সময় আমি তাঁকে মোটেই ভীত হতে দেখিনি। তবে, তিনি পবিত্রতার জন্য আমার নিকট ক্ষুর চাইলেন। আমি আমার অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুত্রের মাধ্যমে তাঁর নিকট ক্ষুর পাঠালাম। পরে আমার খেয়াল হলো যে, আমি তো নির্বোধের মত কাজ করেছি। এই কয়েদী তো নিজের জীবন সম্পর্কে নিরাশ হয়ে পড়েছে। সে তার পুত্রকে মেরে না ফেলে। আমি দৌড়াতে দৌড়াতে কয়েদখানায় গিয়ে পৌঁছলাম। সেখানে গিয়ে দেখলাম যে, খুবায়েব(রা) ক্ষুর হাতে নিয়ে আমার পুত্রকে বলছে, "পুত্র! তোমার মা কি আমাকে ভয় পায়নি। সে তোমার হাতে ক্ষুর কি করে পাঠালো!" আমি দরজার আড়াল থেকে বললাম, "হে খুবায়েব! আমি এই শিশুকে তোমার নিকট আল্লাহর নিরাপত্তায় প্রেরণ করেছি।" খুবায়েব (রা) আমার ভীতি আঁচ করতে পারলেন এবং বললেন ঃ

"আমি সেই ব্যক্তি নই যে, এই নিস্পাপ শিশুকে হত্যা করবো। আমাদের দ্বীনে এই ধরনের জুলুম ও বিশ্বাসঘাতকতার স্থান নেই।"

হযরত খুবায়েবের (রা) এই উন্নত চরিত্র প্রত্যক্ষ করার পরও কালিমা লিপ্ত অন্তরের কুরাইশদের দয়ার উদ্রেক হলো না। তারা সেই পবিত্র চরিত্রের মানুষটিকে হত্যার জন্য উঠে পড়ে লাগলো।

নিসন্দেহে হযরত খুবায়েব (রা) কুরাইশের একজন বড় সরদারের হত্যাকারী ছিলেন। কিন্তু তিনি ধোঁকা দিয়ে এই হত্যাকাণ্ড ঘটাননি। বরং যুদ্ধের ময়দানে বীর পুরুষের মত লড়াই করে হত্যা করেছিলেন। এখন হাতে পেয়ে কুরাইশরা তার ওপর যে নির্যাতন চালাচ্ছিল তা দুনিয়ার কোন আইনেই সিদ্ধ নয়। তা ছিল স্পষ্ট শয়তানী এবং কাপুরুষতা। রশিতে বাঁধা একজন অসহায় কয়েদীকে কুড়িজন সশস্ত্র ব্যক্তি সম্মিলিতভাবে প্রহার করছিল। এই কাজতো আরবদের জাতীয় রীতিনীতিরও সম্পূর্ণ পরিপন্থী ছিল। কিন্তু কুরাইশ মুশরিকরা প্রতিশোধের আবেগে একদম অন্ধ হয়ে পড়েছিল। তারা সেই মজলুম বিদেশীকে হত্যা করার বিশেষ ব্যবস্থা করে এবং তাঁকে শূলে চড়িয়ে

বর্শা দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারার সিদ্ধান্ত নেয়। সুতরাং তারা নিষিদ্ধ মাসসমূহ অতিক্রান্ত হওয়ার পর হেরেমের বাইরে তানয়িম নামক স্থানে শূল স্থাপন করলো এবং সেখানে সকল মক্কাবাসীকে উপস্থিত হওয়ার জন্য কাড়া নাকাড়া বাজিয়ে দিল। মক্কাবাসী এই তামাশা দেখার জন্য সেখানে ভেঙ্গে পড়লো। তারা ঢোল ও দাফ বাজাচ্ছিল। পতাকা ওড়াচ্ছিল এবং তুরি বাজাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল সেখানে যেন কোন মেলা বা উৎসব হচ্ছিল। হযরত খুবায়েবকে (রা) সেখানে আনা হলো। উপস্থিত জনতা আনন্দের আতিশয্যে শ্লোগানে শ্লোগানে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তুললো। হত্যার পূর্বে জালেমরা হযরত খুবায়েবকে (রা) জিজ্ঞেস করলো ঃ "কোন ইচ্ছা থাকলে তা বলতে পারো।"

হযরত খুবায়েব (রা) বললেন ঃ "আমার আর কোন ইচ্ছা নেই। অবশ্য দু'রাকায়াত নামায পড়ার সময় দাও।"

মুশরিকরা বললো ঃ "পড়ে নাও।"

হযরত খুবায়েব (রা) তৎক্ষণাৎ অত্যন্ত বিনয় ও একাগ্রচিত্তে নামায আদায়ের জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন। দু'রাকায়াত পড়া হলে বললেন ঃ

"আমি নামায আদায়ে বেশী সময় ব্যয় করতাম। কিন্তু চিন্তা করলাম যে, তোমরা ভেবে বসবে যে, খুবায়েব (রা) মৃত্যুকে ভয় পেয়ে গেছে এবং হত্যার সময় ফাঁকি দিচ্ছে।"

তারপর বাহাদুর মরদে মু'মিনটি শূলের নীচে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং এই কবিতা আবৃত্তি করলেন ঃ

"লোকজন উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে আমার চারপাশে একত্রিত হচ্ছে। বড় বড় গোষ্ঠী আমার হত্যার তামাশা দেখার জন্য দাঁড়িয়ে রয়েছে।

এসব মানুষ আমার প্রতি শত্রুতা প্রকাশ করছে এবং আবেগে উদ্বেলিত হয়ে আছে।

আমি এই বধ্যভূমিতে আপাদমস্তক দাঁড়িয়ে আছি। কবিলাগুলোর লোকজন আমার হত্যার তামাশা দেখানোর জন্য শিশু ও মহিলাদেরকে নিয়ে এসেছে।

লোকজন আমাকে একটি উঁচু লাকড়ীর নিকট নিয়ে এসেছে এবং বলছে ইসলাম পরিত্যাগ করলে তোমার জীবন বাঁচতে পারে। কিন্তু দ্বীনে হক পরিত্যাগ করার চেয়ে মরে যাওয়াই উত্তম।

আমার চোখ আদ্র। কিন্তু আমি ধৈর্য ধারণ করবো এবং শত্রুর সামনে অবনত হবো না। কেননা আমি আল্লাহর নিকট সাফল্য লাভকারী হবো।

মৃত্যুকে আমি ভয় করিনা। ভয় করি শুধু জাহান্নামের রক্ত শোষণকারী লেলিহান অগ্নিশিখাকে। উত্তম আরশের মালিক আমার খিদমত গ্রহণ এবং আমাকে ধৈর্য ও স্থৈর্যের হেদায়াত করেছেন।

দীনে হকের দুশমনরা মেরে মেরে আমার গোশতকে একদম ভরতা বানিয়ে দিল। আমি আমার বিদেশী ও অসহায় হওয়ার ফরিয়াদ আমার স্রষ্টার নিকটই করছি। আল্লাহর কসম! আমি যখন আল্লাহর পথে জীবন দিচ্ছি তখন কোন দিকে পতিত হচ্ছি বা কিভাবে জীবন দিচ্ছি তার পরোয়া নেই। আল্লাহর নিকট আশা, তিনি চাইলে আমার দেহের প্রতিটি অংশে বরকত দেবেন।"

এই কবিতা পাঠের পর তিনি এই বলে দোয়া করলেন ঃ

"হে আল্লাহ! আমি তোমার রাসূলের (সা) পয়গাম তাদের নিকট পৌঁছে দিয়েছি। এখন তুমি তোমার রাসূলে বরহকের নিকট আমার অবস্থার খবর পৌঁছে দাও।"

এই দোয়া করার পর তিনি আসমানের পানে তাকালেন। সে সময় তার মুখ দিয়ে নিজের হত্যাকারীদের জন্য এই বদ দোয়া জারী হয়ে গেল ঃ

"তাদের প্রত্যেকের ওপর তোমার শাস্তি নাযিল করো এবং তাদেরকে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ধ্বংস করো। তাদের কেউ যেন রক্ষা না পায়।"

হযরত খুবায়েবের (রা) বদদোয়ায় মুশরিকরা এতো ভীত এবং সন্ত্রস্তিত হয়ে উঠলো যে, তাদের অধিকাংশই একপাশ হয়ে মাটির ওপর শুয়ে পড়লো। অনেকে একে অপরের পিছনে লুকালো। কিছু মানুষ কানে আঙ্গুল দিয়ে পালাতে লাগলো এবং কেউ বা গাছের আড়ালে গিয়ে পালালো। কেননা বদদোয়া থেকে বাঁচার জন্য এসব পদ্ধতিই তাদের জানা ছিল। এই দৃশ্য এত শিক্ষণীয় এবং হৃদয়বিদারক ছিল যে, সে সময় উপস্থিত লোকদের আজীবন তা স্মরণ ছিল।

[এ সময় হযরত মুয়াবিয়া (রা) বিন আবু সুফিয়ান (রা) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, যে সময় খুবায়েব (রা) বদদোয়া করলেন তখন আমার পিতা আবু সুফিয়ান আমাকে এত জোরে ধাক্কা দিলেন যে, আমি উবু হয়ে মাটিতে পড়ে গেলাম। তারপর আমাকে এমনভাবে টানতে লাগলেন যে, আমার শরীরের অনেক স্থানে যুনহা ঘা হয়ে গেল এবং তার ব্যথায় আমি কয়েকদিন বিছানায় শুয়ে ছিলাম।

হাকিম (রা) বিন হাযাম বলেন যে, আমি খুবায়েবের (রা) বদদোয়ার ভয়ে বৃক্ষের আড়ালে গিয়ে লুকিয়ে ছিলাম। জোবায়ের (রা) বিন মাতয়াম অন্য

মানুষের আড়ালে আড়ালে চলছিল। হুয়াইতিব (রা) বিন আবদুল উজ্জা নিজের কানে আঙ্গুল দিয়ে দ্রুত প্রস্থান করলেন যাতে খুবায়েবের (রা) বদদোয়া না শুনতে হয়। এসব ব্যক্তি সে সময় কাফের ছিল এমনিভাবে সেখানে উপস্থিত অন্যান্য সকল মানুষের মধ্যে বিশৃংখলা ও ভীতি সৃষ্টি হয়। মশহুর সাহাবী হযরত সাঈদ (রা) বিন আমের কখনো কখনো অচেতন হয়ে পড়তেন। একবার হযরত ওমর ফারুক (রা) তাঁর নিকট এই অচেতন হওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, আমি খুবায়েবের (রা) হত্যার সময় তামাশা প্রত্যক্ষকারীদের মধ্যে একজন ছিলাম। যখনই খুবায়েবের (রা) বদদোয়ার কথা আমার স্মরণ হয় তখনই আমি কাঁপতে থাকি এবং অচেতন হয়ে পড়ি। এটা প্রতিরোধ করা আমার সাধ্যের বাইরে।]

এই বদদোয়ার পর হযরত খুবায়েব (রা) ফাঁসির রজ্জু নিজের গলায় লটকে নিলেন। উরওয়া (রা) এবং মূসা (রা) বিন উকবা থেকে বর্ণিত আছে যে, মুশরিকরা যখন হযরত খুবায়েবকে (রা) শূলিতে চড়ালো তখন তাঁকে ডেকে এবং কসম দিয়ে বললো যে, মুহাম্মাদকে (সা) তোমার স্থানে শূলিতে চড়ালে এবং নিজের গৃহে আরামের সঙ্গে বসে থাকাকে কি তুমি পসন্দ করতে?

হযরত খুবায়েব (রা) বললেন ঃ "আল্লাহর কসম! আমিতো মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) পবিত্র পায়ে কাঁটা ফোটাও সহ্য করতে পারবো না। আর তোমরা বলছো আমি ঘরে আরামে বসে থাকবো।"

অতপর কাফেররা হযরত খুবায়েবকে (রা) ইসলাম থেকে পশ্চাৎগমনের সর্বশেষ চেষ্টা চালালো। কিন্তু তিনি মুশরিকদের লোভ-লালসা অবজ্ঞাভরে প্রত্যাখ্যান করলেন। জালেমরা এবার শূলির রশিতে টান দিল এবং তাঁর মুখ কিবলামুখী করে দিল। সে সময় হযরত খুবায়েবের (রা) মুখ দিয়ে এই আয়াত বেরিয়ে এলো ঃ

فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ

"তোমরা যেদিকেই রুখ করো না কেন সেদিকেই আল্লাহ রয়েছেন।"

কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত খুবায়েব (রা) সে সময় রাসূলে আকরামের (সা) ওপর সালাম প্রেরণ করলেন এবং রাব্বুল ইজ্জতের দরবারে দোয়া করলেন যে, তিনি যেন তাঁর অবস্থার খবর হুজুরকে (সা) পৌঁছে দেন।

তারপর পাষাণ হৃদয় মুশরিকরা সেই মরদে মু'মিনের দেহের ওপর বল্লমের আঘাত শুরু করলো। কয়েকবার খুবায়েবের (রা) মুখ কিবলামুখী হয়ে গেল। তখনো জীবনের স্পন্দন কোনমতে অবশিষ্ট ছিল। তিনি বললেন ঃ

"আলহামদুলিল্লাহ! তিনি আমার মুখ তাঁর ঘরমুখী করে দিয়েছেন।"

কাফেররা তাঁর ঘায়েলকৃত দেহের ছটফটানি দেখে আনন্দে মা'রা লাগাচ্ছিল। তারা খুবায়েবের (রা) চেহারা কিবলার দিক থেকে অন্য দিকে ফিরিয়ে দেয়ার খুব চেষ্টা করলো। কিন্তু তাতে ব্যর্থ হলো। অবশেষে একজন মুশরিক তাঁর বুকের ওপর এত প্রচণ্ড জোরে নিয়াহ মারলো যে, তা এপার ওপার হয়ে গেল। সে সময় তাঁর মুখ দিয়ে কালেমায়ে তাওহীদ উচ্চারিত হচ্ছিল। আর এই অবস্থাতেই তিনি আল্লাহর সান্নিধ্যে উপস্থিত হলেন।(অধিকাংশ সিরাত বা চরিত গ্রন্থে এই মুশরিকের নাম আবু সারুয়া বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই আবু সারুয়া মক্কা বিজয়ের দিন মুসলমান হয়েছিলেন।)

তারপর মুশরিকরা হক পথের এই শহীদের লাশকে শূলে লটকিয়েই রেখে দিল।

হযরত খুবায়েবের (রা) সঙ্গী হযরত যায়েদ (রা) বিন আদ দাছনাকে সাফওয়ান বিন উমাইয়া কিনেছিল। কতিপয় রেওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, সাফওয়ান তাঁকে নিজের গোলাম ফুসতাসের নিকট সমর্পণ করেছিল। সে তাঁকে হেরেমের বাইরে তানয়িম নামক স্থানে নিয়ে গিয়েছিল এবং অনেক তামাশা প্রত্যক্ষকারীদের সামনে শহীদ করে ফেলেছিল। কিন্তু মূসা (রা) বিন উকবা এবং আরো কতিপয় ঐতিহাসিক লিখেছেন যে, হযরত খুবায়েব (রা) ও হযরত যায়েদ (রা) বিন দাছনাকে একই দিনে এবং একইস্থানে শহীদ করা হয়। এই কথাই সঠিক বলে মনে হয়। কেননা যে বস্তু হযরত খুবায়েবকে (রা) তাৎক্ষণিকভাবে হত্যার ব্যাপারে বাধা দিল সেই একই বস্তু যায়েদকে (রা) হত্যার ব্যাপারেও বাধা দিল। আর তাহলো নিষিদ্ধ মাস।

এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীরা বর্ণনা করেছেন, মুশরিকরা যখন হযরত খুবায়েব (রা) ও হযরত যায়েদকে (রা) তানয়িমে আনলো তখন তাঁরা উভয়েই খুব আনন্দের সঙ্গে পরস্পরকে আলিঙ্গন করলেন। তাতে কাফেররা আশ্চর্যান্বিত হয়ে পড়লো। অতপর উভয়ে পরস্পরকে ধৈর্য ও স্থৈর্যের পরামর্শ দিলেন। কাফেররা তৎক্ষণাৎ তাঁদেরকে পরস্পর থেকে পৃথক করে ফেললো। হযরত খুবায়েব (রা) যখন শাহাদাত বরণ করলেন তখন যায়েদকে (রা) বধ্যভূমিতে আনা হলো। আবু সুফিয়ান তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ

"হে যায়েদ! খোদার কসম, সত্যি সত্যি বলোতো তোমার পরিবর্তে যদি মুহাম্মাদের (সা) গর্দান উড়িয়ে দেয়া হয় এবং তুমি নিজের পরিবার পরিজনসহ আনন্দ ও খুশীতে থাকো তা কি তুমি পসন্দ করবে?"

ইবনে ইসহাক এবং ইবনে হিশাম বর্ণনা করেছেন যে, এই মরদে মু'মিনও সেই একই জবাব দিয়েছিলেন যা হযরত খুবায়েব (রা) দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন ঃ

"আল্লাহ্ ক্ষমা করুন, মুহাম্মাদের (সা) পবিত্র পায়ে সামান্য কাঁটা ফুটে যাওয়াও আমি সহ্য করতে পারবো না।"

আবু সুফিয়ান (রা) সঙ্গীদেরকে সম্বোধন করে বললো, "তোমরা দেখলে মুহাম্মাদের (সা) সঙ্গীরা তাকে যেভাবে ভালবাসে তার কোন উদাহরণ পাওয়া যায় না।"

তারপর জনৈক জালেম হযরত যায়েদের (রা) বুকের ওপর নিযাহ মারলো। এই নিযাহ তার অন্তরকে ছিদ্র করে এপার ওপার হয়ে গেল এবং তাঁর মুখ দিয়ে উচ্চৈস্বরে বেরিয়ে এলো আল্লাহু আকবার ধ্বনি। তখন সাফওয়ানের গোলাম ফুসতাস এগিয়ে এলো এবং সে তাঁর মাথা কেটে নিল। এমনিভাবে সেই মরদে মু'মিনও নিজের প্রকৃত মালিকের সান্নিধ্যে চলে গেলেন।

হযরত খুবায়েব (রা) শাহাদাতের পূর্বে আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া করেছিলেন যে, তিনি যেন তাঁর অবস্থার খবর হযরত মুহাম্মাদের (সা) নিকট পৌঁছে দেন। মহান আল্লাহ তাঁর এই দোয়া কবুল করেন এবং হুজুরকে (সা) তৎক্ষণাৎ এই হৃদয়বিদারক ঘটনার খবর ওহীর মাধ্যমে পৌঁছে দিলেন। হিব্বুন্নবী (সা) হযরত যায়েদ (রা) বিন হারিছা বলেন, তিনিও সে সময় নবীর মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। নবীর (সা) ওপর হঠাৎ করে ওহী অবতীর্ণ হওয়ার আলামত পরিস্ফুট হয়ে উঠলো এবং তিনি বললেন ঃ

"মুশরিকরা খুবায়েবকে (রা) শহীদ করে ফেলেছে এবং জিবরাইল (আ) তাঁর সালাম নিয়ে এসেছেন।"

ইবনে জারির (র) ও হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র) বর্ণনা করেছেন যে, এই ঘটনার পর একদিন হযরত মুহাম্মাদ (সা) হযরত আমর(রা) বিন উমাইয়া জামরীকে মক্কা গিয়ে খুবায়েবের (রা) লাশের খবর নিতে এবং তা শূল থেকে নামাতে বললেন। হযরত আমর (রা) খুব দ্রুত গতি সম্পন্ন ছিলেন। তিনি রাত-দিন একাধারে চলে মক্কা পৌঁছলেন এবং রাতের অন্ধকারে যেখানে খুবায়েবের (রা) লাশ শূলে লটকানো ছিল সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি বৃক্ষে চড়ে শূলের রশি কাটলেন। ফলে লাশ মাটিতে পড়ে গেল। হযরত আমর (রা) হযরত খুবায়েবের (রা) পবিত্র দেহ মদীনা নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি গাছ থেকে নীচে নেমে একদম থ' মেরে গেলেন। তিনি লাশ পেলেন না। বললেন, "তাহলে কি মাটি গিলে ফেলেছে।"

অন্য এক রেওয়ায়াতে আছে যে, খুবায়েবের (রা) শাহাদাতের কয়েকদিন পর রহমতে আলম (সা) সাহাবায়ে কিরামকে (রা) বললেন, "কে আছে যে, খুবায়েবের (রা) লাশ শূল থেকে নামিয়ে আনবে এবং জান্নাতের হকদার হবে।"

হযরত যোবায়ের (রা) ইবনুল আওয়াম এবং হযরত মিকদাদ (রা) ইবনুল আসওয়াদ একই সাথে উঠে দাঁড়ালেন এবং আরজ করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমরা এ কাজ করবো।"

সুতরাং উভয়ে লুকিয়ে ছাপিয়ে মক্কা পৌঁছলেন। রাতের বেলায় যখন খুবায়েবের (রা) বধ্যভূমিতে গেলেন তখন তাঁর লাশ শূলের ওপর সম্পূর্ণ তরতাজা দেখে বিস্মিত হলেন। মনে হচ্ছিল সেদিনই তিনি আল্লাহর সান্নিধ্যে গিয়ে পৌঁছেছেন। তাঁর এক হাত ছিল নিজের ক্ষতের ওপর। সেই ক্ষত দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিল। অথচ ৪০ দিন পূর্বে শাহাদাত বরণ করেছিলেন।

হযরত যোবায়ের (রা) লাশ শূল থেকে নামালেন এবং তা নিজের ঘোড়ার ওপর রেখে হযরত মিকদাদ সমভিব্যাহারে মদীনা রওয়ানা হলেন। সকাল হলে কোন মাধ্যমে কুরাইশরা এই ঘটনা জানতে পেল। তারপর অনেক সশস্ত্র মুশরিক উটের ওপর সওয়ার হয়ে হযরত যোবায়ের (রা) ও মিকদাদের (রা) পিছনে ধাওয়া করলো। হযরত যোবায়ের (রা) কুরাইশ সরদারদেরকে নিজের মাথার ওপর দেখে হযরত খুবায়েবের (রা) লাশ ঘোড়া থেকে নামিয়ে মাটির ওপর রেখে দিলেন। মাটি তৎক্ষণাৎ তার লাশ গিলে ফেললো।

এই কারণে হযরত খুবায়েবকে (রা) "বালিগুল আরদ" লকবে ডাকা হয়ে থাকে।

এরপর হযরত যোবায়ের (রা) কুরাইশের প্রতি তাকিয়ে হুংকার দিয়ে বললেন ঃ

"হে কুরাইশ মুশরিকরা! আমাদের পেছনে ধাওয়া করার সাহস তোমাদের কি করে হলো। তোমরা কি জানোনা যে, আমি আওয়ামের পুত্র এবং আবদুল মুত্তালিবের দৌহিত্র। আমার এই সঙ্গী হলো বাহাদুর মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ কিন্দী। আমরা নিজেদের বাড়ী ফিরছি এবং তোমাদের কোন ক্ষতি করিনি। তোমরা যদি তীর দিয়ে লড়াই করতে চাও তাহলে আমরা তীর দিয়েই লড়বো। তরবারী দিয়ে লড়তে চাইলে আমরাও তরবারী দিয়ে লড়াই করবো। আল্লাহর কসম! যতক্ষণ আমাদের দেহে জীবন রয়েছে ততক্ষণ আমরা তোমাদেরকে আমাদের নিকট ঘেষতে দেব না।"

কুরাইশ মুশরিকরা যখন দেখলো যে, এই মরদে মু'মিনরা মরতে ও মারতে কৃত সংকল্প তখন তারা আর তাদের সঙ্গে বাদানুবাদ না করে ফিরে চলে গেল। হযরত যোবায়ের (রা) ও মিকদাদ (রা) যখন রাসূলের (সা) দরবারে হাজির হয়ে সমগ্র ঘটনা বর্ণনা করলেন। শুনে হুজুর (সা) খুব খুশী হলেন এবং বললেন, জিবরাইল আমীন (আ) আমাকে বলেছেন যে, আল্লাহ তায়ালার ফেরেশতারা তোমাদের উভয়ের জন্য গর্ব প্রকাশ করেছেন।

হযরত উসায়েদ (রা) বিন হুদায়ের আশহালী

সাইয়েদুল আনাম রহমতে আলমের (সা) মজলিসসমূহ ছিল খুবই পবিত্র মজলিস। গাম্ভীর্য ও মর্যাদায় পূর্ণ থাকতো এই মজলিস। তাতে সবসময় হেদায়াত ও ইরশাদ, আখলাক, আমল, নফস ও কলবের পরিশুদ্ধির ব্যাপারে আলোচনা হতো। মজলিসে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ মাথা নত করে আদবের সাথে এমনভাবে বসতেন যেন তাঁদের মাথায় পাখী বসে আছে। প্রখ্যাত সাহাবী হযরত উরওয়াহ (রা) বিন মাসউদ ছাকাফী হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় মক্কার কুরাইশদের পক্ষ থেকে দূত হয়ে নবীর (সা) দরবারে উপস্থিত হলেন। সে সময় তিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি। তিনি নবীর মজলিসে রিসালাত প্রদীপের পতঙ্গদের কর্মপদ্ধতি দেখে হতভম্ব হয়ে গেলেন। কুরাইশদের নিকট ফিরে গিয়ে তিনি বললেন :

"কুরাইশ ভাইসব! আমি দুনিয়ার বড় বড় রাজা-বাদশাহদের (রোমের কাইসার, ইরানের কিসরা ও হাবশার নাজ্জাশী) দরবারে গিয়েছি। কিন্তু মুহাম্মাদের (সা) সঙ্গীরা যেভাবে মুহাম্মাদকে (সা) ভালবাসে এবং ভক্তিশ্রদ্ধা করে তা আমি কোন বাদশাহর দরবারে দেখিনি। মুহাম্মাদ (সা) থুথু নিক্ষেপ করলেও তারা তা হাতে নেয় এবং নিজের দেহ ও চেহারায় মেখে নেয়। মুহাম্মাদ (সা) ওজু করার সময় তারা ব্যবহৃত পানির এক এক ফোটার জন্য এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে যেন পরস্পর লড়াই করে মরবে। মুহাম্মাদ (সা) কোন নির্দেশ দিলে প্রত্যেকেই তা পালনের জন্য পরস্পর প্রাধান্য বিস্তার করতে চায়। তাঁর সামনে কেউ উচ্চৈস্বরে কথা বলে না এবং কেউ তাঁর দিকে মুখ উঁচু করে তাকায়ও না।"

নবীর মজলিসের এটা একটা আংশিক দিক ছিলো। মজলিসের সবগুণই ছিল। তাই বলে তা একদম কাটখোট্টা বা নির্জীব ছিল না। রহমতে আলম (সা) লোকদের সাথে খুব হাসি-খুশীভাবে আলাপ-আলোচনা করতেন। অনেক সময় রাসূলের (সা) রসিকতায় সমগ্র মজলিস আনন্দিত হয়ে উঠতো। এসব সময় অনেক সাহাবীও (রা) পবিত্র ব্যঙ্গ ও কৌতুকপ্রদ কথা বলতেন। এসব ব্যঙ্গ বা কৌতুক অন্য সাহাবী (রা) মানসিকভাবে আহত হতেন না এবং হুজুরও (সা) মুচকী হাসতেন। এ ধরনেরই এক মজলিসের ঘটনা। একজন হাসিমুখ সাহাবী (রা) কৌতুকপূর্ণ কথা বলে সঙ্গীদেরকে হাসাচ্ছিলেন।

কৌতুকের কারণে মজলিস যখন একটু উত্তপ্ত হয়ে উঠলো তখন প্রিয় নবী (সা) তাঁর পাঁজরে লাঠি দিয়ে খোঁচা দিলেন। তিনি আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আপনার লাঠি আমাকে কষ্ট দিয়েছে।"

হুজুর (সা) বললেন ঃ "তাহলে ভাই, আমার কাছ থেকে বদলা নাও।"

তিনি বললেন ঃ "হুজুর (সা)। আপনার লাঠিতো আমার খালি শরীরে লেগেছিল। কিন্তু আপনার দেহে কামিস রয়েছে। বদলা কি করে পূর্ণ হতে পারে।"

প্রিয় নবী (সা) তৎক্ষণাৎ নিজের জামা খুলে বললেন ঃ "এসো ভাই, এখন বদলা নাও।"

সেই সাহাবীর চোখ আবেগের আধিক্যে বুঁজে গেলো। হুজুরকে (সা) গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে জাপটে ধরলেন এবং তাঁর পবিত্র পাঁজরে একের পর এক চুমু দিতে লাগলেন। তারপর রুদ্ধকণ্ঠে আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। আমি আপনার কাছ থেকে বদলা নেবো? আল্লাহর কসম! হুজুরের (সা) পবিত্র পাঁজরে চুমু দেয়ার সৌভাগ্য লাভই আমার লক্ষ্য ছিল।"

সর্বোত্তম মানুষ হযরত মুহাম্মদের (সা) এই সত্যিকার প্রেমিকের নাম ছিল হযরত উসায়েদ (রা) বিন হুজায়েরুল কিতায়েব আশহালী আনসারী।

সাইয়েদেনা আবু ইয়াহইয়া উসায়েদ (রা) বিন হুজায়ের অন্যতম মহান মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবী ছিলেন। স্বয়ং নবী করিম (সা) একবার তাঁর সম্পর্কে বলেছিলেন। "উসায়েদ বিন হুজায়ের খুব ভাল মানুষ।"

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা) সিদ্দীকা বলতেন, উসায়েদ (রা) আনসারের তিনজন সর্বোত্তম মানুষের একজন [অন্য দুই ব্যক্তি হলেন আওস সরদার হযরত সায়াদ (রা) বিন মায়াজ এবং উবাদ বিন বাশার (রা)]। হযরত উসায়েদ (রা) আওস কবিলার আবদুল আশহাল বংশের অন্যতম নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর বংশ আওসের তরবারীধারী যোদ্ধা ছিলেন এবং মহানবীর (সা) ইরশাদ অনুযায়ী বনু নাজ্জারের (খাজরাজ) পর আনসারের সর্বোত্তম খান্দান ছিলো।

হযরত উসায়েদের (রা) পিতা হুজায়েরুল কিতায়েব (বিন সামমাক বিন আতিক বিন রাফে' বিন ইমরাউল কায়েস বিন যায়েদ বিন আবদুল আশহাল) আওস কবিলার সিপাহসালার ছিলেন এবং জাহেলী যুগে একজন নেতৃস্থানীয়

ব্যক্তি হিসেবে পরিগণিত হতেন। তিনি শুধু লিখাপড়াই জানতেন না বরং অত্যন্ত উঁচু শ্রেণীর তীরন্দাজ, তরবারী যোদ্ধা এবং সাঁতারুও ছিলেন। এ জন্য তিনি কিতায়েব কালমাহ এবং কামিল উপাধিতে ভূষিত হতেন। হুজায়েরের পিতা সামমাকও নিজের গোত্রের সরদার ছিলেন। "আইয়ামে আনসারের" সময়ে একবার বনু হারিছা ও বনু আবদুল আশহালের মধ্যে এক রক্তাক্ত লড়াই সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে সামমাক মারা যায় এবং আবদুল আশহাল নিজের বাড়ী-ঘর পরিত্যাগ করে বনি সুলাইমের এলাকায় আশ্রয় নেয়। হুজায়ের কসম খেয়ে শপথ গ্রহণ করে যে, সে বনু হারিছার বিরুদ্ধে অবশ্যই প্রতিশোধ নেবে। সুতরাং সে কিছুদিনের মধ্যেই এক বিরাট বাহিনী তৈরী করে এবং তাদেরকে সাথে নিয়ে বনু হারিছার ওপর হামলা চালায়। বনু হারিছা এই হামলা মুকাবিলা করতে না পেরে খাইবারের দিকে পালিয়ে যায় (অথবা হুজায়ের তাদেরকে বহিস্কার করে)। কয়েক মাস পর হুজায়েরের দয়ার্দ্র হয়ে ওঠেন এবং তিনি তাদেরকে ইয়াসরাবে ডেকে আনেন। তারপর হুজায়ের খাযরাজের বিরুদ্ধে কয়েকটি যুদ্ধে আওসের নেতৃত্ব দেন। নবীর (সা) হিজরতের পাঁচ বছর পূর্বে প্রখ্যাত বুয়াছের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধেও যথারীতি আওসের সিপাহসালার ছিলেন হুজায়েরুল কিতায়েবই। উভয় পক্ষই অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে লড়াই করে। কিন্তু অবশেষে আওসের ওপর পরাজয়ের চিহ্ন পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। এই অবস্থায় হুজায়ের যুদ্ধের ময়দানে শিরদাঁড়া উঁচু করে দাঁড়িয়ে গেল। বর্শার তীক্ষ্ণ অংশ পায়ের নীচে গেড়ে নিলেন এবং নতুন করে নিজের কবিলার মধ্যে যুদ্ধের এমন প্রাণ ফুঁকে দিলেন যে, পলায়নরত আওসীরা উল্টো প্রচণ্ড বেগে হামলা করে বসলো। ফলে খাজরাজীদের পলায়ন ছাড়া গত্যন্তর রইলো না। খাজরাজের সিপাহসালার আমর বিন নু'মান বায়াজী যুদ্ধের ময়দানেই নিহত হলো। হুজায়েরও মারাত্মকভাবে আহত হলো এবং এ কারণেই পরে মারা গেল। উসায়েদ (রা) এই প্রখ্যাত জেনারেলের তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হন এবং নিজের পিতার মত তিনিও যুদ্ধবিদ্যা, সাঁতার এবং লিখাপাড়ায় পূর্ণ পারদর্শীতা অর্জন করেছিলেন। বস্তুত লোকজন তাঁকেও কিতায়েব ও কামেল বলে ডাকতেন। ইবনে হিসাম (র) বর্ণনা করেছেন যে, হুজায়েরের মৃত্যুর পর আওস গোত্রের সাধারণ নেতৃত্বের মুকুট হযরত সায়াদ (রা) বিন মায়াজের মাথায় রাখা হয় এবং সামরিক নেতৃত্ব অর্পিত হয় উসায়েদ (রা) বিন হুজায়েরের ওপর। কিন্তু সে সময় কে জানতো যে, তাকদীরের লিখন সায়াদ (রা) এবং উসায়েদের (রা) ভাগ্যে যে মর্যাদা লিখছেন তা এত মর্যাদাকর যে, মুসলিম উম্মাহ এই উভয় যুবকের জন্য চিরকাল গৌরব করবে।

মহানবীর (সা) হিজরতের কিছুদিন পূর্বে আওস ও খাজরাজ বছরের পর বছর ধরে পরস্পরের গলা কেটে ভয়ানক দুর্বল হয়ে পড়েছিল। অতপর পারস্পরিক যুদ্ধ করার মত শক্তি আর তাদের ছিল না। এ জন্য তারা সকলে মিলে খাজরাজের এক সরদার আবদুল্লাহ বিন উবাই বিন সলুলকে (মুনাফিক সরদার) নিজেদের বাদশাহ বানানোর প্রশ্নে ঐকমত্য ঘোষণা করলো। সে সময় ইসলাম সূর্য ফারান পর্বত শীর্ষে উদিত হয়েছিল এবং তার কিরণচ্ছটা ইয়াসরাবের মাটিতেও নিপতিত হচ্ছিল। নবুওয়াতের দশম বছরে খাজরাজের ছ'ব্যক্তি হজ্জের জন্য মক্কা গিয়েছিলেন। তাঁরা ইসলামের নিয়ামতে অভিষিক্ত হয়ে ইয়াসরাব প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। পরবর্তী বছরে ১২ জন সৌভাগ্যবান ইয়াসরাবী রহমতে আলমের (সা) হাতে বাইয়াত করেন। এসব ব্যক্তির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ব নবী (সা) হযরত মুসয়াব (রা) বিন উমায়েরকে দ্বীনের তাবলীগ ও তালিমের জন্য ইয়াসরাব প্রেরণ করেন। তিনি ইয়াসরাব পৌঁছেই খুব দ্রুত হকের তাবলীগে মশগুল হয়ে পড়লেন।

তিনি একদিন বনু আবদুল আশহাল সংলগ্ন এক বাগানে বসে বসে তাবলীগ করছিলেন। এমন সময় দেখতে পেলেন যে, একজন ক্রোধান্বিত মানুষ তাঁর দিকে আসছেন। হযরত মুসয়াবের (রা) মেযবান হযরত আসয়াদ(রা) বিন যারারাহও সেখানে ছিলেন। তিনি বললেন, "ইনি হলেন, উসায়েদ বিন হুজায়ের। দুই আওস সরদারের অন্যতম। হক কবুলের ভাগ্য যদি তার হয় তাহলে আমাদের কাজ সহজ হয়ে যাবে।"

সে সময় উসায়েদ (রা) আওস সরদার সায়াদ (রা) বিন মায়াজের ইঙ্গিতে হযরত মুসয়াব (রা) এবং তাঁর সঙ্গীদেরকে নিজের মহল্লা থেকে বহিষ্কারের জন্য এসেছিলেন। কেননা তাঁরা ইয়াসরাববাসীকে তাদের পূর্ব-পুরুষদের ধর্ম থেকে বিচ্যুত করছিলেন। সেখানে এসেই উসায়েদ (রা) বর্শা আন্দোলিত করলেন এবং অত্যন্ত কর্কশ স্বরে মুসয়াবকে (রা) বললেন ঃ

"এই মহল্লায় এসে আমাদের লোকদেরকে পথভ্রষ্ট করার সাহস তোমার কোত্থেকে হলো? ভাল চাইলে এক্ষুণি এখান থেকে চলে যাও এবং ভবিষ্যতে আর কখনো এদিকে আসার নাম নেবে না।"

হযরত মুসয়াব (রা) একজন মুবাল্লিগের মত ধৈর্যশীল হয়ে জবাব দিলেন ঃ

"সম্মানিত ভাই আমার! আগে বসুন এবং আমার কথা শুনুন। যদি পসন্দ হয় তাহলে ভাল। তা নাহলে প্রত্যাখ্যানের অধিকার আপনার রয়েছে।"

উসায়েদ (রা) হযরত মুসয়াবের (রা) মিষ্ট ও বিনীত কণ্ঠের কথা শুনে খুব প্রভাবিত হলেন। ক্রোধ উবে গেল এবং বর্শা গেড়ে বসে পড়লেন। হযরত

মুসয়াব (রা) খুব সুন্দরভাবে তাঁর সামনে হকের দাওয়াত পেশ করলেন এবং কুরআনে কারীমের কতিপয় আয়াত পড়লেন। উসায়েদ (রা) ছিলেন শিক্ষিত এবং বিচক্ষণ মানুষ। আল্লাহর কালাম শুনে তাঁর অন্তরজগত মুহূর্তের মধ্যে বদলে গেল। তৎক্ষণাৎ কালেমা পড়ে তিনি মুসলমান হয়ে গেলেন এবং বললেন ঃ

"আরো এক ব্যক্তি রয়েছেন। তিনি যদি দ্বীনে হক কবুল করেন তাহলে সমগ্র কওম মুসলমান হয়ে যাবে।"

একথা বলেই তিনি সোজা সায়াদ (রা) বিন মায়াজের নিকট পৌঁছলেন। তিনি তাঁকে দেখেই বললেন, "আল্লাহর কসম! এখনতো তোমার সেই চেহারা নেই।" উসায়েদ (রা) এমন কিছুকথা বললেন যে, সায়াদও (রা) নিজের বর্শা উঠিয়ে বাগানের দিকে গেলেন। সেখানে তাঁর সঙ্গে একই ঘটনা ঘটলো যা হযরত উসায়েদের (রা) সঙ্গে ঘটেছিল। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে পবিত্র স্বভাব দান করেছিলেন। তিনিও মুসলমান হয়ে গেলেন এবং নিজের প্রভাব খাটিয়ে সিরিয়া পর্যন্ত সমগ্র কবিলাকে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে নিয়ে এলেন। আল্লামা ইবনে হিশাম বর্ণনা করেছেন যে, হযরত উসায়েদ (রা) বিন হুজায়ের এবং সায়াদ (রা) বিন মায়াজের ইসলাম গ্রহণের প্রভাবে আনসারের সকল খান্দানে তীব্র গতিতে ইসলাম সম্প্রসারিত হতে লাগলো এবং কিছুদিনের মধ্যেই ইয়াসরাবের অলি গলি তাকবির ধ্বনিতে গুঞ্জরিত হতে লাগলো।

নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বছরে হজ্জের মওসুমে ইয়াসরাব থেকে ৭৫ জন হকপন্থী (৭৩ জন পুরুষ এবং দু'জন মহিলা) মক্কা মুয়াজ্জামা আগমন করলেন এবং একটি নির্ধারিত রাতে উকবার গিরিপথে একত্রিত হলেন। প্রিয় নবীও(সা) সেখানে তাশরীফ আনলেন। তাঁরা সকলেই হুজুরের (সা) হাতে বাইয়াত করলেন। অতপর তাঁরা হুজুরকে (সা) ইয়াসরাব তাশরীফ নেয়ার দাওয়াত দিলেন। এ সময় তাঁরা এই প্রতিশ্রুতিও দিলেন যে, রাসূলের (সা) জীবন রক্ষার্থে তাঁদের প্রতিটি সন্তান জীবন দানে কসুর করবে না।

ইতিহাসে এই বাইয়াতকে বাইয়াতে লাইলাতুল উকবা, বাইয়াতে উকবায়ে ছানিয়া, বাইয়াতে উকবায়ে কবিরাহ এই বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়। ইসলামের ইতিহাসে এই বাইয়াত একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তাতে আনসাররা এমন নিষ্ঠাপূর্ণ আবেগের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন যে, ইতিহাসে তার কোন উদাহরণ পাওয়া যায় না। আরবভূমির প্রতিটি অনু-পরমাণু হকপন্থীদের খুন পিপাসু ছিল এবং আরবের কোন কবিলার ইসলাম অনুসারীদের প্রতি সমর্থনের কথা ঘোষণা করার সাহস ছিল না। এমন এক ঘনঘোর দুর্যোগপূর্ণ

সময়ে ইয়াসরাবের ভূমি থেকে এসব মানুষ মাথা তুলে দাঁড়ান এবং শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজেদের জীবন, মাল ও সন্তান মক্কার ইয়াতিম নবীর (সা) পায়ের নিকট সমর্পণ করেন। সেসব হক- পন্থীর মধ্যে উসায়েদ (রা) বিন হুজায়েরও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। বাইয়াতের পর মহানবী (সা) ইয়াসরাববাসীকে বললেন, দ্বীনি ব্যাপার সংরক্ষণের জন্য তোমরা নিজেদের ১২ জন নকীব নির্বাচন কর। সুতরাং তাঁরা ঐকমত্যের ভিত্তিতে বারোজন নকীব নির্বাচিত করলেন। তাদের মধ্যে ৯ জন ছিলেন খাজরাজের এবং তিনজন ছিলেন আওসের আশা-আকাংখার ভরসাস্থল। আওসের তিন নকীবের অন্যতম ছিলেন হযরত উসায়েদ (রা) বিন হুজায়ের। তিনি নিজের প্রভাব প্রতিপত্তি ও আল্লাহ এবং রাসূলের (সা) প্রতি গভীর ভালবাসার কারণে ইসলামের অত্যন্ত শক্তিশালী বাহু হিসেবে বিবেচিত হয়েছিলেন।

হিজরতের কয়েক মাস পর রাসূলে আকরাম (সা) মুহাজির ও আনসারের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। এ সময় তিনি হযরত উসায়েদ (রা) বিন হুজায়েরকে নিজের প্রিয় সাহাবী এবং মুখে ডাকা পুত্র হযরত যায়েদ (রা) বিন হারিছার ইসলামী ভাই বানিয়েছিলেন। দ্বিতীয় হিজরীতে কুফর ও ইসলামের প্রথম যুদ্ধ বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মাওলানা সাঈদ আনসারী মরহুম "সিয়ারে আনসার" গ্রন্থে লিখেছেন যে, "হযরত উসায়েদের (রা) বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণের ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে।" কিন্তু বাস্তবত ইতিহাস ও চরিতগ্রন্থের কোন একটি গ্রহণযোগ্য পুস্তকে হযরত উসায়েদের (রা) নাম "আসহাবে বদরের" তালিকায় পরিদৃষ্ট হয় না। এ ধরনের অভিজ্ঞ সিপাহী এবং ইসলাম প্রেমিকের বদরের যুদ্ধে অনুপস্থিত থাকাটা অবশ্যই আশ্চর্যের ব্যাপার বটে। নিশ্চয়ই তার যুক্তিযুক্ত কোন কারণ থাকবে। এমনও হতে পারে যে, তিনি অসুস্থ ছিলেন অথবা মদীনাতে উপস্থিত ছিলেন না। তা সত্ত্বেও তাতে তাঁর মর্যাদা কমেনি। কেননা তিনি উকবার বাইয়াতে অংশ নিয়েছিলেন এবং জমহুর উলামার নিকট আসহাবে উকবার মর্যাদা আসহাবে বদর থেকে আফজাল। বদরের পর যত যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল তার সকলটিতেই হযরত উসায়েদ (রা) জীবন বাজী রেখে অংশগ্রহণ করেন। ওহোদের যুদ্ধে তিনি সেই বিশেষ প্রসিদ্ধ বীরদের অন্যতম ছিলেন যাঁরা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধের ময়দানে ছাবিত কদম বা অটল ছিলেন এবং নিজেদের মাথা ও বুককে রাসূলের (সা) ঢাল বানিয়ে রেখেছিলেন। এক রেওয়ায়াতে আছে যে, ওহোদের যুদ্ধে আওসের ঝাণ্ডা হযরত উসায়েদের (রা) নিকট ছিল। এই যুদ্ধে তিনি সাতটি আঘাত পান। খন্দকের যুদ্ধে হযরত উসায়েদ (রা) অত্যন্ত বীরত্ব প্রদর্শন করেন। তিনি দুইশ' মুজাহিদকে সঙ্গে নিয়ে কয়েকদিন পর্যন্ত অব্যাহতভাবে

খন্দক হিফাজত করেন। এই যুদ্ধকালে একবার মহানবী (সা) বনু গাতফানের লুটেরাদেরকে কাফেরদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য তাদের একজন প্রভাবশালী সরদার আমের বিন তোফায়েলকে ডেকে পাঠালেন। সে একজন সঙ্গীসহ হুজুরের (সা) নিকট এলো। এসময় তিনি তাকে বুঝালেন যে, তোমরা আমাদের প্রতিবেশী এবং তোমরা সবসময়ই আমাদের সঙ্গে রয়েছ। এ জন্য তোমাদেরকে কাফেরদের প্রতি সমর্থন ও মদীনার ওপর চুপিসারে হামলা থেকে বিরত থাকা উচিত।

সে জবাব দিল যে, মদীনায় উৎপাদিত পণ্যের এক তৃতীয়াংশ তাদেরকে দেয়া হলে তারা ফিরে যাবে। পরামর্শের জন্য হুজুর (সা) আনসার সরদারদেরকে ডাকলেন। তাঁদের মধ্যে হযরত উসায়েদও ছিলেন। তাঁরা সকলেই আমেরের দাবী প্রত্যাখ্যান করলেন। হযরত উসায়েদ (রা) এত আবেগ প্রবণ হয়ে পড়লেন যে, তিনি নিজের বর্শার তীক্ষ্ণ প্রান্ত দিয়ে আমেরের মাথায় খোঁচা দিয়ে বললেন, "খেঁকশিয়াল! এখান থেকে পালা" "আমের ক্রোধান্বিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো, "তুমি কে?" বললেন, "আমি উসায়েদ বিন হুজায়ের।" সে জিজ্ঞাসা করলো, হুজায়েরুল কিতায়েবের পুত্র? বললেন, "হ্যাঁ।" আমের বললো, "তোমার পিতা তোমার থেকে ভাল ছিল।" উসায়েদ (রা) কর্কশ কণ্ঠে জবাব দিলেন, "অবশ্যই নয়। আমার পিতাও কাফের ছিল এবং তুমিও কাফের। এ জন্য আমি তোমাদের দু'জনের চেয়ে ভাল।"

হযরত উসায়েদ (রা) অধিকাংশ সময় রাসূলের (সা) দরবারে হাজির থাকতেন এবং প্রিয় নবীর (সা) হেফাজতের বিশেষ খেয়াল রাখতেন। আল্লামা মুহাম্মাদ বিন সায়াদ (কাতিবুল ওয়াকেদী) তাবকাতে কাবিরে লিখেছেন যে, নবীর (সা) হিজরতের পর (সম্ভবত পঞ্চম হিজরীতে) একবার আবু সুফিয়ান রাসূলে আকরামকে (সা) মদীনা মুনাওয়ারাতে শহীদ করে ফেলার পরিকল্পনা করলো এবং এ কাজের জন্য আমর বিন উমাইয়াতাজ জুমরীকে নির্বাচিত করলো। (সে সময় তিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি)। কাপড়ের নীচে খঞ্জর লুকিয়ে একটি দ্রুত গতিসম্পন্ন উটে চড়ে আমর মদীনা রওয়ানা হয়ে গেলো। ৬ষ্ঠ দিনে মদীনার নিকট জোহরুল হিরাহ নামক স্থানে পৌঁছলেন। সেখানেই উট ছেড়ে দিলেন এবং স্বয়ং রাসূলের (সা) ঠিকানা জিজ্ঞাসা করতে করতে বনু আবদুল আশহালের মসজিদে এলো। হুজুর (সা) তখন সেই মসজিদে সাহাবীদের একটি দলের মধ্যে আরাম করছিলেন। আমরের ওপর তাঁর দৃষ্টি পড়লো। এ সময় তিনি বললেন, এই ব্যক্তির নিয়ততো ভাল মনে হচ্ছে না। সাহাবীদের মধ্যে হযরত উসায়েদ (রা) বিন হুজায়েরও সেখানে উপস্থিত

ছিলেন। তিনি হুজুরের (সা) ইরশাদ শুনে চিতার মত লাফ দিলেন এবং আমরকে নিজের থাবার মধ্যে নিলেন। তাঁর দেহ তালাশ করা হলো। তখন কাপড়ের নীচে থেকে খঞ্জর বের হয়ে পড়লো। আমর খুব শক্তিশালী এবং দ্রুতগতিসম্পন্ন মানুষ ছিল। সে পলায়নের চেষ্টা করলো। কিন্তু উসায়েদের (রা) বজ্রমুষ্ঠি থেকে বের হওয়া তার পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভব হলো না। অসহায় অবস্থায় নিজের অপরাধের কথা স্বীকার করলো এবং সকল ঘটনার আদ্যোপান্ত বর্ণনা দিল।

রহমতে আলম (সা) মুচকি হেসে হযরত উসায়েদকে (রা) বললেন, "ঠিক আছে, তাকে ছেড়ে দাও। আমি তাকে ক্ষমা করছি।"

আমর (রা) হুজুরের (সা) দয়ার শান দেখে তৎক্ষণাৎ মুসলমান হয়ে গেলেন। কিন্তু হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র) এবং ইবনে আছির (র) লিখেছেন, এ ধরনের সকল রেওয়ায়াত যাতে বলা হয়েছে যে, হযরত আবু সুফিয়ান (রা) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে অমুক সময় হুজুরকে (সা) হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিলেন তা জয়িফ বা দুর্বল বর্ণনা। হতে পারে অন্য কোন মক্কাবাসী এই ধরনের ষড়যন্ত্র করেছিল।

৬ষ্ঠ হিজরীর শা'বান মাসে মুররে ইয়াসির (অথবা বনি মুসতালিক) যুদ্ধের সময় ইফকের আফসোসনাক ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। [এই যুদ্ধের ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন যে, তা খন্দকের যুদ্ধের পর সংঘটিত হয়েছিল। আবার কেউ বলেছেন তা পরে হয়েছিল। সম্ভবত এই অনুমানই ঠিক যে, তা খন্দকের যুদ্ধের পর হয়েছিল। মুররে ইয়াসির যুদ্ধের সফরে হযরত আয়েশা সিদ্দীকাও (রা) হুজুরের (সা) সঙ্গে ছিলেন। যুদ্ধের পর ফিরতি সফরকালে সৈন্যবাহিনী একস্থানে রাত কাটালো। হযরত আয়েশা (রা) প্রকৃতির ডাকে সাড়া দানের জন্য তাঁবু থেকে দূরে চলে গেলেন। অসাবধানতাবশত সেখানে তাঁর গলার হার খুলে পড়ে গেল। সেখান থেকে ফিরে আসার পর ব্যাপারটি বুঝতে পেলেন এবং উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। অতপর তিনি সেখানে আবার গেলেন। ধারণা করেছিলেন যে, সেনাবাহিনী রওয়ানা হওয়ার পূর্বেই হার তালাশ করে ফিরে আসতে পারবেন। কিন্তু হার তালাশ করে যখন ফিরলেন তখন সেনাবাহিনী ইতিমধ্যে রওয়ানা হয়ে গেছে। তাতে তিনি খুব ঘাবড়ে গেলেন। বয়সটা ছিল অনভিজ্ঞের বয়স। চাদর গায়ে দিয়ে সেখানেই শুয়ে পড়লেন। হযরত সাফওয়ান (রা) বিন মুয়াত্তাল সালমী নামক এক সাহাবী কোন ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনে অথবা দেরীতে ঘুম থেকে জাগার অভ্যাসের কারণে সেনাবাহিনী থেকে পেছনে রয়ে গিয়েছিলেন। তিনি উম্মুল

মু'মিনীনকে (রা) চিনে ফেললেন। কেননা শৈশবকালে (অথবা পর্দার নির্দেশের পূর্বে) তিনি তাঁকে দেখেছিলেন। তাঁকে পিছনে পড়ে থাকার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। যখন ঘটনা জানতে পেলেন তখন খুব হামদরদী প্রকাশ করলেন। সেই সময়ই উম্মুল মু'মিনীনকে (রা) উটের ওপর বসিয়ে দ্রুতগতিতে সেনাবাহিনীর পেছনে রওয়ানা হলেন এবং দ্বিপ্রহরের মধ্যে সেনাবাহিনীর সঙ্গে গিয়ে মিলিত হলেন। মুনাফিক সরদার আবদুল্লাহ বিন উবাই যখন এই ঘটনা জানতে পেলো তখন সে বলে বেড়াতে লাগলো যে, আয়েশা (রা) আর পবিত্র নেই (নাউজুবিল্লাহ)। এটা সরাসরি অপবাদ ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আবদুল্লাহ'র মিথ্যা প্রচার ও অপবাদে কিছু সরল অন্তরের মুসলমানও ভুল ধারণার শিকার হলো। প্রিয় নবী (সা) যখন একথা শুনলেন তখন খুব দুঃখিত হলেন এবং একদিন সাহাবায়ে কিরামের (রা) সামনে নিজের ক্রোধ এই ভাষায় প্রকাশ করলেন ঃ

"এক ব্যক্তি আমার পরিবার সম্পর্কে আমাকে খুব কষ্ট দিয়েছে। তোমাদের মধ্যে কেউ কি তার তদারক করতে পারো না।"

হযরত উসায়েদ (রা) আবেগ উদ্বেলিত হয়ে দাঁড়িয়ে আরজ করলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল! সে যদি আওস গোত্রের মানুষ হয় তাহলে আপনি তার নাম বলুন। আল্লাহর কসম! আমি তার গর্দান উড়িয়ে দিব এবং তার সম্পর্ক যদি খাজরাজের সঙ্গে থাকে তাহলেও আপনি যে নির্দেশ দিবেন আমি তা পালন করবো।"

খাজরাজ সরদার হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদার নিকট কথাটি অসহনীয় ছিল, কেননা তাঁর ধারণায় এভাবে খাজরাজের ওপর আওসের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। তিনি হযরত উসায়েদকে (রা) সম্বোধন করে বললেন ঃ "তুমি ভুল বলছো। তুমি কোন খাজরাজীকে হত্যা করতে পারো না।"

হযরত উসায়েদ (রা) দ্বিধাহীন চিত্তে জবাব দিলেন ঃ

"তুমি একথা বলছো অথচ আল্লাহর রাসূল (সা) যদি নির্দেশ দেন তাহলে সে যেই হোক না কেন আমরা তাকে অবশ্যই হত্যা করবো।"

এভাবে কথা বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। রাসূলে আকরাম (সা) হস্তক্ষেপ করলেন এবং উভয় গোত্রের প্রজ্জ্বলিত আবেগকে ঠাণ্ডা করলেন। কিছুদিন পর বারায়াতের আয়াত নাযিল হলো। আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং হযরত আয়েশা সিদ্দীকার (রা) পবিত্রতার সত্যতা স্বীকার করলেন। সেই মুররে ইয়াসির (বনি মুসতালিক) যুদ্ধের সময় আরো একটি দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছিল। সূরায়ে

আল মুনাফিকুনে তার বর্ণনা সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা করা হয়েছে। যুদ্ধের পর মুসলমানরা তখনো বনি মুসতালিকের এলাকায় অবস্থান করছিলেন। এমন সময় এক মুহাজির ও এক আনসারের মধ্যে পানি নিয়ে ঝগড়া হয়ে গেল এবং ঘটনা হাতাহাতি পর্যন্ত গড়ালো। উভয়েই মুহাজির ও আনসারকে সাহায্যের জন্য ডাকলো। মুনাফিক সরদার আব্দুল্লাহ বিন উবাইও সে সময় সেখানে উপস্থিত ছিল। সে এই ঝগড়ায় খুব করে বাতাস দিল। এমনকি একথাও বললো যে, মদীনা পৌঁছে আমাদের মধ্যে যারা মর্যাদাবান তারা নীচদেরকে বহিষ্কার করবে।

রহমতে আলম (সা) এই ঘটনার কথা শুনলেন। তিনি উভয় পক্ষকে সাবধান করলেন এবং তাদের মধ্যে সন্ধি বা মীমাংসা করিয়ে দিলেন। অতপর তিনি নিয়ম বহির্ভূতভাবে ইসলামী বাহিনীকে অসময়ে রওয়ানা হওয়ার নির্দেশ দিলেন। সফরকালে হযরত উসায়েদ (রা) বিন হুজায়ের প্রিয় নবীর (সা) খিদমতে হাজির হয়ে আরজ করলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল! আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। আজ আপনি এমন সময় রওয়ানার নির্দেশ দিয়েছেন যা আপনার নিয়ম বিরোধী ছিল।"

হুজুর (সা) বললেন, "তুমি কি শোননি যে, তোমাদের সেই সাহেব কি বলেছেন?" তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! কোন সাহেব?"

বললেন ঃ "আবদুল্লাহ বিন উবাই।"

হযরত উসায়েদ (রা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ "সে কি বলেছে?"

হুজুর বললেন ঃ "সে বলেছে যে, মদীনা পৌঁছে ইজ্জতওয়ালারা নীচদেরকে মদীনা থেকে বের করে দেবে।"

হযরত উসায়েদের (রা) দ্বীনী মর্যাদাবোধ জাগ্রত হলো। অস্থির চিত্তে আরজ করলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর কসম, ইজ্জতওয়ালাতো আপনি। আর নীচ হলো সে। আপনি যখন চাইবেন তাকে বের করে দিতে পারবেন।"

আবদুল্লাহ বিন উবাইর পুত্র হযরত আবদুল্লাহ (রা) যখন পিতার কথা জানতে পেলেন তখন তিনিও ক্রোধের আবেগে অস্থির হয়ে পড়লেন। ইসলামের কাফেলা যখন মদীনা তাইয়েবায় প্রবেশ করছিল তখন তরবারী ধরে পিতার সামনে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন ঃ

"আপনি বলেছিলেন যে, মদীনা পৌঁছে ইজ্জতওয়ালা নীচকে বের করে দেবে। এখন আপনি জানতে পাবেন যে ইজ্জতওয়ালা কে। আল্লাহর কসম, যতক্ষণ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (সা) অনুমতি না দেবেন, আপনি মদীনায় পা রাখতে পারবেন না।"

লোকজন হুজুরের (সা) নিকট একথা পৌঁছালো। তিনি হযরত আবদুল্লাহকে (রা) বলে পাঠালেন যে, সে যেন তার পিতাকে বাড়ী যেতে দেয়।

৬ষ্ঠ হিজরীতে হুদায়বিয়ার সন্ধিকালে হযরত উসায়েদ (রা) বিন হুজায়ের বাইয়াতে রিদওয়ানের সৌভাগ্য লাভ করেন এবং এমনিভাবে সেই চৌদ্দশ' আসহাবে শাজারাহ'র শামিল হয়ে গেলেন যাঁদেরকে স্বয়ং আল্লাহ পাক নিজের সন্তুষ্টির কথা এই ভাষায় বর্ণনা করেছেন :

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

"আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেছেন, যখন তারা গাছের তলায় তোমার বাইয়াত করছিল।"

হুদায়বিয়ার সন্ধির সপ্তম হিজরীতে হযরত উসায়েদ (রা) খায়বারের যুদ্ধে নিজের তরবারীর পারদর্শীতা প্রদর্শন করলেন। মক্কা বিজয়ের সময় তিনি সেই দশ হাজার সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাঁরা রহমতে আলমের (সা) সহযাত্রী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। অধিকন্তু তিনি এই দিক দিয়েও সৌভাগ্যবান যে, তিনি বিশেষ দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সেই বিশেষ দলে ছিলেন স্বয়ং প্রিয় নবী (সা), হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) এবং অন্যান্য বুজর্গ সাহাবীবৃন্দ। বিশ্ব নবী (সা) মক্কায় প্রবেশ করলেন। এ সময় হযরত উসায়েদ (রা) তাঁর পাশে পাশে চলছিলেন। একটি রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত উসায়েদের (রা) এক পাশে ছিলেন মহানবী (সা) এবং অপর পাশে হযরত সিদ্দীকে আকবার (রা)।

মক্কা বিজয়ের পর হযরত উসায়েদ (রা) হুনাইনের যুদ্ধ এবং তারপর তায়েফের যুদ্ধে বীরবিক্রমে অংশ নেন। হুনাইনের যুদ্ধের প্রথম দিকে যখন বনু হাওয়াযেনের প্রচণ্ড তীর নিক্ষেপে মুসলমানদের ব্যূহে বিশৃংখলা সৃষ্টি হলো তখন হযরত উসায়েদ (রা) নিজের স্থানে অটল থাকলেন। সে সময় আওসের ঝাণ্ডা তাঁর হাতে ছিল। তাবুকের যুদ্ধের সময় অন্য সাহাবীদের মত হযরত উসায়েদও (রা) জিহাদের সামান সরবরাহে প্রতিযোগিতামূলকভাবে অংশ নিয়েছিলেন এবং তাবুকের কঠোরতম সফরে বিশ্ব নবীর (সা) সহযাত্রী হওয়ার

সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। বিদায় হজ্জের সময়ও তিনি রহমতে আলমের (সা) সঙ্গে ছিলেন।

প্রিয় নবীর (সা) ইন্তেকালের অব্যবহিত পরেই খিলাফতের সমস্যা দেখা দিল। আনসারের প্রায় সকল পরিবারের বেশীরভাগ সদস্যই খাজরাজ সরদার হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাকে খলিফা বানাতে আগ্রহী ছিলেন। এ জন্য তারা সাকিফায়ে বনু সায়েদাতে একত্রিত হলেন। এ সময় হযরত উসায়েদ (রা) বিন হুজায়ের পূর্ণাঙ্গ দূরদর্শীতা এবং ঈমানী বিচক্ষণতা প্রদর্শন করেছিলেন। আল্লামা ইবনে জারির তাবারী বর্ণনা করেছেন যে, হযরত উসায়েদ (রা) আওস গোত্রকে হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) বাইয়াতের জন্য উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছিলেন। বস্তুত আওস সরদার হযরত সায়াদ (রা) বিন মায়াজের ওফাতের পর সবচেয়ে বেশী প্রভাব প্রতিপত্তি হযরত উসায়েদেরই (রা) ছিল। এ জন্য সকলেই নিশ্চিন্তে ও নির্দ্বিধায় তাঁর কথা মেনে নিলেন এবং হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদার পরিবর্তে হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) হাতে বাইয়াত করলেন। তা দেখে হযরত সায়াদের (রা) নিজের গোত্র খাজরাজও হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) বাইয়াতে বিলম্ব করলো না। এমনিভাবে প্রায় সকল মুসলমান ঐক্যের দৃষ্টিকোণ থেকে একত্রিত হয়ে গেলেন।

হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) শাসনকালে হযরত উসায়েদ (রা) অত্যন্ত কঠিন অবস্থাতে মুহাজির ও আনসারের একটি ক্ষুদ্র দলের সাথে মিলে মদীনা মুনাওয়ারা হিফাজত করতে লাগলেন। মুরতাদ ও বেদুঈন লুটেরারা দু'একবার মদীনার ওপর হামলার অপচেষ্টা চালালো। কিন্তু সিদ্দীকে আকবার (রা) মদীনায় অবস্থানরত অল্প সংখ্যক সাহাবীকে (রা) সঙ্গে নিয়ে তাদের দাঁত- ভাঙ্গা জবাব দিলেন। এ সময় যাঁরা জীবন বাজী রেখে কাজ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে হযরত উসায়েদও (রা) ছিলেন।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) হযরত উসায়েদের (রা) বীরত্ব ও স্পষ্টবাদিতাকে আন্তরিকভাবে স্বীকার করতেন এবং তাঁকে অপরিসীম ভক্তি-শ্রদ্ধা করতেন। কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে যে, সিদ্দীকে আকবারের (রা) নিকট হযরত উসায়েদ (রা) আনসারদের মধ্যে সবচেয়ে আফজাল ছিলেন।

হযরত ওমর ফারুকও (রা) হযরত উসায়েদকে (রা) খুব তাজিম করতেন এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদিতে তাঁর পরামর্শ নিতেন। নিজের শাসনামলে তিনি যখন বাইতুল মুকাদ্দাস তাশরীফ নিলেন (১৬ হিজরী) তখন নিজের সাথে কতিপয় মুহাজির ও আনসারকেও নিয়ে যান। তাঁদের মধ্যে একজন হযরত

উসায়েদ (রা) বিন হুজায়ের ছিলেন। তিনি সিরিয়ার সকল সফরে হযরত ওমর ফারুকের (রা) সঙ্গে ছিলেন এবং তাঁর সঙ্গেই মদীনা ফিরে আসেন।

হযরত উসায়েদ (রা) বিন হুজায়ের বিশ হিজরীতে ওফাত পান। যেদিন তাঁর ওফাত হয় সেদিন মদীনা মুনাওয়ারাতে বিলাপ ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়েছিল। মুহাজির এবং আনসার সকলের চোখই অশ্রুসজল ছিল। আরব ও আজমের খলিফা আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওমর ফারুক (রা) স্বয়ং তাঁর বাড়ীতে গিয়েছিলেন এবং অসংখ্য সাহাবীর সাথে জানাযা নিয়ে বাকী'তে এসে উপস্থিত হয়ে ছিলেন। তিনি নিজেই জানাযার নামায পড়িয়েছিলেন। অতপর শোক বিহ্বলচিত্তে ইসলামের এই মহান ব্যক্তিত্বকে জান্নাতুল বাকী'র মাটির হাওয়ালা করে দিলেন। মৃত্যুকালে হযরত উসায়েদ (রা) চার হাজার দিরহাম ঋণী ছিলেন। হযরত ওমর ফারুককে (রা) তাঁর সম্পত্তি থেকে এই ঋণ পরিশোধের ওসিয়ত করলেন। হযরত ওমর (রা) সম্পত্তি না বেচে ঋণদাতাদেরকে চারটি বার্ষিক কিস্তিতে ঋণ পরিশোধে সম্মত করালেন। সুতরাং হযরত উসায়েদের (রা) বাগানের ফল বিক্রয় করে চার বছরের মধ্যে সকল ঋণ আদায় করা হয়। এমনিভাবে সম্পূর্ণ সম্পত্তিই রক্ষা পায়। হযরত ওমর ফারুক (রা) হযরত উসায়েদের (রা) সন্তানদের জন্য এই কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করেন। তিনি বলতেন যে, তিনি নিজের ভাইয়ের সন্তানদেরকে অভাবগ্রস্ত দেখতে চাননি। হযরত উসায়েদের (রা) সন্তানদের মধ্যে শুধুমাত্র এক পুত্র ইয়াহইয়ার নাম বুখারীর একটি রেওয়ায়াতে পাওয়া যায়। সম্ভবত আতিক নামের কোন পুত্রও ছিলেন। কেননা আবু ইয়াহইয়া ছাড়া তার কুনিয়ত আবু আতিকও ছিল। মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে আছে যে, হযরত উসায়েদের (রা) স্ত্রী রাসূলের (সা) যুগেই ইন্তেকাল করেন। তিনি বিদায় হজ্জ থেকে ফারেগ হয়ে রাসূলে আকরামের (সা) সঙ্গে ফিরে আসছিলেন। এমন সময় জুলহুলাইফা নামক স্থানে কতিপয় যুবক আনসার তাঁকে স্ত্রীর ওফাতের খবর দেন। উসায়েদ (রা) মুখের ওপর কাপড় দিয়ে কাঁদতে লাগলেন। হযরত আয়েশা (রা) বললেন, আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন। আপনি একজন উঁচু মর্যাদার সাহাবী হয়ে একজন মহিলার জন্য কাঁদছেন। তিনি তৎক্ষণাৎ অশ্রু মুছলেন এবং বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেন। আমাকে যদি কাঁদতেই হয় তাহলে সায়াদ (রা) বিন মুয়াজের জন্য কাঁদা উচিত। রাসূলে আকরাম (সা) এসব কথা শুনতে লাগলেন।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) হযরত উসায়েদের (রা) প্রভূত প্রশংসা করতেন। তাঁর থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত উসায়েদ (রা) বিন হুজায়ের অন্যতম জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন।

সাইয়েদেনা উসায়েদ (রা) বিন হুজায়ের সেইসব মহান সাহাবীর মধ্যে পরিগণিত ছিলেন যাঁরা চরম প্রতিকূল অবস্থায় ইসলামের ঝাণ্ডা উড্ডীন এবং আজীবন ইসলামের শক্তিশালী বাহুর ভূমিকা পালন করেন। হযরত উসায়েদের (রা) চারিত্রিক বৈশিষ্টের মধ্যে রাসূল প্রেম, দ্বীনের প্রতি সম্ভ্রমবোধ, শাওকে জিহাদ, বীরত্ব ও চেষ্টা, নাফসের পবিত্রতা, ইখলাস এবং ইবাদাত ও কুরআন-হাদিসের প্রতি প্রচণ্ড আকর্ষণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল। এত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে কুরআনে হাকিম তিলাওয়াত করতেন যে, লোকজন ঈর্ষা করতো। সহীহ বুখারীতে স্বয়ং তাঁর থেকেই বর্ণিত আছে যে, এক রাতে তিনি সূরায়ে বাকারাহ তিলাওয়াত করছিলেন। তাঁর ঘোড়া পাশেই বাঁধা ছিল। ঘোড়াটি হ্রেষা রব করতে লাগলো। তিনি চুপ করলে ঘোড়াও চুপ করে গেল। তিনি পুনরায় পড়া শুরু করলে ঘোড়া আবার ডাকতে লাগলো। তিনি আবার চুপ করলে ঘোড়াও থেমে গেল। বস্তুত তাঁর পুত্র ইয়াহইয়া ঘোড়ার নিকট ছিল। তার কোন ক্ষতি হয় কিনা এ জন্য তিনি ভীত ছিলেন। তিনি নামাযে সালাম ফিরিয়ে ইয়াহইয়াকে নিজের নিকট টেনে নিলেন। এ সময় ঘটনাক্রমে তাঁর দৃষ্টি আসমানের দিকে নিবদ্ধ হলো। তখন একটি মেঘ (ছায়াবান) নিজের মাথার ওপর পেলেন। এই মেঘ থেকে আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। সকালে একথা নবী করিমের (সা) খিদমতে পেশ করলেন। হুজুর (সা) বললেন, "হে ইবনে হুজায়ের! এমনিভাবে পড়বে এবং অবশ্যই পড়বে।" তিনি আরজ করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ভয় পেয়েছিলাম যে, ইয়াহইয়া আবার কষ্ট না পায়। কেননা সে ঘোড়ার নিকট ছিল। এ জন্য আমি সালাম ফিরিয়ে ইয়াহইয়াকে নিজের নিকট টেনে নিয়েছিলাম। আসমানের দিকে যখন তাকালাম তখন একটি মেঘ দেখলাম। এই মেঘে প্রদীপের মত আলো জ্বলছিল অতপর যখন দিন হলো তখন সেই মেঘ অদৃশ্য হয়ে গেল এবং আসমানের দিকে চলে গেল। হুজুর (সা) বললেন, "তুমি কি বুঝতে পারো যে তা কি ছিল?" আমি আরজ করলাম "না।" বললেন, "তা ছিল ফেরেশতা।" তোমার কুরআন তিলাওয়াত শোনার জন্য এসেছিলেন। তুমি যদি সকাল পর্যন্ত তিলাওয়াত অব্যাহত রাখতে তাহলে সে-ও সকাল পর্যন্ত শুনতো। এমনকি মানুষ তাকে দেখে ফেলতো এবং সে কারো থেকে লুকোতো না।

সহীহ বুখারীতে অপর এক রেওয়ায়াতে আছে যে, এক রাতে ছিল প্রচণ্ড অন্ধকার। হযরত উসায়েদ (রা) বিন হুজায়ের নবীর (সা) দরবার থেকে উঠে বাড়ী রওয়ানা হলেন। এ সময় তাঁর সঙ্গে আরও একজন সাহাবীও চললেন। হযরত উসায়েদের (রা) হাতে একটি লাঠি ছিল। লাঠির সাহায্যে তিনি চলতে লাগলেন। এ সময় তিনি দেখতে পেলেন যে, আগে আগে একটি আলো

চলছে। যার কারণে সমগ্র রাস্তা আলোকিত হয়ে গেছে। উভয়ে যখন একস্থানে পৌঁছে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন তখন আলোও উভয়ের সঙ্গে পৃথক হয়ে গেল।

মুসনাদে আবু দাউদের এক রেওয়ায়াতে আছে যে, রাসূলে আকরাম (সা) হযরত উসায়েদ (রা) বিন হুজায়েরকে বনু আবদুল আশহালের মসজিদের ইমাম নিয়োগ করেছিলেন। এ থেকে জানা যায় যে, হযরত উসায়েদ (রা) বনু আবদুল আশহালের মধ্যে সবচেয়ে বেশী কালামুল্লাহ পড়েছিলেন অথবা সবচেয়ে বেশী সুন্নাহ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিলেন। কেননা সহীহ মুসলিমে হযরত আবু মাসউদ (রা) বদরী থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে জামায়াতের ইমামত সেই করবে যে সবচেয়ে বেশী আল্লাহর কিতাব পড়েছে। যদি এ ব্যাপারে সকলেই বরাবর হয় তাহলে সুন্নাহ সম্পর্কে যে বেশী ওয়াকিফ হবে সেই ইমামতি করবে। যদি তাতেও সকলে বরাবর বা সমান হয় তাহলে যে আগে হিজরত করেছিল সে ইমামতি করবে। যদি তাতেও সকলে সমান সমান হয় তাহলে যার বয়স বেশী সেই ইমামতি করবে।

হযরত উসায়েদ (রা) মুহাজিরও ছিলেন না। আবার বয়সেও সকল আশহালীর চেয়ে বড় ছিলেন না। এ জন্য এটা স্পষ্ট যে, হয় তিনি বনু আবদুল আশহালের মধ্যে সবচেয়ে বড় কুরআনের আলেম ছিলেন অথবা সুন্নাহ সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী ওয়াকিফ ছিলেন এবং এটা কোন অসম্ভব ব্যাপার ছিল না যে, তিনি উভয় ফজিলতেই ভূষিত ছিলেন। হযরত উসায়েদ (রা) কোন নতুন শরয়ী মাসয়ালা অথবা হুকুমের জ্ঞান লাভ করলে খুব খুশী হতেন এবং আনন্দের কথা নির্দ্বিধায় প্রকাশ করতেন। সহীহ বুখারীতে আছে যে, হযরত আয়েশা (রা) এক সফরে সহোদরা হযরত আসমার (রা) হার চেয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। রাস্তায় তা কোথাও পড়ে গেল। রাসূলে করিম (সা) কতিপয় সাহাবীকে তা অনুসন্ধানের জন্য পাঠালেন। রাস্তায় তাদের নামাযের সময় হলো। কিন্তু দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ওজুর পানির কোন খোঁজ ছিল না। সকলেই ওজু ছাড়া নামায আদায় করে নিলেন। তাঁরা যখন হুজুরের (সা) নিকট ফিরে এলেন তখন খুব দুঃখের সঙ্গে ওজু ছাড়া নামায পড়ার কথা উল্লেখ করলেন। সে সময় তাইয়াম্মুমের আয়াত নাযিল হয়। হযরত উসায়েদ (রা) বিন হুজায়ের (আনন্দের আতিশয্যে) হযরত আয়েশাকে (রা) সম্বোধন করে বললেন, "উম্মুল মু'মিনীন! আল্লাহ তাআলা আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন। যখনই কোন কাজে আপনি আটকে গেছেন আল্লাহ স্বয়ং তা থেকে বের হওয়ার পথ বাতলে দিয়েছেন এবং মুসলমানদের জন্যও তাতে বরকত হয়েছে।"

হযরত উসায়েদ (রা) নবীর (সা) এত সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন যে, কোন কোন সময় তিনি হুজুরের (সা) নিকট অপর লোকদের জন্য সুপারিশ করতেন। বাইহাকী এবং ইবনে আসাকির হযরত আনাস (রা) বিন মালিক থেকে রেওয়ায়াত করেছেন যে, একদিন নবী (সা) লোকদের মধ্যে খাদ্য বন্টন করলেন। সে সময় হযরত উসায়েদ (রা) বিন হুজায়ের হুজুরের (সা) খিদমতে হাজির হয়ে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! বনি জাফরের অমুক আনসারী খুবই অভাবগ্রস্ত এবং সেই গৃহে মহিলা ছাড়া কোন পুরুষ নেই। হুজুর (সা) বললেন, "হে উসায়েদ! হায়, তুমি যদি আগে আসতে! এখন তো আমি সব বন্টন করে ফেলেছি। তুমি যদি শোনো যে কোথাও থেকে কোন মাল অথবা সামান আমার কাছে এসেছে তাহলে আমাকে স্মরণ করিয়ে দেবে।" তারপর তাঁর নিকট খায়বার থেকে যব ও খেজুর এলো। হুজুর (সা) লোকদের মধ্যে এই সামান বন্টন করলেন। এ সময় তিনি বনি জাফরের সেই সব মহিলাকে সবচেয়ে বেশী দিলেন। হযরত উসায়েদ (রা) আরজ করলেন, "হে আল্লাহর নবী! আল্লাহ তায়ালা আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন।" হুজুর (সা) বললেন, "হে আনসারের দল! আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকেও ভাল প্রতিদান দিন। তোমরা অত্যন্ত পবিত্র ও ধৈর্যশীল।"

হযরত উসায়েদ (রা) বিন হুজায়ের থেকে ১৮টি হাদিস বর্ণিত আছে। তাঁর হাদিস বর্ণনাকারীদের মধ্যে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা), হযরত আনাস (রা) বিন মালিক, হযরত কা'ব (রা) বিন মালিক এবং হযরত আবু সাঈদ খুদরীর (রা) মত মহান মর্যাদা সম্পন্ন বুজুর্গ মানুষও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

হযরত মুছান্না (রা) বিন হারিছা শাইবানী

নবুওয়াতের দশম বছর। হজ্জের মওসুম। রহমতে আলম (সা) হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) সমভিব্যহারে দীর্ঘদিনের প্রথা অনুযায়ী হকের তাবলীগের জন্য মিনা তাশরীফ নিলেন। আরবের দূর-দূরান্ত থেকে হজ্জের জন্য আগত যিয়ারতকারীদের তাবুতে শহরটি ছিল আবাদ। বিভিন্ন গোত্রকে তাওহীদের দাওয়াত দিয়ে তিনি এক মজলিসে উপস্থিত হলেন। এই মজলিস ছিল মহান ও মর্যাদাবান। তাতে কতিপয় সম্মানিত ও মার্যাদাশালী ব্যক্তি আলোচনারত ছিলেন। হযরত আবু বকর (রা) সামনে অগ্রসর হয়ে তাদেরকে সালাম করলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন ঃ

"হে বাইতুল্লাহ'র মেহমানরা! তোমরা কোন্ কবিলার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত?"

উত্তর এলো ঃ "আমরা শাইবান ছা'লাবার সন্তান এবং পারস্যবাসীর প্রতিবেশী।"

উত্তরদানকারী ছিলেন একহারা গড়নের এক প্রভাবশালী মানুষ। তার মাথায় ছিল কালো চুলের গুচ্ছ। তা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে বুকের ওপর এসে পড়েছিল। হযরত আবু বকরের (রা) তৎক্ষণাৎ কিছুকথা স্মরণ হলো। তিনি সেই ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ

"আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে তাহলে তুমি মাফরুক বিন আমর।"

সে বললো, "তুমি ঠিকই চিনেছ ভাই। আমি মাফরুকই। আর আমার সঙ্গে রয়েছেন হানি বিন কাবিসা, মুছান্না বিন হারিছা এবং নুমান বিন শরীক।"

হযরত আবু বকর (রা) আরবের সকল গোত্র এবং তাদের নসব সম্পর্কে খুব ভালভাবে পরিজ্ঞাত ছিলেন। তিনি তাদেরকে চিনে ফেললেন এবং হুজুরের (সা) খিদমতে আরজ করলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল! আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। এরা স্বগোত্রের সার বস্তু। তাদের কবিলাতে তাদের চেয়ে বেশী মর্যাদাবান ও সম্মানিত মানুষ আর কেউ নেই। আপনি অনুমতি দিলে আমি তাদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করতে পারি।"

হুজুর (সা) বললেন ঃ "অবশ্যই।"

অতপর হযরত আবু বকর (রা) পুনরায় মাফরুকের প্রতি মনোযোগী হলেন। সে ছিল তার কবিলার প্রধান বাগ্মী পুরুষ। জবাব দানের জন্য গুছিয়ে গাছিয়ে বসলেন।

হযরত আবু বকর (রা) ঃ "তোমাদের কবিলায় লোক সংখ্যা কত হবে?"

মাফরুক ঃ "আমাদের সংখ্যা হাজারের অধিক। আর এটা ঠিক যে, এটা সংখ্যার দিক দিয়ে কম নয়।"

হযরত আবু বকর (রা) ঃ "তাদের হিফাজতের কি ব্যবস্থা আছে?"

মাফরুক ঃ "আমরা নিজেদের হিফাজতের বা প্রতিরক্ষার জন্য অব্যাহতভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকি। কিন্তু সকল জাতির ভাগ্যই তাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকে।"

হযরত আবু বকর (রা) ঃ "তোমাদের এবং তোমাদের শত্রুদের মধ্যকার যুদ্ধের অবস্থা কি ধরনের হয়?"

মাফরুক ঃ "আমরা যখন যুদ্ধে লিপ্ত হই। তখন আমাদের ক্রোধের কথা না হয় নাই জিজ্ঞেস করলে। ক্রোধান্বিত অবস্থায় আমরা কিভাবে দুশমনের মুকাবিলা করি, তাও আমরাই জানি। আমরা ঘোড়াকে সন্তানের চেয়ে বেশী মূল্যবান মনে করি। অস্ত্রকে দুধদানকারী উটের চেয়ে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকি এবং জয়-পরাজয় তো আল্লাহর হাতে। কখনো আমরা বিজয়ী হই। আবার কখনো পরাজিতও হয়ে থাকি।"

তারপর মাফরুক হযরত আবু বকরকে (রা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ "তোমাকে কুরাইশের লোক বলে মনে হয়। আমার অনুমান কি ঠিক?

হযরত আবু বকর (রা) বললেন ঃ "হ্যাঁ, ভাই তোমার অনুমান ঠিক। তুমি রাসূলুল্লাহ'র (সা) ব্যাপারে শুনে থাকবে। [হুজুরের (সা) দিকে ইঙ্গিত করে] ইনিই তিনি।"

মাফরুক বললেন ঃ "হ্যাঁ, আমরা তাঁর ব্যাপারে শুনেছি।" অতপর তিনি হুজুরকে (সা) সম্বোধন করে বললেন ঃ "হে কুরাইশী ভাই, তুমি কোন্ বস্তুর দাওয়াত দাও?"

হুজুর (সা) অগ্রসর হয়ে বসে গেলেন এবং হযরত আবু বকর (রা) তাঁর ওপর নিজের কাপড়ের ছায়া দিয়ে নিকটে দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি বললেন ঃ "আমি তোমাদেরকে একথার দিকে আহবান জানাই যে, তোমরা সাক্ষ্য দেবে,

আল্লাহ ছাড়া আর কেউই ইবাদাতের যোগ্য নয় এবং আমি আল্লাহর রাসূল। আমি চাই যে, তোমরা আমার সাহায্যকারী হবে এবং আমাকে হিফাজত করবে। যাতে আমি বিনা বাধায় আল্লাহর হুকুম-আহকাম লোকদের নিকট পৌঁছাতে পারি।

কুরাইশরা আল্লাহর হুকুম-আহকামের প্রকাশ্য বিরোধিতা করেছে। তার রাসূলকে (সা) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। বাতিলের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে হককে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং আল্লাহ অবশ্যই সকল বস্তু থেকে মুখাপেক্ষীহীন ও প্রশংসার যোগ্য।"

মাফরুক জিজ্ঞেস করলেন ঃ "আর কোন্ কোন্ বস্তুর দিকে দাওয়াত দিয়ে থাকো?"

জবাবে হুজুর (সা) কুরআনে হাকিমের কতিপয় আয়াত তিলাওয়াত করলেন। এসব আয়াতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহর সঙ্গে কাউকে অংশীদার বানিও না। মাতা-পিতার সঙ্গে ইহসান কর। দারিদ্রতার ভয়ে নিজের সন্তান-সন্ততিকে হত্যা করো না। বেহায়াপনা বা নির্লজ্জতার কাছেও ঘেঁষো না। তা প্রকাশ্যই হোক বা অপ্রকাশ্যই হোক। যাদের রক্ত আল্লাহ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন তাদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করো না। ইয়াতিমের সম্পদে হাত লাগিও না। মাপ-জোপের কাজ ইনসাফের সাথে করবে এবং যখন তোমরা কথা বলবে তখন ইনসাফ করবে। যদি তা কোন আত্মীয়ের ব্যাপারও হয় এবং আল্লাহর সঙ্গে যে প্রতিশ্রুতিই দাও না কেন তা পূর্ণ কর।

মাফরুক এসব আয়াত শুনেই বলে উঠলেন ঃ "হে কুরাইশী ভাই! তুমি যা কিছু শুনিয়েছ তা কখনই এই যমীনের কথা হতে পারে না। যদি এই কালাম যমীনের কোন বাসিন্দার হতো তাহলে আমরা নিশ্চিতভাবে চিনতে পারতাম। আল্লাহর কসম! তোমার দাওয়াত সম্পূর্ণভাবে কল্যাণে ভরপুর। সেই জাতি মিথ্যা বলেছে এবং বাড়াবাড়ি করেছে যারা তোমাকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করেছে। আমি কি ঠিক বলিনি?"

হানি বিন কাবিসাও কুরআনে হাকিমের বর্ণনা ভঙ্গীতে বিমুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। সে মাফরুকের কথার সত্যতা স্বীকার করলো এবং হুজুরকে (সা) সম্বোধন করে বললেন ঃ "হে কুরাইশী ভাই! তুমি যে কালাম বা বাণী শুনিয়েছ তা নিসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু তোমার সাথে এটা আমাদের প্রথম সাক্ষাত। আমাদের কবিলা এখানে উপস্থিত নেই। এ জন্য তাদের পরামর্শ ব্যতীত আমরা কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারি না। যা হোক, আমরা তোমাদের

দাওয়াতের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করবো। ইনি হলেন আমাদের সরদার ও সিপাহ্‌সালার মুছান্না বিন হারিছা। তাঁর সঙ্গেও আলোচনা করুন। তাহলে ভাল হবে।"

মুছান্না ছিলেন এক কমনীয় যুবক। তাঁর সুন্দর চেহারা সুরত দেখে একবাক্যে বলা যায় যে, বাস্তবিকই তিনি কোন সরদার পুত্র সরদার। তাঁর চোখে ছিল ঈগলের চমক এবং চেহারায় চিন্তা-ভাবনার ছাপ পরিলক্ষিত হতো। কুরআনে হাকিমের যাদুময় ভাষার অলংকারে তিনি হতভম্ব হয়ে পড়লেন। হানি যখন তাঁর নাম নিলো তখন চমকে উঠলো এবং হুজুরকে (সা) সম্বোধন করে বললো ঃ

"হে কুরাইশী ভাই! আমি যে বিস্ময়পূর্ণ বাণী আপনার মুখ থেকে শুনেছি, আল্লাহর কসম! এমন পসন্দনীয় বাণী এর পূর্বে কখনো আমার কানে আসেনি। হানি যা কিছু বলেছে তাও ঠিক। কিন্তু বড় কথা হলো যে, আমরা পারস্যের প্রতিবেশী এবং সেখানে আমাদের অবস্থান কিসরার সন্তুষ্টির ওপর নির্ভরশীল। আমরা তার নিকট প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে, আমরা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবো না এবং তার কোন বিরোধীকেও আমাদের মধ্যে আশ্রয় দিব না। হতে পারে যে, যে কথার দিকে আপনি দাওয়াত দিচ্ছেন তা কিসরার পসন্দনীয় নয় এবং সে আমাদেরকে পিষে মারবে। পারস্যের শাসক খুবই নিষ্ঠুর মানুষ। ক্ষমা ও নরমী বলতে কোন কিছুই সে জানে না। আমরা আরবের নিকট ও পাশের শাসকদের মুকাবিলায় আপনাকে সাহায্য করতে পারি। কিন্তু কিসরার মুকাবিলা করা আমাদের সাধ্যাতীত ব্যাপার। এ জন্য আমরা আপনার দাওয়াত সম্পূর্ণরূপে কবুল করতে অক্ষম।

হুজুর (সা) মুছান্নার জবাব শুনে বললেন ঃ "শাইবানী ভাই! তোমাদের জবাবে খারাপ কিছু নেই। তোমরা যা বলেছ তা ঠিকই বলেছ। তবে, আংশিক সহযোগিতা ইসলামী চেতনা বিরোধী। তোমরা যদি হককে স্বীকার করো তাহলে সম্পূর্ণ দ্বীনকে কবুল করতে হবে। কিসরা ও ইসলামের আনুগত্য এক সঙ্গে সম্ভব নয়। আল্লাহর দ্বীনকে নিয়ে সে-ই দাঁড়াতে পারে যে তার চারদিক থেকে হিফাজতের জন্য কোমর বেঁধে দাঁড়ায়।" একথা বলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং হযরত আবু বকরের (রা) হাত ধরে সামনে এগিয়ে গেলেন।

এ হলো সেই ঘটনা যাতে বনু শাইবানের শাহ্‌সওয়ার মুছান্না বিন হারিছার নাম প্রথমবার ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থান পেল এবং রাত-দিনের বিবর্তনে এই ঘটনা দৃষ্টির বাইরে চলে গেল। আর এমনিভাবে কেটে গেল ১১টি বছর।

নবুওয়াত প্রাপ্তির দশম বছর থেকে নবম হিজরী পর্যন্ত কিয়ামতের মত অবস্থা বিদ্যমান ছিল। এযুগে বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সা) মক্কার ভূমিকে বিদায় জানিয়ে মদীনা তাশরীফ নেন। বদর, ওহোদ, খন্দক এবং খায়বারের যুদ্ধ অতীত হয়েছে। হুদায়বিয়ার সন্ধিনামা থেকে স্পষ্ট বিজয়ের পথ সূচীত হয়েছিল। অনেক দেশের রাজা-বাদশাহদেরকে ইসলামের দাওয়াত প্রেরণ করা হয়েছিল। অবশেষে মক্কার ভূমি, যা এক সময় তাওহীদের মহান দায়ীর (সা) প্রতি সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল, তাই আবার অষ্টম হিজরীতে তার মান, মর্যাদা, বিজয় ও সৌভাগ্যের দৃশ্য অবলোকন করেছিল। আরবের কেন্দ্র মক্কা মুয়াজ্জামার ওপর ইসলামের ঝাণ্ডা উড্ডয়নে সমগ্র আরব অবনত হয়ে পড়েছিল। ইসলামের দুশমনদের ওপর হকের আতংক ছেয়ে গেল। তাদের উঁচু মাথা অবনত হয়ে গেল এবং তারা হকের সত্যতা ও মহানত্বের সাক্ষ্য দানের জন্য আরবের প্রতিটি কোণ থেকে উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে রহমতে আলমের (সা) খিদমতে হাজির হতে লাগলো। নবম হিজরীতে এত বেশী প্রতিনিধিদল এসেছিল যে, সে বছরের নামই হয়ে গিয়েছিল "আমুল ওফুদ" বা প্রতিনিধিদলের বছর। কাইসার ও কিসরার ভীতির যাদুও ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল। আরবের উত্তর সীমান্তে আবাদ আরব গোত্রসমূহও তখন সেই যাদুর বন্দীত্ব থেকে স্বাধীন হয়। সেই বনু শাইবান, যারা এক সময় রহমতে আলমের (সা) দাওয়াতকে হক মনে করেও কিসরার ভয়ে তা কবুল করেনি, তাদের অন্তর এখন ইসলামের সত্যতা ও মহানত্বে পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। যখন তারা দেখলো যে, অন্যান্য গোত্রের যুবক ও বৃদ্ধ, নারী ও পুরুষ দলে দলে রাসূলে আরাবীর (সা) দরবারে উপস্থিত হচ্ছে তখন তারাও সামনে অগ্রসর হলো এবং নিজেদের একটি প্রতিনিধিদলকে আনুগত্য প্রকাশের জন্য মদীনা মুনাওয়ারা রওয়ানা করলেন। এই দলের নেতৃত্ব করছিলেন মুছান্না বিন হারিছা। সেই মুছান্না; ১১ বছর পূর্বে যাঁর নিকট একদিন বিশ্ব নবী (সা) স্বয়ং গিয়েছিলেন। কিন্তু তাকদিরের কি ফের, তখন তিনি ইসলাম গ্রহণে সাবিকুনাল আউয়ালুন হওয়ার সৌভাগ্য থেকে মাহরুম হন। আজ তিনি সেই রহমতে আলমের (সা) বন্দীত্বের জিঞ্জির পরিধানে দূর-দূরান্তের পথ অতিক্রম করে মদীনা মুনাওয়ারা পৌঁছেন এবং রাসূলের (সা) খিদমতে হাজির হয়ে ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। এটা ছিল তাঁর জীবনের এক স্মরণীয় দিন। সেদিন তিনি ইসলামের নাঙ্গা তরবারী হয়ে গেলেন। এই তরবারী জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত হকের সহযোগিতায় আর খাপে ঢোকেনি।

হযরত মুছান্না (রা) বিন হারিছা বনু শাইবান গোত্রের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। এই গোত্র আদনানী বংশের মশহুর কবিলা বনু বকর বিন ওয়ায়েলের একটি শাখা ছিল। তাঁর নসবনামা হলো ঃ

মুছান্না (রা) বিন হারিছা বিন সালমা বিন সায়াদ বিন মুররাহ বিন জাহল বিন শাইবান বিন ছা'লাবা বিন উকাবাহ বিন ছায়াব বিন আলী বিন বকর বিন ওয়ায়েল। বনু বকর বিন ওয়ায়েল যেহেতু রবিয়াহ বিন নাযারের (বিন মায়াদ বিন আদনান) বংশোদ্ভূত ছিলেন এ জন্য তাঁর এবং তাঁর সকল শাখাকে আলে রবিয়াহ অথবা রাবয়ীও বলা হতো।

ইসলামের আবির্ভাবের সময় আরবের উত্তর সীমান্ত সে যুগের দুই আভিমুশশান সাম্রাজ্যের সীমান্তের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। ইরাক থেকে পশ্চিম দিকের এলাকা রোমের বাযনাতনী শাসনের অধীন ছিল এবং তার পূর্ব দিকের এলাকা ইরানের সাসানী শাসনাধীন ছিল। ইরাকের সংযুক্ত এলাকায় বসবাসরত আরব গোত্রসমূহ ইরানী শাসকদের ট্যাক্স দিত অথবা তাদের প্রভাবাধীন ছিল এবং সিরিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত এলাকায় বসবাসরত গোত্রসমূহ রোমক শাসকদের আনুগত্য ও সমর্থন জানাতো। বনু শাইবান প্রথমে উল্লেখিত গোত্রসমূহের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং সুদীর্ঘদিন যাবত ইরানী শাসনের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হয়েছিল। তারা খুব বাহাদুর ও যোদ্ধা ছিল। আরবী মান-মর্যাদার অহমিকাবোধও তাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু আরবে এমন কোন শক্তিশালী ও সুসংগঠিত সরকার ছিল না যে, ইরানের শাহের ভীতিপ্রদ শক্তির মুকাবিলা করতে পারে। এ জন্য তারা ইরানী শাসনের আনুগত্য করতে বাধ্য ছিল। ইরানের এই শান-শওকত নবুওয়াতের দশম বছরে বনু শাইবানের সরদারদেরকে রাসূলে আরাবীর (সা) হক দাওয়াত কবুলে বাধা দিয়েছিল। ইরানের অনুগত হওয়া সত্ত্বেও বনু শাইবান আরবের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেনি। আরব বংশোদ্ভূত হওয়ার ব্যাপারে তাদের গভীর অনুভূতি ছিল। এ জন্য তারা অন্য আরব গোত্রের মত প্রত্যেক বছর মক্কা পৌঁছতেন।

মুছান্না নিজের গোত্রের অন্যতম বিশিষ্ট নেতা ছিলেন। তিনি ছিলেন বীর এবং নির্ভিক মানুষ। তিনি সমর বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনি নিজের বিচক্ষণতা, সঠিক মত, দূরদর্শিতা এবং হিকমতের বদৌলতে শুধুমাত্র বনু শাইবানের চোখের মণিই ছিলেন না বরং প্রতিবেশী গোত্রসমূহও তার মজবুত নিপুণতা ও ব্যক্তিত্বের স্বীকৃতি প্রদান এবং প্রশংসা করতেন। অষ্টম হিজরীতে মক্কায় ইসলামের ঝাণ্ডা উড্ডীন হলো। এ সময় হুনাইনে বনু হাওয়াযিনের যোদ্ধাদের শক্তি ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলে মুছান্নার (রা) দূরবীণ দৃষ্টি অনুভব করতে

পারলো যে, আরবে এক নতুন শক্তির আবির্ভাব ঘটেছে। এই শক্তির পক্ষে হকও রয়েছে এবং তার সঙ্গে আল্লাহর সাহায্যও আছে। কিসরাভীতি তাদের অন্তর থেকে সম্পূর্ণরূপে কর্পূরের মত উবে গিয়েছিল এবং তারা অত্যন্ত দ্রুততার সাথে নিজেদেরকে রাসূলে আরাবীর (সা) পায়ের তলায় সমর্পণ করলো। নেতৃস্থানীয় চরিতকাররা এটা পরিষ্কার করেননি যে, ইসলাম গ্রহণের পর মুছান্না (রা) কতদিন মদীনা মুনাওয়ারাতে অবস্থান করেছিলেন। তবুও বিভিন্নভাবে জানা যায় যে, তিনি কিছুদিন মদীনা মুনাওয়ারাতে অবস্থান করে অবশ্যই নবীর (সা) ফয়েজে অবগাহিত হয়েছিলেন। কেননা পরবর্তী জীবনে তাঁর কাজকর্ম মজবুত আকিদা সম্বলিত উদাহরণযোগ্য মুসলমান এবং আপাদমস্তক মুজাহিদের কর্মতৎপরতাই পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। এই চরিত্রের মানুষের মধ্যে নবীর (সা) প্রভাব অবশ্যই ছিল বলে মনে করার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

একাদশ হিজরীতে রাসূলে আকরাম (সা) ইন্তেকাল করেন এবং হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) খিলাফতের দায়িত্বে সমাসীন হন। এ সময় সমগ্র আরবে ধর্মদ্রোহিতার আগুন জ্বলে উঠে। কিছুসংখ্যক মুরতাদ মুসায়লামা কাজ্জাব এবং তোলায়হা আসদীর মত মিথ্যা নবুওয়াতের দাবীদারের অনুগত হয়ে ইসলাম ত্যাগ করলো। অন্য একটি দল নামায ও যাকাতে কম দাবী করতে লাগলো এবং তৃতীয় আরেক গ্রুপ যাকাত আদায়ে সরাসরি অস্বীকৃতিই জানিয়ে বসলো। মদীনার আনসার, মক্কার কুরাইশ এবং বনু ছাকিফ ছাড়া খুব কম গোত্রই এমন ছিল যে, যাদের সকলে অথবা কতিপয় মানুষ মুরতাদ হয়নি। নব প্রতিষ্ঠিত ইসলামী খিলাফতের জন্য এটা ছিল এক কঠিন ও নাযুক সময়। কিন্তু হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) তুলনাহীন অটলতা, দৃঢ়সংকল্প ও হিম্মতের সঙ্গে কাজ করলেন এবং মুরতাদদের সামনে অবনত হওয়া অথবা তাদের কোন ধরনের সুবিধা দানে শুধু অস্বীকারই করলেন না বরং নিজের উপায়-উপকরণের চরম সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও তাদের উৎখাতের জন্য সংকল্পবদ্ধ হলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি ১১টি বাহিনী প্রস্তুত করলেন এবং বিভিন্ন এলাকায় মুরতাদদের উৎখাতের জন্য তাদেরকে প্রেরণ করলেন।

তাদের মধ্যে একটি বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন হযরত আ'লা (রা) বিন আবদুল্লাহ হাজরামী। তাঁকে বাহরাইনের মুরতাদদেরকে উৎখাতের জন্য নিয়োগ করা হয়েছিল। বাহরাইন ছিল বনু শাইবানের আবাসস্থলের নিকটবর্তী স্থানে। বাহরাইনবাসী শাইবানী যোদ্ধাদেরকে নিজেদের পক্ষে আনার জন্য খুব চেষ্টা চালালো। কিন্তু মুছান্না (রা) বিন হারিছা অটল পাহাড়ের মত তাদের

পথের বাধা হয়ে দাঁড়ালেন। তিনি ইসলামের সমর্থনে জীবনের বাজী লাগিয়ে দিলেন এবং নিজের গোত্রের কোন সদস্যকে মুরতাদদের সাহায্যের জন্য যেতে দিলেন না। আ'লা (রা) যখন বাহরাইনে মুরতাদদেরকে পরাজিত করলেন তখন মুছান্নাও (রা) বনু শাইবানকে সঙ্গে নিয়ে তাদের সঙ্গে মিলিত হলেন এবং পরাজিত মুরতাদদের সকল রাস্তা বন্ধ করে দিলেন। এটা মুছান্নারই (রা) প্রচেষ্টার ফল ছিল যে, সেই এলাকায় বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীরা দ্বিতীয় বার আর মাথা উচু করতে সাহস পায়নি। ধর্মদ্রোহী বা মুরতাদরা সম্পূর্ণরূপে উৎখাত এবং ইসলামী হুকুমাতের একচ্ছত্র শাসন সমগ্র আরবে বহাল হয়ে গেল তখন মুছান্না (রা) ইরানের অগ্নি উপাসকদের নির্যাতনের বিরুদ্ধে এমন জিহাদ শুরু করলেন যে, কয়েক বছরের মধ্যে কিসরা শাসনকে ভূলুণ্ঠিত করে রেখেছিলেন। দ্বাদশ হিজরীতে মুছান্না (রা) ইরানীদের বিরুদ্ধে যে জিহাদ শুরু করেছিলেন তার কয়েকটি কারণ ছিল। সবচেয়ে বড় কারণ এই ছিল যে, ইরানী শাসকবৃন্দ নিজেদের অধিকৃত অথবা প্রভাবিত আরব এলাকাসমূহের বাসিন্দাদের সঙ্গে খুবই খারাপ ব্যবহার করতো এবং তাদেরকে অপমানিত করা ও শোষণের কোন পথই বাকী রাখতো না। এসব আরবের জীবিকা বেশীর ভাগই নির্ভরশীল ছিল কৃষিকাজের ওপর। যখন তারা নিজেদের গায়ের ঘাম ও রক্ত একাকার করে ফসল উৎপন্ন করতো তখন ইরানী শাসকরা আসতো এবং সম্পূর্ণ ফসলই একত্র করে নিয়ে যেতো এবং বখশিশ হিসেবে আরবদেরকে কয়েকটি মুদ্রা দিয়ে যেতো। এই অপমানমূলক আচরণ এবং জঘন্য ধরনের শোষণের কারণে আরবরা ইরানীদেরকে প্রচণ্ডভাবে ঘৃণা করতো।

দ্বিতীয় কারণ হলো, সে যুগে ইরানী সাম্রাজ্য রাজনৈতিক বিশৃংখলায় নিপতিত ছিল। ইরানী শাসকরা পরস্পরের বিরুদ্ধে এমন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল যে, চার বছরের মধ্যে ইরানের সিংহাসনে নতুন নতুন বাদশাহ একের পর এক আরোহণ করেছিল। আর প্রত্যেক নতুন বাদশাহ নিজের বিরোধীদেরকে নির্দয়ভাবে হত্যা করেছিল।

মুছান্না খুব গভীরভাবে ইরানের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছিলেন এবং সঙ্গত কারণেই এই নির্যাতনমূলক শাসনের জোয়াল কাঁধ থেকে দূরে নিক্ষেপ করার সময় এসেছে বলে অনুভব করতেন। ইসলাম তাঁর স্বাধীনতার আবেগকে আরো উদ্বেলিত করে তুললো এবং একটি শক্তিশালী আরব রাষ্ট্র পৃষ্ঠপোষক হওয়ার কারণে তিনি আরো সাহস পেলেন। তিনি যখন দেখলেন যে, অভ্যন্তরীণ বিশৃংখলার কারণে ইরানীদের শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ার আলামত প্রকট হয়ে পড়ছে তখন তরবারী খাপ থেকে বের করলেন এবং নিজের

গোত্রকে সংগঠিত করে আরব ইরাকের ইরান অধিকৃত এলাকাসমূহের ওপর ঝড়ের বেগে আক্রমণের এক অব্যাহত সিলসিলা শুরু করলেন। কতিপয় অন্য আরব গোত্রের যুবকরাও তাঁকে সহযোগিতা করলো এবং ইরানী জমিদার ও জায়গীরদারদের ওপর অনবরত হামলা করে কাহিল করে ফেললো। মুছান্নার(রা) সঙ্গীদের মধ্যে সুয়ায়েদ বিন কুতবাহ আজলীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মুছান্না (রা) হিরার দিক থেকে ইরানীদের ওপর হামলা করতেন। অন্যদিকে সুয়ায়েদ করতেন আবাল্লুর দিক থেকে। এমনিভাবে যা কিছু তিনি হাতের কাছে পেতেন তাই উঠিয়ে নিতেন। ইরানীরা যদি মরিয়া হয়ে তাদেরকে ধাওয়া করতো তাহলে তারা দূর মরুভূমিতে চলে যেতেন। ফলে ইরানীদেরকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যেতে হতো।

ইরানের বিরুদ্ধে আরবদের এই যুদ্ধ এক ধরনের গেরিলা যুদ্ধ ছিল। এই গেরিলা যুদ্ধের সময় মুছান্না সেই ইরানী শাসকদেরও খুব খবর নিয়েছিলেন যারা বাহরাইনে ইসলামী সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আগুন প্রজ্জ্বলনে মুরতাদদের সাহায্য করেছিলো। মুছান্না (রা) আস্তে আস্তে নিজের তৎপরতার ধারা পারস্য উপসাগরসহ উত্তর দিকে ফোরাত নদীর তীর পর্যন্ত সম্প্রসারিত করেন এবং ইরানী বাহিনী ও তার সহযোগী গোত্রসমূহের গর্বকে খর্ব করেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) মুরতাদদের উৎখাতের পর কেবলমাত্র নিজের ভবিষ্যত কর্মসূচী সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করছিলেন, ঠিক এই সময় তিনি মুছান্নার (রা) এক দীর্ঘ পত্র পেলেন। এই পত্রে তিনি তাঁর অভিযানসমূহের অবস্থা লিখে পাঠিয়েছিলেন এবং রাসূলের খলিফার নিকট তাঁর সাহায্যের জন্য অবিলম্বে সৈন্য প্রেরণের প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। ইরানী সরকার তখন অস্থির চিত্তে কাল কাটাচ্ছিল এবং সেই সময়ই ছিল তাদের ওপর হামলার প্রকৃষ্ট সময়। তাঁর অব্যাহত হামলার কারণে ইরানীরা খুব সতর্ক হয়ে গিয়েছিল। এ জন্যই তিনি হযরত আবু বকরের (রা) নিকট পত্র লিখেছিলেন। রাজনৈতিক বিশৃংখলার কারণে নিসন্দেহে তাদের প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। কিন্তু তাহলে কি হবে। তারাতো কয়েক শতাব্দীর পুরাতন এক মহান সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার ছিল। এ জন্য এমনো ছিলো না যে, কয়েক হাজার আরব গেরিলার নিকট তারা আত্মসমর্পণ করে বসবে। সুতরাং তারা আরবদেরকে বাধা দানের জন্য নিজেদেরকে সংগঠিত করতে লাগলো। মুছান্না (রা) যখন এই অবস্থা জানতে পেলেন তখন ইসলামী খিলাফতের খলিফার নিকট সাহায্য প্রার্থনাকে যথোপযুক্ত মনে করলেন। কেননা অসীম উপায়-উপকরণের মালিক একটি সাম্রাজ্যের সঙ্গে অন্য একটি সাম্রাজ্যই যথার্থভাবে মুকাবিলা করতে সক্ষম। গেরিলা বাহিনী কোন এলাকার ওপর

স্থায়ী দখল কায়েম রাখতে পারে না। আবার তারা দূর এলাকা পর্যন্ত রসদ ও যুদ্ধের অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তু আনা-নেয়ার ব্যবস্থাও করতে পারে না।

মুছান্না (রা) কিসরার ক্ষমতা ও শান-শওকতের কোমর ভেঙ্গে দেয়ার জন্য এত অস্থির ছিলেন যে, পত্র প্রেরণের পর স্বয়ং বিদ্যুৎ বেগে মদীনা মুনাওয়ারা পৌঁছুলেন এবং খিলাফতের দরবারে হাজির হয়ে ইরানের রাজনৈতিক বিপ্লব ও নিজের অভিযানের ঘটনাবলী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) তাঁর কথা খুব চিন্তা ও সহমর্মিতার সঙ্গে শ্রবণ করলেন এবং আহলুর রায় সাহাবীদের (রা) সঙ্গে পরামর্শের পর তাঁকে পূর্ণ সহযোগিতার নিশ্চয়তা দিলেন। এ সময় মুছান্না (রা) হযরত আবু বকরের (রা) নিকট তাঁকে ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে নিয়ম মত নিজের কওমের সরদার নিয়োগ করার আবেদন জানান। হযরত আবু বকর (রা) তাঁর দরখাস্ত মঞ্জুর করলেন এবং তাঁকে বনু শাইবানের ইমারাতের ফরমান প্রদান করলেন। সেই সঙ্গে তাঁকে এই নির্দেশও দিলেন যে, ফিরে গিয়ে বনু শাইবান এবং তার মিত্র গোত্রদেরকে ব্যাপকভাবে সংগঠিত করবে এবং মদীনা থেকে সাহায্য পৌঁছার অপেক্ষা করবে। আল্লামা বালাজুরী (র) বর্ণনা করেছেন, মুছান্না (রা) স্বদেশে ফিরে গিয়ে সর্বপ্রথম নিজের গোত্রের সেসব লোককে ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করলেন যারা তখন পর্যন্ত খৃস্টান অথবা মূর্তিপূজারী ছিলো। তাঁর তাবলীগের ফলে তারা সকলেই মুসলমান হয়ে গেলেন। তারপর তাঁরা বনু শাইবান ও অন্যান্য সহযোগী গোত্রদেরকে সঙ্গে নিয়ে এক নতুন সংকল্পসহ ইরাক রওয়ানা হলো এবং দাজলা ও ফোরাত নদীর ডেল্টা এলাকায় ইরানীদের ওপর চাপ প্রয়োগ শুরু করলো। তা সত্ত্বেও সাহায্য পৌঁছার পূর্বে তাঁরা নিজেদের লোকদেরকে কোন বড় ধরনের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া থেকে নিষেধ করে দিলেন। কেননা এটাই ছিল খলিফাতুর রাসূলের নির্দেশ।

মুছান্নার (রা) চলে যাওয়ার পর হযরত আবু বকর (রা) হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদকে মুখলিস মুসলমানদের সমন্বয়ে গঠিত একটি মজবুত বাহিনীসহ অবিলম্বে মুছান্নার (রা) সাহায্যে পৌঁছার জন্য নির্দেশ দিলেন এবং তাঁকে সঙ্গে নিয়ে আরব ইরাকে সুসংগঠিতভাবে অগ্রাভিযান চালানোর নির্দেশ দিলেন। হযরত খালিদ (রা) সবেমাত্র ধর্মদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শেষ করেছিলেন এবং তাঁর অধীন সৈন্যসংখ্যা ছিল খুব কম। কেননা তার অধিকাংশই ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হয়েছিল। তদুপরি হযরত আবু বকরের(রা) নির্দেশ ছিল যে, তিনি যেন নিজের বাহিনীতে এমন কোন লোককে অন্তর্ভুক্ত না করেন যে একবার মুরতাদ হয়ে দ্বিতীয়বার মুসলমান হয়েছিল। তা সত্ত্বেও হযরত খালিদ (রা) এমন একজন অভিজ্ঞ জেনারেল

ছিলেন যিনি কোন বিরাট সমস্যাকেও থোড়াই তোয়াক্কা করতেন। তিনি শুধু দুই হাজার মুজাহিদ সঙ্গে নিয়ে ইরাকের আজিমুশ্বান অভিযানে রওয়ানা হয়ে গেলেন। পথিমধ্যে রবিয়া গোত্রের আরো আট হাজার মানুষ তাতে যোগ দিল। আর এমনিভাবে দশ হাজারের দল নিয়ে ইরাকের সীমান্তে পৌঁছে গেল। মুছান্না (রা) সেখানে আট হাজার মুজাহিদসহ তাঁর অপেক্ষা করছিলেন। এসব সৈন্যের নেতৃত্ব হযরত খালিদ (রা) গ্রহণ করলেন এবং মুছান্না (রা) হলেন তাঁর দক্ষিণ হস্ত। তিনি ইরানীদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য এবং ইরাকের অলি গলি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিলেন। এ জন্য হযরত খালিদ (রা) কোন পদক্ষেপ গ্রহণের পূর্বে তাঁর নিকট অবশ্যই পরামর্শ গ্রহণ করতেন। ইরাকের ওপর হামলার পূর্বে হযরত খালিদ (রা) সেখানকার ইরানী গভর্ণর হুরমুজকে একটি পত্র দিলেন। পত্রে তিনি তাঁকে হয় ইসলাম গ্রহণ অথবা জিযিয়া প্রদান করে মুসলমানদের আশ্রয়ে আসার আহবান জানালেন। এই দুইটির কোনটিই যদি গ্রহণীয় না হয় তাহলে সে-ই অপরাধী হবে বলে জানিয়ে দিলেন। তাছাড়া তিনি পত্রে আরও লিখলেন যে, তিনি এমন এক যোদ্ধা জাতি সঙ্গে নিয়ে এসেছেন, যারা মৃত্যুকে এমন ভালবাসে যেমন তারা জীবিত থাকাকে ভালবেসে থাকে। হুরমুজ এই পত্র পেয়ে সকল অবস্থা কিসরাকে লিখে পাঠালেন এবং নিজে সৈন্য প্রেরণে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কিছুদিনের মধ্যেই সে এক বিরাট বাহিনী তৈরী করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুকাবিলার জন্য রওয়ানা হয়ে গেল।

এদিকে ইরানী দরবার থেকেও সে নির্দেশ প্রাপ্ত হলো। নির্দেশে বলা হলো যে, হামলাকারীরা যেন কোন অবস্থাতেই অগ্রসর হতে না পারে। ইরানীদের উৎসাহ উদ্দীপনার অবস্থাটা এমন ছিল যে, তাদের অনেক দল পরস্পর লোহার শিকলে আবদ্ধ করে রেখেছিল। যাতে কোন ব্যক্তি যুদ্ধের ময়দান থেকে পালাতে না পারে। কাজেমা শহরের নিকটে হাফির নামক স্থানে উভয় বাহিনী পরস্পরের সামনাসামনি হলো। ইরানীরা মুসলমানদের ওপর এমন প্রচণ্ড গতিতে হামলা করে বসলো যে, যদি খালিদ (রা), মুছান্না (রা) এবং কা'কা (রা) বিন আমরুত তামিমী নিজেদের বাহিনীকে শামলে না নিতেন তাহলে সম্ভবত তাদের ব্যুহসমূহ ছিন্নভিন্ন হয়ে যেত। মুসলমানরা শামলে নিয়ে এমন প্রচণ্ড জবাবী হামলা চালালো যে, শত্রুর অগ্রসরমান কদম থেমে গেল। অতপর সামনা সামনি ও দলে দলে যুদ্ধ শুরু হলো। যুদ্ধের সময় ময়দানে হযরত খালিদের (রা) হাতে হুরমুজ মারা গেল। তার হত্যার খবরে ইরানীরা হতোদ্যম হওয়ার পরিবর্তে আরো উত্তেজিত হয়ে উঠলো এবং তারা পাগলের মত মুসলমানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। দীর্ঘক্ষণ যাবত ঘোরতর যুদ্ধ হতে লাগলো। কিন্তু সেনাপতির অনুপস্থিতির কারণে অবশেষে ইরানীদের

মধ্যে পরাজয়ের চিহ্ন পরিস্ফুট হয়ে উঠতে লাগলো। এমনকি তাদের ডান ও বাম বাহু বা দিক সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেল। অবশিষ্ট সৈন্য ব্যাকুল হয়ে ভেগে গেল।

এই যুদ্ধে মুসলমানেরা প্রচুর গনিমতের মাল লাভ করলো। ইরানীরা যেসব শিকল দিয়ে নিজেদেরকে শৃংখলিত করে রেখেছিল তা যুদ্ধের ময়দান থেকে একত্রিত করা হলো। এই শিকলের ওজন হয়েছিল প্রায় স্যাড়ে সাত মণ। এই কারণে এই যুদ্ধকে "জাতুস সালাসিল"ও বলা হয়ে থাকে।

গনিমতের মালের যে অংশ মদীনা মুনাওয়ারা প্রেরণ করা হয়েছিল তার মধ্যে একটি হাতিও ছিল। হযরত আবু বকরের (রা) নির্দেশে তা শহরে ঘোরানো হলো। মহিলারা তা দেখে বিস্ময়ের সঙ্গে বলতে লাগলো, "আমাদের সামনে যা রয়েছে তাকি আল্লাহর সৃষ্টি?" ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখানোর পর হাতিটিকে ইরাকে পাঠিয়ে দেয়া হলো।

কতিপয় ঐতিহাসিক লিখেছেন যে, সালাসিল যুদ্ধের পর হযরত খালিদ(রা) মুছান্নাকে (রা) পলায়নরত ইরানীদের পশ্চাদ্ধাবনের নির্দেশ দিলেন। সুতরাং তিনি এক মজবুত সেনাদলসহ পলায়নপর ইরানীদের পিছু নিলেন। পথিমধ্যে তিনি দু'টি দুর্গ অতিক্রম করছিলেন। এই দুর্গের একটির মালিকানা ছিল জনৈকা ইরানী শাহজাদী এবং তার স্বামীর। মুছান্না (রা) দুর্গ দু'টি জয় করে নিলেন এবং পুনরায় পরাজিত সৈন্যদের ধাওয়া করা শুরু করলেন। তাঁর ধারণা ছিল যে, মাদায়েন পৌঁছার পূর্বেই পলায়নপর সৈন্যদেরকে শেষ করে ফেলা যাবে। তিনি রাস্তাতেই ছিলেন এমন সময় মাদায়েন থেকে ইরানীদের এক বিরাট সেনাবাহিনী আগমনের খবর পেলেন। শাহানশাহ ইরদে শির এই সৈন্য হুরমুজের পরাজয়ের খবর শুনে মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুকাবিলার জন্য প্রেরণ করেছিল। তার নেতৃত্ব দিচ্ছিল প্রখ্যাত ইরানী আমীর কারিন বিন কারইয়ানিস। রাস্তায় সালাসিল যুদ্ধের পলায়নরত ইরানীরাও তাদের সঙ্গে শামিল হয়ে গেল। কিছু দূর অগ্রসর হয়ে সেই বাহিনী মাযার নামক স্থানে তাঁবু ফেললো। হযরত মুছান্নার (রা) সৈন্যদলের এই নতুন সৈন্যের সংখ্যা সম্পর্কে কোন ধারণাই ছিল না। কিন্তু তাঁরা ছিলেন বিরাট বীর মানুষ। সেখান থেকে পিছপা হওয়াটাকে তারা কোনক্রমেই সহ্য করতে পারলো না এবং ইরানী বাহিনীর নিকটেই একটি উপযুক্ত স্থানে তাঁবু ফেললো। সঙ্গে সঙ্গে এক দ্রুতগতিসম্পন্ন দূত প্রেরণ করে হযরত খালিদকে (রা) ইরানীদের পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত করালেন।

হযরত খালিদ (রা) মুছান্নার (রা) পয়গাম বা পত্র পেলেন। পত্র পেয়ে তিনি মুহূর্তকালও বিলম্ব করলেন না এবং তৎক্ষণাৎ তাঁর সাহায্যের জন্য রওয়ানা দিলেন। ঠিক সেই সময়ই কারিন মুছান্নার (রা) স্বল্প সংখ্যক সৈন্যের ওপর হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। খালিদ (রা) মাযারে পৌঁছে তার পরিকল্পনা বানচাল করে দিলেন। যুদ্ধ শুরু হলে ইরানীরা এমনভাবে গর্জন করতে করতে অগ্রসর হলো যে, মাটি কেঁপে উঠলো। তাদের অন্তর ছিল প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহায় ভরপুর এবং মুসলমানদেরকে নিজেদের ভূখণ্ড থেকে বহিষ্কারের প্রশ্নে ছিল কৃতসংকল্প। মুছান্না (রা) স্ব সৈন্যের সম্মুখ সারির নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। তিনি মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে বললেন, হে আরব ভাইয়েরা! এসব বুযদিলের তর্জন গর্জনের পরোয়া করো না। আমি বহুবার তাদেরকে পরীক্ষা করেছি। নিজেদের বর্শা সোজা কর এবং তাদের কলিজা ছিদ্র করে ফেল। একথা বলেই তারা ইরানীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং তাদের কয়েকটি ব্যূহ তছনছ করে ফেললো। ইরানীরা যথাসাধ্য বীরত্ব প্রদর্শন করলো এবং সালাসিল যুদ্ধের চেয়েও বেশী অটলতা দেখালো। কিন্তু খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদের তরবারী তাদেরকে নাস্তানাবুদ করে ছাড়লো। ত্রিশ হাজার ইরানী মারা গেল। নিহতদের মধ্যে কারেন এবং আরো অনেক ইরানী সরদারও শামিল ছিলো।

মাযারের লড়াইয়ের পর দুলজা, উলাইয়্যিস, ইয়াওমুল মাকার, হিরাহ, আইনুত তামার, দাওমা, আম্বার, হাছিদ, মাদিহ, ছানা এবং ফারাজ-এর যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

ইরাক যেহেতু ইরানী শাসকদের নির্ধারিত আবাসস্থল বা বিশ্রামাগার ছিল এবং কিসরার রাজধানী মাদায়েন সেই প্রদেশেই (বাগদাদের নিকট) অবস্থিত ছিল। সে জন্য ইরানীরা প্রতিটি যুদ্ধেই জীবন বাজী রেখে মুসলমানদের মুকাবিলা করেছিল। কিন্তু খালিদ সাইফুল্লাহ (রা), মুছান্না (রা) বিন হারিছা, জারার (রা) বিন আযদার, কা'কা (রা) বিন আমর অন্যান্য বীরদের সহযোগিতায় প্রতিটি যুদ্ধেই শত্রুকে শিক্ষণীয় পরাজয় স্বীকারে বাধ্য করেছিলেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই মাদায়েন পর্যন্ত ময়দান সাফ করে দেন। মুছান্নার (রা) নির্ভীকতা এবং বীরত্বের অবস্থাটা এমন ছিল যে, তিনি ইরানীদের পিছু ধাওয়া করে মাদায়েনের ইরানী পরিখা পর্যন্ত গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু হযরত খালিদ (রা) তাঁকে আরো অগ্রসর হওয়া থেকে বিরত করেন। কেননা যুদ্ধের ময়দান বিস্তৃতরূপ ধারণ করেছিল। সে সময় মুসলমানরা সিরিয়ার ওপরও হামলা করেছিলেন এবং কয়েকটি যুদ্ধে সিরীয়দেরকে ভয়ানকভাবে পরাজিত করে রোমক সম্রাট হিরাক্লিয়াসকে

হতবাক করে দিয়েছিলেন। হিরাক্লিয়াস প্রথমত মনে করেছিল যে, তার অভিজ্ঞ সৈন্যবাহিনী সংখ্যাধিক্য ও উচ্চমানের যুদ্ধ সরঞ্জামের শক্তির বলে বলীয়ান হয়ে কিছুদিনের মধ্যেই মুসলমানদেরকে পরাজিত হতে বাধ্য করবে। কিন্তু পরিস্থিতি যখন তার বিপরীত হলো তখন সে কয়েক লাখ যোদ্ধা রোমকদেরকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করে সিরিয়ায় মুসলমানদের মুকাবিলায় এনে দাঁড় করালো। পরিস্থিতিটা ছিল খুবই ভয়াবহ। কেননা মুসলমান সংখ্যা এবং সরঞ্জামের দিক থেকে রোমকদের দশ ভাগের এক ভাগও ছিল না। রোমকদের এই যুদ্ধ প্রস্তুতির খবর মদীনা পৌঁছলো। এ সময় হযরত আবু বকর (রা) হযরত খালিদকে (রা) ইরাকের ব্যাপারটি মুছান্নার (রা) ওপর ছেড়ে দিয়ে নিজের বাহিনীসহ সিরিয়া পৌঁছার নির্দেশ দিলেন। এই নির্দেশ পৌঁছতেই হযরত খালিদ ইরাকের ইমারাত হযরত মুছান্নার (রা) ওপর ন্যস্ত করলেন এবং দ্রুত সিরিয়া রওয়ানা হয়ে গেলেন।

হযরত খালিদ (রা) সিরিয়া গমনের পর হযরত মুছান্নার (রা) নিকট খুব কম সংখ্যক সৈন্যই অবশিষ্ট ছিল। তা সত্ত্বেও তিনি হিরাতে অবস্থানস্থল বানিয়ে অত্যন্ত সুন্দরভাবে বিজিত এলাকাসমূহের প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করলেন। সেই যুগেই ইরানে হঠাৎ করে আরো একটি রাজনৈতিক বিপ্লব সমুপস্থিত হলো। ইরানী আমিররা মুসলমানদের বর্ধিত শক্তিতে ভীত হয়ে সাময়িকভাবে নিজেদের মধ্যেকার পারস্পরিক বিবাদ মিটিয়ে ফেললো এবং ঐকমত্যের ভিত্তিতে শাহরিরান (অথবা শাহরি বারাজ) বিন ইরদে শিরকে নিজেদের বাদশাহ হিসেবে মেনে নিল। নির্বিশেষে ইরানের সকল ধরনের জনগণ তার আনুগত্যের প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হলো। শাহরিরান কিছুদিনের জন্য দেশের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির উন্নয়নে কাজ করলো। অতপর মুসলমানদের প্রতি মনোনিবেশ করলো। সিংহাসনে আরোহণের সঙ্গে সঙ্গে সে খবর পেল যে, আরবদের সেনাপতি অর্ধেক সৈন্য নিয়ে সিরিয়া চলে গেছে এবং বর্তমানে ইরাকে অবস্থানরত অবশিষ্ট সৈন্যের নেতৃত্ব দিচ্ছে একজন বেদুঈন সরদার। শাহরিরানের নিকট মুসলমানদেরকে ইরাক থেকে বহিষ্কারের এইটাই ছিল সর্বোত্তম সুযোগ। এ জন্য সে দশ হাজার যোদ্ধা সমন্বয়ে গঠিত একটি বাহিনীকে প্রত্যেক ধরনের যুদ্ধ সরঞ্জামে সজ্জিত হয়ে মুসলমানদের ওপর হামলার নির্দেশ দিল। সঙ্গে সঙ্গে মুছান্নাকে (রা) বিদ্রূপ ও অবজ্ঞামূলক একটি পত্র প্রেরণ করলো। তাতে লিখা ছিল ঃ

"আমি তোমাদের মুকাবিলার জন্য একটি বাহিনী পাঠিয়েছি। তাদের অধিকাংশই মুরগী ও শুয়োর চরিয়ে থাকে। তা সত্ত্বেও এই বাহিনী তোমাদের আচার কিভাবে বের করে তা দেখতে পাবে।"

মুছান্না (রা) এই পত্র পেতেই হিরা থেকে রওয়ানা হয়ে বাবেলের পরিত্যক্ত স্থানে গিয়ে তাঁবু ফেললেন এবং শাহরিরানকে জবাবে জানালেন ঃ

"তুমি বিদ্রোহী হও অথবা মিথ্যাবাদী। উভয় অবস্থাই তোমার জন্য অমঙ্গলের। আল্লাহর নিকট বিদ্রোহ ও মিথ্যাচার উভয় বস্তুই শাস্তিযোগ্য। জানা যায় যে, মুরগী ও শুয়োরের রাখাল ছাড়া অন্যান্য মানুষও আমাদের মুকাবিলায় জীবন বাঁচানোর চেষ্টা করে থাকে এবং তুমি এ ধরনের মানুষেরই সাহায্য গ্রহণে বাধ্য। আল্লাহর শোকর যে, তিনি তোমার ধোঁকাবাজীর কৌশল তোমার ওপরই ফিরিয়ে দিয়েছেন।"

ইরানী বাহিনী মাদায়েন থেকে পঞ্চাশ মাইলের দূরত্ব অতিক্রম করে বাবেলের নির্জনভূমিতে উপস্থিত হলো। এ সময় মুছান্না (রা) অগ্রসর হয়ে তাদের রাস্তা বন্ধ করে দিল। তাঁর দুই জানবাজ ভাই মাসউদ (রা) এবং মা'নাও (রা) সঙ্গে ছিলেন। একজন বাঁদিক আগলে রেখেছিলেন। অন্যজন ছিলেন ডানদিকে। ইরানী বাহিনীতে একটি ভীতিজনক যোদ্ধা হাতিও ছিল। হাতিটি চিৎকার করতে করতে এবং শূঁড় উচিয়ে ইসলামী বাহিনীর দিকে অগ্রসর হলো। তখন মুছান্না (রা) নিজের ঘোড়ার উপর থেকে লাফিয়ে পড়লেন। আরো কতিপয় জানবাজ তাকে অনুসরণ করলেন এবং তাঁরা তরবারী দিয়ে হাতির ওপর একযোগে হামলা করে বসলো। হাতির শূঁড় কেটে গেল এবং খুব তাড়াতাড়ি ধরাশায়ী হয়ে পড়লো। তারপর মুসলমানরা ইরানীদের ওপর নতুন উৎসাহ-উদ্দীপনাসহ এমন প্রচণ্ড হামলা চালালো যে, তাদের আর প্রতিরোধ ক্ষমতা রইলো না এবং নিজেদের হাজার হাজার মানুষ নিহত অবস্থায় ফেলে রেখে হতবুদ্ধি অবস্থায় পালিয়ে গেল। এই পরাজয়ের খবর শাহরিরানের ওপর বিদ্যুতের মত আপতিত হলো এবং সে প্রচণ্ড জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মারা গেল।

শাহরিরানের মৃত্যুর পর ইরান পুনরায় বিপ্লবের আবর্তে নিক্ষিপ্ত হলো। প্রথমে দুখতে যিনান সিংহাসনে আরোহণ করলো। কিন্তু খুব শীঘ্র তাকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে দেয়া হলো। তারপর একের পর এক শাপুর ও আযর মিদাখত ইরানের রাজমুকুট নিজের মাথায় রাখলো। কিন্তু তাদের ভাগ্যও প্রসন্ন ছিল না। অবশেষে পুরান দখত ইরানের সিংহাসনের মালিক হলো। সে ছিল একজন বুদ্ধিমতী মহিলা। সে ইরানের নামকরা বাহাদুর রোস্তম বিন ফারখ যাদকে নিজের উজির এবং সেনাপতি নিয়োগ এবং সকল রাষ্ট্রীয় ব্যাপার তার হাতে ন্যস্ত করলো। রোস্তম ক্ষমতায় এসেই মুসলমানদেরকে বাধা দানের জন্য একটি বিরাট বাহিনী প্রস্তুত করলো। মুছান্না (রা) সে সময় হিরাতে

অবস্থান করছিলেন। তিনি ইরানীদের যুদ্ধ প্রস্তুতির খবর পেলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ হযরত আবু বকরকে (রা) চিঠি লিখলেন যে, তাঁর নিকট সামান্য সৈন্য রয়েছে এবং বিরাট ইরানী বাহিনীর মুকাবিলা করতে হলে আরো বেশী সৈন্যের প্রয়োজন। এ জন্য আপনি অবিলম্বে সাহায্য প্রেরণ করুন এবং আমাকে আমার বাহিনীতে সেসব কবিলাকেও অন্তর্ভুক্তির অনমুতি দিন যারা ধর্মদ্রোহিতা থেকে তওবা করে পুনরায় ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছে। কয়েক সপ্তাহ যাবত যখন এই পত্রের জবাব এলো না তখন মুছান্না (রা) বাশির (রা) বিন খাসাসিয়াকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করে স্বয়ং মদীনা রওয়ানা হয়ে গেলেন।

হযরত মুছান্না (রা) যখন মদীনা পৌঁছলেন তখন খলিফাতুর রাসূল হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) খুবই অসুস্থ ছিলেন এবং জীবনের শেষ মনযিল অতিক্রম করছিলেন। এই অবস্থায় তিনি মুছান্নার (রা) নিকট থেকে ইরাকের অবস্থা শুনলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে হযরত ওমরকে (রা) ডেকে পাঠালেন। ইতিমধ্যেই তিনি তাঁকে নিজের স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করেছিলেন। তিনি হাজির হলে ওসিয়ত করলেন ঃ

"হে ওমর! আমি জীবন সায়াহ্নে উপনীত হয়েছি। আজ সন্ধ্যা পর্যন্ত বেঁচে থাকবো এমন আশাও নেই। আমি যা বলি তা মনোযোগ দিয়ে শোনো এবং তার ওপর আমল করো। দিনে যদি আমার জীবন বায়ু নির্বাপিত হয় তাহলে সন্ধ্যার পূর্বে আর যদি রাতে হয় তাহলে সকালের আগেই মুসলমানদেরকে উৎসাহ দিয়ে মুছান্নাকে (রা) সাহায্যের জন্য উদ্বুদ্ধ করবে। কোন মুসিবত তোমাকে আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ ও দ্বীনের কাজ থেকে যেন গাফিল করে না দেয়। তুমি জানো যে, রাসূলের (সা) ওফাতের পর আমি কোন কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করেছিলাম। প্রকৃতপক্ষে সেটা ছিল একটা বিরাট পরীক্ষা। আমি যদি সে সময় দুর্বলতা প্রদর্শন করতাম তাহলে দ্বীনে হানিফীর সমাপ্তি ঘটতো। আল্লাহ যদি মুসলমানদেরকে সিরিয়ায় বিজয় দান করেন তাহলে খালিদের (রা) সেনাবাহিনীকে পুনরায় ইরাক পাঠিয়ে দেবে। কেননা অত্র এলাকার অভিযানসমূহে সে-ই অন্যদের চেয়ে বেশী যোগ্য।"

এই ওসিয়তের পর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) পরপারের ডাকে সাড়া দিলেন এবং হযরত ওমর ফারুক (রা) খিলাফতের আসেন সমাসীন হলেন। সিদ্দীকে আকবরের (রা) ওসিয়ত অনুযায়ী তিনি সর্বপ্রথম মুসলমানদেরকে একত্রিত করলেন এবং জিহাদের জন্য তাদেরকে ইরাক গমনে উদ্বুদ্ধ করলেন। এটা ছিল অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ কাজ। এ জন্য তারা পরস্পরের প্রতি চাওয়া চাওয়ি করে চুপ

মেরে যেতেন। তিনদিন পর্যন্ত একই অবস্থা চললো। চতুর্থ দিন মুছান্না (রা) সর্বসাধারণ্যে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত আবেগের সঙ্গে বললেন ঃ

"হে মুসলমানেরা! জানি না তোমরা চুপ মেরে আছো কেন? সম্ভবত তোমরা ইরানকে ভীতিপ্রদ মনে করে থাকবে। আল্লাহর কসম! আমরা অগ্নি উপাসকদেরকে পরীক্ষা করে দেখেছি। তারা যুদ্ধের ময়দানের মানুষ নয়। আমরা তাদের একটি বিরাট এলাকা কবজা করে নিয়েছি এবং তাদের বিরুদ্ধে আমাদের বীরত্বের প্রমাণ রেখেছি। ইনশাআল্লাহ তারা আমাদের মুকাবিলায় টিকতে পারবে না।"

মুছান্নার (রা) বক্তৃতা শেষ হলে বনু ছাকিফ কবিলার এক মুজাহিদ আবু ওবায়েদ (র) বিন মাসউদ উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, "আমীরুল মু'মিনীন! এ কাজের জন্য আমি উপস্থিত।" হযরত আবু ওবায়েদের (র) বাহাদুরী সকল মুসলমানকে উত্তেজিত করে তুললো। হযরত সালিত (রা) বিন কায়েস এবং হযরত সায়াদ (রা) বিন ওবায়েদ আনসারীও "আমরাও এ কাজের জন্য হাজির" বলে উঠে দাঁড়ালেন এবং চারদিক থেকে ইরাকের জিহাদে গমনে আকাংখীদের ভীড় সৃষ্টি হয়ে গেল।

হযরত ওমর ফারুক (রা) হযরত মুছান্নাকে (রা) সাহায্য দানের জন্য এক হাজার যুবক নির্বাচন করলেন এবং হযরত আবু ওবায়েদকে (র) তাদের নেতা নিয়োগ করলেন। সাহাবী না হওয়া সত্ত্বেও তিনি জিহাদের দাওয়াত কবুলে অগ্রগামী হয়েছিলেন। এভাবে তিনি নিজেকে নেতৃত্বের যোগ্য করে তুলেছিলেন। তারপর হযরত ওমর (রা) মুছান্নাকে (রা) এই বলে হেদায়াত করলেন ঃ

"কাল বিলম্ব না করে তুমি ইরাক রওয়ানা হয়ে যাও। সাহায্যকারী বাহিনী প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণের পর খুব শীঘ্র তোমাদের নিকট পৌঁছে যাবে। যতক্ষণ পর্যন্ত এই বাহিনী না পৌঁছবে ততক্ষণ যুদ্ধ শুরু করবে না।"

হযরত মুছান্না (রা) আমীরুল মু'মিনীনের নির্দেশ অনুযায়ী তৎক্ষণাৎ ইরাক রওয়ানা হয়ে গেলেন।

মুছান্না (রা) হিরাহ পৌঁছলেন। এ সময় সমগ্র ইরান মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য এক পায়ে দাঁড়িয়ে ছিল। রোস্তম ইরানের সামরিক শক্তিকে নতুনভাবে সুসংগঠিত করেছিল এবং সে আরব ইরাকের সকল সীমান্ত জেলায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল। মুছান্না (রা) ছিলেন একজন দূরদর্শী ও তীক্ষ্ণ ধীসম্পন্ন জেনারেল। তিনি আঁচ করতে পারলেন যে,

এই অবস্থায় তাঁর হিরাহ অবস্থানের ফলে মুসলমানদের সমূহ বিপদ হতে পারে। বস্তুত তিনি নিজের বাহিনীকে হিরাহ থেকে সরিয়ে খাফ্ফান নিয়ে এলেন। স্থানটি ছিল এমন যে, ইরানীরা সেখানে হামলা করতে সক্ষম ছিল না। এক মাস পর আবু ওবায়েদ ছাকাফীও (র) খাফফানে এসে তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন। এ সময় আবু ওবায়েদের (র) বাহিনীতে ছিল কয়েক হাজার যুবক। কেননা রাস্তায় বহু আরব গোত্র জিহাদে অংশ গ্রহণের মর্যাদা লাভের জন্য তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। তাদের মধ্যে অনেক এমন যোদ্ধাও ছিলেন যাঁরা ধর্মদ্রোহিতার ফিতনায় জড়িয়ে পড়ার পর তওবা করেছিলেন। হযরত ওমর(রা) তাদেরকে মুছান্নার (রা) পরামর্শের ভিত্তিতে ইসলামী বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে সংঘটিত ঘটনাবলী প্রমাণ করেছিল যে, হযরত মুছান্নার (রা) পরামর্শ সম্পূর্ণ ঠিক ছিল। কেননা ইরান ও সিরিয়ার যুদ্ধসমূহে তারা নজিরবিহীন বীরত্ব প্রদর্শন করেছিল।

রোস্তম ইতিমধ্যে দু'টি বিরাট বাহিনী জাবান ও রাজপুত নারসীর নেতৃত্বে মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিল। জাবান হিরাহ ও কাদেসিয়ার মধ্যবর্তী নিমারক নামক স্থানে তাঁবু ফেললো। আবু ওবায়েদ (র) খাফ্ফান থেকে বের হয়ে ইরানী বাহিনীর ওপর হামলা করে বসলেন এবং এক রক্তাক্ত যুদ্ধের পর তাদেরকে পরাজিত করলেন। মাতার (রা) বিন ফাজ্জা নামক একজন মুসলমান সৈন্য জাবানকে গ্রেফতার করলো। তিনি জাবানকে চিনতেন না। অনুনয় বিনয়ের কারণে জাবানকে তিনি নিরাপত্তা দিয়ে দিলেন। পরে মুসলমানরা জাবানকে চিনে ফেললো এবং তাকে গ্রেফতার করে হত্যা করতে চাইলো। আবু ওবায়েদ (র) ঘটনা জানতে পেরে জাবানকে মুক্তি দানের নির্দেশ দিলেন। কেননা একজন মুসলমান তাকে নিরাপত্তা দিয়েছে। অন্য দিকে নারসী ৩০ হাজার সৈন্যসহ কাসকারে তাঁবু ফেলে রেখেছিল। জাবানের বাঁচা খোঁচা অবশিষ্ট সৈন্যও তার বাহিনীতে গিয়ে শামিল হয়েছিল। এদিকে রোস্তম যখন জাবানের পরাজয়ের খবর পেল তখন নারসীর সাহায্যের জন্য একটি সহযোগী বাহিনী জালিইয়ানুস নামের এক ইরানী নেতার নেতৃত্বে কাসকার প্রেরণ করলো। নারসী এই সাহায্যকারী বাহিনীর আগমনের অপেক্ষায় ছিল। ঠিক এমন সময় আবু ওবায়েদ (র) ফোরাত নদী পার হয়ে তার মাথার ওপর গিয়ে উপস্থিত হলেন। কাসকারের নিকট সাকাতিয়া নামক স্থানে উভয় বাহিনীর মধ্যে ভয়ংকর যুদ্ধ সংঘটিত হলো। ইরানীরা খুব উল্লম্ফন দেখালো। কিন্তু মুসলমানদের দ্রুতগতিসম্পন্ন হামলার সামনে কোনমতেই তারা তিষ্ঠাতে পারলো না এবং খুব শীঘ্র যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে গেল। অতপর মুসলমানরা জালিইয়ানুসের দিকে অগ্রসর হলো। তখন সে বারে সামা (অথবা

বাকেশিয়া) নামক স্থানে অবস্থান করছিল। এক হামলাতেই তারা তাকেও পালিয়ে যেতে বাধ্য করলো এবং সে মাদায়েন পৌঁছে কোনমতো নিজেকে বাঁচালো। তারপর আবু ওবায়েদ (র) মুছান্না (রা) ও অন্যান্য সামরিক অফিসারকে ছোট ছোট দলে বিভক্ত করে আরব ইরাকের সর্বত্র ছড়িয়ে দিলেন। তাঁরা কিছুদিনের মধ্যেই অবশিষ্ট সকল বিদ্রোহী গোত্রকে পদানত করে ফেললেন এবং ইরাকীদের ওপর নিজেদের কর্তৃত্ব মজবুত করলেন।

নারসী ও জালিইয়ানুসের পরাজয়ের খবর শুনে রোস্তম খুবই অসন্তুষ্ট হলো। সে নিজের এক বিশ্বস্ত এবং প্রখ্যাত সেনা অফিসার জুলহাজিব বাহমন জাদেবিয়াকে বিরাট সেনা বাহিনী সমেত এমন শান শওকতের সঙ্গে রওয়ানা করালো যে, ইরানের জাতীয় পতাকা "দারফাশে কাবিয়ানী" তাদের মাথার ওপর পত পত করে উড়ছিল এবং পাহাড় সদৃশ্য অনেক যুদ্ধের হাতি সেই বাহিনীর আগে আগে চলছিল। এসব হাতির পদধ্বনিতে মাটি কেঁপে কেঁপে উঠছিল। সৈন্য বাহিনীটি ফোরাত নদীর তীরবর্তী কাসসুন নাতিফ নামক স্থানে তাবু ফেললো। এদিকে আবু ওবায়েদ (র) কাসকার থেকে রওয়ানা হয়ে ফোরাতের অপর তীরে অবস্থিত মারোহা নামক স্থানে অবস্থান নিয়েছিলেন। বাহমন জাদেবিয়া তাঁকে এক পয়গাম প্রেরণ করলো। পয়গামে তিনিই নদী পার হয়ে আসবেন, না সে পার হয়ে যাবে তা জানতে চাইলো। মুছান্না (রা), সালিত (রা) এবং অন্যান্য অভিজ্ঞ মুসলমান আবু ওবায়েদকে (র) ইরানী বাহিনীকে এ পারে আসার আহবান জানানোর পরামর্শ দিলেন। কিন্তু তার ধারণায় অপর তীরে গিয়ে যুদ্ধ করাটাই সমীচিন ছিল। সুতরাং তিনি বীরত্বের আবেগে নিজের বাহিনী নিয়ে নদীর অপর তীরে চলে গেলেন। আবু ওবায়েদের (র) এই কর্মপদ্ধতির সঙ্গে মুছান্নার (রা) প্রচণ্ড মতবিরোধ ছিল। কিন্তু আমীরের আনুগত্যের বিরোধিতা করা তার রীতি ছিল না। নদীর অপর তীরে গিয়ে যুদ্ধ করলে মুসলমানদের মারাত্মক ক্ষতির আশংকা রয়েছে শুধু এ কথাটুকুন বলেই তিনি চুপ মেরে গেলেন। তবে, তিনি বললেন যে, তাঁরা আমীরের অনুগামী হবেন।

দুর্ভাগ্যবশত ফোরাত নদীর অপর তীর ও ইরানী বাহিনীর মধ্যেকার ময়দান খুবই অপ্রশস্ত ছিল। এ জন্য মুসলমানরা নিজেদের ব্যূহ সঠিকভাবে সাজাতে পারলেন না। যুদ্ধ শুরু হলে ইরানীরা প্রথমে নিজেদের হাতিকে আগে প্রেরণ করলো। মুসলমানদের ঘোড়া তাদের ভয়াবহ আকৃতি দেখে পেছনে হটতে শুরু করলো। আবু ওবায়েদ (র) এবং আরো কয়েকজন জানবাজ যোদ্ধা নিজেদের

ঘোড়ার ওপর থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়লো এবং তরবারী উচিয়ে হাতিদের ওপর হামলা করে বসলেন। বন্য হাতিরা বহু মুসলমানকে নিজের পায়ের তলায় পিষে ফেললো। আবু ওবায়েদ (র) অগ্রসর হয়ে তাদের শূঁড়ের ওপর তরবারী চালাতে এবং সঙ্গীদেরকে সাহস যোগাতে লাগলেন। তাঁর সীমাহীন বাহাদুরী দেখে অন্য মুসলমানরাও পাগলপ্রায় হাতির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। ঠিক এমনি সময় এক ভয়ংকর সাদা হাতি আবু ওবায়েদের (র) ওপর হামলা করে বসলো। তিনি নিজের তরবারী দিয়ে এক কোপে তার শূড় মাথা থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেললেন। কিন্তু হাতিটিও অগ্রসর হয়ে তাকে পায়ের তলায় পিষে ফেললো। আবু ওবায়েদের (র) শাহাদাতের পর তাঁর ভাই হাকাম (র) বিন মাসউদ ছাকাফী নিজের হাতে ঝাণ্ডা তুলে ধরলেন। অন্য একটি হাতি তাকেও শহীদ করে ফেললো। মোটকথা, ছাকিফ গোত্রের ছ'জন বাহাদুর এমনিভাবে ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে অগ্রসর হলেন এবং শহীদ হয়ে গেলেন।

সবশেষে মুছান্না (রা) বিন হারিছা ঝাণ্ডা হাতে তুলে নিলেন এবং লোকদের ভগ্ন সাহস পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু হাতিদের ভয়াবহ হামলায় মুসলমানদের ব্যূহ তছনছ হয়ে গিয়েছিল এবং তারা হন্তদন্ত হয়ে পিছু হটছিল। আবদুল্লাহ বিন মুরছাদ ছাকাফী নামক একজন মুজাহিদ লজ্জিত হয়ে নদীর পুল ভেঙ্গে দিলেন এবং মুসলমানদেরকে উচ্চৈস্বরে আহবান জানিয়ে বললেন ঃ

"হে মানুষেরা! আবু ওবায়েদের পদাংক অনুসরণ করে জীবন দাও অথবা শত্রুর ওপর বিজয় হাসিল কর।"

আবদুল্লার এই আবেগপূর্ণ কাজে মুসলমানদেরকে আরো ক্ষতি স্বীকার করতে হয় এবং তাদের একটা বিরাট সংখ্যক ব্যাকুল চিত্তে পিছু হটতে গিয়ে পানিতে ডুবে গেল। এ সত্ত্বেও মুছান্না (রা) অন্য জানবাজদেরকে সঙ্গে নিয়ে ইরানীদের সামনে প্রাচীরের মত দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি মুসলমানদেরকে দ্বিতীয়বার পুল নির্মাণের নির্দেশ দিলেন এবং পলায়নকারীদের প্রতি আহবান জানিয়ে বললেন ঃ

"হে মানুষেরা! ঘাবড়ে যেয়ো না। আমি হলাম মুছান্না (রা)। দুশমন আমার লাশ অতিক্রম করেই তোমাদের দিকে আসতে পারে। ইতমিনারের সঙ্গে পুল অতিক্রম কর।"

ইত্যবসরে মুছান্নার (রা) ওপর জনৈক ইরানী বর্শা দিয়ে হামলা করলো। এর আঘাত গিয়ে লাগলো তাঁর যিরাহর ওপর এবং তার একটি অংশ তাঁর দেহে বিদ্ধ হয়ে গেল। কিন্তু তাতে তাঁর কদম এক মুহূর্তের জন্যও কম্পিত

হলো না এবং তিনি পুল পুনঃনির্মিত না হওয়া পর্যন্ত ময়দানে অটল রইলেন। এরপর তিনি অবশিষ্ট সৈন্যের সঙ্গে অত্যন্ত সুশৃংখল হয়ে নদীর অপর পারে নামলেন। এই দুঃখজনক ঘটনা ইতিহাসে জাসারের সংঘর্ষ অথবা পুলের যুদ্ধ নামে খ্যাত। তাতে মুসলমানদেরকে জীবনের প্রচণ্ড ক্ষতি স্বীকার করতে হয়। তাদের ৯ হাজারের মধ্যে ৬ হাজার মানুষই শহীদ হয়ে যান। চরম অবস্থায় যদি মুছান্না (রা) নজীরবিহীন বীরত্ব ও অটলতার সাথে কাজ না করতেন তাহলে কোন মানুষ জীবিত থাকতো কিনা সে ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে। যারা এই যুদ্ধে পালিয়ে যাওয়ার পথ অবলম্বন করেছিলো তারা দীর্ঘদিন যাবত মানুষের সামনে মুখ দেখাতো না। বাহমন জাদেবিয়া যদিও এই যুদ্ধে শানদার বিজয় লাভ করেছিল তবুও মুসলমানদের পিছু ধাওয়া করার ব্যাপারে তার কোন সাহসই ছিল না এবং সে নিজের বাহিনীসহ সেখান থেকেই মাদায়েন চলে যায়।

জাসারের যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয়ে এবং আবু ওবায়েদের (র) শাহাদাতের খবর পেয়ে ফারুকে আজম (রা) খুব দুঃখিত হলেন। তিনি সমগ্র আরবে খতিব ও নকীব প্রেরণ করলেন। এসব খতিব ও নকীববৃন্দ লোকদেরকে জিহাদে উদ্বুদ্ধ করতেন এবং জাসারের যুদ্ধের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য আরবদের জাতীয় আবেগ উস্কে দিতেন। কিছুদিনের মধ্যেই সমগ্র আরবে যেন আগুন লেগে গেল। চারদিক থেকে কাতার বন্দী হয়ে জিহাদের আবেগে পূর্ণ আরব গোত্রসমূহ মদীনা আগমন শুরু করলো। এমনকি বনু নমর ও বনু তাগাল্লুবের খৃস্টান সরদারও স্ব স্ব গোত্রের হাজার হাজার যোদ্ধা সঙ্গে নিয়ে ফারুকে আজমের (রা) খিদমতে হাজির হলেন। তাদের নিকট এটা ছিল আরব ও আজমের জাতীয় যুদ্ধ। এই যুদ্ধে কোন আরবের অনুপস্থিত থাকার অর্থই ছিল ভীরুতা ও কাপুরুষতার নামান্তর। ঘটনাক্রমে এ সময় বাজিলা গোত্রের প্রখ্যাত সরদার হযরত জারির (রা) বিন আবদুল্লাহও স্ব গোত্রসহ মদীনা মুনাওয়ারা এসে পৌঁছেন। এরপূর্বে হযরত ওমর (রা) হযরত মুছান্নাকে (রা) আবু ওবায়েদের (র) স্থলে ইরাকে মুসলমানদের স্থায়ী সেনাপতি হিসেবে নিয়োগ করেন। তিনি হযরত জারিরকে (রা) একটি বিরাট বাহিনীসহ হযরত মুছান্নার (রা) সহযোগিতার জন্য রওয়ানা করালেন। এদিকে জওয়ান হিম্মত মুছান্না (রা) সীমান্তবর্তী জেলাসমূহে নকীব প্রেরণ করে এক বড় সৈন্যবাহিনী একত্রিত করেছিলেন এবং বুয়েব নামক স্থানে তাঁবু খাটিয়েছিলেন। হযরত জারিরও (রা) সাহায্যকারী সৈন্য নিয়ে বুয়েবে তাদের সঙ্গে এসে মিলিত হলেন।

অন্যদিকে ইরানে রোস্তম নিজের বিরোধীদের ওপর বিজয়ী হলো। সে মুসলমানদের পুনরায় একত্রিত হওয়ার খবর পেল। এ খবর শুনে সে মিহরান বিন মাহারবিয়া হামদানিকে ১২ হাজার যোদ্ধা বাহিনী দিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুকাবিলার জন্য প্রেরণ করলো। পথিমধ্যে ইরানী সৈন্যের আরো কয়েকটি দল এবং ইরানের সমর্থক গোত্রসমূহও এই বাহিনীতে এসে যোগ দিল। এমনিভাবে মিহরানের ঝাণ্ডাতলে এক লাখেরও বেশী সৈন্য একত্রিত হলো। মিহরান বিদ্যুতগতিতে বোয়েব পৌঁছলেন এবং ফোরাত নদীর অপর পারে মুসলমানদের সামনে তাঁবু ফেললো। দ্বিতীয় দিন মুছান্নাকে (রা) পয়গাম প্রেরণ করে জানতে চাইলো যে, তোমরা নদী পার হয়ে এদিকে আসবে, না আমরা সেদিকে যাবো? মুছান্নার (রা) জাসারের ঘটনার কথা স্মরণ ছিলো। তিনি জবাবে বলে পাঠালেন যে, আমরা নিজেদের অবস্থান ত্যাগ করবো না। তুমিই এদিকে এসে যাও।

মিহরান নদী অতিক্রম করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে নিজের বাহিনীকে এমনভাবে সজ্জিত করলেন যে, সর্বপ্রথম ছিল বিরাহ পরিধানকারী সৈন্য। তাদের পেছনে ছিল যোদ্ধা হাতি। এসব হাতির ওপর ছিল অভিজ্ঞ তীরন্দাজ। ডাইনে এবং বাঁয়ে ছিল সওয়ারের বাহিনী। হযরত মুছান্নাও (রা) অত্যন্ত সুশৃংখলভাবে নিজের বাহিনীর ব্যূহ রচনা করলেন এবং নিজের ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে সমগ্র বাহিনী পরিদর্শন করলেন। তিনি প্রত্যেকের ঝাণ্ডার নীচে দাঁড়িয়ে মুজাহিদদের সাহস দিতেন এবং বলতেন :

"আমি আশা করি তোমরা আজ আরবদের বীরত্ব ও শারাফতির ওপর কলংক লেপন করতে দেবে না। আল্লাহর কসম! আমি আজ নিজের জন্য সেই বস্তুর আকাংখী যা তোমাদের জন্য পসন্দ করি।"

মুছান্নার (রা) অগ্নিঝরা ভাষণ প্রতিটি মুসলমানের অন্তরে শাহাদাতের আকাংখার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ প্রজ্জলিত করে দিলো। যে সময় তিনি যুদ্ধের ব্যূহ ঠিক করছিলেন সেসময় জনৈক মুসলমান জিহাদের আবেগে উদ্বেলিত হয়ে নিজের কাতার থেকে বের হয়ে ইরানীদের দিকে অগ্রসর হলো। মুছান্না (রা) নিজের বর্শা দিয়ে তাকে পেছনে ঠেলে দিলেন এবং বললেন : "তোমার পিতা না থাকুক, নিজের স্থানে দাঁড়িয়ে থাকো। যুদ্ধ যখন শুরু হবে তখন মনের আকাংখা পূরণ করবে।"

ইরানীরা হামলার পূর্বে ধ্বনি দিয়ে আকাশ মাতিয়ে তুলতো। মুছান্না (রা) নিজের বাহিনীকে সম্বোধন করে বললেন : "এটা কাপুরুষোচিত শোরগোল। তীর ও বর্শা দিয়ে তোমরা এর জবাব দাও।" মুসলমানরা কেবলমাত্র হাতিয়ার

হাতে নিচ্ছিলেন ঠিক এমনি সময় ইরানী বাহিনী হামলা করে বসলো। হযরত মুছান্না (রা) অত্যন্ত সাহসের সাথে সৈন্য বাহিনীকে সুশৃংখল করলেন এবং নিয়ম অনুযায়ী তিন তাকবির বলে ইরানীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ইরানীদের হামলা এত তীব্র ছিল যে, মুসলমানরা হতচকিত হয়ে পড়লো এবং বনু আজলের ব্যুহসমূহ বিশৃংখল হয়ে গেল। মুছান্না (রা) তাদের নিকট পয়গাম প্রেরণ করে বললেন যে, মুসলমানদেরকে অপমানিত করো না এবং পিছু হটার চেয়ে কেটে মরাকে অগ্রাধিকার দাও। বনু আজল এই বাণী পেয়েই নিজেদেরকে সামলে নিলো এবং মজুবতভাবে লড়াই করতে লাগলো। তারপর যুদ্ধের ময়দান খুব গরম হয়ে উঠলো এবং কয়েক ঘন্টা এমন প্রচণ্ড যুদ্ধ সংঘটিত হলো যে, মাটি ও পাহাড় কেঁপে উঠলো। মুছান্না (রা) এত জোশের সঙ্গে লড়াই করছিলেন যে, মাথা ও পায়ের কোন খেয়াল ছিল না। তাঁর পাশাপাশি বনু তাগাল্লাব ও বনু নামারের খৃস্টান সরদার ইবনুল ফাহার তাগাল্লুবী এবং আনাস বিন হিলালও যথাযথ বীরত্ব প্রদর্শন করছিলেন।

লড়াই চলাকালীন সময়ে মুছান্নার (রা) সাহোদর মাসউদ (রা) বিন হারিছা শাইবানী প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে ঢলে পড়লেন এবং অন্তিম নিশ্বাসের সময় উচ্চৈস্বরে বললেন ঃ "হে বাকার বিন ওয়ায়েলের সন্তান সন্ততি! নিজেদের ঝাণ্ডা সমুন্নত রাখো। আল্লাহ তোমাদেরকে সুমহান মর্যাদা দান করবেন। সাবধান, আমার মৃত্যুতে যেন তোমাদের পদস্খলন না ঘটে।" এ সময় মুছান্নাও (রা) মুসলমানদেরকে উচ্চৈস্বরে বললেন ঃ "হে মুসলমানরা! এভাবেই শরীফরা জীবন দিয়ে থাকে। তোমাদের ঝাণ্ডা যেন অবনত না হয়।"

ইতিমধ্যে আনাস বিন হেলালও প্রচণ্ড আঘাত খেয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। মুছান্না (রা) তাকে নিজের শহীদ সাহোদরের পাশে শুইয়ে দিলেন এবং তরবারী হাতে দুশমনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সে সময় পর্যন্ত ইরানী বাহিনীর বড় বড় অফিসার মারা গিয়েছিল। কিন্তু মেহরান খুব দৃঢ়তার সাথে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল। বনু তাগাল্লাবের একজন যুবক তাকে নিশানা বানালো এবং তরবারী উচিয়ে একা একা তার ওপর গিয়ে পড়লো। মেহরান ঘোড়া থেকে নেমে পড়লো। এ সময় যুবকটি লাফ দিয়ে সেই ঘোড়ার ওপর চড়ে বসলো এবং উচ্চৈস্বরে না'রা লাগিয়ে বললো যে ঃ "আমি হলাম তাগাল্লাবের আওলাদ এবং ইরানী সেনাপতির হত্যাকারী" ইরানী সৈন্যরা নিজেদের সেনাপতিকে নিহত হতে দেখে ভগ্নহৃদয় হয়ে পড়লো এবং অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় পালিয়ে গেল। মুছান্না (রা) নিজের বাহিনীর কতিপয় শক্তিশালী দল সঙ্গে নিয়ে পুলের ওপর পৌঁছে গেলেন এবং পলায়নপর ইরানীদের রাস্তা বন্ধ করে তাদেরকে হত্যা করা শুরু করলেন। ইবনে খালদুনের রেওয়ায়াত অনুযায়ী

প্রায় একলাখ ইরানী মুসলমানদের তরবারীর খোরাক হয়েছিল এবং হাজার হাজার ইরানী নদীতে ডুবে গিয়েছিল। অধিকাংশ ঐতিহাসিক লিখে থাকেন যে, বুয়েবের যুদ্ধে যে সংখ্যক ইরানী নিহত হয়েছিল সেই সংখ্যক জীবনহানি তাদের আর কোন যুদ্ধে ঘটেনি। বুয়েবের ময়দানে অনেক দিন পর্যন্ত ইরানীদের হাড়গোরের স্তুপ পড়েছিল। পথিক এই পথ দিয়ে অতিক্রমের সময় মুখ দিয়ে অযাচিতভাবে শিক্ষণীয় বাক্যাবলী নির্গত হতো।

বুয়েবের যুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে জাসারের যুদ্ধের পূর্ণ জবাব ছিলো। এই যুদ্ধে একলাখ ইরানী নিহত হওয়ার মুকাবিলায় শুধুমাত্র একশ' মুসলমান শহীদ হয়েছিলেন এবং একজন মুসলমান দশজন ইরানীকে হত্যা করে। এ জন্য এই লড়াইকে ইয়াওমুল আ'শারও বলা হয়ে থাকে। যুদ্ধ শেষ হলে মুছান্না (রা) নিজের ভাই মাসউদ (রা) এবং খৃস্টান সরদার আনাস বিন হেলালের লাশ জাপটে ধরলেন ও কোমল স্বরে তাদের বাহাদুরীর প্রশংসা করলেন। অতপর মুসলমান শহীদদের জানাযার নামায পড়ালেন এবং বললেন ঃ

"আল্লাহর কসম! তাঁরা নিজেদের বীরত্ব, অটলতা এবং নির্ভীকতার ঝাণ্ডা উড্ডীন করে গেছেন ও জীবনের নযরানা পেশ করে নিজেদের গুনাহর কাফ্ফারা আদায় করেছেন।"

বুয়েবের যুদ্ধের পর খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদের মত সমগ্র ইরাকে মুছান্না (রা) বিন হারিছার নাম মুখে মুখে উচ্চারিত হতে লাগলো। তিনি কিছু সামরিক বাহিনীকে মাদায়েনের সম্পূর্ণ বিপরীতে সাবাতে হামলার নির্দেশ দিলেন এবং কতিপয় দল নিজের সঙ্গে নিয়ে খানাফস ও আম্বারের ওপর হামলা করলেন। সে সময় সেখানে ইরানীদের একটা মেলা বসেছিল এবং বাজার ছিল পণ্য সম্ভারে পরিপূর্ণ। প্রথম হামলাতেই ইরানীরা পালিয়ে গেল এবং বেশুমার গনিমতের মাল মুসলমানদের হস্তগত হলো। এদিকে বুয়েবের পরাজয়ের খবর মাদায়েনে পৌঁছলে সমগ্র ইরানে বিলাপ ধ্বনি উচ্চারিত হতে লাগলো এবং জাতীয় মর্যাদাবোধ প্রতিটি ইরানীকে অস্থির করে তুললো। তারা বিস্মিত হয়ে একে অপরকে জিজ্ঞেস করতো যে, অন্নহীন ও বস্ত্রহীন আরবদের মধ্যে এই সাহস কোত্থেকে সৃষ্টি হলো যে, তারা ইরানী সিংহাসনকে অপমানিত করতে কুণ্ঠাবোধ করছে না।

এরপর ইরানীরা নিজেদের মধ্যকার সকল মতবিরোধ ভুলে গিয়ে রাণী পুরানদখতকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে জওয়ান শাহজাদা ইয়াযদ গিরদকে সিংহাসনে বসালো। ইরানে সকল সাধারণ ও অসাধারণ মানুষ মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেল এবং জাতীয় মর্যাদা ও আবেগ সমগ্র দেশে যেন

আগুন লাগিয়ে দিল। যেসব এলাকা মুসলমানদের দখলে ছিল সেখানেও বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠলো এবং চারদিক থেকে মুসলমানদেরকে বিপদে ঘিরে ধরলো। মুছান্না (রা) পরিস্থিতি লিখে খিলাফতের দরবারে প্রেরণ করলেন। সেখান থেকে নির্দেশ এলো যে, নিজের বাহিনী গুটিয়ে আরব সীমান্তে হটে এসো এবং রবিয়া ও মুদিরের গোত্রসমূহকেও সাহায্যের জন্য ডেকে পাঠাও। মুছান্না (রা) এই নির্দেশ পালন করলেন এবং নিজের সৈন্য বাহিনীকে গুটিয়ে জুকার নামক স্থানে অবস্থান নিলেন এবং মদীনা থেকে আরো নির্দেশের অপেক্ষা করতে লাগলেন। ওদিকে খলিফাতুল মুসলিমুন ওমর ফারুক (রা) ইরাকের অবস্থা শুনে শুনে খুব বিচলিত হলেন এবং আবেগাপ্লুত হয়ে বলতে লাগলেন ঃ

"আল্লাহর কসম! আমি অবশ্যই আজমের সাথে আরবের লড়াই করাবো।"

তিনি আরবের সকল গোত্রে দূত প্রেরণ করলেন। দূত প্রেরণের উদ্দেশ্য ছিল যাতে তারা অগ্নি উপাসকদের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য প্রস্তুত হয়ে আসে। তার জিহাদের ডাকে সমগ্র আরব সাড়া দিল এবং চারদিক থেকে মানুষ জিহাদের আবেগে উদ্বেলিত হয়ে মদীনা পৌঁছতে লাগলো। অবশ্য যারা ইরাক সীমান্তের সন্নিকটে ছিল তারা সরাসরি মুছান্নার (রা) নিকট জুকারে পৌঁছে গেলো। মদীনায় যখন বিরাট সংখ্যক মুজাহিদ একত্রিত হলো তখন হযরত ওমর(রা) স্বয়ং ইরানীদের মুকাবিলায় যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কিন্তু সাহাবীরা (রা) তাতে বাধা দিলেন এবং তাঁর জন্য মদীনায় অবস্থানই উপযুক্ত বলে মত প্রকাশ করলেন। সুতরাং তারা হযরত সায়াদ (রা) বিন আবি ওয়াক্কাসকে ইরাকী অভিযানের নেতৃত্ব দানের জন্য নির্বাচিত করলেন। হযরত সায়াদ (রা) ত্রিশ হাজার মুজাহিদকে সঙ্গে নিয়ে ইরাকের দিকে অগ্রসর হলেন এবং ছালাবা গিয়ে তাঁবু ফেললেন। মুছান্নার (রা) আট হাজার সৈন্যও এই বড় বাহিনীতে এসে যোগ দিচ্ছিলেন। পরে এই সৈন্য শারাফ নামক স্থানে হযরত সায়াদের (রা) বাহিনীতে এসে যোগও দিয়েছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো যে, তাতে মুছান্না (রা) ছিলেন না।

ইবনে আছির বর্ণনা করেছেন, জাসারের যুদ্ধে মুছান্না (রা) প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছিলেন। যদিও সাময়িকভাবে তিনি সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন এবং বুয়েবের যুদ্ধে আরেকবার নিজের বীরত্ব প্রদর্শন করে ইরানীদেরকে হতভম্ব করে দিয়েছিলেন। কিন্তু জুকার অবস্থানকালে তাঁর ক্ষত পুনরায় কষ্ট দেয়া শুরু করলো এবং কোন চিকিৎসাই কাজ দিলো না। মুছান্নার (রা) স্থির বিশ্বাস হয়ে গেল যে, প্রকৃত স্রষ্টার ডাক এসে গেছে। সুতরাং তিনি বশির (রা) বিন

খাসাসিয়াকে নিজের স্থলে সেনাবাহিনীর আমীর নিয়োগ করলেন এবং হযরত সায়াদের (রা) নিকট তাঁর এই পয়গাম পৌঁছে দেয়ার জন্য ওসিয়ত করলেন ঃ

"যতদূর সম্ভব হয় আরব সীমান্তের নিকট থেকে ইরানীদের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন। আল্লাহ্ যদি মুসলমানদেরকে বিজয়ী করেন তাহলে নির্দ্বিধায় ইরানের অভ্যন্তরে প্রবেশ করবেন এবং খোদা নাখাস্তা যদি মুসলমানরা ইরানীদেরকে পরাজিত না করতে পারে তাহলে স্বদেশের সীমান্তের অভ্যন্তরে গিয়ে পুনরায় সুসংগঠিত হয়ে হামলা করবেন।"

এই ওসিয়তের পরে বনু শাইবানের এই মহান সেনাপতি পরপারের ডাকে সাড়া দিলেন এবং জুকারের মাটি তার লাশকে আলিঙ্গন করলো। হযরত সায়াদ (রা) এবং অন্যান্য মুজাহিদ মুছান্নার (রা) ওফাতের খবর শুনে খুব দুঃখ পেলেন। কেননা এই নাজুক সময়ে তিনি তাদের অত্যন্ত শক্তিশালী বাহু হিসেবে পরিগণিত হতেন। মুছান্নার (রা) সূক্ষ্মদৃষ্টি ও দূরদর্শিতার ব্যাপারটি ছিল প্রমাণিত সত্য। হযরত সায়াদ (রা) যখন পত্রে মুছান্নার (রা) মৃত্যুর খবর হযরত ওমরকে (রা) দিলেন তখন তিনি জবাবে হযরত সায়াদকে (রা) প্রায় সেই নির্দেশই লিখে পাঠিয়েছিলেন যা মুছান্না (রা) নিজের ওসিয়তে বর্ণনা করেছিলেন।

মুছান্না (রা) বিন হারিছা যদিও বিশ্ব নবীর (সা) শেষ যুগে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তবুও তিনি নিজের ইখলাস, ত্যাগ, কুরবানী, নির্ভীকতা, অটলতা এবং সূক্ষ্ম জ্ঞানের যে নকশা ইতিহাসের পাতায় রেখে গেছেন তাতে আমরা নির্দ্বিধায় তাঁকে ইসলামের প্রথম কাতারের মুজাহিদ ও নেতা হিসেবে পরিগণিত করতে পারি। মুহাম্মাদ হোসাইন হাইকালের ভাষায় হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ যদি নজিরবিহীন সেনাপতি ও আল্লাহ্র তরবারীর গৌরবে গৌরবান্বিত হতে পারেন তাহলে মুছান্না (রা) বিন হারিছার প্রথম কাতারের নেতা ও মুজাহিদ হওয়ার ব্যাপারটি অস্বীকার করা যায় না। তিনি ছিলেন একজন অভিজ্ঞ নেতা। তিনি চরম নাজুক সময়ে মুসলমানদের দায়িত্ব নিজের মাথায় তুলে নেন এবং একজন এমন পরামর্শদাতা ছিলেন যে, ধর্মীয় মতবিরোধ সত্ত্বেও ইরাকের সকল আরব বংশোদ্ভূত গোত্রের অন্তর জয় করে নিয়েছিলেন। তিনি তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে বুয়েবের যুদ্ধে ইরানীদের ওপর এমন আঘাত হেনেছিলেন যার কথা ইরানীরা কখনই ভুলতে পারেনি এবং তারপর আর তাদের বিজয়ের মুখ দেখার ভাগ্য হয়নি।

হযরত জিরার (রা) বিন আযওয়ার আসাদি

অষ্টম হিজরীতে মক্কা মুয়াজ্জামার ওপর ইসলামের ঝাণ্ডা উড্ডীন হলো। এ সময় বাতিল মাবুদ পূজারীদের ওপর হক ভীতিতে পেয়ে বসলো। নবম হিজরীতে এত অধিক সংখ্যক প্রতিনিধি দলের আগমন ঘটলো যে, বছরটির নামই হয়ে গেল "আমুল ওফুদ।" সেই বছরেরই প্রথম দিককার ঘটনা, একদিন ১০ জন বিরাট বপুধারী ও ভীতিপ্রদ মানুষ এমনভাবে মদীনা মুনাওয়ারাতে আবির্ভূত হলো যে, তাদের হাতে ছিল ঝাণ্ডা, বর্শা এবং তরবারী। তারা মসজিদে নববীর বাইরে নিজেদের উট বাঁধলো এবং এমনভাবে পা ফেলে নবীর দরবারের দিকে রওয়ানা হলো যেন মাটি তাদের পায়ের নীচে দেবে যাচ্ছিল। রহমতে আলমের (সা) খিদমতে পৌঁছে তাঁরা গৌরবপূর্ণ স্বরে আরজ করলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল! আমরা হলাম বনু আসাদ বিন খাজিমার মানুষ। আপনি নিজের কোন মানুষ আমাদের নিকট পাঠাননি বরং আমরা স্বয়ং ইসলাম গ্রহণ করেছি এবং অতপর দূর দূরান্তের পথ ভেঙ্গে আপনার খিদমতে এসেছি।"

বনু আসাদের লোকজন অত্যন্ত যোদ্ধা ও বাহাদুর ছিল। তারা কুফর ও ইসলামের সংঘর্ষে সবসময়ই কুরাইশদেরকে সমর্থন করেছে। কিন্তু মক্কা বিজয়ের পর তারা নিজেরাই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এখন তারা হুজুরের(সা) দর্শন লাভ ও বাইয়াত করার জন্য নিজেদের গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল মদীনা প্রেরণ করেছিলেন। সে সময় সেই প্রতিনিধি দল যা কিছু বলেছিল তার প্রতিটি শব্দই সঠিক ছিল। কিন্তু তাদের কণ্ঠস্বরে এমন মনে হচ্ছিল যেন তারা হুজুরের (সা) ওপর নিজেদের ইসলামের ইহসান করছিলেন। আল্লাহ তায়ালা তাদের এই আচরণ পসন্দ করলেন না এবং ইরশাদ হলো ঃ

يَمُنُّوْنَ عَلَيْكَ اَنْ اَسْلَمُوْا ؕ قُلْ لَّاتَمُنُّوْا عَلَيَّ اِسْلَامَكُمْ ۚ بَلِ اللّٰهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ اَنْ هَدٰكُمْ لِلْاِيْمَانِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ – (الحجرات : ١٧)

"[হে নবী (সা)] এরা ইসলাম গ্রহণ করেছে বলে তোমার ওপর ইহসান করে। বলে দাও যে, নিজের ইসলাম গ্রহণের জন্য আমার ওপর ইহসান করো না। বরং আল্লাহ্ তোমাদের ওপর ইহসান করেছেন যে, সে তোমাদেরকে ঈমান আনয়নের হেদায়াত করেছেন। যদি তোমরা তোমাদের কথায় সত্য হও।" (আল হুজুরাত ঃ ১৭)

এ সময় প্রতিনিধি দলের সদস্যদের মধ্য থেকে একজন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ সামনে অগ্রসর হলেন এবং অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে একটি কবিতা আবৃত্তি করলেন। কবিতাটির ভাবার্থ নিম্নরূপ ঃ

"আমি মদ্যপান ত্যাগ করেছি এবং মদের পাত্র ভেঙ্গে ফেলেছি—এবং সেই সত্তার দিকে এসেছি যিনি খুব বুলন্দ এবং যার মহানত্বের কোন সীমা পরিসীমা নেই। আমার সকল শক্তি ও প্রচেষ্টা মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধেই ব্যয়িত হতো।"

তাঁর কবিতা শুনে রহমতে আলম (সা) মুচকি হাসি দিলেন এবং বললেন ঃ

"তোমার বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি।"

এই ব্যক্তি যার ইখলাস ও কুরবানী রাসূলের (সা) দরবারে গৃহীত হওয়ার মর্যাদা পেল এবং যাঁর কর্মপদ্ধতিকে মহানবী (সা) লাভজনক বলে আখ্যায়িত করলেন—তিনি ছিলেন হযরত জিরার (রা) বিন আজওয়ার আসাদি। এই সেই জিরার (রা) বিন আজওয়ার; যাঁর বীরত্ব এবং নির্ভিকতার ঘটনাবলী ইসলামের ইতিহাসের পাতায় জ্বলজ্বল করছে। এসব ঘটনা পাঠ করে মৃত লোকদের শিরা উপশিরাতেও জীবনের উত্তাপ সৃষ্টি হয়ে থাকে।

সাইয়েদেনা আবু আজওয়ার জিরার বিন মালিক আজওয়ার (বিন আওস বিন খুজায়মা বিন রবিয়া বিন মালিক বিন ছা'লাবা বিন দাওদান বিন আসাদ বিন খুজায়মা) আরবের মশহুর কবিলা বনু আসাদ বিন খুজায়মার সাঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। গোত্রটির বসতি ছিল খায়বারের উপকণ্ঠে। হযরত জিরার(রা) স্বগোত্রে সম্মান ও বিত্তের দিক থেকে খুবই মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তিনি একাকী এক হাজার উটের মালিক ছিলেন এবং অত্যন্ত সচ্ছলতার সঙ্গে জীবন যাপন করতেন। তিনি নিজের গোত্রের রেওয়াজ অনুযায়ী তীর চালনা এবং নেযাবাজীতে পূর্ণ ধরনের পারদর্শীতা রাখতেন। তাঁর বীরত্বের কাহিনী মানুষের মুখে মুখে উচ্চারিত হতো। কবিতা ও কাব্যেও তাঁর বুৎপত্তি ছিল। তাঁর দিন-রাত এভাবেই কাটছিলো। এমন সময় কোথাও থেকে

তিনি ইসলামের কথা শুনতে পেলেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে নরম অন্তর দিয়েছিলেন। ইসলামের শিক্ষায় খুব প্রভাবিত হলেন। কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তিনি দেখতে চাইলেন যে, ইসলামের দায়ী ও কুরাইশের মধ্যেকার দ্বন্দ্বের পরিণাম ফল কি দাঁড়ায়। যখন তিনি শুনলেন যে, আরবের কেন্দ্র মক্কা মুয়াজ্জামাকে হকপন্থীরা দখল করে নিয়েছেন এবং কুরাইশরা ইসলামের রহমতের ছায়ায় আশ্রয় খুঁজছে তখন তাঁর অন্তর সাক্ষ্য দিল যে, ইসলাম সত্য দ্বীন। বস্তুত তিনি আর কোন মুবাল্লিগের অপেক্ষা না করে মন প্রাণ দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করলেন। বনু আসাদের বেশীরভাগ মানুষ তাঁকে অনুসরণ করলেন। তাদের মধ্যে তোলায়হা বিন খুয়ায়েলদ এবং ওয়াবিসা বিন মাবাদের মত নামকরা মানুষও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইসলাম হযরত জিরারের (রা) জীবনে এক বিস্ময়কর বিপ্লব সৃষ্টি করলো। তিনি মদ পান থেকে চিরকালের জন্য তওবাহ করলেন এবং মদের পাত্র ভেঙ্গে খান খান করে ফেললেন। এই সঙ্গে নিজের সকল ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে বিলিয়ে দিলেন। সুতরাং নবম হিজরীর প্রথম দিকে যখন তিনি বনু আসাদের প্রতিনিধি দলে শামিল হয়ে রহমতে আলমের (সা) পবিত্র খিদমতে পৌঁছলেন তখন তাঁর নিকট ঈমান সম্পদ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। হুজুর (সা) তাঁর ইনফাক ফী সাবীলিল্লাহ বা আল্লাহর পথে ব্যয়ের অবস্থা শুনে খুব প্রশংসা করলেন। কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে যে, এই প্রতিনিধি দলের সদস্যরা হুজুরের (সা) নিকট জিজ্ঞেস করলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল! পশুদের বুলি থেকে ভাবী শুভাশুভের নিদর্শন নেয়া যায় কি?"

হুজুর (সা) বললেন ঃ "এটা নাজায়েয।"

তারপর তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন ঃ "জ্যোতিবিদ্যা সম্পর্কে কি মত?"

হুজুর (সা) বললেন ঃ "নিসন্দেহে এটা একটা বিদ্যা। শর্ত হলো তা জানতে হবে।"

হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র) "আল ইসতিয়াব" গ্রন্থে লিখেছেন যে, হযরত জিরারের (রা) ইসলাম গ্রহণের পর বিশ্ব নবী (সা) বনু সায়েদ এবং বনু হাযিলে গিয়ে তাঁকে ইসলামের তাবলীগের কাজ শুরু করার নির্দেশ দিলেন। জিরার (রা) নবীর (সা) ইরশাদ পালনে সেই পবিত্র মিশনে রওয়ানা হয়ে গেলেন এবং হুজুরের (সা) ওফাত পর্যন্ত হকের তাবলীগের দায়িত্ব পালন করতে থাকেন।

যদিও চরিতকাররা হযরত জিরার কতদিন নবীর (সা) সরাসরি ফয়েজ লাভ করেছিলেন তা পরিষ্কার করে বলেননি। তবে, বিভিন্ন কার্যকারণে জানা যায় যে, তিনি কিছুদিন অবশ্যই হুজুরের (সা) খিদমতে থেকে দ্বীনের হুকুম-আহকাম শিখেছিলেন এবং তাবলীগের প্রশিক্ষণ লাভ করেছিলেন। কেননা হুজুর (সা) শুধু সেই সকল সাহাবীকেই দ্বীনের তাবলীগের জন্য প্রেরণ করতেন যাঁরা তাঁর নিকট সেই কাজের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হতেন এবং লোকদেরকে শুধুমাত্র ইসলামের রবকত ও ফজিলত সম্পর্কেই অবহিত করতে সক্ষম হতেন না বরং তাদেরকে সৎ ও অসৎকাজ সম্পর্কেও শিক্ষা দিতেন। কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে যে, প্রিয় নবীর (সা) শেষ যুগে তোলায়হা বিন খুয়ায়েলদ আসদী শয়তানের প্ররোচনায় এসে নবুওয়াতের দাবী করে বসলো এবং সামিরাকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করে মানুষকে কুপথে পরিচালনার কাজে ব্যাপৃত হয়ে পড়লো। বিশ্ব নবী (সা) হযরত জিরার (রা) বিন আযওয়ারকে তোলায়হার উৎখাতের জন্য নিজেদের সেসব কর্মচারী ও গোত্রের নিকট জিহাদের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করলেন যারা সামিরার কাছাকাছি ছিল। হযরত জিরার (রা) সিনান বিন আবু সিনান, আলী বিন আসাদ, কাজায়াহ এবং বনু ওয়ারকাহ গোত্রসমূহের নিকট হুজুরের (সা) পয়গাম পৌঁছিয়ে তাদের প্রতি মুরতাদদের বিরুদ্ধে সমগ্র শক্তি দিয়ে জিহাদের আহবান জানালেন। তারা হুজুরের (সা) আহবানে সাড়া দিলেন এবং হযরত জিরারের(রা) পতাকাতলে সমবেত হলেন। ওয়ারদাত নামক স্থানে মুরতাদ ও হক- পন্থীদের মধ্যে রক্তাক্ত যুদ্ধ সংঘটিত হলো। এই যুদ্ধে তোলায়হা ও তার সহযোগীদের শিক্ষণীয় এবং শোচনীয় পরাজয় ঘটলো। তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে গেল। হযরত জিরার (রা) বিজয়ীর বেশে মদীনা রওয়ানা হলেন। কিন্তু তিনি পথেই ছিলেন, এমন সময় রহমতে আলম (সা) ইন্তেকাল করেন।

হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) খিলাফতের প্রারম্ভে ধর্মদ্রোহিতার ফিতনার আগুন প্রজ্বলিত হয়ে উঠলো। সিদ্দীকে আকবার (রা) মুরতাদদের উৎখাতের জন্য বিভিন্ন দিকে সৈন্য বাহিনী প্রেরণ করলেন। এ সময় হযরত জিরারও (রা) হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদের বাহিনীতে শামিল হয়ে গেলেন। হযরত খালিদ (রা) সর্বপ্রথম তোলায়হার প্রতি মনোযোগ দিলেন। সে হযরত জিরারের (রা) নিকট পরাজিত হয়ে বাজাখাতে অবস্থান গ্রহণ করেছিলো এবং তায়, ফাজারাহ এবং আসাদ গোত্রকে নিজেদের পতাকাতলে একত্রিত করে নিয়েছিল। হযরত খালিদ (রা) তোলায়হাকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করে সিরিয়ার দিকে তাড়িয়ে[১] দিয়েছিলে। তারপর তিনি বাতাইর

পরাজিত করে সিরিয়ার দিকে তাড়িয়ে[১] দিয়েছিলে। তারপর তিনি বাতাইর দিকে অগ্রসর হলেন। এখানে বনু হানজালার সরদার এবং জাকাত আদায়কারী মালিক বিন নুয়াইরাহ দ্বিমুখী কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। সে স্বগোত্রের যাকাত খিলাফতের দরবারে প্রেরণ করেনি এবং কিছুদিন যাবত মিথ্যা নবুওয়াতের দাবীদার সাজাহ বিনতে হারেছ তামিমিয়ার সঙ্গেও তার খুব দহরম-মহরম ছিল। সাজাহ যখন পলায়নের পথ অবলম্বন করলো তখন বনু তামিমের অধিকাংশ মানুষ দ্বিতীয়বার মুসলমান হয়ে গেল এবং মালিক বিন নুয়াইরাহও ইসলাম গ্রহণ করলো। [সাজাহ প্রথমে বনু তাগাল্লুবে আশ্রয় নিল। তারপর নিজের কওমের সঙ্গে বসরায় এলো এবং নিজের কবিলার সকলের সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করেন। তারপর তিনি সারা জীবন পরহেজগারী ও দ্বীনদারীর সাথে অতিবাহিত করেন। আমীরে মুয়াবিয়ার (রা) শাসনকালে ওফাত পান। মশহুর সাহাবী হযরত সামুরাহ বিন জুনদুব (রা) তখন বসরার শাসক ছিলেন। তিনি তার নামাযে জানাযা পড়ান।] হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ বাতাহ পৌঁছে মুসলমানদের একটি দল এলাকার বিভিন্ন বস্তির দিকে প্রেরণ করলেন এবং সেই দলকে হেদায়াত দিয়ে বললেন যে, যে বস্তিতেই পৌঁছবে সেখানে প্রথমে আজান দেবে। জবাবে যদি তারাও আজান দেয় তাহলে তাদেরকে ছেড়ে দেবে। আর যদি তারা মৌনতা অবলম্বন করে অথবা কোন ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। সেই দল তাবলিগী ভ্রমণের সময় মালিক বিন নুয়াইরাহ এবং তার কতিপয় সাথীকে গ্রেফতার এবং তাদেরকে হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদের সামনে পেশ করলো। তাদের ব্যাপারে তাবলিগী দলের সদস্যদের মধ্যে মতবিরোধ ছিলো। কিছু লোকের বক্তব্য ছিল যে, মালিক বিন নুয়াইরার বস্তি থেকে আজানের আওয়াজ এসেছিল। এ জন্য তাদেরকে ছেড়ে দেয়া উচিত। অন্যদের মত ছিল যে, তারা আজানের জবাবে মৌনতা অবলম্বন করে। এ জন্য তাদের গ্রেফতারী প্রয়োজন ছিল। হযরত খালিদ (রা) তাদের বর্ণনা শুনে তাৎক্ষণিকভাবে তাদেরকে আটক

---

১. আল্লাহ তায়ালা তোলায়হাকে তওবার তাওফিক দিয়েছিলেন। সিরিয়া অবস্থানকালে তিনি দ্বিতীয়বার ইসলাম গ্রহণ করেন। একবার আবু বকর সিদ্দীকের (রা) খিলাফতকালে তিনি ওমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা গমন করছিলেন। তিনি মদীনার নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। এ সময় জনৈক ব্যক্তি হযরত আবু বকরকে (রা) তোলায়হার গমনের খবর দিল। তিনি শুনে বললেন, এখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তার সঙ্গে সংঘর্ষ বাধানো উচিত হবে না তাকে যেতে দাও। হযরত ওমর ফারুকের (রা) খিলাফতকালে তোলায়হা মদীনা এসে হযরত ওমরের বাইয়াত করলেন এবং সে যুগের অসংখ্য যুদ্ধে বিস্ময়কর কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন।

রাখার নির্দেশ দেন। বস্তুত তাদেরকে এক তাঁবুর মধ্যে আটক রাখা হলো এবং তাদের তত্ত্বাবধানের জন্য হযরত জিরার (রা) বিন আযওয়ারকে নিয়োগ করা হলো। রাতে খুব ঠাণ্ডা পড়ছিল। হযরত খালিদ (রা) "ইদফিয়ু আসরাকুম" (অর্থাৎ নিজের কয়েদীদেরকে উষ্ণতা দান কর) এই আহবান জানালেন। আরবের কিছু গোত্রের ভাষায় এই বাক্যের–অন্য অর্থও হতো। তাহলো নিজেদের কয়েদীদেরকে হত্যা করো। জিরার (রা) বিন আযওয়ার এই অর্থই বুঝলেন। তরবারীর ঝাপ্টা দিয়ে মালিক বিন নুয়াইরাহ এবং তার সঙ্গীদেরকে হত্যা করে ফেললো।[১] মশহুর সাহাবী হযরত আবু কাতাদাহ আনসারীও (রা) সেই বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁর ধারণা অনুযায়ী নিহতদের বস্তি থেকে আজানের আওয়াজ এসেছিল। এ জন্য সে ক্ষমার যোগ্য ছিল। এই ঘটনায় অসন্তুষ্ট হয়ে তিনি সোজা সিদ্দীকে আকবারের (রা) খিদমতে মদীনা মুনাওয়ারা পৌঁছেন এবং খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেন যে, তিনি মালিক বিন নুয়াইরাহকে অন্যায়ভাবে হত্যা করিয়েছেন। হযরত আবু বকর (রা) হযরত খালিদকে (রা) মদীনা ডেকে জবাব তলব করেন। তিনি যা ঘটেছিল তা সত্য সত্য বর্ণনা করলেন। সিদ্দীকে আকবার (রা) তাঁর ওজর কবুল করলেন। কিন্তু হযরত ওমর ফারুক (রা) মত দিয়ে বললেন যে, খালেদ অবশ্যই সতর্কহীনতার পরিচয় দিয়েছেন। এ জন্য তাঁকে পদচ্যুত করা হোক।

সিদ্দীকে আকবার (রা) জবাবে জানালেন ঃ

"আল্লাহ তায়ালা যে তরবারীকে কাফেরদের ওপর আপতিত করেছেন আমি তাকে খাপে আবদ্ধ করতে পারি না।"

এই ঘটনার পর হযরত জিরার (রা) বিন আযওয়ার হযরত খালিদের (রা) অধীন ইয়ামামার রক্তাক্ত যুদ্ধে শরীক হন। মতান্তরপূর্ণ রেওয়ায়াত অনুযায়ী

---

১. প্রখ্যাত কবি মুতাম্মিম বিন নুয়াইরাহ মলিক বিন নুয়াইরাহর সহোদর ছিলেন। তিনি সহোদরকে সীমাহীন ভালবাসতেন। তার হত্যার পর তিনি সবসময় ক্রন্দন ও মরছিয়া পাঠ করতেন। লোকজন তার মরছিয়া শুনে অযাচিতভাবে কেঁদে দিতেন। মালিকের হত্যায় তিনি এমন দরদমাখা মরছিয়া লিখেন যে, তা শুনে সকলেই রোরুদ্যমান হয়ে উঠতো। একবার তিনি হযরত ওমরের (রা) খিদমতে হাজির হলে তিনি এই মরছিয়া শোনার ইচ্ছা প্রকাশ করেন মুতাম্মিম মরছিয়া পাঠ করলে হযরত ওমর ফারুক (রা) অশ্রুসজল হয়ে উঠলেন এবং বললেন ঃ "হায়! আমিও যদি মরছিয়া বলতে পারতাম তাহলে নিজের ভাই যায়েদ (রা) বিন খাত্তাবের মরছিয়া বলতাম।" মুতাম্মিম বললেন, "আমীরুল মু'মিনীন! আমার ভাই যদি আপনার ভাইয়ের মত লড়াই করে শহীদ হয়ে যেতেন তাহলে আমি কখনই তার জন্য মাতম করতাম না।"

মুসায়লামা কাজ্জাব ৪০ হাজার অথবা এক লাখ সৈন্য নিয়ে মুসলমানদের সঙ্গে মুকাবিলা করে। ঐতিহাসিক তাবারি বর্ণনা করেছেন যে, মুসলমানরা এ থেকে কঠিন যুদ্ধে কোন সময় লিপ্ত হয়নি। হযরত জিরার (রা) এই যুদ্ধে এতো আবেগ প্রদর্শন করেছিলেন যে, সমগ্র দেহ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গিয়েছিল। বাঁচার কোন আশা ছিল না। কিন্তু তাঁকে দিয়ে আরো বড় দায়িত্ব আঞ্জামের পরিকল্পনা ছিল আল্লাহর। কিছুদিন পর ক্ষতগুলো শুকিয়ে গেল এবং তিনি আল্লাহর দুশমনদেরকে ধরাশায়ী করার জন্য উঠে দাঁড়ালেন।

আল্লামা ইবনে আছির (র) "উসুদুল গাব্বাতে" ঐতিহাসিক ওয়াকেদীর উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যে, "হযরত জিরার (রা) বিন আযওয়ার ইয়ামামার যুদ্ধে শাহাদাত প্রাপ্ত হন। লড়াই করতে করতে তাঁর দুই পা গোছা থেকে কেটে গিয়েছিল। এ সময় তিনি হাটুর ওপর ভর করে করে লড়াই চালিয়ে যেতে থাকেন। এভাবে তিনি ঘোড়ার পদতলে নিষ্পিষ্ট হন।"

জানা যায় যে, এ ব্যাপারে ওয়াকেদী কোন কারণে অস্পষ্ট বর্ণনার শিকার হয়েছেন। নিসন্দেহে হযরত জিরার (রা) ইয়ামামার যুদ্ধে মারাত্মকভাবে আহত হন। কিন্তু কয়েক বছর পর তাঁর ওফাত হয়। সকল ঐতিহাসিকই সিরিয়ার যুদ্ধসমূহে হযরত জিরারের (রা) অংশগ্রহণের কথা স্বীকার করেছেন। এমনকি স্বয়ং ওয়াকেদীও সিরিয়ার যুদ্ধসমূহে হযরত জিরারের (রা) কৃতিত্বের কথা প্রা লভাবে বর্ণনা করেছেন। এ জন্য ইয়ামামার যুদ্ধে হযরত জিরারের (রা) শাহাদাতের রেওয়ায়াত কোনভাবেই সঠিক নয়।

মুসলমানরা যখন সিরিয়ার ওপর সেনা অভিযান চালায় তখন হযরত জিরার (রা) এবং তাঁর বাহাদুর বোন খাওলা (রা) বিনতে আযওয়ারও মুজাহিদদের দলে শামিল হন। সিরিয়ার যুদ্ধসমূহে তাঁরা উভয়েই এমন বিস্ময়কর কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন যে, সে কাহিনী পড়ে রক্ত টগবগিয়ে ওঠে। লড়াইয়ের ময়দানে কখনো তিনি আপাদমস্তক যিরাহ পরিধান করতেন। আবার কখনো কুরতা খুলে ঘোড়ার খালি পিঠে চড়ে যুদ্ধগাথা পড়তে পড়তে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তেন। এসব কারণে তিনি রোমকদের মধ্যে "জ্বিন" হিসেবে মশহুর হয়ে গিয়েছিলেন। যে দিকেই যেতেন, রোমকরা জ্বিন এসেছে জ্বিন এসেছে বলে ভেগে যেতো। অধিকাংশ যুদ্ধ ইতিহাস লিখক বলেছেন যে, নজিরবিহীন বীরত্বের বদৌলতে হযরত জিরারকে (রা) এক হাজার আরব বাহাদুরের সমান মনে করা হতো।

তের হিজরীতে মুসলমানরা দামেস্ক অবরোধ করে। এ সময় ইসলামের সিপাহসালার হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ হযরত জিরারকে (রা)

দু'হাজার সওয়ার দিয়ে অগ্রগামী সৈনিক প্রহরীর অফিসার নিয়োগ করলেন। সকল ইসলামী বাহিনীর চার পাশে চক্কর দান এবং তাদের হিফাজত করাই ছিল তাদের প্রধান কাজ। অবরোধকালে একদিন হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ খবর পেলেন যে, অবরুদ্ধদের সাহায্যের জন্য রোমকদের একটি বাহিনী দামেস্কের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তিনি হযরত জিরারকে (রা) পাঁচশ সওয়ার দিয়ে সেই বাহিনীকে রাস্তায় যেভাবেই হোক বাধা দিতে বললেন। হযরত জিরার (রা) সঙ্গীদেরসহ তুফান বেগে সেই অভিযানে রওয়ানা হয়ে গেলেন। শত্রুবাহিনীর নিকট পৌঁছে জানতে পেলেন যে, তাদের সংখ্যা ১০/১২ হাজারের থেকে কম নয়। কয়েক জন মুসলমান সিপাহী পরামর্শ দিয়ে বললেন যে, আমাদের সংখ্যা খুবই কম। এ সময় এতোবড় দলের সাথে লড়াই করাটা মুসলিহাত বিরোধী কাজ হবে। এ জন্য আরো সৈন্য এনে তাদের ওপর হামলা করাটাই উত্তম হবে। হযরত জিরার (রা) আবেগাপ্লুত হয়ে বললেন ঃ

"আল্লাহর কসম! আমি এখান থেকে এক পাও পিছু হটবো না। যারা যেতে চায় তাদেরকে আমি যাওয়ার অনুমতি দিলাম। তারা অবশ্যই চলে যেতে পারে। কিন্তু আমিতো আমার জীবনকে আল্লাহর পথে বিক্রয় করে দিয়েছি।"

অন্য মুসলমানের আবেগও উথলে উঠলো। তারা বললো, এটা তো একটা পরামর্শ মাত্র ছিল। নচেৎ আমরাও মাথায় কাফন বেঁধে বের হয়েছি। একথা বলে সবাই নারায়ে তাকবির ধ্বনি দিল। এই ধ্বনি শত্রুর ওপর বিদ্যুৎবেগে গিয়ে আপতিত হলো। রোমকদের ধারণা ছিল যে, কয়েক মুহূর্তের মধ্যে তারা এই সামান্য কয়েক জনের কাজ শেষ করে দেবে। তাদের এই সুধারণা অহেতুক ছিল না। কেননা তারা সকলেই অভিজ্ঞ সিপাহী ছিল এবং তাদের নেতৃত্ব করছিল হিরাক্লিয়াসের এক নামকরা জেনারেল। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা হৃদয়ঙ্গম করতে পারলো যে, সেই সামান্য কয়েকজন জীবন উৎসর্গকারীকে পরাজিত করা খুব সহজ কাজ নয়। হযরত জিরার (রা) এসময় বীরত্বের আবেগে নিজের কুরতা খুলে ফেললেন। তারপর এক দীর্ঘ বর্শা হাতে নিয়ে বাঘের মত রোমকদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং লাশের পর লাশ ফেলতে ফেলতে রোমকদের সরদার দারদানের দিকে অগ্রসর হলেন। বহু সংখ্যক রোমক যোদ্ধা নিজেদের সরদারকে রক্ষা করছিলো। তারা হযরত জিরারকে (রা) বাধা দিতে লাগলো এবং তাঁকে নিজেদের ঘেরে নিয়ে চারদিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়লো। কিন্তু তিনি কাউকেই তাঁর নিকট ভীড়তে দিচ্ছিলেন না। এই দলে দারদান পুত্র হামরানও শামিল ছিল। সে ছিল একজন নামকরা যোদ্ধা। সে রোমকদেরকে গালি দিয়ে বললো যে, তোমরা একজন মানুষকেও

কাবু করতে পারছো না। একথা বলেই নিজের বর্শা দিয়ে সে জিরারের (রা) ওপর হামলা করে বসলো। হামলায় তাঁর বাহুতে আঘাত লাগলো। কিন্তু এই অবস্থাতে পূর্ণ শক্তি দিয়ে নিজের বর্শা হামরানের ওপর মারলেন এবং তাকে রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে ফেলে দিলেন। রোমকরা এ সময় নিজেদের ঘেরকে ছোট করে ফেললো। কয়েকজন মুসলমান মাথা বাজি রেখে জিরারের (রা) সাহায্যের জন্য অগ্রসর হচ্ছিলেন। এমন সময় জিরারের (রা) ঘোড়া একাএকি হোঁচট খেলো এবং তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন। রোমকরা তাঁকে এবং অন্য কতিপয় মুসলমানকে গ্রেফতার করলো। কয়েদীদের মধ্যে হযরত আবদুর রহমান বিন আবি বকরের (রা) আযাদকৃত গোলাম সালেমও (রা) ছিলেন। রাস্তায় তিনি কোনক্রমে নিজের বাধন খুলে রোমকদের কয়েদ থেকে পালিয়ে সোজা খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদের খিদমতে পৌঁছলেন।

হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ সালেমের (রা) মুখে জিরার (রা) বিন আযওয়ারের গ্রেফতারীর কথা শুনে খুব মনোকষ্ট পেলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি মাইসারাহ (রা) বিন মাসরুককে এক হাজার সিপাহী দিয়ে দামেস্কের পূর্ব দরজাতে অবরোধের জন্য প্রেরণ করলেন এবং অবশিষ্ট সৈন্য সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে রওয়ানা হলেন। পথিমধ্যে তিনি দেখতে পেলেন যে, ইসলামী বাহিনীর আগে আগে একজন নিকাবধারী লাল রংয়ের ঘোড়ার ওপর সওয়ার হয়ে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে যুদ্ধের ময়দানের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তিনি বিস্মিয়াভিভূত হয়ে পড়লেন যে, লোকটি কে। কিন্তু যাচাই করার সুযোগ ছিল না। সেজন্য চুপ রইলেন। যখন রোমক বাহিনীর সঙ্গে মুসলমানদের যুদ্ধ শুরু হলো তখন হযরত খালিদ (রা) দেখলেন যে, সেই নিকাবধারী এমন বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করছে যে, যেদিকে ঝুকছে সেদিকই পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। আঘাতের পর আঘাত খেয়েও পিছু হটার নাম নিচ্ছে না। তিনি সঙ্গীদেরকে সেই নিকাবধারী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। কিন্তু কেউই জবাব দিতে পারলেন না। ইত্যবসরে সেই নিকাবধারী মেরে কেটে রোমক বাহিনীর অভ্যন্তর থেকে রক্তে অবগাহন করে বেরিয়ে এলো। হযরত খালিদ (রা) নিজের ঘোড়া দৌঁড়িয়ে তাঁর নিকট পৌঁছলেন এবং চীৎকার দিয়ে বললেন, "হে মরদে মুজাহিদ! তুমি জীবনবাজী রাখার হক আদায় করেছ। তুমি আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের (সা) সামনে সফল হিসেবে উপস্থিত হবে। তোমার মত জীবন উৎসর্গকারীর নিকাব পরিধান করা শোভা পায় না। নিজের চেহারার ওপর থেকে নিকাব বা পরদা হটিয়ে দাও। যাতে আমি দেখতে পাই যে, তুমি কোন ব্যাঘ্র বীর?"

নিকাবধারী প্রথম দিকে তো চুপ মেরে রইলেন। কিন্তু হযরত খালিদ (রা) যখন পীড়াপীড়ি করলেন তখন বললেন ঃ

"হে আমীর! আমি জিরার (রা) বিন আযওয়ারের সহোদরা খাওলা বিনতে আযওয়ার। আমি আমার প্রিয় ভাইয়ের গ্রেফতারীতে খুব অশান্তিতে আছি। আল্লাহর কসম! আমি আমার ভাইকে দুশমনের পাঞ্জা থেকে মুক্ত করিয়ে ছাড়বো অথবা সেই প্রচেষ্টায় নিজের জীবন দান করবো।"

হযরত খালিদ (রা) খাওলার (রা) বাহাদুরী দেখে বিস্মিত হয়ে পড়লেন এবং বললেন, "সাবাশ খাওলা! যে জাতির মধ্যে তোমার মত কন্যা আছে সে জাতিকে দুশমন কখনো পরাজিত করতে পারে না। বেটি তুমি মুতমায়েন থাকো যে, জিরার (রা) যদি জীবিত থাকে তাহলে ইনশাআল্লাহ আমি তাকে মুক্ত করে ছাড়বো। আর যদি সে শহীদ হয়ে চিরঞ্জীব হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে আমিও তার পদচিহ্ন অনুসরণ করে চলার শপথ নিয়ে রেখেছি।"

একথা বলে তিনি বাছাইকরা সৈন্যদল সঙ্গে নিলেন এবং রোমকদের ওপর "আল্লাহর তরবারী" সদৃশ হামলা চালালেন। হযরত খাওলাও (রা) সে সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন। এই সময় তিনি একটি কবিতা আবৃত্তি করছিলেন। কবিতাটির ভাবার্থ হলো ঃ

"হে আমার একমাত্র ভাই! হে আমার মায়ের পুত্র। তুমি আমার আরাম আয়েশকে মলিন করে ফেলেছ এবং আমার নিদ্রাকে করেছ হারাম। হে জিরার! তুমি কোথায়। তুমি আজ আমার এবং আমার কবিলা ও কওমের দৃষ্টিগোচর হচ্ছো না।"

খাওলার (রা) দরদমাখা কবিতা মুসলমানদের অন্তরে আগুন লাগিয়ে দিল। তারা পাগলের মত জিরারকে (রা) অনুসন্ধান করছিল। ইত্যবসরে রোমকদের একটি দল গ্রেফতার অবস্থায় হযরত খালিদের (রা) সামনে এলো। তিনি রোমকদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, "আমাদের একজন সঙ্গী যে, ঘোড়ার শূন্য পিঠে চড়ে খালি গায়ে লড়াই করছিল সে তোমাদের হাতে গ্রেফতার হয়েছে। তাকে তোমরা কোথায় রেখেছ?"

রোমকরা জবাব দিলো, "আমাদের সরদার সেই ব্যক্তিকে একশ' সওয়ারের হিফাজতে হেমস পাঠিয়ে দিয়েছে। যাতে বাদশাহ হিরাক্লিয়াসের সামনে তাকে পেশ করে বলা যায় যে, কি ধরনের জ্বিনের সামনা সামনি আমরা হয়েছি।"

হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ তক্ষুণি রাফে' (রা) বিন উমায়রাহ তায়ীকে একশ' সওয়ারসহ দ্রুতগতিতে হিমসের পথে রওয়ানা হওয়ার এবং জিরারকে (রা) রোমকদের পাঞ্জা থেকে মুক্ত করে আনার নির্দেশ দিলেন।

রাফে' (রা) কালবিলম্ব না করে একশ' সওয়ারসহ রোমকদের পশ্চাদ্ধাবন করলেন। হযরত খাওলাও (রা) হযরত খালিদের (রা) অনুমতি নিয়ে সেই দলের সঙ্গে গেলেন। অনেক চেষ্টা ও দৌড়াদৌড়ির পর রোমকদের দল মুসলমানদের দৃষ্টিগোচর হলো। তারা জিরার (রা) ও তাঁর সঙ্গীদেরকে হাত পা বাঁধা অবস্থায় উটের ওপর রেখে হেসেখেলে চলছিলো। জিরার (রা) সে সময় খুব দরদপূর্ণ ভাষায় একটি কবিতা পাঠ করছিলেন। কবিতাটির অর্থ হলো ঃ

"হে খবর দানকারী! তুমি আমার কওম ও খাওলাকে এই খবর পৌঁছে দাও যে, আমি গ্রেফতার, অসহায় এবং জিঞ্জিরাবদ্ধ অবস্থায় আছি। আমার চারপাশে রোমক জিরাহ্ পরিধানকারী ও অস্ত্রধারী কাফিররা রয়েছে এবং আমি তাদের মধ্যে এমন অবস্থায় আছি যে, না উল্টে ফিরে যেতে পারি। না কোন সাহায্য পেতে পারি।

অতএব, হে অন্তর! তুমি দুঃখ ও চিন্তায় মৃত হয়ে যাও এবং হে আমার চক্ষু! তুমি আমার গণ্ডদেশে প্রশ্রবণ প্রবাহিত করে দাও। হায়! আমার কওম ও খাওলা যদি আমার নিকট হতো তাহলে আমি আমার জন্য সেই নির্দেশ আবশ্যক করে নিতাম যার ওপর আমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।"

খাওলা (রা) এই কবিতা শুনে অস্থির হয়ে পড়লেন এবং চীৎকার করে বললেন, "হে আমার ভাই! আমি এসে গেছি।" একথা বলে তিনি বাঘের মত রোকমদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। অনান্য মুজাহিদও আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিয়ে রোমকদের ওপর গিয়ে পড়লো এবং কয়েক মুহূর্তের মধ্যে তাদেরকে খতম করে ফেললেন। ভাই-বোন আলিঙ্গনাবদ্ধ হলো এবং আনন্দে আত্মহারা হয়ে উভয়েই কেঁদে ফেললেন। হযরত জিরার (রা) এবং তাঁর সঙ্গীরা দুশমনের কয়েদ থেকে মুক্ত হয়ে হযরত খালিদের (রা) বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হলেন। তারা সে সময় দারদানের মুকাবিলায় নিয়োজিত ছিল। সহীহ্ সালামতে তারা ফিরে আসার জন্য মুসলমানরা খুব খুশী হলো এবং তাদের সাহস দ্বিগুণ হয়ে গেল। পরের দিন যুদ্ধ শুরু হলে রোমকরা খুব তাড়াতাড়ি হিম্মত হারা হয়ে পড়লো এবং নিজেদের হাজার হাজার মানুষ হত্যা করিয়ে পালিয়ে গেল। প্রভূত পরিমাণে গনিমতের মাল মুসলমানদের হস্তগত হলো এবং বিজয়ীর বেশে তাঁরা দামেস্ক প্রত্যাবর্তন করলেন।

দামেস্ক তখনো জয় হয়নি। হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ খবর পেলেন যে, হিরাক্লিয়াস একটি বিরাট বাহিনী আজনাদাইন পাঠিয়ে দিয়েছে। হযরত আবু উবায়দাহ (রা) ইবনুল জাররাহর পরামর্শ অনুযায়ী হযরত খালিদ (রা)

দামেস্কের অবরোধ সাময়িকভাবে প্রত্যাহার করে নিলেন এবং আজনাদাইন রওয়ানা হয়ে গেলেন। এই সাথে অন্যান্য সেকটরের সেনাপতিকে স্ব স্ব সৈন্যসহ আজনাদাইন পৌঁছার চিঠি প্রেরণ করলেন। মুসলমানরা দামেস্ক থেকে রওয়ানা হলে হযরত খালিদ (রা) অগ্রবর্তী বাহিনীর কমাণ্ড নিজের হাতে তুলে নিলেন এবং হযরত আবু ওবায়দাহ (রা) মহিলা ও শিশুদেরকে নিজের তত্ত্বাবধানে নিয়ে সৈন্য বাহিনীর পিছু রওয়ানা হয়ে গেলেন। অবরুদ্ধ দামেস্কবাসীরা যখন দেখলো যে, মুসলমানরা ফিরে যাচ্ছে তখন সেখানকার দুই রোমক সরদারের জীবনে স্পন্দন ফিরে এলো। তারা দু'জন ছিল সহোদর। সেই সঙ্গে একই সাথে ছিল খৃস্টানদের ধর্মীয় নেতা এবং সেনাপতি। তাদের একজনের নাম ছিল পিটার এবং অপর জনের নাম ছিল পল অথবা পোলোস। উভয়ে ১৬ হাজার পদাতিক সৈন্য ও সওয়ারসহ দামেস্ক থেকে বের হলো এবং মুসলমানদের পশ্চাৎভাগের সৈন্যদের ওপর হামলা করে বসলো। বস্তুত এটা ছিল অতর্কিত হামলা। মুসলমানরা এদিকে নজর দিতে দিতে রোমকরা কিছু মুসলমান মহিলাকে গ্রেফতার ও লুটপাট করে নিয়ে গেল। সেই মহিলাদের মধ্যে জিরারের (রা) বাহাদুর বোন খাওলাও (রা) ছিলেন। রোমকরা একস্থানে যখন বিশ্রামের জন্য তাঁবু ফেললো তখন খাওলা (রা) কয়েদী বোনদেরকে বললেন ঃ

"বোনেরা আমার। আমরা বাহাদুর আরবদের কন্যা এবং হাদিয়ে বরহকের (সা) অনুসারী। এসব মুশরিকের আনুগত্য কবুলের পরিবর্তে আমাদের মৃত্যুবরণ করা উচিত।"

এসব মহিলার মধ্যে তাবা' ও হেমইয়ার গোত্রের মহিলারাও ছিলেন। বর্শা চালনা এবং ঘোড় দৌড়ে তাদের পুরুষদের সমান স্বীকৃতি ছিল। খাওলার (রা) অগ্নিঝরা বক্তৃতা শুনে তাদের রক্ত টগবগ করে উঠলো এবং তারা একবাক্যে ঘোষণা করলো ঃ "খাওলা (রা) তুমি ঠিকই বলেছ যে, আমাদের জীবনবাজী রেখে কাজ করা উচিত। কিন্তু অস্ত্র ও ঘোড়া ছাড়া রোমকদের মুকাবিলার কি পন্থা রয়েছে?"

খাওলা বললেন ঃ "পার্থিব সামান ছাড়া শুধুমাত্র আল্লাহর ওপর ভরসা করে বাতিলের বিরুদ্ধে অটল হয়ে দাঁড়ানোই হলো বাহাদুরী। এসো, তাঁবুর খুঁটি তুলে নি এবং তা দিয়ে রোমকদের মাথা ফাটিয়ে দি। এভাবে যদি রেহাই পাওয়া যায় তাহলে নিজেদের বাহিনীতে গিয়ে মিলিত হওয়া যাবে। নচেৎ শাহাদাতের মর্যাদা লাভ ঘটবে।"

এরপর সকল মহিলা উঠে দাঁড়ালো এবং তাঁবুর খুঁটি তুলে লড়াই করে মরার প্রস্তুতি নিলো। খাওলা (রা) তাদেরকে একটি বৃত্তের মত করে সুশৃংখলভাবে দাঁড় করালেন। অতপর সকলেই যুদ্ধগাথা পড়তে পড়তে কাফেরদের ওপর হামলা করলো।

রোমকরা চারদিক থেকে মহিলাদেরকে ঘিরে নিল। কিন্তু তাঁরা তাঁবুর খুঁটি দিয়ে তাদের মাথা ফাটিয়ে দিতে লাগলো এবং কাউকে তাদের নিকট আসতে দিল না। বেশ কিছুক্ষণ যাবত এমনিভাবে মুকাবিলা অব্যাহত রইলো এবং কয়েকজন রোমক এই জানবাজ মহিলাদের হাতে নরক যাত্রা করলো। শেষে রোমকরা ক্রুদ্ধ হয়ে তাদের ওপর এক সিদ্ধান্তমূলক হামলা করার চিন্তা করলো। এদিকে খালিদ (রা) এবং জিরার (রা) মহিলাদের গ্রেফতারীর খবর পেলেন। এ সময় তাঁরা একটি দ্রুতগতিসম্পন্ন বাহিনীসহ রোমকদের পেছনে রওয়ানা হলেন। যখন রোমকরা ইসলামের কন্যাদের ওপর শেষ হামলার জন্য অস্ত্র হাতে নিচ্ছিলো ঠিক সেই সময় তাঁরা মুসলমান ব্যাঘ্রদের ভয়াবহ আওয়াজ শুনলেন। তাদের আসমান বিদীর্ণ নারায় মাটি কেঁপে উঠছিলো। রোমকদের বীরত্ব ভাব উবে গেল এবং তারা সকল কিছু ছেড়ে ছুড়ে উল্টো পায়ে দামেস্কের দিকে পালিয়ে গেল। হযরত জিরার (রা) বিদ্যুৎবেগে অগ্রসর হয়ে পিটারকে ধরে ফেললেন এবং নিজের বর্শা তার শরীরের এপার ওপার করে দিলেন। তারপর দামেস্কের দরজা পর্যন্ত বুযদিল রোমকদের পিছু ধাওয়া করলেন।

মহিলারা এই গায়েবী সাহায্যের জন্য আল্লাহর শুকর আদায় করলেন এবং জিরার (রা) নিজের জানবাজ সহোদরার সঙ্গে মিলিত হয়ে খুব খুশী হলেন।

মহিলাদের এই ব্যাপার থেকে ফারেগ হয়ে হযরত খালিদ (রা) আজনাদাইনের দিকে অগ্রসর হলেন। সেখানে দারদার ৯০ হাজার সৈন্য নিয়ে অপেক্ষা এবং মুসলমানদেরকে পিষে ফেলার পরিকল্পনা করছিলো। হযরত খালিদ (রা) আজনাদাইন পৌঁছে নিজেদের সৈন্যকে নতুন করে সাজালেন এবং অফিসারদেরকে যথাযথ হেদায়াত দিলেন। যুদ্ধ শুরু হলে আরমেনী তীরন্দাজরা মুসলমানদের ওপর এমনভাবে তীর বর্ষণ করলো যে, ২০ জন মুসলমান আহত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। সে সময় হযরত জিরার (রা) একটি মজবুত জিরাহ পরিধান করেছিলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে নিজের ব্যূহ থেকে বের হলেন এবং নিজের বর্শা দিয়ে আর্মেনী তীরন্দাজদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। মুহূর্তের মধ্যে তিনি ৩০ জন আর্মেনীয়র বুক ছিদ্র করে ফেললেন এবং অবশিষ্টদেরকে ভেগে যেতে বাধ্য করলেন। তারপর তিনি ময়দানে

দাঁড়িয়ে গেলেন। এবং রোমকদেরকে উচ্চৈস্বরে আহবান জানিয়ে বললেন যে, যদি কোন পুরুষ থাকে তাহলে সামনে এসো। একজন রোমক অফিসার গর্জন করতে করতে তার মুকাবিলায় দাঁড়ালো। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে জিরারের (রা) বর্শা তার কলিজার এপার ওপার হয়ে গেল। তারপর আসতফান নামক এক রোমক যোদ্ধা হযরত জিরারের (রা) সামনে এলো। সে ছিল একজন অভিজ্ঞ সিপাহী। সে কোনমতেই জিরারের (রা) বর্শার আওতায় আসছিলো না। পক্ষান্তরে সে নিজের বর্শা দিয়ে জিরারের (রা) ওপর উপর্যুপরি হামলা শুরু করে দিল। তাদের দু'জনের যুদ্ধ এত দীর্ঘ সময় ধরে চলতে লাগলো যে, উভয় বাহিনীই অস্থির হয়ে পড়লো। হযরত খালিদ (রা) জিরারকে (রা) ডেকে বললেন ঃ

"জিরার (রা) কি ব্যাপার, তোমার শত্রু এখনো জীবিত রয়েছে। তুমি তোমার আরবী ঘোড়ার সাহায্য কেন নিচ্ছ না। শত্রুর চারপাশে চক্র বেঁধে হতভম্ব করে দাও।"

জিরার (রা) হযরত খালিদের (রা) হেদায়াতের ওপর আমল করলেন। এমনকি আসতুফানের ঘোড়া ক্লান্ত হয়ে পড়লো। ইত্যবসরে জিরার (রা) দেখলেন যে, একজন রোমক একটি তাজাদম ঘোড়া নিয়ে আসতুফানের সাহায্যের জন্য আসছে। জিরার (রা) ঘোড়া ছুটিয়ে তার নিকট পৌঁছে নিজের বর্শা দিয়ে তাকে শেষ করে ফেললেন। সাথে সাথে লাফ দিয়ে রোমকের ঘোড়ায় চড়ে বসলেন এবং নিজের ক্লান্ত ঘোড়াকে ইসলামী বাহিনীর দিকে হাকিয়ে দিলেন। অতপর তিনি আসতুফানের ওপর এমনভাবে হামলা করে বসলেন যে, সে সামলিয়ে উঠতে পারলো না এবং ঘোড়া থেকে পতিত হতে লাগলো। হযরত জিরার (রা) তৎক্ষণাৎ তার মাথা কেটে নিলেন। শারীরিক শক্তি এবং যুদ্ধ পারদর্শীতার ভিত্তিতে রোমকদের মধ্যে আসতুফান খুবই গণ্যমান্য মানুষ ছিলেন। তার হত্যার দৃশ্য দেখে রোমক বাহিনী চীৎকার দিয়ে উঠলো এবং মুসলমানদের তাকবির ধ্বনিতে ভূমি ও পাহাড় গুঞ্জরিত হতে লাগলো। তারপর উভয় বাহিনীর মধ্যে সাধারণ যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রচণ্ড যুদ্ধ হলো। কিন্তু কোন ফায়সালা হলো না। পরের দিন উভয় বাহিনীর মধ্যে রক্তাক্ত যুদ্ধ সংঘটিত হলো। অন্তে রোমক সিপাহসালার দারদান জিরারের (রা) হাতে নিহত হলো এবং ৫০ হাজার রোমকের লাশ যুদ্ধের ময়দানে পড়ে রইলো। এভাবে মুসলমানদের মহান বিজয় সাধিত হলো এবং তারা দ্বিতীয়বার দামেস্ক অবরোধ করলো। খৃষ্টানরা কিছুদিন দৃঢ়তার সঙ্গে মুকাবিলা করলো। কিন্তু তারা নিরাশ হয়ে পড়লো এবং মুসলমানদের নিকট শহর সমর্পণ করলো। দামেস্ক বিজয়েও হযরত জিরার (রা) উল্লেখযোগ্য

ভূমিকা পালন করেন এবং খৃষ্টানদের সাথে কয়েকটি যুদ্ধে নিজের বীরত্বের নৈপুণ্য দেখান।

আজনাদাইন ও দামেস্ক বিজয়ের পর মুসলমানরা ফাহালের দিকে অগ্রসর হলো। সেখানে হিরাক্লিয়াসের জেনারেল সাকলা বিন মিখরাক একটি বিরাট বাহিনীসহ প্রস্তুত ছিল। ফাহালের দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় হযরত আবু ওবায়দা (রা) [অথবা হাশিম (রা) বিন উতবা] সৈন্য ব্যূহের বাম পাশের কমাণ্ড নিজে নিলেন। খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ অগ্রবর্তী বাহিনী, শুরাহবিল (রা) বিন হাসানা অভ্যন্তর বাহিনী, আমর (রা) বিন আছ [অথবা মায়াজ (রা) বিন জাবাল] ডান পাশের, সাঈদ (রা) বিন যায়েদ পদাতিক বাহিনীর এবং জিরার (রা) বিন আযওয়ার অশ্বারোহী বাহিনীর অফিসার নিযুক্ত হলেন। ফাহালে মুসলমান ও রোমকদের মধ্যে প্রচণ্ড লড়াই সংঘটিত হলো এবং তা কয়েকদিন অব্যাহত রইলো। রাত-দিন যুদ্ধের ময়দান উত্তপ্ত থাকতো। রোমকদের তুলনায় মুসলমানদের সংখ্যা খুবই কম ছিল। কিন্তু তারা সীমাহীন সাহাসিকতা ও অটলতার প্রমাণ দিলেন এবং অব্যাহত যুদ্ধের কারণে নিজেদের মধ্যে ক্লান্তি ও শ্রান্তির অবকাশ দিলেন না। জিরার (রা) ও তাঁর সওয়ার শত্রুর জন্য গজব হিসেবে প্রমাণিত হলো। তিনি এত সংখ্যক রোমক হত্যা করলেন যে, ময়দান লাশে পূর্ণ হয়ে গেল। শেষে তাদের সরদার সাকলাও জনৈক মুসলমানের তরবারীর আঘাতে মারা গেল এবং সাথে সাথে রোমক বাহিনী পালিয়ে গেল। এই যুদ্ধের পর জর্দানের সকল শহর এবং স্থান খুব সহজেই বিজয় হলো।

পনেরো হিজরীতে ইয়ারমুকের যুদ্ধ সংঘটিত হয় এই যুদ্ধে সিরিয়ার ভাগ্য নির্ধারিত হয়। এই যুদ্ধে রোমকদের সংখ্যা বিভিন্ন মত অনুযায়ী দুই লাখ থেকে ১০ লাখের মধ্যে ছিল। তাতে অভিজ্ঞ জেনারেল ও সিপাহি ছিল। উভয় বাহিনী মুখোমুখি হলে প্রথমে উভয় দিক থেকে দূত গমনাগমন করলো। রোমকরা চেয়েছিল যে, মুসলমানরা অর্থ নিয়ে ফিরে যাক। কিন্তু মুসলমানরা তাতে কোনমতেই সম্মত হলো না। লড়াই শুরু হলে প্রথম দিন আরব বংশোদ্ভূত ৬০ হাজার খৃষ্টান জাবালা বিন আইহামের নেতৃত্বে মুসলমানদের ওপর হামলা করলো। হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ তাদের মুকাবিলায় শুধুমাত্র ৬০ জন মুজাহিদ প্রেরণ করলেন। তাঁরা ছিলেন আরবের স্বীকৃত অশ্বারোহী এবং তাঁদের প্রত্যেককে এক হাজার অশ্বারোহীর সমান মনে করা হতো। হযরত জিরার (রা) বিন আযওয়ারও সেসব জানবাজের মধ্যে শামিল ছিলেন। এই ৬০ জন জীবন উৎসর্গকারী গেরিলা কায়দায় যুদ্ধ শুরু করলেন।

কখনো শত্রুবাহিনীর এক অংশের ওপর গিয়ে পড়তেন। আবার কখনো অন্য অংশের ওপর। এমনিভাবে তাঁরা সন্ধ্যা পর্যন্ত শত্রুকে ব্যস্ত রাখলেন এবং নিজেদের বড় বাহিনীর দিকে অগ্রসর হতে দিলেন না। এই বিস্ময়কর ও অপূর্ব যুদ্ধে শত্রু পক্ষের হাজার হাজার সিপাই নিহত হলো। পক্ষান্তরে মুসলমানদের ১০ ব্যক্তি শহীদ এবং ৫ জন যুদ্ধবন্দী হিসেবে গ্রেফতার হলেন। [পরবর্তী দিন এসব কয়েদীকে হযরত খালিদ (রা) মুক্ত করিয়ে নিলেন।]

যুদ্ধের প্রথম দিন রোমকদের জন্য অত্যন্ত তিক্ত বলে প্রমাণিত হলো। মুসলমানরা তাদের ওপর কয়েকবার জীবনবাজী রেখে হামলা করলো। কিন্তু রোমকরা সে হামলা প্রতিহত করে তাদেরকে পিছু হটিয়ে দিলো। এই যুদ্ধে মুসলমান মহিলারা প্রচণ্ড সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন। একবার রোমকরা যখন হামলা করতে করতে মহিলাদের তাঁবু পর্যন্ত এসে পৌঁছলো তখন তাঁরা তাঁবুর খুঁটি উঠিয়ে নিয়ে তা দিয়ে কাফেরদের মুখ ফিরিয়ে দিলেন। যেসব মুসলমানের পা টল-টলায়মান হয়ে গিয়েছিল। তাদের মর্যাদাবোধ জাগ্রত করে মহিলারা বললেন যে, জাহেলী যুগে তোমরা হকের বিরুদ্ধে খুব লড়াই করেছ। এখন আল্লাহর পথে লড়াই করতে হচ্ছে। আর এখন তোমরা পা পিছিয়ে নিচ্ছ। একথা শুনে মুসলমানরা উল্টে দাঁড়ালো এবং এত উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে লড়াই করলো যে, রোমকদেরকে পিছু হটিয়ে দিল। এসব মহিলার মধ্যে হযরত খাওলাও (রা) ছিলেন। তিনি হিন্দ (রা) বিনতে উতবা এবং অন্য মহিলাদের সঙ্গে একত্রিত হয়ে যুদ্ধ গাথা পড়তেন এবং মুসলমানদেরকে যুদ্ধে উৎসাহ দিতেন। যুদ্ধের সময় মশহুর সাহাবী হযরত শুরাহবিল (রা) বিন হাসানার মুকাবিলা হলো এক বিরাট বপু সম্পন্ন রোমকের সঙ্গে। শুরাহবিল (রা) অধিক নামায ও রোযার কারণে বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। রোমকরা তাকে মাটিতে ফেলে দিল এবং তার মাথা কেটে নিতে উদ্যত হলো। জিরার(রা) বিন আযওয়ার তীরের বেগে তাঁর মাথার নিকট গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং তরবারীর এক কোপেই জনৈক কাফেরের মাথা মাটিতে ফেলে দিলেন।

ঐতিহাসিক তাবারী এবং হাফেজ ইবনে কাছির (র) বর্ণনা করেছেন যে, যুদ্ধকালে মুসলমানদের পরাজিত হওয়ার মত এক নাজুক অবস্থার সৃষ্টি হলো। সে সময় হযরত ইকরামা (রা) বিন আবি জেহেল সামনে অগ্রসর হয়ে উচ্চৈস্বরে বললেন ঃ

"হে খৃস্টানরা! আমি কুফুরী অবস্থায় স্বয়ং রাসূলের (সা) বিরুদ্ধে লড়াই করেছি। এখন আমি ইসলামের নিয়ামত লাভ করেছি। আমি কি করে তোমাদেরকে পৃষ্ঠদেশ দেখাতে পারি।"

একথা বলেই তিনি নিজের বাহিনীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন এবং বললেন ঃ

"কে আমার হাতে মৃত্যুর বাইয়াত করবে!"

একথা শুনে চারশ' মুজাহিদ অগ্রসর হলেন। তাদের মধ্যে জিরারও (রা) অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তারা ইকরামার (রা) হাতে মৃত্যুর বাইয়াত করলেন। অতপর তাঁরা হযরত খালিদের (রা) তাঁবুর সামনে এত উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং অটলতার সঙ্গে লড়াই করলেন যে, সেখানেই তাঁরা শহীদ হয়ে গেলেন।

এই বীরদের কুরবানী লড়াইয়ের মোড় পরিবর্তন করে দিল এবং খৃষ্টানদের বিরাট বাহিনীর এমন শিক্ষণীয় পরাজয় ঘটলো যে, তারা আর কোনদিন মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারেনি।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র) "ইসাবা"-তে মূসা বিন উকবা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত জিরার (রা) আজনাদাইনের যুদ্ধে শাহাদাতের পেয়ালা পান করেন। কিন্তু তিনি এটা ব্যাখ্যা করে বলেননি যে, তিনি আজনাদাইনের কোন যুদ্ধে শহীদ হন। কেননা আজনাদাইনে দুইবার যুদ্ধ হয়। প্রথমবার হয় ১৩ হিজরীর পূর্বে ইয়ারমুকের যুদ্ধের আগে। আর দ্বিতীয়বার যুদ্ধ হয় ১৫ হিজরীতে ইয়ারমুকের যুদ্ধের পরে। কতিপয় ঐতিহাসিক যুদ্ধে হযরত জিরারের (রা) শাহাদাতের কথা একদম স্বীকারই করেন না। বরং তারা বলেন যে, ইয়ারমুকের যুদ্ধের পর হযরত জিরার (রা) হলব, ইন্তাকিয়া প্রভৃতি যুদ্ধেও বীরত্বের সঙ্গে অংশ নেন এবং অষ্টম হিজরীতে যখন সমগ্র সিরিয়ার বিজয় লাভ ঘটে তখন প্লেগ মহামারীতে ২৫ হাজার, অন্যান্য মুজাহিদের সঙ্গে তিনিও দামেস্কের নিকটে ইন্তেকাল করেন। তার বাহাদুর সহোদরা খাওলাও (রা) সেই প্লেগেই ওফাত পান। সিরিয়ার পূর্ব প্রান্তের দরজার বাইরে আজও দু'টি কবর রয়েছে। কবর দু'টি হযরত জিরার (রা) ও হযরত খাওলার (রা) বলে কথিত আছে।

হযরত আদি (রা) বিন হাতেম তাই

"আমিরুল মু'মিনীন! আপনি কি আমাকে চিনতে পেরেছেন?"

আধা বয়েসী এক ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ মসজিদে নববীতে হযরত ওমর ফারুককে (রা) সম্বোধন করে একথা বলছিলেন। সেই ব্যক্তির পোশাক ছিল মলিন। চেহারায় ছিল ক্লান্তি ও বিস্ময়ের চিহ্ন। এটা ছিল ফারুকে আজমের (রা) খিলাফতের প্রথম দিকের ঘটনা। খিলাফতের বোঝা তাকে নীরব ও গম্ভীর বানিয়ে দিয়েছিল। আমিরুল মু'মিনীন সেই ব্যক্তির সঙ্গে প্রথা অনুযায়ী মুসাফিহা করলেন এতে তার সন্দেহ হলো যে, হযরত ওমর ফারুক (রা) তাকে চিনেনইনি। কিন্তু যেই তার মুখ দিয়ে প্রশ্নবোধক বাক্য উচ্চারিত হলো তখনই ফারুকে আজম (রা) তাঁর ওপর স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন এবং খুব গম্ভীরভাবে বললেন ঃ

"হাঁ, হাঁ। আল্লাহর কসম। তোমাকে খুব ভালভাবেই চিনেছি। আল্লাহ তায়ালা তোমাকে সুন্দর জ্ঞান দান করেছেন। আল্লাহর কসম! তুমি সেই সময় ঈমান এনেছ যখন বেশীর ভাগ মানুষ কুফর ও শিরকের অন্ধকারে পথভ্রষ্ট অবস্থায় ঘোরাফিরা করছিলো। তুমি সেই সময় সত্যের স্বীকৃতি দিয়েছ যখন মানুষ তা অস্বীকার করতো। তুমি সেই সময় ওয়াদা পূরণ করেছ যখন মানুষ তা করতো না। তুমি সেই সময় সামনে অগ্রসর হয়েছ যখন মানুষ পিছু হটছিলো। সর্বপ্রথম সাদকা যা রাসূল (সা) ও তাঁর সাহাবীদের মনে আনন্দের হিল্লোল বইয়ে দিয়েছিলো তা তোমার কবিলা তাই-এরই ছিল।"

আমিরুল মু'মিনীন (রা) কেবলমাত্র এতটুকুনই বলেছিলেন। এমন সময় নবাগত সাক্ষাতকারী বলে উঠলেন ঃ

"হে আমিরুল মু'মিনীন! আর বলতে হবে না—আমার জন্য এতটুকুনই যথেষ্ট।" ফারুকে আজমের (রা) সঙ্গে এই সাক্ষাতকারীর নাম ছিল আবু তোরায়েফ আদি তাই।

আবু তোরায়েফ আদি (রা) সেই প্রখ্যাত পিতার পুত্র ছিলেন যাঁর দানশীলতা, বীরত্ব, ভদ্রতা এবং অতিথি পরায়ণতার কথা সমগ্র আরব বিশ্বে সকলের মুখে মুখে ফিরতো। এটা অবশ্য ইসলামী যুগের কিছু দিনের আগের কথা। আমরা যাঁর কথা বলছি তিনি ছিলেন হাতেম তাই।

হযরত আদির (রা) গোত্র তাই দীর্ঘদিন যাবত ইয়েমেনে বসবাস করেছিলো এবং সেখানকার নেতৃস্থানীয় গোত্রসমূহের মধ্যে পরিগণিত হতো। এই গোত্র অনেক দিন যাবত খৃষ্ট ধর্ম পালন করে আসছিলো এবং খৃষ্টানদের রাকবী ফিরকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। হাতেম তাই ছিলো সেই গোত্রের সরদার। হযরত আদি (রা) বুদ্ধি হওয়ার সাথে সাথে নিজেকে অঢেল সম্পদ, শান শওকত ও নেতৃত্ব-কর্তৃত্বের মাঝে দেখতে পেলো। রাসূলে আকরামের (সা) নবুওয়াত প্রাপ্তির কিছুদিন পূর্বে যখন হাতেম তাই মারা গেলো তখন তাই গোত্রের নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব নিয়ম অনুযায়ী আদির (রা) ওপর ন্যস্ত হলো এবং ইসলামসূর্য অভ্যুদয়ের সময় তিনিই তাই গোত্রের সরদার ও শাসক ছিলেন। ইসলামের বিজয়সমূহ যখন সয়লাবের মত আরবের সবদিক প্লাবিত করে দিল তখন আদি (রা) নিজের ক্ষমতার সিংহাসনকে টল টলায়মান বলে অনুভব করলেন। তিনি হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হলেন যে, এই সয়লাব প্রতিরোধ করা তাঁর সাধ্যের ব্যাপার নয়। কিন্তু ক্ষমতার নেশা সহজে ছাড়ে না। সুতরাং ইসলামের ঝাণ্ডা সমুন্নত করার পরিবর্তে তিনি তখন যে কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন তা তাঁর নিজের ভাষাতেই শোনা যায়ঃ

"রাসূলে আকরামের (সা) মদীনা হিজরতের পর সবদিক থেকে মানুষ ইসলামের সীমায় দাখিল হতে লাগলো। কিন্তু স্বধীনের ওপর আমার পূর্ণ আস্থা ছিল। এদিকে প্রিয় নবীর (সা) বিজয়ের সীমা প্রতিদিন প্রশস্ত হতে লাগলো। তখন আমার অন্তরে নিজের হুকুমাত ও দ্বীন উভয় সম্পর্কে ভীতি সৃষ্টি হলো। সেই সময় এক দিন জনৈক ব্যক্তি মদীনা থেকে এসে আমাকে বললো যে, মুহাম্মাদ (সা) আমার সম্পর্কে এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, কোন একদিন তাই সরদার আদির হাত আমার হাতে থাকবে। আমি একথা শুনে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলাম এবং একটি গোলামকে সবসময় সফরের সামান তৈরী রাখার নির্দেশ দিলাম। যাতে যখনই ইসলামী বাহিনীর আগমনের খবর পাবে তখনই যেন আমাকে খবর দেয়। একদিন সেই গোলাম সাত সকালে দৌড়ে আমার নিকট এলো এবং বললো যে, "প্রভু মুহাম্মাদের (সা) বাহিনী এগিয়ে আসছে।" ঘোড়ার ওপর জীন স্থাপন করা ছিলো এবং সফরের সামান বাধা ছিল। আমি আমার পরিবার-পরিজনকে সঙ্গে নিলাম এবং সোজা সিরিয়া অভিমুখে রওয়ানা দিলাম। সেখানে আমার খৃষ্টান ভাইয়েরা বসবাস করতো। আমি সেখানে "জাওসিয়া" (বস্তিতে) অবস্থান করলাম। বাড়ী থেকে রওয়ানা হওয়ার সময় খুবই দ্রুততার সাথে কাজ করতে হয়েছিল। এ জন্য আমার বোন আমার থেকে অনেক পিছনে পড়ে গিয়েছিল এবং ইসলামী বাহিনীর হাতে গ্রেফতার হয়েছিল।"

এই ঘটনা নবম হিজরীর সেই সময় সংঘটিত হয়েছিল যখন রাসূলে আকরাম (সা) হযরত আলীর (রা) নেতৃত্বে পঞ্চাশ জন মুজাহিদের একটি দল বনু তাইয়ের প্রতি প্রেরণ করেছিলেন। গোত্র নেতা আদি ফেরার হয়ে গিয়েছিলেন। গোত্রের অন্যান্য সদস্যরা নামমাত্র বাধা দানের পর অস্ত্র সমর্পণ করেছিলো। যুদ্ধ বন্দীদের মধ্যে সাফানা (রা) বিনতে হাতেমও ছিলেন। তাদের সকলকে গনিমতের মালসহ মদীনা পৌঁছে দেয়া হয়েছিল।

মদীনায় যখন বনু তাইয়ের কয়েদীদেরকে রাসূলের (সা) খিদমতে পেশ করা হলো তখন সাফানা অগ্রসর হয়ে আরজ করলো ঃ

"হে সাহিবে কুরাইশ! আমি অসহায়ের প্রতি রহম করুন। পিতার স্নেহ ছায়া আমার মাথার ওপর থেকে সরে গেছে এবং ভাই আমাকে বন্ধু ও সাহায্যকারীহীন অবস্থায় রেখে পালিয়ে গেছে। আমার পিতা ছিলেন কবিলার সরদার। তিনি অভুক্তদের খাবার খাওয়াতেন। এতিমদের অভিভাবকত্ব করতেন। অভাবগ্রস্তদের অভাব পূরণ করতেন। প্রতিবেশীদের হক আদায় করতেন। কয়েদীদেরকে মুক্ত করাতেন। অসহায়দেরকে সাহায্য করতেন। মজলুমদেরকে সহযোগিতা দিতেন এবং জালেমদের মন্দকাজের শাস্তি দিতেন। আমি সেই হাতেম তাইয়ের কন্যা। যার নিকট থেকে কোন সায়েল শূন্য হাতে ফিরে যায়নি। হুজুর যদি উপযুক্ত মনে করেন তাহলে আমাকে মুক্তি দিতে পারেন। তাতে আমার কারণে আরবের জাতীয় কিংবদন্তীর ওপর কলংক লেপন হবে না।"

হুজুর (সা) সাফানার (রা) কথা শুনে ইরশাদ করলেন ঃ "হে মহিলা! তোমার পিতার যে গুণাবলীর কথা বর্ণনা করেছ তাতো মুসলমানদের সঙ্গেই বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট। তোমার পিতা যদি জীবিত থাকতেন তাহলে আমি তাঁর সাথে ভাল ব্যবহার করতাম।"

অতপর তিনি সাহাবায়ে কিরামকে (রা) সম্বোধন করে বললেন ঃ "এই মহিলাকে ছেড়ে দাও। সে একজন উত্তম চরিত্রসম্পন্ন পিতার কন্যা। কোন সম্মানিত ব্যক্তি অপমানিত হলে এবং কোন বিত্তবান মানুষ অভাবী হলে অথবা কোন আলেম জাহেলদের মধ্যে ফেঁসে গেলে তাহলে তাঁর সেই অবস্থার ওপর প্রীতি প্রকাশ করো।"

হুজুরের (সা) ইরশাদ অনুযায়ী সাফানাকে (রা) মুক্ত করে দেয়া হলো। কিন্তু সে স্বস্থানে দাঁড়িয়ে রইলো। হুজুর (সা) জিজ্ঞেস করলেন, "কি ব্যাপার, আর কিছু বলার আছে?"

সাফানা (রা) আরজ করলেন ঃ "হে মুহাম্মাদ! আমি যে পিতার কন্যা তাঁর এটা নিয়ম ছিল না যে, কওম মুসিবতে আপতিত হবে এবং সে সুখের নিদ্রা যাবে। আপনি যখন আমার ওপর দয়া প্রদর্শন করেছেন তখন আমার সঙ্গীদের ওপরও দয়া প্রদর্শন করুন। আল্লাহ আপনাকে প্রতিদান বা জাযা দিবেন।"

হুজুর (সা) সাফানার (রা) আবেদনে খুব প্রভাবিত হলেন এবং সকল ভাই কয়েদীকে মুক্তিদানের নির্দেশ দিলেন। ফলে সাফানার (রা) মুখ দিয়ে অযাচিতভাবে একথা বেরিয়ে এলো ঃ

"আল্লাহ আপনার নেকীকে সেই ব্যক্তি পর্যন্ত পৌঁছাবেন যে তাঁর যোগ্য। আল্লাহ আপনাকে কোন খারাব বস্তুর মুখাপেক্ষী যেন না করেন এবং কোন দানশীল বা উদার কওম থেকে যদি কোন নিয়ামত ছিনিয়ে নেয়া হয়, তা যেন আপনার মাধ্যমে ফিরিয়ে দেন।"

অন্য এক রেওয়ায়াতে আছে যে, সাফানা যখন প্রথমবার হুজুরের (সা) নিকট নিজের মুক্তির জন্য দরখাস্ত করেছিল তখন তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার অভিভাবক কে ছিল?"

জবাবে সাফানা (রা) বললো, "আদি বিন হাতেম। আমি তাঁর সহোদরা।"

হুজুর (সা) বললেন ঃ "সেই আদি যে আল্লাহ ও রাসূল থেকে ভেগে গেছে?"

সাফানা ইতিবাচক জবাব দিলে হুজুর (সা) কোন সিদ্ধান্ত ছাড়াই চলে গেলেন। পরের দিনও হুজুর (সা) এবং সাফানার (রা) মধ্যে একই ধরনের কথোপকথন হলো। কিন্তু হুজুর (সা) কোন সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন না, তৃতীয় দিন সাফানা (রা) পুনরায় একই আবেদন জানালো। এবার হযরত আলীও (রা) তাঁর পক্ষে সুপারিশ করলেন। রাসূলে আকরাম (সা) এবার তাঁর দরখাস্ত কবুল করলেন এবং সাফানাকে মুক্তির নির্দেশ দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ইরশাদ করলেন যে, এখন দেশে ফিরে যাওয়ার জন্য তাড়াহুড়া করো না। ইয়েমেন গমনকারী কোন বিশ্বস্ত মানুষ পাওয়া গেলে আমাকে খবর দিও।

কিছুদিন পর ইয়েমেনের বাল্লি অথবা কাজায়া গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল মদীনা এলো। সাফানা (রা) হুজুরের (সা) নিকট সেই দলের ফেরার সময় তাকে তাদের সঙ্গে পাঠিয়ে দেয়ার অনুরোধ জানালেন। সুতরাং হুজুর (সা) সাফানার (রা) মর্যাদা অনুযায়ী সওয়ারী, পোশাক এবং পাথেয়'র ব্যবস্থা করে তাঁকে কাফেলার সঙ্গে পাঠিয়ে দিলেন।

সাফানা (রা) আদির (রা) বাসগৃহ সম্পর্কে জানতেন। তিনি মদীনা মুনাওয়ারা থেকে সোজা "জাওশিয়া" পৌঁছলেন। ভাই-বোনের সাক্ষাত কিভাবে হয়েছিল তা হযরত আদির (রা) ভাষায় শোনা যাক ঃ

"একদিন জাওশিয়াতে আমাদের বাড়ীর সামনে একটি উষ্ট্রী এসে থেমে গেল। হাওদাতে একজন নিকাবপোশ মহিলা বসে ছিলো। সে আমার বোন বলে আমার সন্দেহ হলো। কিন্তু পরে ধারণা হলো যে, তাকেতো মুসলমানরা বন্দী করে নিয়ে গেছে। সে এভাবে কি করে আসতে পারে। তৎক্ষণাৎ হাওদার পর্দা উঠলো এবং এই কথা আমার কানে এলো ঃ

"জালেম, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী, তোমার ওপর থু। নিজের পরিবার পরিজন নিয়ে এসেছ এবং হাতেমের কন্যাকে একাকী রেখে এসেছ।"

বোনের কথা শুনে আমি খুব লজ্জিত হলাম। নিজের ভুল স্বীকার করলাম এবং ক্ষমা চাইলাম। বোন চুপ মেরে গেল। তারপর সওয়ারী থেকে নেমে যখন কিছুক্ষণ আরাম করলো তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ "সাহিবে কুরাইশ কেমন মানুষ?" বোন জবাবে বললো ঃ

"যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, তুমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করো। যদি তিনি নবী হয়ে থাকেন তাহলে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করা তোমার জন্য গৌরবের ব্যাপার হবে এবং যদি বাদশাহও হন তাহলেও শীঘ্র সাক্ষাত তোমার জন্য মর্যাদার ওসিলা হবে।"

আমি বোনের মুখে একথা শুনেই ঘোড়ার জীন বাঁধলাম এবং সোজা মদীনা যাত্রা করলাম।

হযরত আদি (রা) মদীনা পৌঁছলেন। এ সময় অনেকেই তাঁকে চিনে ফেললেন এবং আনন্দের আতিশয্যে বলে উঠলেন ঃ "আরে এতো আদি বিন হাতেম।" কেউ তাঁর সঙ্গে কোন বাদানুবাদ করলো না এবং তিনি সোজা মসজিদে নববীতে রাসূলে আকরামের (সা) খিদমতে হাজির হলেন। হুজুর (সা) তাঁর নাম জিজ্ঞেস করলেন এবং তারপর তাঁর হাত নিজের পবিত্র হাত দিয়ে ধরে বাড়ীর দিকে রওয়ানা করলেন। পথিমধ্যে একজন বৃদ্ধা মহিলা এবং একজন যুবক তাঁর গতিরোধ করে দাঁড়ালেন এবং দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। যখন তাঁরা স্বয়ং আলোচনা শেষ করলো তখন হুজুর(সা) সামনে অগ্রসর হলেন। হযরত আদি (রা) এই ঘটনা দেখে খুব বিস্মিত হলেন এবং ধারণা করলেন যে, দুনিয়ার কোন বাদশাহ এই ধরনের আচরণ করতে পারে না। বাড়ী পৌঁছে হুজুর (সা) খুব অনুনয় ও বিনয়ের সঙ্গে

তাকে চামড়ার গদির ওপর বসালেন এবং নিজে মাটির ওপর বসে পড়লেন। হুজুরের (সা) উদার চরিত্র দেখে হযরত আদির (রা) পূর্ণ আস্থা জন্মালো যে, তিনি দুনিয়ার কোন বাদশাহ নন। তারপর বিশ্ব নবী (সা) এবং হযরত আদির (রা) মধ্যে আলোচনা শুরু হলো। সেই আলোচনার বিস্তারিত স্বয়ং হযরত আদি (রা) পরে এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) ঃ "হে আদি। তুমি আজ পর্যন্ত দ্বীনে ইসলাম থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছ। অথচ এই দ্বীন প্রতিটি পদক্ষেপেই নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করে থাকে।"

আদি (রা) ঃ "আমি খৃস্ট ধর্মের অনুসারী এবং আমার দ্বীনও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করে থাকে।"

রাসূলুল্লাহ (সা) ঃ "আমি তোমার দ্বীনকে তোমার চেয়ে বেশী বুঝি।"

আদি (রা) ঃ (বিস্মিত হয়ে) আপনি কি আমার দ্বীনকে আমার চেয়ে বেশী বুঝেন?"

রাসূলুল্লাহ (সা) ঃ "অবশ্যই। তুমি কি রুকবী নও এবং নিজের কওমের নেতা হিসেবে তাদের উৎপাদনের চতুর্থাংশ গ্রহণ কর না?"

আদি (রা) ঃ "জ্বী, হাঁ। আমি রুকবী এবং এলাকার উৎপাদনের চতুর্থাংশ ওসুল করে থাকি।"

রাসূলুল্লাহ (সা) ঃ "চতুর্থাংশ গ্রহণ কি খৃস্ট ধর্মে বৈধ?"

হুজুরের এই প্রশ্নের কোন জবাব আমি দিতে পারিনি। কেননা চতুর্থাংশ গ্রহণ খৃস্ট ধর্মে প্রকৃতপক্ষেই অবৈধ ছিল। তারপর রাসূলে আকরাম (সা) বললেন ঃ

"হে আদি। দ্বীনে হক গ্রহণ না করার পেছনে তোমার একটি ধারণা কাজ করছে। তুমি মনে করে থাকো যে, মুসলমানরা একটি গরীব জাতি এবং তাদের কোন সচ্ছলতা নেই। কিন্তু খুব শীঘ্রই তোমরা দেখতে পাবে যে, এই মুসলমানরাই কিসরা বিন হুরমুজের ধনাগার দখল করে নেবে।"

আদি ঃ (বিস্মিত হয়ে) কিসরা বিন হুরমুজ?

রাসূলুল্লাহ (সা) ঃ "হাঁ, কিসরা বিন হুরমুজ এবং ধন-সম্পদের এতো আধিক্য হবে যে, লোকজনকে তা দান করা হবে। কিন্তু তাঁরা তা নিতে অস্বীকার করবে এবং কিসরার কায়সার আবইয়াজের ওপরও মুসলমানদের দখল হবে।"

[আদি (রা) বলেন, কয়েক বছর পর এসব কিছু আমার চোখের সামনে সংঘটিত হলো এবং যে বাহিনী কিসরার রাজধানী মাদায়েন ও তাঁর কাসরে আবইয়াজ দখল করলো তাতে আমি স্বয়ং শামিল ছিলাম।]

অতপর রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "হে আদি! তুমি কি হিরা দেখেছ?"

আমি ঃ "আমি কখনো হিরা যাইনি বটে। তবে, অবশ্যই তাঁর নাম শুনেছি।"

রাসূলুল্লাহ (সা) ঃ "হে আদি! সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার জীবন রয়েছে। সেই সময় আসছে যখন (ইসলামের বরকতে) একজন পর্দানশীল মহিলা (কোন মুহাফিজ ছাড়া) হিরা থেকে এসে কাবার তাওয়াফ করবে এবং কেউই তাঁর প্রতি চোখ উঠিয়ে দেখবেও না।"

[আদি (রা) বলেন, কয়েক বছর পর আমি স্বচক্ষে এই দৃশ্য অবলোকন করি। আমি দেখলাম যে, একজন পর্দানশীল মহিলা একাকী হিরা থেকে এসে কা'বা তাওয়াফ করলো এবং তারপর তেমনিভাবে স্বদেশ ফিরে গেল।]

এই আলোচনার পর হযরত আদি (রা) কালবিলম্ব না করে ইসলাম গ্রহণ করলেন। হুজুর (সা) তাঁর ইসলাম গ্রহণে খুব খুশী হলেন এবং নিজের পক্ষ থেকে তাঁর কবিলা তাইয়ের ইমারাত অর্পণ করলেন। তারপর তিনি প্রায়ই রাসূলের দরবারে হাজির হতেন এবং যতদূর সম্ভব নবীর (সা) ফয়েজে অভিষিক্ত হতেন।

বিশ্ব নবীর (সা) ইন্তেকালের পর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) খিলাফতের আসনে সমাসীন হন। এ সময় সমগ্র আরবে কয়েকবার ধর্মদ্রোহিতার আগুন প্রোজ্জলিত হয়ে উঠে এবং অধিকাংশ গোত্র যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। হযরত আদি (রা) এই নাজুক এবং ভয়ংকর যুগে পূর্ণ অটলতা প্রদর্শন করেন। তিনি নিজেই শুধুমাত্র অটল থাকেননি বরং নিজের কবিলাকেও এই ফিতনা থেকে হিফাজত রাখেন। ফিতনা যখন চরম পর্যায়ে তখন তিনি একবার রাতের বেলা নিজের কওমের যাকাত নিয়ে মদীনা মুনাওয়ারা পৌঁছেন। কিন্তু সে সময় পদে পদে ছিল ভয়। তিনি নিজের জীবনকে মারাত্মক ঝুকির মধ্যে নিক্ষেপ করেন। তবে, যাকাত প্রেরণে বিলম্ব করাকে সহ্য করেননি।

হযরত ওমর ফারুকের (রা) শাসনামলে হযরত আদি (রা) স্বগোত্রের সঙ্গে ইরাক ও সিরিয়াতে অনেক যুদ্ধে বীরের মত অংশগ্রহণ করেন। ইরাকের

যুদ্ধসমূহে তিনি প্রথমে হযরত মুছান্না (রা) এবং তারপর হযরত সায়াদ (রা) বিন আবি ওয়াক্কাসের নেতৃত্বে লড়াই করেন। তিনি সেই সকল মুজাহিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাঁরা কিসরার কোষাগার দখল করেছিলেন। এমনিভাবে তিনি রাসূলে আকরামের (সা) ভবিষ্যদ্বাণী নিজের চোখের সামনেই বাস্তবায়িত হতে দেখেন। সিরিয়ার কয়েকটি যুদ্ধে তিনি হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদের সাথে বীরত্বের সঙ্গে অংশ নেন।

হযরত উসমান জুন্নুরাইনের (রা) খিলাফতকালে হযরত আদি (রা) নির্জনত্ব অবলম্বন করেন। কেননা কতিপয় ব্যাপারে হযরত উসমানের (রা) সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ ছিল। তিনি প্রকৃতিগত দিক দিয়ে ছিলেন নেক স্বভাবের মানুষ। এ জন্য হাঙ্গামার পরিবর্তে তিনি রাজনৈতিক তৎপরতা থেকে সম্পূর্ণরূপে সম্পর্কহীন থাকাটাই উপযুক্ত মনে করলেন। অবশ্য মুরতাজার খিলাফতকালে তিনি হযরত আলীর (রা) পূর্ণ সমর্থক ছিলেন। উষ্ট্রের যুদ্ধে হযরত আলীর (রা) সমর্থনে লড়াই করতে করতে তাঁর একটি চোখ ফুটো হয়ে যায় এবং মুহাম্মাদ নামক তাঁর এক পুত্র শহীদ হন। সিফফিনের যুদ্ধেও তিনি হযরত আলী মুরতাজাকে (রা) জীবন বাজী রেখে সমর্থন করেন এবং এই প্রসঙ্গে সংঘটিত সকল যুদ্ধে এমন অটলতা ও বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করেন যে, স্বয়ং শেরে খোদা তাঁকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন এবং তাঁর খিদমতের স্বীকৃতি দেন। সিফফিনের পর খারেজীদের বিরুদ্ধে নাহরোয়ানের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধেও হযরত আদি হযরত আলীর (রা) বন্ধুত্বের হক আদায় করেন। এই যুদ্ধে তাঁর দ্বিতীয় আরেক পুত্র বীরত্ব প্রদর্শন করতে করতে শাহাদাতের পেয়ালা পান করেন। মোটকথা তিনি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত হযরত আলীর (রা) জান নিছারদের অন্যতম ছিলেন। হযরত আলীর (রা) শাহাদাতের পর হযরত আদি (রা) কুফাতে নির্জনত্ব গ্রহণ করেন এবং ৬৭ হিজরীতে এখান থেকেই আখিরাতের সফরে যাত্রা করেন। এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স ছিল ১২০ বছর।

হযরত আদির (রা) নিকট থেকে ৬৬টি হাদিস বর্ণিত আছে। শায়খাইন(হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর) এবং হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুর সাহচর্যের ফয়েজে তিনি দ্বীনি জ্ঞানে প্রচুর দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। তিনি অত্যন্ত আবেদ ও যাহেদ ছিলেন। সবসময় ওজুতে থাকতেন। নামায ও রোযায় বিশেষ আকর্ষণ ছিলো।

হযরত আদি (রা) শুধুমাত্র নিজের কওমেই সম্মানিত ছিলেন না বরং অন্যান্য গোত্রের লোকও তাঁকে সম্মান করতো। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি

যখন রাসূলে আকরামের (সা) খিদমতে হাজির হতেন তখন হুজুরের (সা) পবিত্র চেহারায় প্রফুল্লতা দেখা যেতো এবং তিনি তাঁর জন্য নিজের স্থান ছেড়ে দিতেন। হক কথন এবং স্পষ্টবাদিতা ছিল তাঁর চরিত্রের বিশেষ গুণ। হযরত আলীর (রা) পর আমীর মুয়াবিয়া (রা) তাঁর সাথে কোন ঝগড়া বিবাদ করেননি। তাসত্ত্বেও একবার তাঁর সঙ্গে হযরত আদির (রা) সাক্ষাত হলো। এ সময় তিনি তাঁকে হযরত আলীর (রা) সাহচর্যের গালি দিলেন। হযরত আদি (রা) বাস্তবত রাজনীতি থেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন। কিন্তু এই অপবাদ বরদাশত করতে পারলেন না এবং বজ্রপাতের মত বললেন ঃ

"আল্লাহর কসম! যে অন্তর তোমার বিরোধিতা করতেন, এখন পর্যন্ত আমার পাশে রয়েছে এবং সেই সব তরবারী যা দিয়ে আমরা তোমার বিরুদ্ধে লড়াই করেছি তাও এখন পর্যন্ত আমাদের দখলে আছে। তুমি যদি আমাদের সঙ্গে খারাপ কিছু করতে চাও তাহলে আমরা তাঁর মুকাবিলা করবো। আমরা আলী (রা) বিন আবি তালিবের বিরুদ্ধে কোন কঠোর কথা শোনার চেয়ে মৃত্যুকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকি।"

আমীর মুয়াবিয়া (রা) অত্যন্ত ধৈর্যশীল ও বিজ্ঞ মানুষ ছিলেন। তিনি উপস্থিত সকলকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

"আদির কথা খুব সঠিক কথা। তা লিখে রাখো।"

অতপর তিনি দীর্ঘক্ষণ হযরত আদির (রা) সঙ্গে খুব নরম ও স্নেহপূর্ণ আলোচনা করলেন। হক কথনের সঙ্গে হযরত আদির (রা) মধ্যে সাহসিকতা ও প্রতিশ্রুতি পূরণের গুণও প্রচুর পরিমাণে ছিল। যে যুগে তিনি কুফায় নির্জনত্ব অবলম্বন করেছিলেন, সেই যুগে কুফার গভর্ণর যিয়াদ এক ষড়যন্ত্র প্রসঙ্গে তাঁর চাচাতো ভাই আবদুল্লাহ বিন খলিফাতুত তাইকে গ্রেফতারের নির্দেশ দিলো। তিনি হযরত আদির (রা) নিকট আশ্রয় নিলেন। যিয়াদ হযরত আদির (রা) নিকট জিজ্ঞেস করলো এবং বললো, "আবদুল্লাহকে আমার হাওয়ালা করে দাও। নচেৎ তোমার ভাল হবে না।"

হযরত আদি (রা) তাঁর চোখে চোখ রেখে জবাব দিলেন ঃ

"তুই চাস যে, আমি তাকে তোঁর হাওয়ালা করে দিই। আর তুই তাকে হত্যা করবি। আল্লাহর কসম! আমি তা কখনই করতে পারবো না।" যিয়াদ হযরত আদিকে (রা) গ্রেফতার করে জেলখানায় নিক্ষেপ করলো। তাতে জনগণের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হলো এবং একটি প্রতিনিধিদল যিয়াদের নিকট গিয়ে বললো, "এটা খুব ক্রোধের কথা যে, তুই আসহাবে রাসূল (সা) এবং

তাই কবিলার সরদারের সঙ্গে এ ধরনের আচরণ করছিস।" যিয়াদ জনগণের অসন্তুষ্টিতে ভীত হয়ে তৎক্ষণাৎ হযরত আদিকে (রা) মুক্ত করে দিলো এবং আর কোন দিন তাঁকে উত্যক্ত করেনি।

হযরত আদি (রা) পৈত্রিকসূত্রে দানশীলতা ও ক্ষমার গুণ পেয়েছিলেন। কোন সায়েল বা ভিক্ষুক তাঁর দরজা থেকে শূন্য হাতে ফিরে যেতো না। লোকদেরকে থলে ভরে ভরে দিতেন। যদি কোন ব্যক্তি তাঁর মর্যাদার চেয়ে কম পরিমাণ চাইতো তাহলে তাকে দান করতে অস্বীকৃতি জানাতেন। একবার জনৈক ব্যক্তি একশ' দিরহাম চাইলে জবাব দিলেন, "আমি হাতেম তাই'র পুত্র। আর তুমি আমার কাছে শুধুমাত্র একশ' দিরহাম চাইছো। খোদার কসম! (এত কম পরিমাণ) কখনই দেব না।"

একবার আশয়াছ বিন কায়েস ড্যাগ চাইলো। হযরত আদি (রা) পূর্ণ করে তা তাঁর নিকট প্রেরণ করলেন। আশয়াছ বলে পাঠালেন যে, সেতো খালি ড্যাগ চেয়েছিলো। হযরত আদি (রা) তাকে জবাব পাঠালেন যে, শূন্য ড্যাগ কাউকে প্রদান করা তাঁর আদত বিরোধী। মোটকথা, এক বিশ্ব তাঁর দানশীলতায় উপকৃত হতো। এমনকি পিপড়েদের জন্যও তাঁর তরফ থেকে খাদ্য নির্ধারিত ছিল। আল্লামা ইবনে আবদুল বার (র) তাঁর ব্যাপারে এই মত প্রকাশ করেছেন যে, "আদি (রা) নিজের কওমের সম্মানিতদের মধ্যে ছিলেন। তিনি ছিলেন সুবক্তা, সুশিক্ষিত এবং উপস্থিত জবাব দানকারী ও ক্ষমাশীল।"

হযরত জারির (রা) বিন আব্দুল্লাহ আল বাজলী

মক্কা বিজয় ও হুনাইনের যুদ্ধের পর (অষ্টম হিজরী) ইসলামের ইতিহাসের এক নতুন মোড় পরিলক্ষিত হয় এবং এই মোড়ে وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا - (النصر ٢) এর চিত্র প্রতিভাত হয়। আরবের প্রতিটি কোণ থেকে বিভিন্ন এলাকা ও কবিলার প্রতিনিধি দল (Deputations) উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে রাসূলের (সা) দরবারে উপস্থিত হতে লাগলো। কেউ আসতে লাগলো ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে। কেউ আসতে লাগলো দ্বীনের আহকাম শেখার জন্য। আবার কেউ বা এলো সন্ধি ও শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের লক্ষ্যে।

দশম হিজরীর পবিত্র রমযানের একদিন তেমনি ধরনের একটি প্রতিনিধি দল মদীনায় এতো শান শওকতে আগমন করলো যে, তা দেখে মদীনাবাসী বিস্মিত হয়ে গেল। প্রতিনিধি দলের সকল সদস্যই অত্যন্ত সুন্দর পোশাকে সজ্জিত ছিল এবং সকলের কাঁধে মূল্যবান ইয়েমেনী চাদর শোভা পাচ্ছিল। এই দলের নেতৃত্ব করছিলেন এক আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের যুবক। তাঁর শরীরের রং এবং চেহারা সুরত ইঙ্গিত দিচ্ছিল যে, তিনি কোন উঁচু খান্দানের সদস্য। প্রতিনিধি দলটি রাসূলের (সা) দরবারে উপস্থিত হলে হুজুর (সা) তাদের আচার-আচরণে খুব খুশী হলেন। তাঁদেরকে আহলান সাহলান ওয়া মারহাবা বললেন এবং প্রতিনিধি দলের জন্য নিজের মুবারক চাদর বিছিয়ে দিলেন। অতপর মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

"তোমাদের নিকট যখন কোন কওমের সম্মানিত ব্যক্তি আসবে তখন তাদের সম্মান করো।"

তারপর সুন্দর যুবককে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "এখানে তোমাদের আগমনের হেতু কি?" আরজ করলেন ঃ "ইসলাম গ্রহণের জন্য।"

হুজুরের (সা) পবিত্র চেহারায় উৎফুল্লতা ছেয়ে গেল এবং বললেন ঃ "ঠিক আছে, তাহলে তুমি আমার নিকট বাইয়াত করো যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল। যে নামায তোমাদের ওপর ফরজ করা হয়েছে তাঁর পাবন্দী কর। নির্ধারিত যাকাত যথাযথভাবে আদায় কর। সবসময়

মুসলমানদের কল্যাণ কামনা এবং সহমর্মিতা প্রকাশ কর। কেননা যে কারোর ওপর রহম করে না আল্লাহ তাঁর ওপর রহম করে না। নিজের আমীরের আনুগত্য কর। যদি সে হাবশী গোলামও হয়।"

প্রতিনিধি দলের নেতা নির্দ্বিধায় বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমি এসব কথার ইকরার করলাম।আপনার পবিত্র হাত এগিয়ে দিন।"

হুজুর (সা) মুচকি হেসে তাঁর বাইয়াত নিলেন এবং সেই সঙ্গে প্রতিনিধি দলের অন্যান্য সদস্যও কালেমায়ে শাহাদাত পড়ে হকপন্থীদের দলে শামিল হয়ে গেলেন। যাদের ব্যাপারে রাদিয়াল্লাহু আনহুম ওয়া রাদু আনহু বলা হয়েছে।

এই ভাগ্যবান যুবক, যাঁর জন্য হুজুর (সা) নিজের পবিত্র চাদর বিছিয়ে দিয়েছিলেন তিনি ছিলেন হযরত জারির (রা) বিন আবদুল্লাহ আল বাজলী।

আবু ওমর জারির (রা) বিন আবদুল্লাহ আল বাজলী বাজিলা গোত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এই গোত্রের লোকজন আরবের বিভিন্ন জেলায় বসবাস করতো। তিনি নিজের এলাকার বনু বাজিলার সরদার ছিলেন। জারিরের (রা) প্রপিতামহরা কোন এক যুগে ইয়েমেনের শাসক ছিলেন। এ জন্য তাঁদের শিরায় ছিল শাহী খুন এবং স্বদেশে তাঁকে অত্যন্ত সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হতো। নসবনামা হলো ঃ

জারির (রা) বিন আবদুল্লাহ বিন জাবের বিন মালিক বিন নাজার বিন ছালাবা বিন জাশাম বিন আওফ বিন খুযায়মা বিন হারব বিন আলী বিন মালিক বিন সায়াদ বিন নাযির বিন কাসার বিন আবকার বিন আনমার বিন আরাশ বিন আমর বিন গাওছ বাজলী।

রাসূলের (সা) শেষ যুগে জারির (রা) মুসলমান হয়েছিলেন। এ জন্য নবীর(সা) আমলের যুদ্ধসমূহে অংশগ্রহণে মাহরুম রয়ে গিয়েছিলেন। তবুও তিনি বিদায় হজ্জে রাসূলের (সা) সঙ্গে অংশ নেন এবং হুজুরের (সা) নির্দেশে একটি সারিয়্যাহ বা যুদ্ধে নেতৃত্ব প্রদানের সৌভাগ্যও অবশ্যই লাভ করেন।

এই যুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে মূর্তি ভাঙ্গার একটি অভিযান ছিল। যুদ্ধটি কবে সংঘটিত হয়েছিল? এ ব্যাপারে দু'টি বর্ণনা পাওয়া যায়। তাবকাতে ইবনে সায়াদের রেওয়ায়াত অনুযায়ী এই যুদ্ধ হযরত জারিরের (রা) বাইয়াতের অব্যবহিত পরই (অর্থাৎ বিদায় হজ্জের পূর্বে) সংঘটিত হয় এবং সেই অভিযানের সাফল্যের খবর হযরত জারির (রা) স্বয়ং ফিরে এসে হুজুরকে (সা) দিয়েছিলেন। পক্ষান্তরে সহীহ বুখারীতে আছে যে, এই যুদ্ধ বিদায়

হজ্জের পরে সংঘটিত হয় এবং তাঁর বিজয়ের খবর হুজুরকে প্রদান করেছিলেন জারিরের (রা) দূত। তাঁর কিছুদিন পরই হুজুর (সা) ওফাত পান।

তাবকাতের বর্ণনার সংক্ষিপ্ত সার নিম্নরূপ ঃ

হযরত জারির (রা) যখন রাসূলে আকরামের (সা) নিকট বাইয়াত করলেন তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ

"জারির, তোমার কওমের যারা মূর্তিপূজা পরিত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করেছেন, তাঁরা নিজেদের মূর্তির সাথে কেমন আচরণ করলো?"

জারির (রা) ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ ইসলামকে বিজয় দান করেছেন। মসজিদ ও মরুভূমিতে তাওহীদের আওয়াজ (আজান) উত্থিত হয়েছে। এ সময় তাঁরা নিজেদের মূর্তিকে ভেঙ্গে ফেলেছে।"

রাসূলে আকরাম (সা) ঃ "তোমাদের মন্দির জিল-খালসার কি অবস্থা?"

জারির (রা) ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! এখনো তা আছে। আমরা যখন ফিরে যাবো তখন তা ধ্বংস করে ফেলবো।"

রাসূলে আকরাম (সা) ঃ "হাঁ, তোমরা যাও এবং তা ধ্বংস করে আমাকে খবর দিও।"

হযরত জারির (রা) তৎক্ষণাৎ সঙ্গীদেরসহ এই অভিযানে রওয়ানা হয়ে গেলেন এবং কিছুদিন পর হুজুরের (সা) খিদমতে ফিরে এসে আরজ করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমরা জিল-খালসাকে ধ্বংস করে তাতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছি। এখন তা মাটির ঢিবি। কেউ আমাদের কাজে বাধা প্রদানে সাহস করেনি।"

সারওয়ারে আলম (সা) এই খবর পেয়ে খুব খুশী হলেন এবং তিনি হযরত জারির (রা) এবং তাঁর সঙ্গীদেরসহ দোয়া করলেন।

সহীহ বুখারীতে এই অভিযান সম্পর্কে দু'টি রেওয়ায়াত বর্ণিত আছে। এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী যে মন্দির ধ্বংসের কাজ হযরত জারিরের (রা) হাতে ন্যস্ত করা হয়েছিল তাঁর নাম ছিল জিল-হালিফা। দ্বিতীয় রেওয়ায়াতে তাঁর নাম জিল-খালসা বর্ণনা করা হয়েছে। আমাদের নিকট সঠিক নাম জিল-খালসাই। কেননা তাতে রক্ষিত মূর্তিসমূহের মধ্যে সর্ববৃহৎ মূর্তির নাম ছিল "খালসা।" হযরত জারির (রা) বলেন যে, জিল-খালসা খাছয়াম ও বাজিলা গোত্রের তৈরী একটি গৃহের নাম ছিল। তাতে অনেক মূর্তি ছিল এবং লোকজন তাকে কা'বায়ে ইয়ামানিয়া বলতো। একদিন আমি রাসূলে আকরামের (সা)

খিদমতে হাজির হলাম। তিনি বললেন : "জারির (রা) জিল-খালসা আর কতদিন পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকবে। তুমি কি তা ধ্বংস করে আমাকে তৃপ্ত করবে না?" হুজুরের (সা) ইরশাদ শুনে তৎক্ষণাৎ আহমাস গোত্রের একশ পঞ্চাশ জন সওয়ার নিয়ে সেই অভিযানে গমনের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলাম। এসব মানুষ ঘোড় সওয়ারীতে খুব পটু ছিল এবং আমি ঘোড়ার ওপর মজবুতভাবে বসে থাকতে পারতাম না। আমি হুজুরের (সা) নিকট নিজের সমস্যার কথা বর্ণনা করলাম। তখন তিনি আমার বুকের ওপর নিজের পবিত্র হাত এত জোরে মারলেন যে, তাঁর আঙ্গুলের ছাপ আমার বুকের ওপর পড়ে গেল এবং তিনি দোয়া করলেন, "হে আল্লাহ, তুমি তাকে (জারির) ঘোড়ার পিঠের ওপর কায়েম রেখো এবং হেদায়াত প্রাপ্ত রাহবার (হাদি এবং মাহদী) বানিয়ে দাও।" অতপর আমরা নিজেদের মনযিলে মাকসুদে রওয়ানা হয়ে গেলাম। যখন সেখানে পৌঁছলাম তখন জিল-খালসাকে ফেলে দিয়ে আগুন লাগিয়ে দিলাম এবং এই খবর দানের জন্য একজন দূতকে রাসূলের(সা) খিদমতে প্রেরণ করলাম। সেই দূত [হযরত আবু আরতাত (রা)] হুজুরের (সা) খিদমতে হাজির হয়ে আরজ করলেন :

"হে আল্লাহর রাসূল! সেই আল্লাহর কসম যিনি আপনাকে সত্য রাসূল বানিয়ে প্রেরণ করেছেন। জিল-খালসাকে জ্বালিয়ে না দেয়া পর্যন্ত আমি আপনার নিকট আগমন করিনি।"

হুজুর (সা) এই সুসংবাদ শুনে খুব খুশী হলেন এবং তিনি এই অভিযানে পদব্রজে ও সওয়ারের ওপর গমনকারীর জন্য পাঁচবার বরকতের দোয়া করলেন।

বুখারীর অন্য আর এক রেওয়ায়াতে আছে যে, জারির (রা) ইয়েমেনেই ছিলেন, এমন সময় রাসূলের (সা) ইন্তেকাল হয়। হুজুরের (সা) ইন্তেকালের তিন দিন পর তিনি আমর নামক একজন ইয়েমেনীর নিকট এই খবর শুনে অস্থির এবং শোকাভিভূত হয়ে পড়লেন এবং তৎক্ষণাৎ মদীনা রওয়ানা হয়ে গেলেন। পথিমধ্যে কতিপয় সওয়ার মদীনার দিক থেকে আসতে দেখলেন। তাঁরা এই শোকাবহ খবরের সত্যতা স্বীকার করলেন এবং একথাও বললেন যে, হুজুরের (সা) ওফাতের পর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) খিলাফতের মসনদে আসীন হয়েছেন।

এই রেওয়ায়াত এখানেই শেষ হয়ে যায়। তবে, তা থেকে স্পষ্ট ধারণা জন্মে যে, হযরত জারির (রা) মদীনা পৌঁছে হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) বাইয়াত করেন এবং তার পর স্বদেশ ফিরে আসেন।

হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) শাসনামলে মুসলমানরা যখন ইরাক ও সিরিয়ায় সেনা অভিযান পরিচালনা করেন তখন হযরত জারির (রা) ইয়েমেন থেকে মদীনা এলেন এবং সিদ্দীকে আকবারের (রা) খিদমতে হাজির হয়ে আরজ করলেন ঃ

"হে রাসূলের খলিফা! আমি একবার রাসূলের (সা) নিকট আবেদন করেছিলাম যে, বিচ্ছিন্ন বাজিলা গোত্রকে একত্রিত করে তাঁর নেতৃত্ব আমার ওপর ন্যস্ত করুন। হুজুর (সা) এই আবেদন কবুল করেছিলেন। কিন্তু তা বাস্তবায়নের সুযোগ না আসতেই হুজুর (সা) ওফাত পান। আপনি যদি এখন সেই কাজ করতে পারেন তাহলে আমার কওমও জিহাদে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের যোগ্য হয়ে যাবে।"

হযরত সিদ্দীকে আকবার (রা) বললেন ঃ "এখন আমরা সিরিয়া ও ইরাকের যুদ্ধে ব্যস্ত রয়েছি। এ জন্য এ সমস্যা বর্তমানে সমাধান ছাড়াই থাক।"

সুতরাং জারির (রা) ইয়েমেন ফিরে গেলেন। কিছুদিন পর সিদ্দীকে আকবার (রা) ইন্তেকাল করলেন এবং হযরত ওমর ফারুক (রা) খিলাফতের আসনে সমাসীন হলেন। তাঁর খিলাফতের প্রথম যুগে (ত্রয়োদশ হিজরীর রমযান মাসে) জাসারের দুঃখজনক ঘটনা সংঘটিত হলো। তাতে ভুল তদবিরের কারণে ইরানীদের হাতে মুসলমানদেরকে চরম পরাজয় বরণ করতে হলো এবং সেনাপতি হযরত আবু ওবায়েদ ছাকাফীসহ (র) হাজার হাজার মুসলমান শহীদ হয়ে গেলেন। হযরত ওমর (রা) এই দুঃখজনক ঘটনার সংবাদ পেয়ে খুব দুঃখীত হলেন এবং সমগ্র আরবে তিনি খতিব ও নকীব প্রেরণ করলেন। এসব খতিব ও নকীব আগুন ঝরা বক্তৃতা দিয়ে সকল আরব গোত্রের রক্ত গরম করে ফেললেন। এমনকি খৃস্টান আরবরাও ইরনীদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হয়ে উঠলো এবং কিছুদিনের মধ্যেই প্রত্যেক দিক থেকে যোদ্ধা আরব গোত্রসমূহ মদীনার দিকে ঢলের মত আসতে লাগলো। সেই যুগে হযরত জারিরও (রা) হযরত ওমর ফারুকের (রা) খিদমতে হাজির হলেন এবং তাঁর নিকট বনু বাজলাকে একত্রিত করার আবেদন জানালেন। হযরত ওমর (রা) সেই সময় সকল সরকারী কর্মচারীর নামে একটি নির্দেশ প্রেরণ করলেন। নির্দেশে তিনি যেখানে যেখানে বনু বাজলিয়ার লোক আছে তাদেরকে নির্দিষ্ট তারিখে জারিরের (রা) নিকট পৌঁছার কথা বললেন। বস্তুত হযরত জারির (রা) ফিরে গেলেন এবং কিছুদিন পর বনু বাজলিয়ার এক বিরাট বাহিনী সমেত পুনরায় খলিফার দরবারে উপস্থিত হলেন। আবু হানিফা আদ

দিনাওয়ারী সাহিবে "আল আখবার আত তাওয়ালের" বর্ণনা হলো যে, হযরত ওমর (রা) জারিরকে (রা) বনু বাজলিয়া সমেত সকল গোত্রের আমীর নিয়োগ করলেন এবং তাঁকে মুছান্না (রা) বিন হারিছা শাইবানীর সাহায্যের জন্য ইরাক রওয়ানা করলেন। তাঁরা আবু ওবায়েদের (র) শাহাদাতের পর ইরানীদের মুকাবিলাকারী মুসলমানদের নেতৃত্ব করেছিলেন। জারির (রা) মদীনা থেকে রওয়ানা দিয়ে ছালাবিয়া নামক স্থানে তাঁবু ফেললেন। মুছান্নাও (রা) সঙ্গীদেরসহ তাঁদের সঙ্গে এসে মিলিত হলেন। অতপর এই সম্মিলিত বাহিনী ছালাবিয়া থেকে রওয়ানা হয়ে কুফার নিকটে বুয়ায়েব নামক স্থানে তাঁবু ফেললো। এদিকে ইরান সরকার একজন অভিজ্ঞ জেনারেল মিহরান বিন মাহরবিয়া হামদানীকে এক বিরাট বাহিনী দিয়ে মুসলমানদের মুকাবিলার জন্য প্রেরণ করলো। তাঁরা বুয়ায়েব পৌঁছে ফোরাত নদীর পশ্চিম তীরে মুসলমানদের সামনে (তাঁরা পূর্ব তীরে ছিল) অবস্থান নিল। পরের দিন ইরানীরা নদী পার হয়ে মুসলমানদের ওপর হামলা করে। মুছান্না (রা) ইসলামী বাহিনীর দক্ষিণ বাহুকে সঙ্গে নিয়ে ইরানী বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হলো। সেই সঙ্গে জারির (রা) বামবাহু ও অভ্যন্তরীণ দল নিয়ে ইরানীদের ওপর বিদ্যুতের মত ঝাঁপিয়ে পড়লো। ইরানী বাহিনীর সকল সৈন্য নির্বাচিত যোদ্ধা ছিলেন তাঁরা এমন জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করলো যে, মুসলমানদেরকে পেছনে ঠেলে দিল। মুছান্না (রা) স্বহস্তে নিজের দাড়ি ধরে মুসলমানদের সম্ভ্রম বোধকে আহবান জানালেন। তাঁর আহবানে মুসলমানরা ঘুরে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে ইরানীদের ওপর হামলা করে বসলো। এই হামলায় মুছান্নার (রা) সহোদর মাসউদ (রা) বিন হারিছা বীরবিক্রমে লড়াই করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন। তিনি মাটিতে পড়ে গেলে মুছান্না(রা) উচ্চৈস্বরে বলে উঠলেন ঃ

"হে মুসলমানরা! শহীদরা এভাবেই জীবন দিয়ে থাকে। দেখো, তোমাদের ঝাণ্ডা যেন অবনত না হয়।"

এদিকে জারির (রা) নিজের গোত্রকে আহবান জানিয়ে বললেন, "হে বাজলিয়ার ভাইয়েরা! এটা তোমাদের পরীক্ষার সময়। দেখো, শত্রু নিধনে অন্যরা যেন তোমাদের ওপর বাজি নিয়ে না যায়। আল্লাহ যদি তোমাদেরকে সফল করেন তাহলে এই দেশের সবচেয়ে বেশী হকদার তোমরাই হবে।"

উভয়ের আহবানে মুসলমানরা কিয়ামতের মত হামলা চালালো। তাদের হামলার প্রচণ্ডতায় হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও ইরানীরা টিকতে পারলো না। তবুও মিহরান অটলতার সঙ্গে লড়াই করে চলেছিল। তাগলুবী একজন যুবক তাকে

তাক করে সামনে অগ্রসর হয়ে তরবারীর এক কোপে তাঁর ভবলীলা সাঙ্গ করে ফেললো। মিহরানের নিহত হওয়ায় ইরানীরা সম্পূর্ণরূপে স্তম্ভিত হয়ে পড়লো এবং দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য অবস্থায় পালাতে লাগলো। পলায়নরত অবস্থায় হাজার হাজার মারা গেল এবং নদীতে ডুবে নিহত হলো হাজার হাজার। কেননা মুসলমানরা সেতু দখল করে রেখেছিল। এটা ছিল জাসারের জবাব। যদিও এই যুদ্ধে বহুসংখ্যক মুসলমান শহীদ হয়েছিলেন। কিন্তু ইরানীদের লাশের সংখ্যা ছিল বেশুমার। আল্লামা শিবলীর (র) বক্তব্য অনুযায়ী, "ঐতিহাসিকরা বর্ণনা করেছেন যে, কোন যুদ্ধে এত বেশুমার লাশ আর দেখা যায়নি।"

এই যুদ্ধের পর মুসলমানরা ইরাকের দূরদূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে।

বুয়ায়েবের পরাজয়ে সমগ্র ইরানে বিলাপ ধ্বনি উচ্চারিত হতে লাগলো। উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তারা রাণী পুরান দখতকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে এক নওজোয়ান শাহজাদা বা যুবরাজ ইয়াযদ গিরদকে বাদশাহ বানালো এবং পুনরায় অত্যন্ত জোরেশোরে যুদ্ধের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। কিছুদিন পর তারা অত্যন্ত দৃঢ়তা ও সাহসিকতার সাথে উঠে দাঁড়ালো এবং মুসলমানদের সকল পরাভূত এলাকার ওপর দ্বিতীয়বার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করলো। হযরত মুছান্না (রা) এবং জারির (রা) যুদ্ধকৌশল অনুযায়ী আরব সীমান্তের দিকে পিছিয়ে এলেন। এদিকে হযরত ওমর ফারুক (রা) এই খবর পেয়ে সমগ্র আরবে দূত প্রেরণ করে মুসলমানদেরকে জিহাদের জন্য ডেকে পাঠালেন। কয়েক দিনের মধ্যেই জিহাদের আবেগে উদ্বেলিত হয়ে বহু সংখ্যক মুসলমান মদীনায় একত্রিত হলেন। হযরত সায়াদ (রা) বিন আবি ওয়াক্কাসকে এই বাহিনীর নেতা নিয়োগ করা হলো। হযরত ওমর (রা) তাঁদেরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ এবং পুনরায় খুব শীঘ্র ইরাক পৌঁছার নির্দেশ দিলেন। হযরত সায়াদ (রা) যখন ইরাক সীমান্তের নিকট পৌঁছলেন তখন হযরত মুছান্না (রা) বুয়ায়েবের যুদ্ধে প্রাপ্ত আঘাতের ক্ষতের কারণে ওফাত পেলেন। তাঁর ওফাতের পর হযরত জারির (রা) নিজের সঙ্গীদের নিয়ে হযরত সায়াদের (রা) বাহিনীতে শামিল হয়ে গেলেন।

হযরত সায়াদ (রা) সামনে অগ্রসর হয়ে কাদেসিয়ার ময়দানে তাঁবু ফেললেন। সেখানেই ইতিহাসের রক্তাক্ত লড়াই সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধই ইরানীদের ভাগ্যের বেশীর ভাগ ফায়সালা করে। হযরত জারির (রা) কাদেসিয়ার যুদ্ধে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। ইরানী সেনাপতি রোস্তম বিরাট সাজ-সরঞ্জামসহ মুসলমানদের ওপর হামলা চালিয়েছিল। তিন দিনের

ভয়াবহ যুদ্ধে তাঁর যুদ্ধহাতী এবং যিরাহ্ পরিধানকারী সওয়াররা মুসলমানদের ওপর এমন তীব্র গতিতে হামলা চালিয়েছিল যে, তাদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু নিজেদের জানবাজ সরদারদের উচ্চৈস্বরের আহবানে তারা পুনরায় সামলে নিচ্ছিল। এসব সরদারের মধ্যে হযরত জারিরও (রা) ছিলেন। বাজলিয়া গোত্রের অশ্বারোহীরা এই যুদ্ধে এমন হিম্মত ও বীরত্ব প্রদর্শন করেছিল যে, ইরানী অশ্বারোহীরা তাদের মোকাবিলা করতে ইতস্তত করছিলো। যুদ্ধের তৃতীয় দিন এক সময় কয়েকটি ইরানী দল একত্রিত হয়ে একবারে বনু বাজলিয়ার ওপর এসে পড়লো। তাঁরা হযরত জারিরের (রা) নেতৃত্বে জীবনবাজী রেখে মুকাবিলা করলো। কিন্তু ইরানীরা তাদেরকে নিজেদের আয়ত্বের মধ্যে নিয়ে এলো। এই নাজুক মুহূর্তে একাকি এক নিকাবধারী সওয়ার চারদিকের ধূলোর মধ্য থেকে আবির্ভূত হলেন এবং ইরানীদের ওপর এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়লেন যে, তাদের ব্যূহ তছনছ হয়ে গেল এবং বনু বাজলিয়া মুসিবত থেকে পরিত্রাণ পেলো। এই নিকাবধারী অশ্বারোহী ছাকিফের নামকরা বাহাদুর হযরত আবু মাহজান ছিলেন।[১] তারপর বনু বাজলিয়া বনু কান্দাহ, বনু আসাদ, নাখা এবং আরো কতিপয় গোত্রের সঙ্গে মিলিত হয়ে শত্রুর কেন্দ্রের ওপর এমন প্রচণ্ড জোরে হামলা করলো যে, ইরানীদের প্রতিরোধ ক্ষমতা একদম গুড়িয়ে গেল এবং তারা পালিয়ে গেল। এই বিশৃংখল অবস্থায় রোস্তমও মারা গেল। আবু হানিফা দিনাওয়ারী (র) বর্ণনা করেছেন যে, যুদ্ধের পর জারির (রা) ইরানীদের পিছু ধাওয়া করতে করতে অনেক দূর পর্যন্ত গেলেন এবং নদীর সেতুর ওপর গিয়ে ইরানীদের রাস্তা বন্ধ করে দিয়ে দাঁড়িয়ে গেলে পলায়নরত ইরানীরা তার ওপর বর্শা দিয়ে হামলা করে বসলো এবং তিনি মাটির ওপর পড়ে গেলেন। ইত্যবসরে তাঁর

---

১. হযরত আবু মাহজান (রা) ছাকাফী নবম হিজরীতে ইসলাম গ্রহণ করেন। অত্যন্ত বাহাদুর ও দানশীল ছিলেন। কবিতাতেও ব্যুৎপত্তি রাখতেন। কাদেসিয়ার যুদ্ধে প্রথমে মদপানের অপরাধে নজরবন্দী ছিলেন। যখন প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছিলো ঠিক তখন তিনি হযরত সায়াদের (রা) স্ত্রী সালমার নিকট আবেদন জানিয়ে বললেন যে, আল্লাহর ওয়াস্তে আমার বেড়ি খুলে দাও এবং সায়াদের (রা) ঘোড়া এবং অস্ত্র আমাকে দাও। যদি জীবিত বেঁচে যাই তাহলে স্বয়ং বেড়ি পরিধান করবো। [হযরত সায়াদ (রা) ফোঁড়ার কারণে নিজে যুদ্ধে অংশ নিতে পারেননি] সালমা অস্বীকৃতি জানালে তিনি এমন এক হৃদয়স্পর্শী কবিতা পাঠ করলেন যে, সালমার অন্তর গলে গেল এবং তিনি আবু মাহজানকে মুক্ত করে দিলেন। তিনি নিজের মুখের ওপর কাপড় দিয়ে ঢেকে হযরত সায়াদের (রা) ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে এমন শানে যুদ্ধের ময়দানে পৌঁছলেন যে, যেদিকে অগ্রসর হতেন সেদিকেই ইরানীদের ধ্বংস সাধন করতেন। যুদ্ধের পর হযরত সায়াদ (রা) তাঁকে মুক্ত করে দিলেন এবং তিনি মদপান থেকে তওবা করলেন।

বেঁচে যাওয়া সাথীরা পৌঁছে গেলেন এবং তারা ইরানীদেরকে তরবারী দিয়ে সাবাড় করে ফেললো। জারির (রা) তেমন মারাত্মকভাবে আহত হননি। তবে তাঁর ঘোড়া নিহত হয়েছিল। তার স্থলে তিনি একটি ইরানী টাট্টু লাভ করেন। হযরত জারির (রা) তাতে সওয়ার হলে তাকে নিজের ঘোড়ার মতই দ্রুতগতি সম্পন্ন পান।

কাদেসিয়াতে মুসলমানদের বিজয় এত শানদার ছিল যে, ইরানের সিংহাসন টলমল করে উঠলো। কাদেসিয়া থেকে মুসলমানদের দল মাদায়েন ও জালুলার দিকে অগ্রসর হয় এবং তা দখল করে নেয়। হযরত জারির (রা) চার হাজার সওয়ারসহ জালুলার হিফাজতে নিয়োজিত হন। কিছুদিন পর হযরত সায়াদ (রা) তাঁর নিকট আরো তিনহাজার সিপাহী প্রেরণ করেন এবং তাদেরকে নিকটবর্তী হালওয়ান শহরের ওপর হামলার নির্দেশ দেন। এখানে ইরানীদের এক ভীতিপ্রদ ইজতিমা চলছিল। হযরত জারির (রা) বিদ্যুৎবেগে তুফানের মত হালওয়ানের ওপর হামলা করে বসলেন। ইরানীরা এই হামলা মোকাবিলা করার সাহস পেলো না এবং এই গুরুত্বপূর্ণ শহরও মুসলমানদের করায়ত্ত্বে এলো।

হালওয়ান দখলের পর হযরত জারির (রা) আহওয়াজ ও তাসতুরের(অথবা শোস্তর) যুদ্ধে নিজের বীরত্ব প্রদর্শন করেন। এসব যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর ইরানীরা এদিক ওদিক বেঁচে থাকা শক্তি নাহারওয়ান্দে একত্রিত করে এবং মুসলমানদেরকে ইরান থেকে বহিষ্কার করার জন্য শেষ সৈন্যটি পর্যন্ত কাজে লাগিয়েছিল। তাদের নেতৃত্ব করছিল একজন নামকরা জেনারেল মারদান শাহ বিন হুরমুজ। হযরত ওমর ফারুক (রা) হযরত নোমান (রা) বিন মাকরানকে ত্রিশ হাজারের বাহিনী দিয়ে ইরানীদের মুকাবিলার জন্য প্রেরণ করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ওসিয়ত করলেন যে, এই যুদ্ধে যদি নোমান শহীদ হয়ে যান তাহলে তাঁর স্থলে হুজায়ফা (রা) ইবনুল ইয়ামান সেনাপতি হবেন। তিনিও যদি নিহত হন তাহলে মুগিরাহ (রা) বিন শু'বা সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব দেবেন এবং তিনিও যদি মারা যান তাহলে আশয়াছ (রা) বিন কায়েস আমীর হবেন।

কাদেসিয়ার পর ইরানের মাটিতে সংঘটিত সকল যুদ্ধের মধ্যে নাহারওয়ান্দের যুদ্ধ সবচেয়ে কঠিন যুদ্ধ ছিল। হযরত জারির (রা) এই যুদ্ধে পূর্ণ বীরত্ব প্রদর্শন করেন। হযরত নোমান (রা) শহীদ হলে হুজায়ফা (রা) ইবনুল ইয়ামান সেনাবাহিনীর সেনাপতি হলেন। জারির (রা) তাঁর নেতৃত্বে বনু বাজিলা ও অন্যান্য গোত্রকে সঙ্গে নিয়ে ইরানীদের ওপর এমন তুফানের বেগে

হামলা করলেন যে, তারা হতভম্ভ হয়ে পড়লো এবং নিজেদের ২০ হাজার মানুষ নিহত হওয়ার পর পালিয়ে গেল। মুসলমানরা হামদান পর্যন্ত তাদের পিছু ধাওয়া করলেন। এই বিজয় এমন শানদার বিজয় ছিল যে, তারপর আজম আর কখনো শক্তি সঞ্চয় করতে পারেনি। এ জন্য মুসলমানরা তাকে "ফাতহুল ফুতুহ" বা বিজয়সমূহের বিজয় বলে আখ্যায়িত করে থাকেন।

হযরত ওমরের (রা) শাহাদাতের পর হযরত উসমান জুন্নুরাইন (রা) খিলাফতের মসনদে সমাসীন হন। এ সময় তিনি হযরত জারিরের (রা) দ্বীনী ও মিল্লী খিদমতের স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁকে হামদানের গভর্ণর নিযুক্ত করেন। হযরত উসমান (রা) শহীদ হলে হযরত জারির (রা) কোন চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুর বাইয়াত করেন। তারপর নিজের এলাকার লোকদের নিকট থেকে হযরত আলীর (রা) বাইয়াত নিয়ে কুফায় তাঁর কাছে আসেন। আবু হানিফা দিনাওয়ারী "আল-আখবারুত তাওয়াল" গ্রন্থে লিখেছেন যে, হযরত উসমানের (রা) শাহাদাতের সময় হযরত জারির (রা) (তাঁর পক্ষ থেকে) যাহর বিন কায়েস জু'ফির সঙ্গে মিলিতভাবে জাবাল নামক স্থানের আমেল ছিলেন এবং সেই এলাকার লোকদের নিকট থেকে তাঁরা হযরত আলীর বাইয়াত গ্রহণ করেন। হযরত আলী (রা) বিভিন্ন প্রদেশের শাসকদেরকে নিজের বাইয়াতের দাওয়াত দিলেন। এ সময় সিরিয়ার গভর্ণর আমীর মুয়াবিয়ার (রা) নামেও পত্র প্রেরণ করলেন। আমীর মুয়াবিয়াকে (রা) এই পত্র পৌঁছানোর দায়িত্ব অর্পণ করা হয় হযরত জারিরের (রা) ওপর। জারির (রা) এই পত্র নিয়ে আমীর মুয়াবিয়ার (রা) নিকট দামেস্ক পৌঁছেন। সে সময় তাঁর দরবারে সিরিয়ার কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। জারির (রা) হযরত আলীর (রা) পত্র তাঁকে দিয়ে বললেন ঃ "এটা আমীরুল মু'মিনীন আলীর (রা) পত্র আপনার এবং সিরিয়াবাসীর নামে। তিনি আপনাকে তাঁর বাইয়াতের দাওয়াত দিয়েছেন। মক্কা মুয়াজ্জামা, মদীনা মুনাওয়ারা, কুফা, বসরা, ইয়েমেন, বাহরাইন, আম্মান, ইয়ামামা, ফারেস, হাম্বল, খোরাসান ও মিসর প্রভৃতি সকলেই ঐকমত্য অনুসারে তাঁকে খলিফা হিসেবে মেনে নিয়েছে। আপনার এলাকা ছাড়া এখন আর অন্য কোন এলাকা তাঁর আনুগত্যের বাইরে নেই। আর যদি হযরত আলীর (রা) বহমান উপত্যকাসমূহের কোন উপত্যকাও যদি এই অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয় তাহলে এটা ডুবে যাবে।"

আমীর মুয়াবিয়া (রা) কিছুদিন নিজের সমর্থক ও সাহায্যকারীদের সঙ্গে এ ব্যাপারে মতবিনিময় করলেন। অতপর তিনি হযরত জারিরকে (রা) ডেকে

পাঠালেন এবং তাঁকে বললেন, "আপনি আপনার বন্ধুর [হযরত আলী (রা)] কাছে ফিরে যান এবং তাঁকে বলুন যে, আমি এবং সিরিয়াবাসী তাঁর বাইয়াত করবো না।"

হযরত জারির (রা) ফিরে গিয়ে হযরত আলীকে (রা) আমীরে মুয়াবিয়ার(রা) জবাব শুনালেন এবং সেই সঙ্গে তাঁকে আমীরে মুয়াবিয়ার (রা) যুদ্ধ প্রস্তুতি সম্পর্কেও অবহিত করলেন। তাছাড়াও তাঁরা কি কি করতে যাচ্ছে তাঁর পুংখানুপুংখ বর্ণনা দিলেন—তাতে হযরত আলীর (রা) কতিপয় সাথী আবেগাপ্লুত হয়ে উঠলো এবং তারা হযরত জারিরকে (রা) মুয়াবিয়ার (রা) পক্ষে পক্ষপাতিত্ব করার অভিযোগে অভিযুক্ত করলো। মালিক আশতার তো এতো উত্তেজিত হলো যে, তিনি প্রকাশ্যে হযরত আলীকে (রা) বললেন ঃ

"আমীরুল মু'মিনীন! যে কাজের জন্য আপনি জারিরকে (রা) প্রেরণ করেছিলেন, সে কাজে যদি আমাকে প্রেরণ করতেন তাহলে আল্লাহর কসম, আমি মুয়াবিয়ার গলা দাবানোর প্রশ্নে সামান্যতম শৈথিল্যও প্রদর্শন করতাম না এবং প্রথম থেকেই তাঁর প্রতিটি তদবির ও দলিলের তদারক করে নিতাম।"

হযরত জারির (রা) বললেন ঃ "প্রথমে যদি না যেতে পারো তাহলে এখন গিয়ে করে দেখাও।"

মালিক আশতার বললো ঃ "এখন আমি গিয়ে কি করতে পারি! তুমি সকল ব্যাপার প্রকাশ করে দিয়েছ। আল্লাহর কসম! আমারতো ধারণা, তুমি ভেতরে ভেতরে মুয়াবিয়ার সঙ্গে কোন ষড়যন্ত্র করেছ। নচেৎ তুমি আমাদেরকে তাঁর সৈন্যদের দিয়ে ভীতি প্রদর্শন করতে না। আমীরুল মু'মিনীন যদি আমাকে অনুমতি দেন, তাহলে আমি তোমাকে এবং তোমার মত অন্যান্য সন্দেহ ভাজন ব্যক্তিদেরকে কারাগারে নিক্ষেপ করতাম।"

মালিক আশতারের এ ধরনের আক্রমণাত্মক কথায় হযরত জারির (রা) খুব মনোকষ্ট পেলেন এবং তিনি ভগ্নহৃদয়ে নিজের খান্দানসহ রাতের মধ্যেই কুফা থেকে বের হয়ে কারকেশিয়া চলে গেলেন এবং অবশিষ্ট জীবন চুপচাপ সেখানেই কাটিয়ে দিলেন। কারকেশিয়া অবস্থানকালে দেশে কয়েকটি রাজনৈতিক উত্থান-পতন ঘটলো। কিন্তু তিনি কোনটিতেই অংশ নেননি। যদি তাঁর কোন দূরভিসন্ধি থাকতো তাহলে তিনি অত্যন্ত সহজেই আমীর মুয়াবিয়ার (রা) নিকট যেতে পারতেন। তিনি তাঁকে বড় পদ দেয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু তিনি শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত হযরত আলীর (রা) বাইয়াত বাতিল করার জন্য অগ্রসর হননি।

হযরত জারির (রা) ৫৪ হিজরীতে কারকেশিয়াতে নির্জনত্ব গ্রহণ অবস্থাতেই শেষ সফরে যাত্রা করেন। ওফাতের সময় আমর, মানযার, আইয়ুব, ইবরাহিম এবং ওবায়দুল্লাহ নামক পাঁচ পুত্র রেখে যান।

আল্লাহ পাক হযরত জারিরকে (রা) সুন্দর সিরতের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণ মাত্রার সুন্দর সুরতও দান করেছিলেন। তিনি এত সুদর্শন ছিলেন যে, হযরত ওমর ফারুক (রা) তাঁকে উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার ইউসুফ বলতেন। আল্লামা ইবনে আবদুল বার (র) লিখেছেন যে, তাঁর দেহের উচ্চতা ছিল ৬ গজ লম্বা। সীমাহীন সুদর্শন ছিলেন। মাথার চুল পেকে গেলে তাতে মেহেদীর খেজাব লাগাতে শুরু করেন। তাতে তাঁর ব্যক্তিত্ব ও খুবসুরত আরো বৃদ্ধি পেতে থাকে।

হযরত ওমর ফারুক (রা) মানুষ চেনার ব্যাপারে খুব অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি অন্তর দিয়ে হযরত জারিরের (রা) গুণাবলী স্বীকার করতেন এবং তাঁকে খুব শ্রদ্ধা করতেন। একবার তিনি সাক্ষাতের জন্যে এলেন। এ সময় তিনি তাঁকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

"আল্লাহ তোমার ওপর অনুগ্রহ বর্ষণ করুন। জাহেলী যুগেও তুমি ভাল নেতা বা সরদার ছিলে এবং ইসলাম গ্রহণের পরও ভাল সরদার রয়েছো।"

হযরত জারির (রা) রাসূলে আকরামের (সা) ওফাতের মাত্র ছ/সাত মাস পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং এই সংক্ষিপ্ত সময়ও তিনি অব্যাহতভাবে হুজুরের (সা) খেদমতে কাটান। উপরন্তু নবীর (সা) ফয়েজে অভিষিক্ত হওয়ার জন্য যতটুকুন সময়ই তিনি পেয়েছিলেন তা তিনি সম্পূর্ণরূপে কাজে লাগিয়েছিলেন। তাঁর থেকে একশ' হাদিস বর্ণিত আছে। এসব হাদিস থেকে প্রকাশ পায় যে, হযরত জারির (রা) যখনই রাসূলে আকরামের (সা) নিকট উপস্থিত হওয়ার সুযোগ পেতেন তখন তিনি সর্বাবস্থায় হুজুরের (সা) সঙ্গে সঙ্গে থাকতেন এবং তাঁর ইরশাদ সমূহকে জপমালা বানিয়ে নিতেন। যেসব ঘটনা তাঁর সামনে ঘটতো তা একটু বিস্তারিতভাবে স্মরণ রাখতেন এবং তা হুবহু লোকদের সামনে দোহরাতেন। একবার মদীনা এলেন। এসময় নবী করিম (সা) তাঁকে ও অন্য সাহাবীদেরকে সঙ্গে নিয়ে মদীনার বাইরে গেলেন। হযরত জারির (রা) বলেন যে, আমরা সামান্য একটু এগিয়ে ছিলাম। এ সময় আমরা একটি সওয়ারীকে খুব দ্রুতগতিতে আসতে দেখলাম। হুজুর (সা) বললেন, মনে হয় যেন এই সওয়ার তোমাদের নিকটই আসছে। ইত্যবসরে সওয়ার এসে পৌঁছলো এবং সালাম করলো। আমরা তাঁর সালামের জবাব

দিলাম। হুজুর (সা) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "কোত্থেকে আসছো?" সে আরজ করলো, "বিবি-বাচ্চা এবং নিজের খান্দানের নিকট থেকে।"

তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ "কোথায় যেতে চাও?"

সে বললো, "আল্লাহর রাসূলের নিকট যাওয়ার ইচ্ছা।"

হুজুর (সা) বললেন ঃ "তাহলে তুমি মনযিলে মাকসুদে পৌঁছে গেছ।"

সে আরজ করলো ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! ঈমান কি? তা আমাকে শিখান।"

তিনি বললেন ঃ "একথার সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহর রাসূল। পাবন্দীর সঙ্গে নামায পড়, যাকাত দাও, রমযানের রোযা রাখো, বাইতুল্লাহর হজ্জ করো।"

সে বললো, আমি এসব বিষয়ের স্বীকৃতি দিলাম। তারপর যখন এই ব্যক্তি সেখান থেকে রওয়ানা হলো তখন তাঁর উটের পা কোন বন্য ইঁদুরের গর্তে গিয়ে পড়লো এবং উট পড়ে গেল। সেই ব্যক্তিও উটের ওপর থেকে উবু হয়ে পড়লো এবং মারা গেল। হুজুর (সা) বললেন, ঐ ব্যক্তিকে আমার কাছে ডেকে আনো। হযরত হুজায়ফা (রা) ইবনুল ইয়ামান এবং হযরত আম্মার (রা) বিন ইয়াসির (রা) তৎক্ষণাৎ তাকে ডাকার জন্য অগ্রসর হলেন। তাঁকে মাটির ওপর থেকে উঠিয়ে বসালেন। কিন্তু সে মারা গিয়েছিল। তাঁরা এসে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সেই ব্যক্তিতো ইন্তেকাল করেছে। একথা শুনে হুজুর (সা) সেই ব্যক্তির পরিবর্তে অন্যদিকে দেখতে লাগলেন। অতপর তিনি বললেন, তোমরা দেখেছ যে, আমি সেই ব্যক্তির পরিবর্তে অন্যদিকে মনোযোগী হয়ে গিয়েছিলাম। আমি দেখলাম যে, দুইজন ফেরেশতা তাঁর মুখের মধ্যে বেহেশতের ফল নিক্ষেপ করছেন। তা দেখে আমি মনে করলাম যে, অবশ্যই এই ব্যক্তি অভুক্ত অবস্থায় মারা গেছে। আল্লাহর কসম! তারা সেসব লোকের মধ্যে পরিগণিত যাদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন, যারা ঈমান এনেছে এবং তারপর ঈমানে সামান্য পরিমাণ পাপের দাগও লাগতে দেয়নি। এরাই হলো তারা যাদের জন্য রয়েছে শান্তি এবং এরাই হলো হেদায়াত প্রাপ্ত। অতপর তিনি (সা) বললেন যে, নিজের ভাইয়ের কাফন দাফনের ব্যবস্থা করো। আমরা তাকে উঠিয়ে পানির কাছে আনলাম। গোসল দিলাম। খোশবু লাগালাম। কাফন পরালাম এবং দাফনের জন্য নিয়ে গেলাম। হুজুর (সা) কবরের এক পাশে বসে গেলেন এবং বললেন, বগলের কবর বানাও। সিন্দুকের কবর বানিও না। কেননা, আমাদের জন্য বগলের কবরই উপযুক্ত। অন্যদের জন্য সিন্দুক।

এই রেওয়ায়াতের অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, সে সময় হুজুর (সা) সেই ব্যক্তির জন্য عَمِلَ قَلِيلاً وَأُجِرَ كَثِيرًا (সে আমল কম করেছিল কিন্তু সওয়াব বেশী পেয়েছিল) এই বাক্যও বলেছিলেন।(তিবরানী, মুসতাদরাকে হাকিম ও তিরমিযী)

হযরত জারির (রা) অন্য একটি হাদিসে বলেন, "রাসূলে করিম (সা) সেনাবাহিনীর একটি ছোট দলকে খাছয়াম গোত্রের দিকে প্রেরণ করেন। গোত্রটির কিছু মানুষ সিজদাবনত হয়ে নিজেদের জীবন বাঁচাতে চাইলো। কিন্তু ইসলামী বাহিনী কালবিলম্ব না করে তাদেরকে হত্যা করে ফেললো। যখন এই ঘটনা বিশ্ব নবী (সা) জানতে পেলেন তখন তিনি তাদের শোনিতপাতের বা দিয়তের অর্ধেক আদায়ের নির্দেশ দিলেন এবং বললেন, আমি প্রত্যেক এমন মুসলমান থেকে দায়িত্বমুক্ত যে মুশরিকদের মধ্যে প্রবেশ করে রয়ে গেছে। লোকজন জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল। এটা কেন? তিনি বললেন, উভয়কে এমন দূরত্বে অবস্থান করতে হবে যে, একে অপরের আগুনের আলো চোখে পড়বে না।" (আবু দাউদ)

(হাদিসের ব্যাখ্যাকারীরা লিখেছেন যে, এই দূরত্বে অবস্থানের নির্দেশ সেই যুগের গোত্রসমূহের পরিবেশের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত ছিল। মোটকথা, মুসলমানদেরকে মুশরিকদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকা থেকে দূরে থাকতে হবে।)

হযরত জারির (রা) হুজুরের (সা) ইরশাদের ওপর কিভাবে আমল করতেন তাঁর আন্দাজ এই ঘটনা থেকে করা যায়। একবার তাঁর খাদেম তাঁর গাভীগুলোকে চরিয়ে ফিরিয়ে আনলো, এ সময় তাঁর দলে অন্য কারোর গাভীও চলে এসেছিল। হযরত জারির (রা) খাদেমকে নির্দেশ দিলেন, "তাকে বের করে দাও। আমি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে শুনেছি যে, অন্যের পশু শুধুমাত্র পথভ্রষ্টরা নিজের কাছে রাখতে পারে।"

হযরত জারির (রা) বিন আবদুল্লাহ আল বাজলী সেসব সৌভাগ্যবান সাহাবীর (রা) মধ্যে পরিগণিত হয়ে থাকেন যাঁদেরকে রহমতে আলম (সা) শুধুমাত্র ভালই বাসতেন না, বরং তাঁদেরকে ভক্তি ও শ্রদ্ধাও করতেন। তিনি যখন প্রথমবার হুজুরের (সা) খিদমতে হাজির হয়েছিলেন তখন তিনি তাঁকে বসার জন্য নিজের পবিত্র চাদর বিছিয়ে দিয়েছিলেন এবং লোকদেরকেও যখন কোন কওমের কোন সম্মানিত ব্যক্তি তোমাদের নিকট আগমন করলে তাঁর সম্মান করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তারপরও জারির (রা) যখনই হুজুরের (সা)

খিদমতে হাজির হতেন তখন তিনি তাঁকে সম্মান করতেন। তিনি মদীনা এলে হুজুর (সা) অবশ্যই তাঁকে দর্শন দিতেন।

সহীহ মুসলিমে আছে যে, হুজুর (সা) তাঁকে দেখলে মুচকি হেসে দিতেন এবং তাঁর চেহারায় উৎফুল্লতা ছেয়ে যেতো। কখনো যদি হুজুরের (সা) মজলিশে জারিরের (রা) উল্লেখ হতো তাহলে তিনি অত্যন্ত ভাল বাক্যে তাঁর উল্লেখ করতেন। স্বয়ং হযরত জারির (রা) বর্ণনা করেছেন ঃ

"একবার আমি মদীনা মুনাওয়ারা এলাম এবং সওয়ারী বসিয়ে কাপড়ের থলে থেকে নিজের হুল্লা বের করলাম এবং তা পরিধান করে মসজিদে নববীর দিকে রওয়ানা হলাম। হুজুর (সা) সে সময় খুতবা দিচ্ছিলেন। আমি সালাম করে বসে পড়লাম। লোকজন আমার দিকে বিস্ময়কর স্নেহের দৃষ্টিতে দেখতে লাগলো। আমি আমার নিকটের লোককে জিজ্ঞেস করলাম ঃ

আবদুল্লাহ! হুজুর (সা) কি আমার কথা উল্লেখ করছিলেন?"

তিনি বললেন, "হাঁ, এইমাত্র খুতবার সময় হুজুর (সা) বললেন যে, খুব অল্প সময়ের মধ্যে এই দরজা অথবা জানালার রাস্তা দিয়ে তোমাদের নিকট ইয়েমেনের সর্বোত্তম ব্যক্তি আসবেন। তাঁর চেহারায় বাদশাহীর আলামত থাকবে।"

আমি নিজের ব্যাপারে হুজুরের (সা) এই ইরশাদ শুনে খুব খুশী হলাম এবং আল্লাহ তায়ালার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলাম।

হযরত সাখার (রা) বিন

হারব—কুরাইশ সেনাপতি

অষ্টম হিজরীর পবিত্র রমযান মাসে রহমতে আলম (সা) মক্কা মুয়াজ্জামার ওপর ইসলামের পতাকা উড্ডীন করলেন। এ সময় সমগ্র আরব তাকে দ্বীনে ইসলামের সত্যতার নিদর্শন হিসেবে মেনে নিল। কিন্তু মক্কার নিকটবর্তী হাওয়াযিনের শক্তিশালী গোত্রের দুর্ভাগ্য ছিল। অথবা তাদের জ্ঞান ছিল কম। আরবের কেন্দ্র বিন্দু মক্কার ওপর হকপন্থীদের বিজয় তাদেরকে অগ্নিশর্মা করে দিয়েছিল এবং তারা ইসলামকে উৎখাত করার জন্য তৎক্ষণাৎ অত্যন্ত জোরে শোরে উঠে দাঁড়ালো। তারা নিজেদের সঙ্গে নজর এবং জুশুমের গোত্রদেরকেও একত্রিত করলো এবং অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে মক্কার দিকে অগ্রসর হলো। হকের ঝাণ্ডাবাহী এবং তাদের মধ্যে হুনাইন উপত্যকায় এক রক্তাক্ত যুদ্ধ সংঘটিত হলো। এই যুদ্ধে বনু হাওয়াযিন এবং তার মিত্রদের শিক্ষণীয় পরাজয়ের শিকার হতে হলো। তাদের অসংখ্য মানুষ যুদ্ধের ময়দানে লাশ হয়ে পড়ে রইলো এবং বিরাট সংখ্যক মুসলমানদের হাতে বন্দী হলো। অবশ্য হাওয়াযিনের কিছু মানুষ পালিয়ে তায়েফের দুর্গে একত্রিত হলো। মুশরিক বনু ছাকিফ তাদেরকে সেখানে আশ্রয় দিল। রাসূলে করিম (সা) এই খবর পেয়ে কালবিলম্ব না করে তায়েফ অবরোধ করে বসলো। এই অবরোধ কম-বেশী তিন সপ্তাহ অব্যাহত ছিল। এই সময় মুসলমানরা দুর্গের ওপর বার বার হামলা করলো। কিন্তু প্রতিবারই দুর্গবাসীদের প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ ও তীর নিক্ষেপ তাদেরকে পিছু হটতে বাধ্য করলো। এমনই এক হামলায় এক বর্ষীয়ান অথচ চঞ্চল ও হৃষ্টপুষ্ট রাসূলের সাহাবী অগ্রগামী ছিলেন। এ সময় দুশমনের একটি তীর তাঁর চোখে লাগলো। তীরের আঘাতে তাঁর চক্ষুর ঢিলা অংশ চক্ষু থেকে বের হয়ে ঝুলতে লাগলো। সেই সাহাবী সেই অবস্থায় হুজুরে আকরামের (সা) খিদমতে হাজির হলেন। তিনি তাঁকে দেখে বললেন ঃ

"আপনি যদি চান তাহলে আমি দোয়া করবো। যাতে আপনার চোখ ভাল হয়ে যায়। কিন্তু আপনি যদি পসন্দ করেন এবং ধৈর্য ধারণ করেন, তাহলে আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর বিনিময়ে আপনাকে জান্নাত দিবেন।"

সেই ব্যক্তি রাসূলের (সা) ইরশাদ শুনে নিজের দুঃখের কথা ভুলে গেলেন। গণ্ডদেশে ঝুলন্ত চোখের ঢিলা অংশটুকু কেটে ফেলে দিলেন এবং আরজ করলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল! আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। আমি জান্নাত চাই।"

এই সাহিবে রাসূল যিনি সাকিয়ে কাওছারের (সা) নিকট জান্নাতের সুসংবাদ পেয়ে নিজের চোখ ভাল হওয়া পসন্দ করেননি এবং ধৈর্যকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন, তিনি হলেন কুরাইশের প্রখ্যাত সরদার হযরত সাখার(রা) বিন হারবে উমুব্বী। ইতিহাসে তিনি আবু সুফিয়ান কুনিয়তে মশহুর হয়ে আছেন। তাঁর আর এক কুনিয়াত ছিল আবু হানজালা। কিন্তু এই কুনিয়াত খ্যাতি লাভ করেনি।

হযরত আবু সুফিয়ান সাখার (রা) বিন হারব কুরাইশের অত্যন্ত ক্ষমতা ও প্রভাবশালী খান্দান (শাখা) বনু উমাইয়ার সরদার ছিলেন। তিনি বিশ্ব নবীর(সা) পিতামহের সমতুল্য ছিলেন। তাঁর নসব চুতর্থ পুরুষে গিয়ে হুজুরের (সা) নসবের সঙ্গে মিলে যায়। নসবনামা হলো ঃ

১। হযরত সারওয়ারে কায়েনাত মুহাম্মাদ (সা) বিন আবদুল্লাহ বিন আবদুল মুত্তালিব বিন হাশিম বিন আবদি মান্নাফ বিন কুসাই।

২। হযরত আবু সুফিয়ান সাখার (রা) বিন হারব বিন উমাইয়া বিন আবদুস শামস বিন আবদি মান্নাফ বিন কুসাই।

কুরাইশ পরিবারের মধ্যে সবচেয়ে মশহুর, প্রভাবশালী, শরীফ এবং সম্মানিত পরিবার ছিল বনু হাশিমের। কা'বার অভিভাবকত্ব করা ছাড়া হাজীদের পানি পান করানোর মত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনও এই খান্দানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল। বনু হাশিমের পর দ্বিতীয় দরজা ছিল বনু উমাইয়ার। এই খান্দান কুরাইশের ঝাণ্ডাবহন, সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব প্রদান এবং কাফেলার দলপতিত্ব করায় নিয়োজিত থাকতো। যদিও কতিপয় রেওয়ায়াত অনুযায়ী সামরিক ক্যাম্পের ব্যবস্থাপনা করার দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল বনু মাখজুমের ওপর। কিন্তু নিজের মর্যাদা ও বিত্ত বৈভব, জনসংখ্যাধিক্য, সাহসিকতা, বাহাদুরী এবং বুদ্ধিমত্তার বদৌলতে সাধারণত বনু উমাইয়াই কুরাইশের ঝাণ্ডা বহনের সঙ্গে সঙ্গে সেনাপতিত্বের দায়িত্বও আঞ্জাম দিত। যা হোক, ঝাণ্ডাবহনের দায়িত্ব বনু উমাইয়া স্থৈর্যের সঙ্গেই করতো।কুরাইশের যুদ্ধের নিশান শুধু কঠিন লড়াইয়ের সময়ই বাইরে বের করা হতো এবং এই যুদ্ধ নিশান সবসময় বনু উমাইয়ার নেতার হাতে থাকতো। যে যুগে রহমতে আলম (সা) হকের দাওয়াত প্রদান

শুরু করেছিলেন সে সময় আবু সুফিয়ান (রা) বনু উমাইয়ার সরদার ছিলেন। এই মর্যাদার কারণে তিনি কুরাইশের ঝাণ্ডাবাহীও ছিলেন।

বনু হাশিম এবং বনু উমাইয়ার মধ্যে দীর্ঘদিন যাবত শত্রুতামূলক সংঘাত চলে আসছিলো। এই সংঘাতের শুরু হয় উভয় খান্দানের পূর্বপুরুষ আবদি মান্নাফের মৃত্যুর পরই। সংঘাতের কারণ হলো, আবদি মান্নাফের পর হাশিম পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। কেননা তাঁর বড় ভাই আবদিস শামস পিতার সামনেই মারা যায়। উমাইয়া বিন আবদিস শামস চাচার নেতৃত্ব মেনে নিতে পারলো না এবং বড় পুত্রের সন্তান হিসেবে স্থলাভিষিক্ত হওয়ার দাবী করলো। কিন্তু কুরাইশের পঞ্চায়েত হাশিমের পক্ষে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলো। সুতরাং উমাইয়া চরম ক্রোধান্বিত অবস্থায় স্বদেশকে বিদায় জানিয়ে সিরিয়া চলে গেল এবং যতদিন পর্যন্ত হাশিম জীবিত ছিলেন ততদিন ফিরে আসেনি। হাশিমের মৃত্যুর পর তার ভাই মুত্তালিব এবং আবদুল মুত্তালিবের পুত্ররা একের পর এক কা'বার মুতাওয়াল্লী হলেন। উমাইয়া ফিরে এসে কুরাইশের ঝাণ্ডা বহন, কাফেলার নেতৃত্ব প্রদান এবং সামরিক সেনাপতির পদেই তুষ্ট থাকে। তা সত্ত্বেও তার এবং তার সন্তানদের অন্তরে বনু হাশিমের বিরুদ্ধে তিক্ততা সৃষ্টি হয়েছিল তা দূর হয়নি। এই তিক্ততা বনু উমাইয়া পর্যন্ত সীমিত ছিল না। কুরাইশের অন্য গোত্র যেমন বনু মাখজুম, বনু সাহাম এবং বনু জুমাহ প্রভৃতি গোত্রেরও চক্ষুশূল ছিল বনু হাশিম। তারা বনু হাশিমকে হেয়প্রতিপন্ন করার জন্য যাবতীয় অপচেষ্টাই করেছিল। কিন্তু লক্ষ্য হাসিলে কখনো সফল হয়নি। বেশী হলেও তারা পার্থিব বিত্ত বৈভব ও সম্মান এবং প্রভাব প্রতিপত্তির দিক থেকে বনু হাশিমের সমান বলে ধারণা করতো। কিন্তু নবীয়ে আখিরুজ্জামান যখন বনু হাশিমের মধ্যে আবির্ভূত হলেন তখন তাদের সেই ধারণা বা কল্পনাও ভেঙ্গে চুরে খান খান হয়ে গেল। তার অর্থ হলো বনু হাশিমের মান-মর্যাদা যা প্রথম থেকেই তাদের চক্ষুশূল ছিল তা এখন স্থায়ীভাবে বনু হাশিমের জন্য নির্ধারিত হয়ে গেল। এসব গোত্রের অধিকাংশ সরদার অন্তরে বিশ্ব নবীর (সা) সত্যতা স্বীকার করতেন। কিন্তু তাঁর রিসালাত মেনে নিতে সবসময় তাদের বংশীয় গোড়ামী প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতো।

ইবনে হিশাম এবং বাইহাকী বিশুদ্ধ উদ্ধৃতিসহ বর্ণনা করেছেন "হুজুরের(সা) নবুয়ত প্রাপ্তির পর একবার আখনাস বিন শুরাইক আবু জেহেলের নিকট হুজুরের (সা) ব্যাপারে তার মত জিজ্ঞেস করলো। সে বললো, আমাদের ও বনু আবদি মান্নাফের মধ্যে কে মর্যাদাশালী তা নিয়ে

বিবাদ ছিল। তারাও দায়িত্ব নিল এবং আমরাও দায়িত্ব বুঝে নিলাম। তারাও সাধারণ মানুষের জন্য দস্তরখান বিছালো এবং আমরাও। তারাও উদারতা প্রদর্শন করলো। আমরাও করলাম। এমনকি যখন তারা ও আমরা সমান সমান হয়ে গেলাম তখন তারা বলতে লাগলো যে আমাদের মধ্যে একজন নবী প্রেরিত হয়েছে। তার নিকট ওহী এসে থাকে। এখন আমরা এই দাবীর ব্যাপারে তাদের সঙ্গে কি মুকাবিলা করতে পারি। আল্লাহর কসম! আমরা তাদের নবীকে মানবো না।"

অন্য এক রেওয়ায়াতে আল্লামা ইবনে জারির তাবারী আবু জেহেলের সঙ্গে এই বাক্যাবলী সংশ্লিষ্ট করে থাকেন ঃ "আল্লাহর কসম! ইবনে আবদুল্লাহ সত্যবাদী। তাঁর যবান কখনো মিথ্যায় মলিন হয়নি। কিন্তু কুসাইর সন্তানরা যখন কা'বার অভিভাবকত্ব ও হাজীদের পানি পান করানোর সাথে সাথে নবুয়তের ওয়ারিশও হয়ে যান তখন অবশিষ্ট কুরাইশের জন্য আর কি থাকে?"

বাস্তবত আবু জেহেলের এই ধারণা তার গোত্রের সকল কুরাইশ সরদারের আবেগেরই প্রতিবিম্ব অনুমিত হয়। মজার ব্যাপার হলো যে, যেসব গোত্র আবদি মান্নাফের সন্তানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল না তারা ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে শুধু বনু হাশিমের সঙ্গেই নয়, বনু উমাইয়ার সাথেও শত্রুতা করতো। অবশ্য হুজুরের (সা) নবুয়ত প্রাপ্তির পর কুরাইশ নেতৃবৃন্দের মধ্যে ঐক্যের মাপকাঠি ছিল ইসলাম বিরোধিতা অথবা তার প্রতি সমর্থন।

ইসলামের পূর্বে কুরাইশের সকল গোত্র নিজেদের মধ্যেকার পারস্পরিক শত্রুতা ও বিরোধ সত্ত্বেও কোন বহিঃশত্রুর মুকাবিলায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে যেতো এবং একই ঝাণ্ডার অধীন দুশমনের মুকাবিলা করতো। এই প্রসঙ্গে কুরাইশ যুগের মশহুর যুদ্ধ দ্বিতীয় ফুজ্জারের যুদ্ধের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এই যুদ্ধে এক পক্ষে বনু কায়েস আইলান ছিল। অন্য পক্ষে ছিল বনু কিনানাহ এবং কুরাইশ। কুরাইশের সকল গোত্রের নেতৃত্ব আবু সুফিয়ানের (রা) পিতা হারব বিন উমাইয়ার হাতে ছিল। ইবনে হিশাম বর্ণনা করেছেন যে, এই যুদ্ধে রাসূলে আকরামও (সা) শরীক ছিলেন। সে সময় তাঁর বয়স ছিল ১৫ বছর। ইবনে আছির (র) সে সময় হুজুরের (সা) বয়স ১০ বছর ছিল বলে লিখেছেন এবং অন্য কতিপয় ঐতিহাসিক ২০ বছর বলে উল্লেখ করেছেন। এই যুদ্ধে হাশেমীয়দের সরদার হুজুরের (সা) বড় চাচা যোবায়ের বিন আবদুল মুত্তালিব ছিলেন এবং তাঁর অন্য চাচা আবু তালিব, হামযা (রা) এবং আব্বাসও (রা) শরীক ছিলেন। কতিপয় ঐতিহাসিক লিখেছেন, হুজুর (সা) এই যুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু কারোর ওপর হাত তোলেননি। বরং শুরু থেকে শেষ

পর্যন্ত নিজের চাচাদেরকে দুশমনের তীর থেকে রক্ষা করতে থাকেন। হযরত আবু সুফিয়ানও (রা) এই যুদ্ধে হুজুরের (সা) পাশে পাশে ছিলেন। যুদ্ধের ময়দানে প্রথমে বনু কায়েসের পাল্লাই ভারী ছিলো। কিন্তু পরে কুরাইশ তাদের ওপর বিজয়ী হয়। দ্বিতীয় ফুজ্জার দিবসের পর কুরাইশদেরকে আর কখনো কোন বহিঃশত্রুর হামলা মোকাবিলা করতে হয়নি। অবশ্য তাদের বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে বন্ধুত্ব ও শত্রুতার সিলসিলা অব্যাহত ছিল এবং পরস্পরের মধ্যে ছোটোখাটো ঝগড়া ঝাটি হতো। কুরাইশের এই ধরনের অতিবাহিত দিন-রাতের মধ্যে সেই মহান ব্যক্তিত্ব নিজের উন্নত চরিত্রসহ শৈশবকাল অতিক্রম করে যৌবনের বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করছিলেন।

আবু সুফিয়ান সাথারের বয়স প্রায় ৫০ বছর। এমন সময় মক্কা মুয়াজ্জামা থেকে রিসালাত সূর্য উদয় হলো। এটা একটা সাধারণ ঘটনা ছিল না। বরং হক ও বাতিলের মধ্যে এক দীর্ঘ সংঘাতের সূচনা মাত্র ছিল। কুরাইশের সেই সব নেতা যারা মন ও অন্তর দিয়ে হুজুরের (সা) মহান চরিত্রের স্বীকৃতি দিতেন এবং যাদের যবান তাঁকে সত্যবাদী ও আমিন বলতে বলতে অস্থির হয়ে যেতো, তারাই হকের পয়গাম শুনে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলো এবং নিজেদেরকে ইসলামের উৎখাত ও রহমতে আলমের (সা) বিরোধিতায় ওয়াকফ করে দিল। আবু সুফিয়ান তখন পোক্ত বয়সের মানুষ এবং বংশীয় গোড়ামী তার প্রকৃতি থেকে দূর হয়েছিল কিন্তু সে-ও ইসলাম বিরোধিদের দলের সদস্য হয়ে গেল। তবে, তার বিরোধিতার ধরন তেমন ছিল না যেমন আবু লাহাব, আবু জেহেল, উকবা বিন আবি মুয়াইত, উমাইয়া বিন খালফ, ইবনুল আসদা, নাজার ইবনুল হারিছ, আসওয়াদ বিন আবদি ইয়াগুছ, ওয়ালিদ বিন মুগিরাহ, মুনাব্বাহ ইবনুল হাজ্জাজ এবং আদি বিন হামরা প্রমুখ দুষ্ট প্রকৃতির মানুষেরা বিরোধিতা করতো। আল্লামা ইবনে সায়াদ (র) তাবকাতে লিখেছেন যে, তারা হুজুরের (সা) বিরুদ্ধে এমনভাবে লেগেছিল যে, রাসূলকে (সা) কষ্ট দেয়ার নিকৃষ্টতম পন্থাও হাতছাড়া করেনি। হুজুরের (সা) পথে কাঁটা বিছানো, গলা টিপে ধরা, পিঠের ওপর উটের নাড়িভুঁড়ি চাপিয়ে দেয়া, গালি প্রদান, হাসি-ঠাট্টা করা এবং এ ধরনের ছ্যাচরামো ও নিকৃষ্টতম কাজ এসব লোক করতো। পক্ষান্তরে আবু সুফিয়ান, তার শ্বশুর উতবা বিন রবিয়া এবং চাচা শ্বশুর শাইবা বিন রবিয়ার মত কিছু ব্যক্তি অবশ্যই ইসলামের শত্রু ছিল। কিন্তু তারা হুজুরকে (সা) কখনো শারীরিক কষ্ট দেয়নি এবং কোন হীন তৎপরতাও চালায়নি। হাফেজ ইবনে হাজার (র) এ পর্যন্তও লিখেছেন ঃ

"নবুওয়াত প্রাপ্তির পর মুশরিকরা মক্কায় যখন তাঁর ওপর নির্যাতন চালাতো তখন তিনি তাদের হীনতৎপরতা থেকে বাঁচার জন্য আবু সুফিয়ানের বাড়ী চলে

যেতেন। সে বনু উমাইয়ার সরদার হওয়া ছাড়াও সামরিক বাহিনীর সেনাপতিও ছিল। এ জন্য মক্কাবাসী তাকে খুব ভয় করতো। তার গৃহে প্রবেশ করতেই হুজুর (সা) সকল নির্যাতন থেকে রক্ষা পেয়ে যেতেন। সে সময় আবু সুফিয়ান এবং তার পরিবারের সকল সদস্য ইসলামের দুশমন হওয়া সত্ত্বেও হুজুরের (সা) সাথে অত্যন্ত ভাল ব্যবহার করতো। সম্ভবত এর বিনিময়েই কয়েক বছর পর হুজুর (সা) যখন মক্কা জয় করেন তখন প্রকাশ্যে ঘোষণা দিলেন যে, যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের গৃহে আশ্রয় নেবে সে নিরাপদ থাকবে।" (আল-ইসাবা)

ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ুতী (র) হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) থেকে বর্ননা করেছেন ঃ

"হুজুরের (সা) নবুয়ত প্রাপ্তির প্রথম যুগে একদিন আবু জেহেল সাইয়েদা ফাতিমাকে (রা) কোন কথার কারণে থাপ্পড় মারলো। সে সময় তার বয়স খুব কম ছিল। কাঁদতে কাঁদতে হুজুরের (সা) নিকট গেলেন এবং আবু জেহেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন। তিনি তাঁকে বললেন ঃ "বেটি, আবু সুফিয়ানের নিকট গিয়ে আবু জেহেলের এই কাজ সম্পর্কে অবহিত করো।" তিনি তৎক্ষণাৎ আবু সুফিয়ানের নিকট গেলেন এবং তাকে সকল ঘটনা বর্ণনা করলেন। আবু সুফিয়ান শিশু ফাতিমার (রা) আঙ্গুল ধরলো এবং সোজা সেখানে গেল যেখানে আবু জেহেল বসেছিল। সে ফাতিমাকে বললো, বেটি, যেভাবে সে তোমার মুখের ওপর থাপ্পড় মেরেছিল, তুমিও তার মুখের ওপর থাপ্পড় মারো। (তাতে যদি সে কিছু বলে তাহলে আমি তাকে দেখে নেবো।) সুতরাং তিনি আবু জেহেলকে থাপ্পড় মারলেন এবং তারপর বাড়ী ফিরে গিয়ে হুজুরকে (সা) তা বললেন। তিনি সে সময়ই দু'হাত তুলে দোয়া করলেন ঃ "হে আল্লাহ! আবু সুফিয়ানের এই নেক আচরণ ভুলে যেও না।" হুজুরের (সা) এই দোয়ার ফলেই কয়েক বছর পর আবু সুফিয়ান (রা) ইসলামের নেয়ামতে অভিষিক্ত হলেন।

অনেক নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, আবু সুফিয়ান অন্তর থেকে রাসূলে আকরামের (সা) সত্যতা স্বীকার করতেন। কিন্তু পিতৃধর্মের ও জাহেলিয়াতের গোঁড়ামী তার ইসলাম গ্রহণে সবচেয়ে বড় বাধা ছিল।

হযরত মুয়াবিয়া (রা) বিন আবু সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে,[হুজুরের (সা) নবুয়ত প্রাপ্তির পর] একবার আমি আমার পিতা আবু সুফিয়ান ও মাতা হিন্দের সঙ্গে মরুভূমির দিকে যাচ্ছিলাম। আমার মাতা ও পিতা একটি গাধির ওপর সওয়ার ছিলেন এবং আমি অন্য আরেকটির ওপর

তাদের আগে আগে যাচ্ছিলাম। ঘটনাক্রমে পথিমধ্যে রাসূলে আকরামের (সা) সঙ্গে আমাদের সাক্ষাত ঘটলো। আমার পিতা আমাকে বললেন, মুয়াবিয়া তুমি গাধির ওপর থেকে নেমে যাও। যাতে মুহাম্মাদ (সা) তার ওপর সওয়ার হতে পারেন। সুতরাং আমি নেমে গেলাম এবং হুজুর (সা) তার ওপর সওয়ার হলেন। অতপর তিনি আমার মাতা-পিতাকে সম্বোধন করে বললেন ঃ "হে আবু সুফিয়ান! হে হিন্দ বিনতে উতবা! আল্লাহর কসম, তোমাদের সবার ওপর একদিন মৃত্যু আসবে। অতপর দ্বিতীয়বার জীবিত করে উঠানো হবে। সে সময় যে নেক বলে প্রতীয়মান হবে সে বেহেশতে যাবে এবং যে খারাব হবে সে জাহান্নামে যাবে। তারপর তিনি সূরায়ে হা-মিম আস সিজদার প্রথম এগারো আয়াত তাদেরকে শুনালেন। তারপর তিনি গাধি থেকে নেমে গেলেন এবং আমি তাতে সওয়ার হলাম। রাস্তায় আমার মা আমার পিতাকে বললো, "এই জাদুকর ও মিথ্যাবাদীর (নাউজুবিল্লাহ) খাতিরে তুমি আমার বাচ্চাকে সওয়ারী থেকে নামিয়েছ।" আমার পিতা বললো, "আল্লাহর কসম! এই ব্যক্তি জাদুকরও নন এবং মিথ্যাবাদীও নন।"

এমনিভাবে আরো কতিপয় রেওয়ায়াত থেকে প্রকাশ পায় যে, আবু সুফিয়ান (রা) কয়েকবারই হুজুরের (সা) সত্যবাদিতার প্রকাশ্য স্বীকৃতি দেন। তা সত্ত্বেও সামষ্টিক ও রাজনৈতিক পর্যায়ে তিনি সবসময় কওমকে সমর্থন করেছিলেন ও ইসলামকে উৎখাতের সকল পরিকল্পনাতেই অংশ নিয়েছিলেন। হকের দাওয়াতের প্রথম যুগে কুরাইশের প্রতিনিধি দল একের পর এক হুজুরের (সা) বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে আবু তালিবের নিকট গিয়েছিল। এই প্রতিনিধিদলে আবু সুফিয়ানও শামিল ছিলেন। নিসন্দেহে তিনি ইসলাম বিরোধিতায় নিজের কওমকে সমর্থন করতেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি হুজুরের (সা) সঙ্গে সবসময়ই সম্পর্ক রেখেছিলেন এবং মাঝে মধ্যে তাঁর সাথে এমন আচরণ করতেন যাতে শরাফত ও মানবিকতা প্রতিবিম্বিত হতো। যে যুগে কুরাইশ মুশরিকরা বনু হাশিম ও বনিল মুত্তালিবকে শি'বে আবি তালিবে অবরোধ করে রেখেছিল। (নবুয়তের ৭ থেকে ৯ বছর পর্যন্ত)। কখনো সখনো কোন মুসলমান অথবা রহমদিল মুশরিক চুরি করে অথবা লুকিয়ে ছুপিয়ে অবরুদ্ধদেরকে কিছু খাদ্য পৌঁছে দিত। এ ধরনের লোকদের মধ্যে এক সুন্দর অন্তরের মানুষ ছিলেন হিশাম বিন আমরুল আমেরী। তিনি রাতের বেলায় উটের পিঠে খাদ্য বোঝাই করে এবং শি'বে আবি তালিবের কাছে গিয়ে উট তাতে ঢুকিয়ে দিতেন। অবরুদ্ধরা উট থেকে খাবার নামিয়ে তা পুনরায় ফেরত পাঠিয়ে দিত। কুরাইশ মুশরিকরা একবার তাকে ধরে ফেললো এবং খুব কঠোরতার সাথে অবরুদ্ধদের সাহায্য করায় বাধা দিল। সে সময় আবু

সুফিয়ান উঠে দাঁড়ালেন এবং কুরাইশদেরকে তাকে ছেড়ে দেয়ার জন্য ধমক দিলেন। তিনি বললেন, "এই ব্যক্তি যদি নিজের আত্মীয়দের সাথে আত্মীয়তার হক আদায় করে থাকে তাহলে তোমাদের তাতে কি আসে যায়। তাকে তা করতে দাও।"

সহীহ বুখারীতে হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন মাসউদ থেকে বর্ণিত আছে যে, কুরাইশ মুশরিকরা যখন রাসূলে আকরামকে (সা) খুব বেশী করে নির্যাতন করলো তখন একবার তিনি এই বলে দোয়া করেছিলেন ঃ

"হে আল্লাহ! ইউসুফের (আ) সাত সালা দুর্ভিক্ষের মত তাদের ওপরও দুর্ভিক্ষ দাও।"

বস্তুত মক্কায় এমন কঠিন দুর্ভিক্ষ পড়লো যে, লোকজন হাড়গোর এবং মুর্দা পর্যন্ত খাওয়া শুরু করলো। শেষে আবু সুফিয়ান এবং কুরাইশের অন্য কিছু নেতা হুজুরের (সা) খিদমতে হাজির হলেন। আবু সুফিয়ান তাদের মুখপাত্র হিসেবে বললেন ঃ

"মুহাম্মাদ (সা) তুমি লোকদেরকে আত্মীয়ের হক আদায়ের শিক্ষা দিয়ে থাকো। তোমার কওম ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। তোমার খোদার নিকট দুর্ভিক্ষ দূর হওয়ার জন্য দোয়া কেন করছো না।"

যদিও কুরাইশের নির্যাতন ও অপতৎপরতা মানবতার সীমালংঘন করে গিয়েছিল তবুও আবু সুফিয়ানের কথা শুনে তৎক্ষণাৎ রহমতে আলমের (সা) পবিত্র হাত দোয়ার জন্য উঠে গেল এবং এত বর্ষণ হলো যে জল-স্থল পানিতে একাকার হয়ে গেল। এমনকি লোকজন অতিবর্ষণের কারণে অস্থির হয়ে উঠলো। এরপর তারা দ্বিতীয়বার হুজুরের (সা) নিকট বৃষ্টি বন্ধের দোয়ার আবেদন নিয়ে হাজির হলেন। তিনি দোয়া করলেন ঃ

"হে আল্লাহ! আমাদের ওপর না হয়ে আমাদের চারপাশে বৃষ্টি হোক।" তারপর আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল।

বুখারীর অন্য এক রেওয়ায়াতে হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) থেকে দুর্ভিক্ষের ঘটনা এভাবে বর্ণিত আছে ঃ "এত কঠিন দুর্ভিক্ষ ছিল যে, কিছু না পেয়ে লোকজন পশম পর্যন্ত ভক্ষণ করতে লাগলো। শেষে একদিন আবু সুফিয়ান হুজুরের (সা) খিদমতে হাজির হয়ে ক্ষুধার ফরিয়াদ জানালো। তিনি দোয়া করলেন এবং আল্লাহ পাক এই দুর্ভিক্ষ দূর করে দিলেন।

নবুওয়াতের দশম বছরে বিশ্ব নবী (সা) হকের তাবলীগের জন্য তায়েফ তাশরীফ নিলেন। তায়েফবাসী আরবদের প্রথাগত মেহমানদারীকে উপেক্ষা

করে রাসূলের (সা) যে অসদাচারণ করে তা ইতিহাসের এক দুঃখজনক অধ্যায়। তিনি তায়েফ থেকে ফিরে খুবই পেরেশান হয়ে ওঠেন। তিনি ধারণা করতে থাকেন যে, মক্কার মুশরিকরা তায়েফের ঘটনা শুনে পূর্বের থেকে বেশী নির্যাতন চালাবে। আল্লামা ইবনে ইসহাক (র) বর্ণনা করেছেন যে, হিরার নিকটে পৌঁছে তিনি (সা) আবদুল্লাহ ইবনুল উরাইকিতের মাধ্যমে প্রথমে আখনাস বিন শুরাইক চাকাফী এবং তারপর সোহায়েল বিন আমরকে পয়গাম প্রেরণ করে বললেন যে, সে যেন তাকে পৃষ্টপোষকতা করে। তারা উভয়েই এ ব্যাপারে ক্ষমা চাইলো। তখন হুজুর (সা) বনি নওফিল বিন আবদি মান্নাফের সরদার মাতয়াম বিন আদিকেও একই পয়গাম প্রেরণ করলেন। যদিও সময়টা খুবই ভয়ংকর। মক্কার প্রতিটি অনু পরমাণু হুজুরের (সা) শত্রু হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেই বাহাদুর ব্যক্তি মুশরিক হওয়া সত্ত্বেও সহযোগিতা ও পৃষ্টপোষকতার প্রতিশ্রুতি দিলেন। সুতরাং হুজুর (সা) মক্কায় তার গৃহে তাশরীফ নিলেন এবং তার ছ'সাতজন পুত্র সশস্ত্রভাবে তাঁকে (সা) হিফাজত করতে লাগলো। কুরাইশের অন্যান্য সরদার মাতয়ামের এই কাজে খুব কঠোরতা অবলম্বন করলো। কিন্তু আবু সুফিয়ান (রা) তাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা ঠাণ্ডা করে দিলেন। তিনি বললেন, মাতয়াম যাকে আশ্রয় দিয়েছে তাকে আমরাও আশ্রয় দিয়েছি। মাতয়ামের আশ্রয় দানের প্রতিশ্রুতি ভাঙ্গা যায় না।

হযরত আবু সুফিয়ান (রা) যদিও মক্কা বিজয় পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত ছিলেন, তবুও তাঁর নিজের গৃহ এবং গোত্র ইসলাম থেকে সম্পর্কহীন ছিলেন না। তাঁর কন্যা রামলা (রা) (পরে যিনি উম্মুল মু'মিনীন হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন এবং যিনি উম্মে হাবিবা কুনিয়তে প্রখ্যাত হন) নবুয়তের প্রথম যুগেই ইসলাম গ্রহণ করেন এবং হুজুরের (সা) ইঙ্গিতে নিজের স্বামী ওবায়দুল্লাহ বিন জাহাশের সঙ্গে হাবশা বা আবিসিনিয়া হিজরত করেন। আবু সুফিয়ানের (রা) অন্য এক কন্যা ফারেয়াও (রা) প্রথম যুগে ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত আবু আহমদ (রা) বিন জাহাশের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিল। ওবায়দুল্লাহ (রা) এবং আবু আহমদ (রা) দু'জন সহোদর ছিলেন এবং রাসূলে আকরাম (সা) তাঁদের মামাতো ভাই ছিলেন। এমনিভাবে বনু উমাইয়া খান্দানে হযরত উসমান (রা) বিন আফফান, আমর (রা) বিন সাঈদ বিন আছ এবং খালিদ (রা) বিন সাঈদ বিন আছও দাওয়াতের শুরুতে ইসলাম গ্রহণ করে সাবিকুনাল আউয়ালুনের মধ্যে পরিগণিত হন।

নবীর হিজরতের পূর্বে ইসলামের তের বছরের মক্কী যুগে আবু সুফিয়ান ইসলামের শত্রুদের দলে অবশ্যই ছিলেন। তবে, হক ও দায়ীয়ে হকের (সা)

বিরুদ্ধে তৎপরতার নেতৃত্ব সবসময় আবু জেহেল, আবু লাহাব, আছ বিন ওয়ায়েল, উমাইয়া ও আবি পসরানে খালফ এবং উকবা বিন আবি মুইত প্রমুখ অন্যান্য কুরাইশ নেতার হাতে ছিল। হিজরতের ১৯ মাস পর মক্কার কুরাইশ এবং হকপন্থীদের মধ্যে সামরিক পর্যায়ে প্রথম যুদ্ধ হয় বদর নামক স্থানে। এই যুদ্ধে কুরাইশের নেতৃত্ব দিয়ে ছিল আবু জেহেল। তার নিরাপত্তার আড়ালে কুরাইশরা হকের ঝাণ্ডাবাহীদের ওপর হামলা চালিয়েছিল। এই বিরাট কাফেলা বিভিন্ন রেওয়ায়াত অনুযায়ী দেড় অথবা আড়াই হাজার উটের সমন্বয়ে গঠিত ছিল। এসব উটের ওপর পাঁচ লাখ দিরহামের পণ্য বোঝাই ছিল। মক্কার কুরাইশের প্রায় প্রত্যেক খান্দানেরই তাতে অংশ ছিল। দ্বিতীয় হিজরীর রমযান মাসে সিরিয়া থেকে ফিরতি সফরকালে আবু সুফিয়ান খবর পেলেন যে, মুসলমানরা এই কাফেলার ওপর গেরিলা হামলা চালাতে পারে তিনি একজন দ্রুতগতিসম্পন্ন দূতকে মক্কাবাসীকে এই পয়গাম দিয়ে পাঠালেন যে, কাফেলার নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে চলেছে। তাকে মুসলমানদের লুটতরাজ থেকে বাঁচানোর জন্য কালবিলম্ব না করে চলে এসো। এই পয়গাম পেতেই কুরাইশের এক হাজার যোদ্ধা অনেক সাজ-সরঞ্জামসহ মদীনা রওয়ানা হয়ে গেল ইত্যবসরে আবু সুফিয়ান নিজের রাস্তা পরিবর্তন করে কাফেলাকে সহিহ সালামতে মক্কা পৌঁছে দিলেন। কুরাইশ সৈন্যরাও একথা জানতে পেল। কিন্তু তারা ফিরে যাওয়ার পরিবর্তে আক্রমণাত্মকভাবে সামনে অগ্রসর হতে লাগলো এবং বদরের ময়দানে গিয়ে তাঁবু ফেললো। এখানে হক ও বাতিলের প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তাতে মক্কার মুশরিকদের শোচনীয় ও শিক্ষণীয় পরাজয় ঘটে এবং আবু জেহেলসহ তাদের বড় বড় সরদার নিহত হয়। নিহতদের মধ্যে আবু সুফিয়ান তনয় হানজালা, শ্বশুর উতবা, নিসবতী ভাই ওয়ালিদ বিন উতবা, চাচা শ্বশুর শাইবা এবং আরো কয়েকজন আত্মীয় শামিল ছিল। বদরের পরাজয়ের খবর মক্কা পৌঁছলে সেখানে মাতম পড়ে গেল এবং বদরের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য মক্কাবাসীরা জোরেশোরে প্রস্তুতি নিতে লাগলো। এ সময় তাদের নেতৃত্ব ছিল আবু সুফিয়ানের হাতে। তিনি কসম খেলেন যে, মুসলমানদের নিকট থেকে প্রতিশোধ না নেয়া পর্যন্ত দুনিয়ার কোন মজা গ্রহণ করবেন না। তিন মাস পর তিনি দুইশ' সশস্ত্র ও সত্তর সওয়ারসহ মদীনার ওপর অতর্কিতে হামলা চালালো। শহরের উপকণ্ঠে খেজুরের পাতার বেড়া সম্বলিত কিছু বাড়ী এবং ঘাসের স্তুপ জ্বালিয়ে ফেললো এবং দু'জন মুসলমানকে শহীদ করে দ্রুতগতিতে মক্কা ফিরে এলো। এটা সাবিকের যুদ্ধ নামে খ্যাত। কেননা এই সফরে কুরাইশের খাদ্য ছিল সাবিক অর্থাৎ ছাতু। ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় এই ছাতু ফেলে রেখেই তারা পালিয়ে গিয়েছিল। বিশ্ব নবী (সা) এই খবর পেয়ে কারকারাতুল

কদর পর্যন্ত হামলাকারীদের পিছু ধাওয়া করলেন। কিন্তু তারা পালিয়ে যেতে সফল হয়।

পরবর্তী বছর তৃতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসে আবু সুফিয়ান ওহোদের যুদ্ধে কুরাইশ মুশরিকদের নেতৃত্ব দেন। এই যুদ্ধে হকপন্থীদের ব্যাপক জীবনহানি ঘটে। (সত্তর জন মুসলমান শাহাদাতের পেয়ালা পান করেন)। তবুও সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে আবু সুফিয়ান মুসলমানদেরকে পরিপূর্ণভাবে পরাজিত করতে সক্ষম হননি। যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে হুজুরে আকরাম (সা) আহত অবস্থায় কতিপয় জীবন উৎসর্গকারীসহ পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ করেন। আবু সুফিয়ান একটি সৈন্য দল নিয়ে মুসলমানদের দিকে অগ্রসর হন। কিন্তু ওপর থেকে প্রচণ্ড পাথর নিক্ষেপে তাদেরকে পিছু হটতে বাধ্য করা হয়। সামনের নিকটবর্তী কংকরময় মরুভূমিতে দাঁড়িয়ে তিনি মুসলমানদেরকে ডেকে বললেন, "তোমাদের মধ্যে কি মুহাম্মাদ (সা) আছে?" হুজুর (সা) সাথীদেরকে জবাব দান থেকে বিরত থাকতে বললেন। যখন কোন জবাব এলোনা তখন আবু সুফিয়ান বুঝলেন যে, বিশ্ব নবীর (সা) শাহাদাতের খবর সঠিক ছিল। তিনি পুনরায় ডেকে বললেন, "তোমাদের মধ্যে কি ইবনে আবি কুহাফা [হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)] আছে?" তারও জবাব এলো না।" ওমর আছে কি?" এই প্রশ্নের জবাবেও সবাই চুপচাপ রইলো। ফলে তিনি বললেন, তাহলে অবশ্যই সকলে মারা গেছে। হযরত ওমর (রা) আর নিজেকে আয়ত্তে রাখতে পারলেন না। তিনি বজ্রকণ্ঠে বললেন ঃ

"এই আল্লাহর দুশমন, আমরা সবাই জীবিত রয়েছি।"

আবু সুফিয়ান উচ্চৈস্বরে বললেন ঃ "হোবল জিন্দাবাদ।" হুজুরের (সা) নির্দেশে হযরত ওমর (রা) তার জবাবে বললেন ঃ "আল্লাহু আ'লা ওয়া আজাল্লা" (অর্থাৎ আল্লাহ বুলন্দ ও সর্বশ্রেষ্ঠ)।

আবু সুফিয়ান বললেন ঃ "আমাদের নিকট আমাদের মাবুদ উজ্জা আছে। তোমাদের নিকট নেই।"

সাহাবীরা (রা) জবাব দিলেন ঃ "আল্লাহ আমাদের মাওলা এবং তোমাদের কোন মাওলা নেই।"

এবার আবু সুফিয়ান অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে বললো, আজকের দিন হলো বদরের জবাব। আমার লোকেরা মুসলমানদের লাশ বিকৃত করে ফেলেছে। কিন্তু আমি এই নির্দেশ দিইনি। যা হবার তা হয়ে গেছে। তাতে দুঃখ করে আর কি লাভ।

হযরত ওমর (রা) বললেন, "মুসলমানরা শহীদ হয়ে জান্নাতে চলে গেছেন। আর তোমাদের নিহতরা জাহান্নামে গেছে।"

তারপর আবু সুফিয়ান কসম দিয়ে হযরত ওমরের (রা) নিকট জিজ্ঞেস করলেন যে, সত্য সত্য বলো, মুহাম্মাদ (সা) কি প্রকৃতপক্ষেই জীবিত আছেন? তিনি বললেন, "আল্লাহর কসম, তিনি জীবিত আছেন এবং তোমাদের কথা শুনছেন। তা শুনে আবু সুফিয়ান বললো, "আমাকে ইবনে কামিয়া বলেছিল যে, আমি মুহাম্মাদকে (সা) হত্যা করে ফেলেছি। কিন্তু তোমরা বলছো যে, তিনি জীবিত আছেন। তাহলে এইটাই সঠিক হবে। কারণ তোমরা ইবনে কামিয়া থেকে বেশী সত্যবাদী।"

এই কথোপকথনের পর আবু সুফিয়ান নিজের সৈন্যদেরকে গুটিয়ে দ্রুত মক্কা রওয়ানা হয়ে গেলেন। হুজুর (সা) তাদের পিছু ধাওয়া করার জন্য সত্তর জনকে প্রেরণ করলেন এবং পরের দিন স্বয়ং হামরা উল আসাদ পর্যন্ত তাদের পিছু ধাওয়া করলেন। কিন্তু আবু সুফিয়ানের পুনরায় ফিরে হামলা করার আর সাহস হলো না।

ওহোদের যুদ্ধে আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ বিনতে উতবাও অত্যন্ত তৎপরতা প্রদর্শন করেছিল। সে অন্যান্য মহিলার সঙ্গে নিজেদের পুরুষদেরকে যুদ্ধে উত্তেজিত করেছিল। রাসূলের (সা) চাচা হযরত হামযা (রা) শাহাদাত প্রাপ্ত হলে হিন্দ ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে তাঁর লাশ বিকৃত করে। এমনকি তাঁর কলিজা মুখে নিয়ে চিবাতে থাকে। এই ক্রোধের কারণ হলো, বদরের যুদ্ধে তার পিতা, চাচা, ভাই এবং পুত্র নিহত হয়েছিল। দু'বছর পর খন্দকের বা পরিখার যুদ্ধ সংঘটিত হলে তাতেও কুরাইশ এবং তার মিত্রদের নেতৃত্ব আবু সুফিয়ানের হাতেই ছিল। এই যুদ্ধে আরবের সকল ইসলাম দুশমন ঐক্যবদ্ধভাবে মদীনার ওপর চড়াও হয়। বিশ্ব নবী (সা) মদীনার চার পাশে নিরাপত্তামূলক পরিখা খনন করে তুফান সদৃশ্য এই মুসিবতের মুকাবিলা করেন এবং শত্রুদেরকে শহরের মধ্যে প্রবেশ করতে দেননি। হামলাকারীরা প্রায় তিন সপ্তাহ যাবত অবরোধ অব্যাহত রাখে। এই সময় আল্লাহ তায়ালা তাদের মধ্যে অনৈক্যের বীজ বপন করে দেন এবং এক রাতে তাদের ওপর এমন ভয়াবহ ধূলি-ঘূর্ণি প্রবাহিত করেন যে, তাদের তাঁবু উড়ে গেল। খাবারের হাড়ি পাতিল চুলার ওপর উল্টে গেল এবং ঘোড়া ভেগে গেল। এই আকস্মিক মুসিবতে কাফেরদের সাহসে ভাটা পড়লো এবং তারা সেই রাতে অবরোধ প্রত্যাহার করে রওয়ানা দিল।

৬ষ্ঠ হিজরীতে হুদায়বিয়ার সন্ধির পর বিশ্ব নবী (সা) প্রতিবেশী দেশসমূহের শাসকদের নিকট পত্রাবলী প্রেরণ করে ইসলামের দাওয়াত দেন। এ সময় দাহিয়া কালবীর (রা) হাতে একটি পত্র রোমের কায়সার বা বাদশাহ হিরাক্লিয়াসের নামেও প্রেরণ করেন। তখন সে বাইতুল মুকাদ্দাস অথবা ইলিয়াতে অবস্থান করছিল। হিরাক্লিয়াস হুজুরের (সা) পত্র পেয়ে নিজের অফিসারদেরকে কোথাও হেজাজের ব্যবসায়ীকে পেলে তাকে তার নিকট হাজির করার নির্দেশ দিল। ঘটনাক্রমে সেই সময় আবু সুফিয়ান একটি বাণিজ্যিক কাফেলা নিয়ে সিরিয়া গিয়েছিলো এবং গাজাতে অবস্থান করছিলো। রোমক অফিসার সেই কাফেলাকে সঙ্গে নিয়ে হিরাক্লিয়াসের দরবারে হাজির হলো। এ সময় সে পূর্ণ দরবারে তাদের সাথে অনুবাদকের মাধ্যমে আলোচনা শুরু করলো। সর্বপ্রথম সে কাফেলার লোকদেরকে সম্বোধন করে বললো, "আরব ভাইয়েরা আমার! তোমাদের মধ্যে কে আছ সেই নবীর দাবীদারের নিকটাত্মীয়।"

আবু সুফিয়ান সামনে অগ্রসর হয়ে বললো এদের মধ্যে আমিই তার নিকটাত্মীয়। হিরাক্লিয়াস নিজের দরবারীদেরকে বললো, "এই ব্যক্তিকে আমার নিকট বসাও এবং তার সঙ্গীদেরকে তার পিছনে বসিয়ে দাও।" অতপর সে আবু সুফিয়ানের সাথীদেরকে বললেন, "আমি এই ব্যক্তির নিকট নবীর দাবীদার সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করবো। যদি সে সঠিক জবাব না দেয় তাহলে তোমরা তার মিথ্যাকে প্রকাশ করে দেবে।"

আবু সুফিয়ান বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর কসম, সে সময় আমি যদি এই ভয় না করতাম যে আমার সঙ্গীরা মক্কা ফিরে গিয়ে আমার মিথ্যা কথার উল্লেখ করবে তাহলে আমি মিথ্যা বর্ণনা করতেও পিছপা হতাম না।

(এই বর্ণনা হযরত আবু সুফিয়ানের সত্যবাদিতার প্রমাণ বহন করে। ইসলাম গ্রহণের পর এই ঘটনা বর্ণনা করে তিনি লোকদেরকে এটাই বলতে চাইতেন যে, তার অন্তরে ইসলামের বিরুদ্ধে এত বিদ্বেষ ছিল যে, মিথ্যা বর্ণনাও যদি তার সাধ্যে কুলাতো তাহলে তাও তিনি করতেন। শুধুমাত্র অপবাদের ভয়ে তিনি সত্য বলতে বাধ্য হয়েছিলেন। কেননা সে সময় আরবে মিথ্যাকে সবচেয়ে বড় অপরাধ এবং গুনাহ মনে করা হতো। তারা যিনাকারী এবং হত্যাকারীর গালি সহ্য করতেন, কিন্তু 'মিথ্যাবাদী'র গালি সহ্য করতে পারতেন না।)

এরপর হিরাক্লিয়াস ও আবু সুফিয়ানের মধ্যে নিম্নলিখিত কথোপকথন হয়ঃ

হিরাক্লিয়াস ঃ "এই ব্যক্তি, যে তোমাদের মধ্যে পয়গম্বরীর দাবী করে থাকে তার বংশ কেমন?

আবু সুফিয়ান ঃ "সে উচ্চ বংশের মানুষ।"

হিরাক্লিয়াস ঃ "তার পূর্বেও কি তার খান্দানের কেউ এই দাবী করেছিল?"

আবু সুফিয়ান ঃ "না।"

হিরাক্লিয়াস ঃ "তার দ্বীন যারা গ্রহণ করেছে তারা সম্মানিত ও শরীফ মানুষ, না দুর্বল ও মর্যাদাহীন।"

আবু সুফিয়ান ঃ "বেশীর ভাগ নিম্নশ্রেণীর মানুষ তাকে মানছে।"

হিরাক্লিয়াস ঃ "তার অনুসারীর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে না কমছে?"

আবু সুফিয়ান ঃ "দিন দিন অনুসারীর সংখ্যা বাড়ছে।"

হিরাক্লিয়াস ঃ "কোন ব্যক্তি কি তার দ্বীন গ্রহণ করার পর তা আবার পরিত্যাগ করেছে?"

আবু সুফিয়ান ঃ "না।"

হিরাক্লিয়াস ঃ "নবুওয়াতের দাবীর পূর্বে তোমাদের মধ্যে কেউ কি তাকে মিথ্যা বলতে দেখেছে?"

আবু সুফিয়ান ঃ "না।"

হিরাক্লিয়াস ঃ "সে কি কখনো নিজের ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে?"

আবু সুফিয়ান ঃ "এখন পর্যন্ত করেনি। তবে বর্তমানে আমাদের ও তার মধ্যে একটি চুক্তি চলছে। জানি না, সে তা পালন করে না ভঙ্গ করে।

হিরাক্লিয়াস ঃ "কখনো তার সঙ্গে কি তোমাদের যুদ্ধ হয়েছে?"

আবু সুফিয়ান ঃ "হাঁ, হয়েছে"।

হিরাক্লিয়াস ঃ "তার ফলাফল কি হয়েছে?"

আবু সুফিয়ান ঃ "কখনো আমরা বিজয়ী হয়েছি কখনো সে।"

হিরাক্লিয়াস ঃ "আচ্ছা, সেই ব্যক্তি কি শিক্ষা দেয়? তার পয়গাম কি?"

আবু সুফিয়ান ঃ "সে বলে, এক আল্লাহর ইবাদাত কর। কাউকে তার অংশীদার করো না। নিজের বাপ-দাদার ধর্ম পরিত্যাগ কর। নামায পড়। সত্য কথা বলো। পরহেজগারী অবলম্বন কর। দান খয়রাত কর। বন্ধু বান্দব ও আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে নেকী, রহম ও উদারতাপূর্ণ আচরণ কর।"

হিরাক্লিয়াস অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ধীসম্পন্ন বাদশাহ ছিলেন। সে এই কথোপকথনে খুবই প্রভাবিত হলো এবং বলতে লাগলেন ঃ হে "কুরাইশ সরদার! তুমি যা বলেছ তা যদি ঠিক হয় তাহলে এই নবুওয়াতের দাবীদার নিসন্দেহে সাচ্চা পয়গম্বর। আমার এ ধারণা অবশ্যই ছিল যে, একজন পয়গম্বর আসছেন। কিন্তু এটা জানা ছিল না যে, সে আরবে জন্মগ্রহণ করবে। আমার বিশ্বাস যে, একদিন এমন আসবে যে সে আমার পদতলের এই মাটি দখল করে নেবে। আমি তার সত্যতার স্বীকৃতি দিচ্ছি। হতে পারে যে, আমি গিয়ে তার পা ধুয়ে দেব।

অন্য এক রেওয়ায়াতে আছে যে, হিরাক্লিয়াস একাকী হযরত দাহিয়া কালবীকে (রা) বলেছিলেন ঃ "আমি জানি, রাসূলে আরাবী (সা) তাঁর দাবীতে সত্য। কিন্তু আমি নিজের জীবন এবং রাষ্ট্রের ভয়ে প্রকাশ্যে তাঁর দ্বীন গ্রহণ করতে পারি না।"

সহীহ বুখারীতে আছে যে, হিরাক্লিয়াসের প্রতিক্রিয়া দেখে আবু সুফিয়ান দরবার থেকে বাইরে এসে নিজের সঙ্গীদেরকে বললেন ঃ "আরে, ইবনে আবি কাবশার [হুজুর (সা)] ব্যাপারটি এমন পর্যায়ে এসে পৌছেছে যে, গোরা রোমক বাদশাহও তাকে ভয় করা শুরু করেছে।"

এই রেওয়াতে স্বয়ং আবু সুফিয়ানের এই বাক্যও উল্লেখ করা হয়, "ব্যাস, সেদিন থেকেই আমার আস্থা জন্মেছিল যে তাঁরই [হুজুরের (সা)] বিজয় ঘটবে। এমনকি আল্লাহ তায়ালা আমাকে ইসলামে দাখিল করিয়ে দিলেন।"

সেই বছর (৬ষ্ঠ হিজরীতে) হযরত উম্মে হাবিবা রামলা (রা) বিনতে আবু সুফিয়ানের নিকাহ রাসূলে আকরামের (সা) সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। এমনিভাবে রহমতে আলমের (সা) সঙ্গে আবু সুফিয়ানের শ্বশুরের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। হযরত উম্মে হাবিবা (রা) নবুওয়াতের প্রথম যুগেই ইসলাম কবুল করেছিলেন এবং হাবশায় দ্বিতীয় হিজরীতে স্বামী ওবায়দুল্লাহ বিন জাহাশের সঙ্গে উদ্বাস্তুর জীবন গ্রহণ করেন। সেখানে দুর্ভাগ্যবশতঃ ওবায়দুল্লাহ খারাপ সাহচর্যে মুরতাদ হয়ে যায় এবং খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে মদপান শুরু করে দেয়। হযরত উম্মে হাবিবা (রা) সেই সময়েই তার থেকে পৃথক হয়ে যান। কিছুদিন পর অধিক মদ পানের জন্য ওবায়দুল্লাহ মারা যায়। এ সময় হযরত উম্মে হাবিবা একাকিনী ছিলেন। তা সত্ত্বেও তিনি অত্যন্ত সবর ও সাহসিকতার সঙ্গে বৈধব্যের জীবন কাটাতে লাগলেন। বিশ্ব নবী (সা) এই অবস্থার কথা জানতে পেরে তাঁকে নিকাহর পয়গাম দেয়ার জন্য হযরত আমর (রা) বিন উমাইয়া জুমরীকে

হাবশার বাদশাহ্ নাজ্জাশীর নিকট প্রেরণ করলেন। একটি রেওয়ায়াতে আছে যে, তিনি (সা) হযরত আমর (রা) বিন উমায়াকে হাবশায় প্রেরণের পূর্বে আবু সুফিয়ানকে বলে পাঠালেন যে, তোমার কন্যা উম্মে হাবিবা রামলা বিধবা হয়ে গেছে। আমি তাকে নিকাহ্ করতে চাই। তুমিও অনুমতি দিলে ভাল হয়। আবু সুফিয়ান ইসলামের শত্রু হওয়া সত্ত্বেও চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই অনুমতি দিয়ে দিলেন। নাজ্জাশী হুজুরের (সা) পয়গাম পেয়ে নিজের দাসী আবরাহার মাধ্যমে হযরত উম্মে হাবিবার (রা) নিকট তাঁর পয়গাম পৌছালেন। তিনি অত্যন্ত খুশীর সঙ্গে হুজুরের (সা) সাথে নিকাহ্তে সম্মতি দিলেন এবং হযরত খালিদ (রা) বিন সাঈদ (মুহাজিরে হাবশা)-কে নিজের উকিল নিয়োগ করলেন।] নাজ্জাশী বিয়ের মাহফিলের ব্যবস্থা করলেন এবং ভিন্ন রেওয়ায়াত অনুযায়ী তিনি স্বয়ং অথবা হযরত জাফর (রা) বিন আবি তালিব বিয়ের খুতবা দিলেন। মোহর হিসেবে বাদশাহ্ চারশ' দিনার হুজুরের (সা) পক্ষ থেকে খালিদ (রা) বিন সাঈদকে আদায় করলেন এবং তারপর মজলিশে উপস্থিত সকলকে খাবার খাইয়ে বিদায় করলেন। বিয়ের কিছু দিনপর হযরত উম্মে হাবিবা (রা) নৌ জাহাজের মাধ্যমে হেজাজ প্রত্যাবর্তন করেন। সে সময় রহমতে আলম (সা) খায়বারে ছিলেন।

হাফেজ জাহাবী (র) "মুনতাকাতে" লিখেছেন যে, আবু সুফিয়ান যখন এই বিয়ের খবর পেলেন তখন তার মুখ দিয়ে হুজুরের (সা) প্রশংসাসূচক কথা বের হয়ে গেল। আল্লামা ইবনে সায়াদের (র) বর্ণনা হলো যে, এই সময় আবু সুফিয়ানের মুখ দিয়ে স্বতস্ফুর্তভাবে এই বাক্য বেরিয়ে গেল ঃ "মুহাম্মাদ (সা) আমার কন্যার জন্য উত্তম।"

কতিপয় রেওয়ায়াতে হযরত উম্মে হাবিবার (রা) সঙ্গে হুজুরের (সা) বিয়ের সাল সপ্তম হিজরী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। হতে পারে, ৬ষ্ঠ হিজরীর শেষ দিকে হুজুর (সা) পয়গাম প্রেরণ করে ছিলেন এবং সপ্তম হিজরীর প্রথম দিকে বিয়ে হয়েছিল। হাফেজ ইবনে কাছির (র) নিজের তাফসির গ্রন্থে লিখেছেন যে, উম্মে হাবিবার (রা) সঙ্গে বিয়ের পর আবু সুফিয়ানের (রা) অন্তর নরম হয়ে গিয়েছিল; আর তাই ভালবাসার কারণ হয়েছিল। কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে, সেই যুগেই বিশ্ব নবী (সা) এবং আবু সুফিয়ানের মধ্যে কিছু তোহফা বিনিময় হয়েছিল। হাফেজ জাহাবী (র) বর্ণনা করেছেন যে, একবার হুজুর (সা) হযরত আমর (রা) বিন উমাইয়াতাজ জুমুরীর হাতে কিছু খেজুর হযরত আবু সুফিয়ানকে হাদিয়া হিসেবে পেশ করেছিলেন। তিনি তার জবাবে কোন বস্তু (হাদিসে যাকে আওম বলা হয়েছে) হুজুরের (সা) নিকট হাদিয়া হিসেবে প্রেরণ

করেন। অন্য আরো এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী হুজুর (সা) আওমের জন্য স্বয়ং ফরমায়েশ করেছিলেন।

মক্কা বিজয়ের কিছু দিন পূর্বে সেখানে প্রচন্ড দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র) "আল-ইসতিয়াব" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, হুজুর (সা) এই দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে জানতে পেয়ে হযরত আমর (রা) বিন উমাইয়ার মাধ্যমে হযরত আবু সুফিয়ানকে কতিপয় বস্তু হাদিয়া হিসেবে প্রেরণ করেন। অন্য এক রেওয়ায়াতে আছে যে, হুজুর (সা) মক্কায় দুর্ভিক্ষ ও অভাবের খবর শুনে কয়েকশ' দিনার হযরত আবু সুফিয়ানকে প্রেরণ করেন এবং তা মক্কার অভাবগ্রস্তদের মধ্যে বন্টন করে দিতে বলেন। আবু সুফিয়ান এই অর্থ গ্রহণ করেন কিন্তু হেসে বলেন ঃ

"আচ্ছা, মুহাম্মাদ (সা) কি এখন আমাদের যুবকদেরকে কিনতে চায়।"

শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (র) "ইজালাতুল খুলাফা আন খিলাফাতুল খুলাফা" নামক গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন আব্বাসের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যে, হযরত উম্মে হাবিবার (রা) বিয়ের কিছু দিন পূর্বে যে আয়াত নাযিল হয় তার তরজমা হলো ঃ"আল্লাহ তায়ালা সম্ভবতঃ আপনার এবং আপনার সঙ্গে শত্রুতা পোষণকারীর মধ্যে বন্ধুত্ব করিয়ে দেবেন।"

এই আয়াত হযরত উম্মে হাবিবার (রা) শানে ছিল এবং তাতে তাঁর পিতার অন্তরে ইসলাম ও হুজুরের (সা) ব্যাপারে নরম স্থান সৃষ্টির ব্যাপারে ইঙ্গিত ছিল।।

হুদায়বিয়ার সন্ধি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে, যেসব গোত্র মুসলমানদের মিত্র হতে চায় তাতে তাদের স্বাধীনতা থাকবে এবং যারা কুরাইশের সঙ্গে চুক্তি করতে চাইবে তাতেও তাদের স্বাধীনতা থাকবে। বস্তুত এই চুক্তি অনুযায়ী বনু খাযায়া রাসূলে আকরামের (সা) সঙ্গে এবং বনু বকর কুরাইশের সঙ্গে বন্ধুত্বের চুক্তি করেছিল। এখন দু'পক্ষই পরস্পরের মিত্রদেরকে কোন ধরনের কষ্ট না দেয়া এবং তাদের বিরুদ্ধে তাদের দুশমনের সাহায্য না করার ব্যাপারে বাধ্য ছিল। বনু খাজায়া এবং বনু বকরের মধ্যে দীর্ঘ দিন থেকে শত্রুতা চলে আসছিল। সন্ধি বা চুক্তির পর আঠারো মাস পর্যন্ত এসব গোত্র শান্তিতেই ছিল। কিন্তু তারপর হঠাৎ করে বনু বকর বনু খাজায়ার উপর হামলা করে বসলো এবং অত্যন্ত নির্দয়ভাবে তাদের শিশু ও মহিলাদেরকে পর্যন্ত হত্যা করলো। তারা হেরেমে আশ্রয় নিল। কিন্তু বনু বকর তাদেরকে সেখানেও ছাড়লো না। ইকরামা বিন আবু জেহেল এবং বেশ কিছু অন্য কুরাইশ নেতা এ

সময় প্রকাশ্যে বনি বকরকে সাহায্য করে এবং এমনিভাবে হুদায়বিয়ার সন্ধিনামা বাস্তবতঃ ছিন্নভিন্ন করে ফেলা হয়।

বনু খাজায়া আমর বিন সালেম খাজায়ীর নেতৃত্বে ৪০ জনের একটি প্রতিনিধি দল রাসূলের (সা) নিকট প্রেরণ করলো। এ প্রতিনিধি দল হুজুরের(সা) খিদমতে হাজির হয়ে অত্যন্ত দরদভরা ভাষায় তাদের ওপর সংঘটিত নির্যাতনের চিত্র পেশ করেন। সারওয়ারে আলম (সা) বনু বকর ও কুরাইশের নৃশংসতা এবং চুক্তিভঙ্গের ঘটনাবলী শুনে খুব দুঃখীত হলেন। তবুও তিনি প্রতিবাদের জন্য কুরাইশের নিকট দূত প্রেরণ করলেন এবং তিনটি শর্ত পেশ করলেন এবং তার মধ্যে যে কোন একটি মেনে নিতে বললেন ঃ

১-নিহতদের দিয়ত দিতে হবে (২) কুরাইশরা বনু বকরের সমর্থন প্রত্যাহার করে নেবে (৩) প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করতে হবে যে, হুদায়বিয়ার চুক্তি ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে।

দূত যখন কুরাইশদের নিকট পৌছলো তখন তারা অত্যন্ত অহংকারের সঙ্গে বললো "যাও, আমরা মুহাম্মাদের (সা) প্রজা নই আমরা যা ইচ্ছা তাই করেছি। চুক্তির কোন পরওয়া আমরা করি না।" সে সময় তো তারা জাহেলিয়াতের আবেগে একথা বলে ফেললো। কিন্তু দূত চলে যাওয়ার পর তারা নিজেদের যুক্তিহীন জবাব এবং তার পরিণাম সম্পর্কে চিন্তা করে খুব পস্তালো ও তৎক্ষণাৎ আবু সুফিয়ানকে (রা) দূত বানিয়ে মদীনা প্রেরণ করলো। যাতে তিনি হুজুরের (সা) খিদমতে হাজির হয়ে হুদায়বিয়ার চুক্তি নবায়ন করে আনতে পারেন।

আবু সুফিয়ান (রা) মদীনা পৌছেই প্রথমে স্বীয় কন্যা উম্মে হাবিবার (রা) ঘরে গেলেন। তিনি উম্মুল মু'মিনীন ছিলেন। তিনি রাসূলে আকরামের (সা) পবিত্র বিছানায় বসতে চাইলেন। হযরত উম্মে হাবিবা (রা) তৎক্ষণাৎ বিছানা গুটিয়ে ফেললেন। বললেন, একি? কন্যা জবাব দিলেন ঃ

"এটা রাসূলের (সা) বিছানা। আপনি যেহেতু মুশরিক সে কারণে অপবিত্র। এ জন্য এই পবিত্র বিছানায় বসতে পারেন না।"

আবু সুফিয়ান (রা) কন্যার কথা শুনে প্রায় মূর্ছা যাওয়ার অবস্থা। সে ছিল তাঁর সবচেয়ে বেশী প্রিয় কন্যা। যার সম্পর্কে তিনি একথা বলে গৌরব প্রকাশ করতেন ঃ

[আমার নিকট আরবের হাসিন ও জামিল (আমার কন্যা) উম্মে হাবিবা রয়েছে]

হাফিজ ইবনে হাজার (র) "ইসাবাতে" লিখেছেন যে, এ সময় আবু সুফিয়ান শুধু বললেন ঃ "কন্যা আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে খারাপ হয়ে গেছে।" অর্থাৎ নিজের দ্বীনের খাতিরে পিতাকে স্বামীর বিছানার ওপর বসতে দেয়নি। তারপর আবু সুফিয়ান (রা) রাসূলের (সা) দরবারে হাজির হয়ে চুক্তি নবায়নের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। হুজুর (সা) দূতের মাধ্যমে মক্কার ঘটনাবলী জানতে পেরেছিলেন। এ জন্য তিনি চুক্তি নবায়ন সমর্থন করলেন না। এরপর হযরত আবু সুফিয়ান (রা) হযরত আবু বকর সিদ্দীককে (রা) এ ব্যাপারে মধ্যস্থতা করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তিনি এ ব্যাপারে সুপারিশ করতে রাজী হলেন না। এমনিভাবে হযরত ওমর (রা) এবং হযরত আলীও (রা) এ ব্যাপারে অস্বীকৃতি জানালেন। একটি বর্ণনায় আছে যে, এ সময় তিনি হযরত ফাতিমাতুজ জোহরার (রা) নিকট উপস্থিত হয়ে আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে বললেন, বেটি; হাসান তোমার পিতার খুবই প্রিয়। তাকে দিয়ে তোমার পিতাকে বলালে তিনি চুক্তি নবায়নে সম্মত হয়ে যাবেন। কিন্তু হযরত ফাতিমাও (রা) ক্ষমা চাইলেন। অবশেষে তিনি স্বয়ং [অথবা এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী হযরত আলীর (রা) পরামর্শক্রমে] মসজিদে নববীতে দাঁড়িয়ে চুক্তি নবায়নের এক পক্ষীয় ঘোষণা দিলেন এবং মক্কা ফিরে গেলেন। এদিকে বিশ্ব নবী (সা) খুব চুপিসারে মক্কার ওপর চড়াও হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। যখন সকল ব্যবস্থা সম্পন্ন হলো তখন অষ্টম হিজরীর ১০ই রমযান তিনি ১০ হাজার জীবন উৎসর্গকারীকে সঙ্গে নিয়ে মদীনা থেকে মক্কা রওয়ানা হলেন।

ইসলামী বাহিনী মক্কা থেকে এক মনযিল আগে মাররুজ জাহরান নামক স্থানে রাতে তাঁবু ফেললো। কুরাইশরাও মুসলমানদের তৎপরতা এবং আনা-গোনার খবর পেল। কিন্তু তারা এটা ধারণাও করতে পারেনি যে, হুজুরের (সা) সঙ্গে এতবড় বাহিনী এসেছে। আবু সুফিয়ান (রা) বাদিল (রা) বিন ওয়ারকা এবং হাকিম (রা) বিন হাযামের সঙ্গে গোয়েন্দাগিরী করতে বের হলেন। মাররুজ জাহরানের নিকটে পৌছে দেখলেন যে, স্থানে স্থানে আগুন জ্বলছে এবং দূর দূরান্ত পর্যন্ত লোকজন ছড়িয়ে রয়েছে। মুসলমানদের এই অবস্থা দেখে তিনি হতভম্ব হয়ে পড়লেন। এদিকে রাসূলের (সা) চাচা হযরত আব্বাসের (রা) অন্তরে ধারণা সৃষ্টি হলো যে, মক্কায় সৈন্য প্রবেশের পূর্বে যদি মক্কাবাসীরা নিরাপত্তা কামনা না করে তাহলে তাদেরকে মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। একথা চিন্তা করে তিনি সৈন্যদের থেকে বাইরে বেরুলেন। মক্কা গমনকারী কোন মানুষ যদি পাওয়া যায় তাহলে তার হাতে কুরাইশদের নিকট পয়গাম প্রেরণই লক্ষ্য ছিল। সেই পয়গামে তিনি জানাতে চেয়েছিলেন যে, মুসলমানরা মক্কার ওপর হামলা করতে যাচ্ছে। যদি ভাল চাও,

তাহলে নিরাপত্তা চেয়ে নাও। ঘটনাক্রমে তিনি সেইদিকে গেলেন যেখানে আবু সুফিয়ান নিজের সঙ্গীদের সঙ্গে কথা বলছিলেন। হযরত আব্বাস (রা) কণ্ঠস্বর চিনতে পেরে বলে উঠলেন, "আবু সুফিয়ান।" তিনি বললেন, "আবুল ফজল?" বললেন, "হাঁ।" আবু সুফিয়ান বললেন, "আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। আপনি এখানে কেন?" হযরত আব্বাস (রা) বললেন, "এটা মুসলমান বাহিনী এবং মক্কা দখল করতে চায়।" আবু সুফিয়ান পেরেশান হয়ে পড়লেন এবং বললেন, "আপনিই তাহলে কোন পথ বাতলে দিন।"

হযরত আবুল ফজল আব্বাস (রা) এবং আবু সুফিয়ানের মধ্যে খুবই বন্ধুত্ব ছিল। আবু সুফিয়ানের ওপর তাঁর দয়া হলো। তার সঙ্গীদেরকে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন এবং স্বয়ং আবু সুফিয়ানকে (রা) নিজের খচ্চরের ওপর বসিয়ে হুজুরের (সা) নিকট নিয়ে চললেন। রাস্তায় হযরত ওমরের (রা) সঙ্গে দেখা হলো। তিনি আবু সুফিয়ানকে চিনে ফেললেন এবং এই আল্লাহর দুশমন বলে তার দিকে অগ্রসর হলেন। তিনি বললেন, আল্লাহর শোকর যে, তিনি কোন দায়িত্ব ছাড়া আমাদেরকে তোমার ওপর বিজয় দান করেছেন।। কিন্তু হযরত আব্বাস (রা) তাঁকে নিয়ে খুব দ্রুততার সঙ্গে হুজুরের (সা) তাঁবুতে প্রবেশ করে আরজ করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমি আবু সুফিয়ানকে আশ্রয় দিয়েছি।" ইত্যবসরে হযরত ওমরও (রা) পৌঁছে গেলেন এবং হুজুরের (সা) নিকট আবু সুফিয়ানের (রা) মাথা কেটে ফেলার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। কিন্তু হযরত আব্বাস (রা) তাঁর ঢাল হয়ে গেলেন। হযরত ওমর (রা) খুব পীড়াপীড়ি করলেন। এতে হযরত আব্বাস (রা) রেগে গিয়ে বললেন, "ওমর, বনু আদির (হযরত ওমরের খান্দান) কোন মানুষ যদি হতো তাহলে তুমি তাকে হত্যার জন্য এত পীড়াপীড়ি করতে না। কিন্তু তুমি বনু আবদি মান্নাফের কোন পরওয়া করছো না।"

হযরত ওমর, জবাব দিলেন, "আব্বাস! আল্লাহর কসম, আপনি যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন আমি এত খুশী হয়েছিলাম যে, নিজের পিতা খাত্তাবের ইসলাম গ্রহণেও তা হতাম না।"

তারপর হুজুর (সা) উভয়কেই চুপ করিয়ে দিলেন এবং হযরত আব্বাসকে (রা) বললেন যে, আবু সুফিয়ানকে, এ সময় তোমার তাঁবুতে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দাও। সকাল হলে তার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে।

সকাল হলে হযরত আব্বাস (রা) আবু সুফিয়ানকে (রা) সঙ্গে নিয়ে রাসূলের (সা) নিকট উপস্থিত হলেন। হুজুর (সা) তাঁকে সম্বোধন করে বললেনঃ

"আবু সুফিয়ান, একক আল্লাহর ওপর ঈমান আনার সময় কি এখনো হয়নি?"

তিনি জবাবে আরজ করলেন, "আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। আপনি কত ধৈর্যশীল এবং উত্তম মানুষ। খোদার কসম, খোদা ছাড়া যদি আর কোন সত্ত্বা পূজার যোগ্য হতো তাহলে আজ আমাকে সাহায্য করতো।" অতপর ইরশাদ হলো ঃ

"আবু সুফিয়ান, কতবড় আফসোস। এখনো কি আমাকে আল্লাহর রাসূল হিসেবে মেনে নেয়ার সময় আসেনি?"

আরজ করলেন ঃ "আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। আপনি কত শরীফ ধৈর্যশীল এবং আত্মীয়ের হক আদায়কারী। সত্য বলতে কি এ ব্যাপারে (রিসালাত) আমার অন্তর মুতমায়িন নয়।"

আল্লামা ইবনে হিশাম (র) বলেন, এই জবাবে হযরত আব্বাস (রা) আবু সুফিয়ানকে ডাটলেন। তিনি বললেন, জাহেলী গোঁড়ামী পরিত্যাগ করো এবং আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের ওপর ঈমান আনো। একথা বলার সাথে সাথে তিনি কালেমায়ে তাওহীদ পড়ে মুসলমান হয়ে গেলেন। সহীহ্ বুখারীতে আছে, আবু সুফিয়ান (রা) মক্কা বিজয়ের দু'দিন পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন।

হাফেজ ইবনে হাজার (র) বর্ণনা করেছেন, তিনি মক্কা বিজয়ের পূর্বের রাতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি একটি চমকপ্রদ রেওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ

"আবু সুফিয়ান হুজুরের (সা) খিদমতে পৌছে দেখলেন যে, মুসলমান তাঁর (সা) নিকট পৌছার জন্য পরস্পর প্রতিযোগিতা করছে। সে সময় তার ধারণা হলো যে, সে-ও তাদের মুকাবিলার জন্য বিরাট এক বাহিনী একত্রিত করবে। ঠিক সেই সময় হুজুর (সা) তাঁর বুকের ওপর হাত রাখলেন এবং বললেন ঃ "তুমি যদি তা করো তাহলে আল্লাহ তোমাকে হেয়প্রতিপন্ন করবেন।" আবু সুফিয়ান বিস্মিত হয়ে পড়লেন এবং স্বতস্ফূর্তভাবে তাঁর মুখ দিয়ে বের হলো ঃ "আস্তাগফিরুল্লাহা ওয়া আতুবু ইলাইহি।" অতপর আরজ করলেন ঃ "আল্লাহর কসম! আমার অন্তরের অবস্থা আল্লাহ আপনার নিকট স্পষ্ট করে দিয়েছেন। নিসন্দেহে আপনি রাসূলে বরহক।" কিন্তু এখন পর্যন্তও আমার অন্তর সন্দেহমুক্ত ছিল না। কয়েক মুহূর্ত পর খেয়াল এলো ঃ "না জানি, মুহাম্মাদ (সা) কোন কারণে আমাদের ওপর বিজয় লাভ করছে।" সে সময় হুজুর (সা) বললেন, "আল্লাহর সাহায্যে বিজয়ী হচ্ছি।" এতক্ষণে হযরত আবু

সুফিয়ানের অন্তর সবধরনের সন্দেহ ও দোদুল্যমানতা থেকে মুক্ত হয়ে গেল এবং তিনি সত্য অন্তরে কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করে ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করলেন।"

তাঁর ইসলাম গ্রহণে হুজুর (সা) খুব খুশী হলেন। তিনি শুধুমাত্র তাঁর জীবনই রক্ষা করলেন না বরং এটাও প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন যে, যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের (রা) গৃহে আশ্রয় নেবে তাকেও কোন কিছু বলা হবে না।

তারপর হুজুর (সা) হযরত আব্বাসকে (রা) আবু সুফিয়ানকে (রা) পাহাড়ের চূড়ায় নিয়ে গিয়ে আল্লাহর বাহিনীর শান প্রদর্শনের নির্দেশ দিলেন। সুতরাং হযরত আব্বাস (রা) তাঁকে যথাযথ স্থানে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে দিলেন। সর্বপ্রথম বনু গিফার পতাকা উড়িয়ে অতিক্রম করলো। তারপর জাহনিয়া, হুযাইম এবং সুলাইম আপাদমস্তক অস্ত্র সজ্জিত হয়ে নারায়ে তাকবির দিতে দিতে অগ্রসর হলেন। সবশেষে মদীনার আনসাররা এমন শানে আবির্ভূত হলেন যে, হযরত আবু সুফিয়ান (রা) হতভম্ব হয়ে পড়লেন এবং হযরত আব্বাসকে (রা) জিজ্ঞেস করলেন, "এরা কারা।" তিনি বললেন, এরা মদীনাবাসী। একথা হচ্ছিল এমন সময় আনসার সরদার হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদা ঝাণ্ডা হাতে সামনে দিয়ে অতিক্রম করলেন। হযরত আবু সুফিয়ানের ওপর নজর পড়তেই চেঁচিয়ে বললেন ঃ "আজ প্রচণ্ড যুদ্ধের দিন। আজ কা'বাকে হালাল করা হবে।"

হযরত আবু সুফিয়ান একথা শুনে ঘাবড়ে গেলেন এবং আনসারের পর যখন স্বয়ং রিসালাত সূর্যের বাহিনীর অভ্যুদয় ঘটলো তখন হুজুরকে (সা) সম্বোধন করে আরজ করলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল! নিজের কওমের ওপর রহম করুন। আপনি নেক্‌কার এবং দয়ালু। সায়াদ (রা) বিন উবাদা কেবল বলে গেল যে, আজ কা'বা হালাল করে ফেলা হবে।

রহমতে আলম (সা) বললেন ঃ "সায়াদ (রা) ভুল বলেছে। আজ কা'বার মর্যাদা দ্বিগুণ হওয়ার দিন। আজ কা'বায় গিলাফ পরানো হবে।"

হুজুরের (সা) ইরশাদ শুনে হযরত আবু সুফিয়ান (রা) মুতমায়িন হয়ে গেলেন এবং মক্কা গিয়ে লোকদেরকে উপদেশ দিলেন যে, তারা যদি ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে মাহফুজ থাকবে। কতিপয় রেওয়ায়াত আছে যে, এই সময় তাঁর স্ত্রী হিন্দ বিনতে উতবা ক্রোধে অস্থির হয়ে পড়লো এবং স্বামীর দাড়ি ধরে উচ্চৈস্বরে গালাগালি করতে লাগলো। হযরত আবু সুফিয়ান ডেঁটে বললেন,

"আমার দাড়ি ছেড়ে দাও। আল্লাহর কসম, তুমি যদি ইসলাম গ্রহণ না কর, তাহলে আমি তোমার গরদান উড়িয়ে দিব। তোমার সর্বনাশ হোক। রাসূল (সা) বরহক। ঘরে চুপচাপ বসে থাকো।"

বর্ণিত আছে যে, ইসলাম গ্রহণের সময়, হযরত আবু সুফিয়ানের (রা) বয়স ৭১ বছর ছিল। কিন্তু তিনি খুব তরতাজা ছিলেন। মক্কা বিজয়ের সময় তাঁর স্ত্রী এবং খান্দানের অন্যান্যরাও ইসলাম গ্রহণ করেন।

ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভের পর হযরত আবু সুফিয়ান (রা) সর্বপ্রথম হুনাইনের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। বিশ্ব নবী (সা) গনিমতের মাল থেকে তাঁকে ৪০ আওকিয়া স্বর্ণ এবং একশ' উট প্রদান করেন। হুনাইনের পর তায়েফের যুদ্ধে তিনি হুজুরের (সা) সহগামী হওয়ার সুযোগ পান। তায়েফবাসী হুনাইনের পলাতকদেরকে আশ্রয় দিয়েছিল এবং দুর্গ বন্ধ করে বসে গিয়েছিল। হুজুর (সা) তায়েফ অবরোধ করেন। এই অবরোধ ১৮/২০ দিন অব্যাহত ছিল। এই সময় মুসলমানরা যখনই দুর্গের ওপর হামলা করতেন তখনই মুশরিকরা দুর্গের বুরুজ থেকে লোহার গরম দণ্ড, পাথর এবং তীরের বৃষ্টি বর্ষণ করতো। তার জবাবে হুজুর (সা) শহরের বাইরে মুশরিকদের আঙ্গুরের বাগান ধ্বংস করে ফেলার নির্দেশ দিলেন। তায়েফবাসীর এটাই ছিল বেঁচে থাকার একমাত্র মাধ্যম। তারা ইবনুল আসওয়াদ ছাকাফীকে হযরত আবু সুফিয়ান (রা) এবং হযরত মুগিরাহ (রা) বিন শু'বার নিকট পয়গাম পাঠিয়ে বললেন যে, মুহাম্মাদ (সা) যদি আমাদের সবুজ বাগান ধ্বংস করে দেয় তাহলে আমরা রুজী থেকে মাহরুম হয়ে যাবো। তাঁকে আল্লাহ এবং আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে আমাদেরকে বর্তমান অবস্থার ওপর ছেড়ে দেয়ার আবেদন জানাও। হুজুরের (সা) সামনে এই দরখাস্ত পেশ হলে তিনি অবরোধ আরো দীর্ঘায়িত করা সঠিক মনে করলেন না এবং "হে আল্লাহ! ছাকিফকে হেদায়াত কর এবং তারা যাতে আমার নিকট উপস্থিত হতে পারে সেই তাওফিক তুমি তাদেরকে দাও"—এই দোয়ার সাথে অবরোধ উঠিয়ে নিলেন। এই দোয়া কবুল হয়ে গেল এবং পরের বছরই বনু ছাকিফ (তায়েফবাসী) রাসূলের (সা) নিকট হাজির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করলো।

তায়েফের যুদ্ধে হযরত আবু সুফিয়ান (রা) নিজের একটি চোখ হক পথে শহীদ করেছিলেন। এই যুদ্ধের বিস্তারিত ওপরে বর্ণিত হয়েছে। তায়েফের পর হুজুর (সা) হযরত আবু সুফিয়ান (রা) এবং মুগিরা (রা) বিন শু'বাকে মুশরিকদের একটি ভূতখানা বা মন্দির ধ্বংস করার কাজে নিয়োগ করেন। এই কাজে হুজুর (সা) বিশেষ বিশেষ সাহাবীকেই দায়িত্ব দিতেন। তাঁরা খুব

সাফল্যের সাথে সেই দায়িত্ব পালন করেন। বালাজুরী (র) লিখেছেন যে, তারপর হুজুর (সা) হযরত আবু সুফিয়ানকে (রা) নাজরানের গভর্ণর বানিয়েছিলেন। কিন্তু কতিপয় ঐতিহাসিক বিশেষ করে ওয়াকেদী এই রেওয়ায়াতকে দুর্বল হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

প্রিয় নবীর (সা) ওফাতের পর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) খিলাফতের আসনে সমাসীন হন। এ সময় হযরত আবু সুফিয়ান (রা) অন্য কতিপয় সাহাবীর মত তার বাইয়াতে বিলম্ব করেন। এসব সহাবী নেক নিয়তের সঙ্গে হযরত আলীকে (রা) খিলাফতের মুসতাহিক বা যোগ্য মনে করতেন। কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত আবু সুফিয়ান (রা) হযরত আলীকে(রা) এ পর্যন্তও বলেছিলেন যে, আবু বকর (রা) কুরাইশের সবচেয়ে ছোট গোত্রের মানুষ। আপনি যদি চান, তাহলে আমি আপনার সমর্থনে মদীনার রাস্তায় সওয়ার ও মানুষের পদভারে পূর্ণ করে দিতে পারি। হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু তাঁর কথা মানলেন না। এবং কিছুদিন পর নিজের সমর্থকদেরসহ সিদ্দীকে আকবারের (রা) বাইয়াত করে নিলেন। হযরত আবু সুফিয়ানও (রা) তাতে শামিল ছিলেন।

হযরত ওমর ফারুকের (রা) শাসনামলে তিনি নিজের পরিবার পরিজনসহ জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর জন্য সিরিয়া পৌঁছলেন। সে সময় তাঁর বয়স ছিল প্রায় ৮০ বছর। কিন্তু শাহাদাতের উৎসাহের কারণে ঘরে বসে থাকাটা সহ্য করতে পারেননি। প্রকৃতপক্ষে তিনি প্রাক ইসলামী জীবনের ক্ষতিপূরণ করতে চাইছিলেন। নেতৃস্থানীয় চরিতকাররা ইয়ারমুকের যুদ্ধে হযরত আবু সুফিয়ানের (রা) জীবনবাজী রেখে যুদ্ধ করার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। এই যুদ্ধ সিরিয়ার অত্যন্ত রক্তাক্ত ও সিদ্ধান্তমূলক যুদ্ধসমূহের অন্যতম হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। তাতে প্রায় তিন লাখ রোমকের এক বিরাট বাহিনী সাজ-সরঞ্জামসহ মুসলমানদের সামনাসামনি হলো। মুসলমানদের সংখ্যা সব মিলিয়ে ৪০ হাজারের কাছাকাছি ছিল। তার এক অংশের নেতা ছিলেন হযরত ইয়াযিদ (রা) বিন আবু সুফিয়ান (রা)। হযরত আবু সুফিয়ান (রা) সেনা বাহিনীর সেই অংশেই নিজের মুজাহিদ পুত্রের নেতৃত্বে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। লড়াই শুরুর পূর্বে হযরত আবু সুফিয়ান (রা) ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে সমগ্র সৈন্য চক্কর মারলেন। তিনি প্রত্যেক পতাকার নীচে দাঁড়িয়ে মুজাহিদদেরকে সাহস ও অটল থাকার উপদেশ দিলেন ঃ

"হে মুসলমানরা! তোমরা শত্রুর দেশে অবস্থান করছো এবং স্বদেশভূমি থেকে রয়েছ অনেক দূরে। তোমাদের চেয়ে শত্রুর সংখ্যা অনেক বেশী এবং

তারা তোমাদের নাম দুনিয়া থেকে চিরতরে মুছে ফেলতে চায়। কিন্তু জয়-পরাজয় সংখ্যার ওপর নির্ভর করে না এবং তা কারোর ক্রোধের ওপরও নির্ভরশীল নয়। তোমরা আরব ও ইসলামের বাহু। আল্লাহর ওপর ভরসা করে হিম্মত বাঁধো এবং যুদ্ধের ময়দানে অটল থেকো। ইনশাআল্লাহ হকের রহমত বৃষ্টির মত তোমাদের ওপর বর্ষিত হবে।"

যুদ্ধ শুরু হলে মুসলমানরা দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত অটল রইলেন। কিন্তু রোমকরা এত প্রচণ্ডভাবে হামলা চালালো যে মুসলমানদের বামবাহুতে বিশৃংখলা সৃষ্টি হলো। যেই তারা পিছু হটলো অমনি মুসলমান মহিলারা তাঁবুর খুঁটি উঠিয়ে নিল এবং চেঁচিয়ে বললো যে, যদি তোমরা পিছিয়ে এসো তাহলে আমরা খুঁটি দিয়ে তোমাদের মাথা ফাটিয়ে দেবো। এদিকের বামবাহুর অফিসার ইয়াযিদ (রা) বিন আবু সুফিয়ান, কুবাছ (রা) বিন আশিম, সাঈদ (রা) বিন যায়েদ এবং শুরাহবিল (রা) বিন হাসানাহ পাথরের মত রোমকদের রাস্তায় বাঁধা দিয়ে দাঁড়ালেন। এসব বাহাদুরের হাত থেকে তরবারী ও বর্শা ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ছিল। আর অন্য মুসলমানরা দৌড়ে তাঁদের হাতে তরবারী অথবা বর্শা ধরিয়ে দিচ্ছিলেন। ঘটনাক্রমে হযরত আবু সুফিয়ান (রা) এদিকে এলেন। পুত্রকে দেখে উচ্চৈস্বরে ডেকে বললেন, "প্রাণের টুকরো আমার। তুমি মুসলমানদের অফিসার এবং সিপাহীদের তুলনায় তোমার ওপর বীরত্ব প্রদর্শনের বেশী হক রয়েছে। সংগীদের মধ্যে তোমার সবচেয়ে বেশী পরকালের আকাংখা, ময়দানে অটলতা, শত্রুর ওপর কঠোরতা এবং যুদ্ধের তীব্রতা বরদাশত করা উচিত। যদি একজন সিপাহীও যুদ্ধের ময়দানে তোমার থেকে অগ্রগামী হয় তাহলে তাহবে তোমার জন্য লজ্জার ব্যাপার।"

তারপর তিনি অত্যন্ত দরদভরা কণ্ঠে দোয়া করলেন ঃ "হে আল্লাহর সাহায্য, তাড়াতাড়ি এসো।" ঠিক সেই সময় অদৃশ্য সাহায্য দেখা দিল এবং কায়েস (রা) বিন হাবিরাহ যিনি বামবাহুর পেছনে মোতায়েন ছিলেন নিজের সৈন্যদল নিয়ে পিছন দিক থেকে বের হলেন ও রোমকদের ওপর হামলা করে বসলেন। তারা নিজেদেরকে খুব করে সামাল দিল কিন্তু মুসলমানদের হামলা এতো প্রচণ্ড গতি সম্পন্ন ছিল যে, অল্পক্ষণেই তাদের ব্যূহ তছনছ হয়ে গেল এবং তারা অত্যন্ত বিশৃংখলভাবে পালিয়ে গেল। ঠিক যুদ্ধের সময় হযরত আবু সুফিয়ানের (রা) ডান চোখের ওপর একটি তীর অথবা পাথর লাগলো এবং এই চোখও খোদার পথে চলে গেল। এমনিভাবে তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য প্রকাশ্য দৃষ্টিশক্তি থেকে সম্পূর্ণরূপে মাহরুম হয়ে গেলেন।

দুই চোখ হক পথে কুরবান করার পর হযরত আবু সুফিয়ান (রা) ঘরে বসে গেলেন। শুধুমাত্র নামায পড়া অথবা কোন জরুরী কাজের জন্য গোলামের সহায়তায় ঘরের বাইরে আসতেন। শেষ বয়সে মদীনায় মুকিম হয়ে যান। সেখানেই হযরত উসমানের (রা) খিলাফতকালে ৩৩ হিজরীর শেষ দিকে অথবা ৩৪ হিজরীর প্রথম দিকে ওফাত পান এবং বাকী' কবরস্তানে তাঁর লাশ দাফন করা হয়। ওফাতের সময় তাঁর বয়স ৮৮ অথবা ৯৭ বছর ছিল। জানাযার নামাযের ব্যাপারেও দু'টি রেওয়ায়াত আছে। কেউ কেউ লিখেছেন যে, আমীরুল মু'মিনীন হযরত উসমান (রা) জানাযার নামায পড়ান। আবার কেউ লিখেছেন আমীরে মুয়াবিয়া (রা) পড়ান। অত্যন্ত সুদর্শন, গমের রং এবং দীর্ঘদেহী মানুষ ছিলেন। চেহারা ছিল প্রশস্ত এবং মাথা এতবড় ছিল যে, এমনি এমনি সরদার বলে মনে হতো। হযরত আবু সুফিয়ানের (রা) সন্তানের মধ্যে হযরত উম্মে হাবিবা (রা), আমীর মুয়াবিয়া (রা) এবং ইয়াযিদুল খায়ের (রা) ইসলামের ইতিহাসে নামকরা ব্যক্তিত্ব। হযরত উম্মে হাবিবা (রা) আযওয়াজে মুতাহহিরাত এবং উম্মুহাতুল মু'মিনীনের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আমীর মুয়াবিয়া (রা) কাতিবে ওহী বা ওহীর লিখক এবং উমাইয়া শাসনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তিনি আরবের জ্ঞানী গুণীদের অন্তর্ভুক্ত। হযরত ইয়াযিদ (রা) দানশীলতা ও সুন্দর স্বভাবের কারণে ইয়াযিদুল খায়েরের লকবে মশহুর ছিলেন। আরবের অন্যতম বীর হিসেবে পরিচিত। সিরিয়ার বিজয়সমূহে তিনি হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ, জিরার (রা) বিন আজওয়ার, আমর(রা) বিন মাদি কারব, যোবায়ের (রা) ইবনুল আওয়াম, কায়েস (রা) বিন হাবিরাহ, শুরাহবিল (রা) বিন হাসানার মত প্রখ্যাত বাহাদুরদের পাশে পাশে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। প্রতিভা ও গুণের দিক থেকে তিনি আমীরে মুয়াবিয়ার চেয়ে ছোট ছিলেন না। আল্লামা শিবলী (র) আল ফারুকে লিখেছেন, সমগ্র বনু উমাইয়াতে তাঁর থেকে বেশী যোগ্য আর কেউ ছিলেন না। এ জন্য হযরত ওমর (রা) তাঁকে ফিলিস্তীনের শাসক বানিয়ে দেন। কিছুদিন দামেস্কের ইমারতের দায়িত্বও তাঁর ওপর ন্যস্ত ছিল। চরিত গ্রন্থসমূহে হযরত আবু সুফিয়ানের (রা) আরো তিন মেয়ের নাম পাওয়া যায়। একজনের নাম ছিল ফা'রিয়া (রা)। রাসূলে আকরামের (সা) ফুফাতো ভাই হযরত আবু আহমদ (রা) বিন জাহাশের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিল। দ্বিতীয় মেয়ের নাম হলো আমেনা। তাঁর বিয়ে হয়েছিল হযরত উরওয়া (রা) বিন মাসউদ ছাকাফীর সঙ্গে। তৃতীয় জনের নাম হলো আযৃযা। সহীহ বুখারীতে আছে যে, একবার হযরত উম্মে হাবিবা (রা) ভুলবশত হুজুরকে (সা) জিজ্ঞেস করলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমার বোন আযৃযাকে কেন বিয়ে করেন না।" তিনি

বললেন, "আয্যাহ হলো আমার শালি এবং স্ত্রীর জীবদ্দশায় তার বোনের সাথে বিয়ে বৈধ নয়।"

হযরত আবু সুফিয়ান (রা) কুরাইশের সেই সব লোকের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাঁরা ইসলামের আবির্ভাবকালে ভালভাবে লেখাপড়া জানতেন। তাঁর থেকে কতিপয় হাদিসও বর্ণিত আছে। এইসব হাদিস হযরত মুয়াবিয়া (রা) এবং হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) রেওয়ায়াত করেছেন।

সাইয়েদেনা হযরত আবু সুফিয়ান সাখার (রা) বিন হারব ইসলামের ইতিহাসে এক নামকরা ব্যক্তিত্ব। তাঁর সাহাবিয়াতের মর্যাদার গুরুত্ব এ জন্য কম করা যাবে না যে, তিনি মক্কা বিজয় পর্যন্ত কুফর ও শিরকের ভ্রান্ত পথে চলাফেরা করেছিলেন এবং তাঁর জীবনের বেশীর ভাগ সময় ইসলাম বিরোধিতায় অতিবাতি হয়। প্রকৃত ব্যাপার হলো যে, এ ব্যাপারে তিনিই শুধু একা ছিলেন না। অন্য অনেক সাহাবায়ে কিরামও (রা) এমন ছিলেন যাঁরা মক্কা বিজয়ের পূর্বে ইসলামের কট্টর দুশমন ছিলেন এবং তাঁর মূলোৎপাটনে সব ধরনের চেষ্টাই করেছেন। যেমন, হযরত ইকরামা (রা) বিন আবি জেহেল, সোহায়েল (রা) বিন আমর, সাফওয়ান (রা) বিন উমাইয়া, জোবায়ের (রা) বিন মাতয়াম, আবদুল্লাহ (রা) বিন জুবয়ারা, শাইবা (রা) বিন উসমান বিন আবি তালহা, মুগিরা (রা) বিন হারিছ [হুজুরের (সা) আপন চাচাতো ভাই ছিলেন। তাঁর কুনিয়াতও ছিল আবু সুফিয়ান] এবং অন্যান্য আরো অনেক বুজর্গ। এসব বুজর্গ সাহাবায়ে কিরামের (রা) পবিত্র জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত এবং সকল দিক থেকেই আদব ও সম্মানের যোগ্য। এটা অবশ্য পৃথক ব্যাপার যে, কুরআনে হাকিমের ফায়সালা অনুযায়ী তাঁদের মর্যাদা মক্কা বিজয় এবং বিশেষ করে হিজরতের পূর্বে ইসলাম গ্রহণকারী বুজর্গদের সমান নয়। কিন্তু ব্যাপারটি তাঁদের ও আল্লাহর মধ্যকার বিষয়। আমাদের জন্য সকল সাহাবীকে (রা) কোন বিশেষত্ব ছাড়া মর্যাদা প্রদর্শন ওয়াজিব।

কিছু মানুষ হযরত আবু সুফিয়ানের (রা) ওপর এই বলে অপবাদ দিয়ে থাকে যে, তিনি সত্য অন্তরে নয় বরং জীবনের ভয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তারা নিজেদের বক্তব্যের স্বপক্ষে যেসব যুক্তি পেশ করে তা এতো দুর্বল যে, কোন সুস্থ স্বভাবের কোন মানুষ তা মানতে পারে না। হযরত আবু সুফিয়ানের (রা) আন্তরিকতায় সন্দেহ পোষণকারীরা এই যুক্তি দিয়ে থাকে যে, ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তিনি ইসলামের কট্টর দুশমন ছিলেন। এটা এমন কোন কথা নয় যে, এ জন্য তিনি আন্তরিকতার সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করতে পারবেন না। শেষ পর্যন্ত তারাও তো ইসলামের নিয়ামতে ও সাধারণ

ক্ষমায় অভিষিক্ত হয়েছিলেন যাদেরকে হুজুর (সা) ইসলামের শত্রুতার জন্য হত্যা আবশ্যিক করে দিয়েছিলেন। স্বয়ং হুজুরের (সা) চাচাতো ভাই মুগিরা(রা) বিন হারিছ বিন আবদুল মুত্তালিব ইসলামের শত্রুতায় এতদূর বেড়ে গিয়েছিলেন যে, হুজুর (সা) তাঁর চেহারা পর্যন্ত দেখতে রাজী ছিলেন না। হযরত সোহায়েল (রা) বিন আমর, সাফওয়ান (রা) বিন উমাইয়া, আবদুল্লাহ (রা) বিন যুবয়ারা এবং এমনি ধরনের কত সাহাবী ইসলাম গ্রহণের পূর্বে ইসলামের মূলোৎপাটনের জন্য কত কিইনা করেছেন। যদি এসব সাহাবী সত্য অন্তরে ঈমান এনে হুজুরের (সা) স্নেহের দাবীদার হতে পারেন তাহলে হযরত আবু সুফিয়ান (রা) তাদের থেকে এমন কি বেশী অপরাধ করেছিলেন?

হযরত আবু সুফিয়ানের (রা) বিরুদ্ধে দ্বিতীয় দলিল এই দেয়া হয় যে, ইসলাম গ্রহণের পর তিনি কয়েকবার ইসলাম দুশমনী প্রকাশ করেছিলেন। এই ইসলাম দুশমনী কি ছিল? হুজুরের (সা) ওফাতের পর তিনি হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুকে বলেছিলেন যে, আবু বকর (রা) কুরাইশের সবচেয়ে ছোট কবিলার মানুষ। আপনি যদি খিলাফতের দাবী নিয়ে দাঁড়ান তাহলে আমি আপনার সমর্থনে মদীনার প্রান্তর সওয়ার ও পদযাত্রী দিয়ে পূর্ণ করে দেবো। দ্বিতীয় মশহুর ঘটনা এই বর্ণনা করা হয় যে, একবার হযরত ওমর ফারুক (রা) হযরত বিলাল (রা), সোহায়েব (রা) ও সালমানকে (রা) কুরাইশ সরদারদের আগে স্বাক্ষাতের জন্য ভেতরে ডেকে পাঠালে তাঁরা অভিযোগ করলেন যে, আমাদের মত কুরাইশ সরদারদের ওপর গোলামদেরকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়। তৃতীয় ঘটনা হলো, হযরত উসমান (রা) খলিফা হলে তিনি বনি উমাইয়াকে সামনে অগ্রসর করানোর জন্য তাঁকে পরামর্শ দিয়েছিলেন।

এ ধরনের রেওয়ায়াতকে যদি ঠিক বলে মেনেও নেয়া হয় তাহলে খুব বেশী হলেও তাকে বংশীয় গোড়ামী। (ইসলাম দুশমনী নয়) বলে আখ্যায়িত করা হয়। এই প্রসঙ্গে একথা বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে যে, হযরত আবু সুফিয়ান (রা) কোন সাধারণ মানুষ ছিলেন না। কুরাইশের ঝাণ্ডাবাহী এবং সিপাহসালার ছিলেন। বনু উমাইয়ার সরদার পুত্র সরদার ছিলেন। তাঁর দু'পুরুষ ইমারাত ও নেতৃত্বে কাটান। যদি কোন সময় তার মুখ দিয়ে এমন কথা বেরিয়ে যায় যাতে বংশীয় গোঁড়ামী প্রকাশ পায় তাতে তাঁর নিয়তের আন্তরিকতা সম্পর্কে সন্দেহ করা কি করে সিদ্ধ হতে পারে? প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের অসংখ্য ঘটনা তো আরো অন্য জালিলুল কদর সাহাবীর (রা) সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট রয়েছে। এখানে তার বিস্তারিত বিবরণ অনাবশ্যক। কেননা তাতে সেই সব বুজর্গের সম্মান ও মর্যাদাতে সামান্য পরিমাণ প্রভাব পড়ে না।

হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র) আল ইসতিয়াবে এবং আল্লামা ইবনে আছির (র) "উসুদুল গাববাহতে" খুব শক্তিশালী ভাষায় লিখেছেন যে, হযরত আবু সুফিয়ানের (রা) সঙ্গে এমন সব অনেক ঘটনা সংশ্লিষ্ট করে দেয়া হয়েছে যার কোন ভিত্তি নেই।

সঠিক পথ হলো, সাহাবায়ে কিরামের (রা) ব্যাপারে সবসময় ভালো ধারণা রাখতে হবে। ছোটখাটো ঘটনার আড়ালে তাদেরকে অপবাদের শিকার এবং তাঁদের আন্তরিকতায় সন্দেহ করা যাবে না।

হযরত আবু সুফিয়ানের (রা) জীবনের ওপর একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে জানা যাবে যে, তিনি স্পষ্টবাদী ও বীর মানুষ ছিলেন। কুফরী অবস্থাতেও যখন মক্কার প্রতিটি অণু পরমাণু হুজুরের (সা) খুন পিপাসু ছিল তখনো তিনি তার বিরুদ্ধে বিগর্হিত কোন কাজ অথবা ছ্যাঁচরামো করেননি। হুজুরের (সা) উন্নত চরিত্রের সাক্ষ্য প্রদানে তিনি কার্পণ্য করেননি। কলিজার টুকরার হুজুরের (সা) সঙ্গে বিয়ে হলে কোন অস্থিরতা প্রকাশ করেননি বরং তাঁর (সা) প্রশংসা করেছেন। [একটু সেই ঘটনা স্মরণ করুন। উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাওদা (রা) বিনতে যামআর বিয়ে হুজুরের (সা) সঙ্গে হলো। এ সময় তাঁর ভাই আবদ (রা) বিন যামআ এই খবর শুনে নিজের মাথার ওপর মাটি রাখা শুরু করলো। যখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন তখন বলতেন যে, আমি আহমক ছিলাম। হুজুরের (সা) সঙ্গে আমার বোনের বিয়েতে আমার মাথায় মাটি নিয়ে ছিলাম।] মক্কা বিজয়ের সময় হুজুর (সা) তাঁর গৃহকে দারুল আমান বানিয়েছিলেন। হুনায়েন এবং তায়েফের যুদ্ধের সময় জীবনবাজী রেখে অংশ নিয়েছিলেন এবং হুজুরের করুণা ও দয়ার পাত্র হয়ে উঠেন। ইয়ারমুকের যুদ্ধে পরিবারের সকলকে সঙ্গে নিয়ে অংশ নেন এবং বার্দ্ধক্যেও বীরত্ব প্রদর্শন করেন। সর্বোপরি নিজের চোখ দু'টির হক পথে বিলীন করে দিয়েছিলেন। এসব কথা সত্ত্বেও তাঁর আন্তরিকতায় সন্দেহ পোষণ করার কোন বৈধতা আছে কি? সঠিক কথাতো এই যে, হযরত আবু সুফিয়ান (রা) নিসন্দেহে সেই সব পবিত্র আত্মার দলে শামিল যাঁদের ব্যাপারে বলা হয়েছে ঃ

"আল্লাহ তাঁদের ব্যাপারে রাজী হয়েছেন এবং তাঁরাও আল্লাহর ব্যাপারে রাজী হয়েছেন। আল্লাহ তাঁদের জন্য এমন বাগান তৈরী করে রেখেছেন যার নীচে দিয়ে নহর প্রবাহিত এবং তারা তাঁতে সবসময় থাকবে।"

হযরত সাঈদ (রা) বিন আমের

হযরত ওমর ফারুকের (রা) খিলাফতকালে হেমসের আমীর হযরত আয়াজ (রা) বিন গানাম ওফাত পান। এ সময় হেমসের ইমারতের জন্য আমীরুল মু'মিনীন (রা) একজন যোগ্য ব্যক্তির নিয়োগের চিন্তা-ভাবনা শুরু করলেন। আল্লাহ পাক মানুষ বাছাইয়ের যোগ্যতা তাঁকে পূর্ণভাবেই প্রদান করেছিলেন। তিনি কয়েকদিন চিন্তা করলেন এবং তারপর একদিন জনৈক ব্যক্তিকে ডেকে পাঠালেন। কয়েকদিন পূর্বে এই ব্যক্তি সিরিয়ার জিহাদ থেকে ফিরে এসেছিলেন এবং মদীনা মুনাওয়ারার এক কোণায় চুপচাপ জীবন অতিবাহিত করছিলেন। ফারুকে আজমের (রা) পয়গাম পেতেই ত্রিশ-পয়ত্রিশ বছর বয়সের এই ব্যক্তি মলিন কাপড় পরিধান করে তৎক্ষণাৎ খলিফার দরবারে হাজির হলেন। তাঁর চেহারা-সুরত দেখে মনে হচ্ছিল যে, তিনি একজন আবেদ এবং লজ্জাশীল মানুষ। তাঁকে দেখে ফারুকে আজমের (রা) চেহারা উজ্জল হয়ে উঠলো। অত্যন্ত মুহাব্বাত ও স্নেহের সঙ্গে তাঁকে নিজের কাছে বসালেন এবং অতপর তাঁকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

"প্রাণের ভাই আমার! তোমাকে কেন ডেকেছি, তাকি জানো?" আরজ করলেন ঃ "আপনিই ভাল জানেন"।

ফারুকে আজম ঃ "তুমি তো জানো যে, কয়েকদিন হলো আয়াজ (রা) বিন গানাম ওফাত পেয়েছেন এবং হেমসে তাঁর স্থান শূন্য পড়ে আছে। আমি অনেক চিন্তা-ভাবনা করে হেমসের ইমারতের জন্য তোমাকে নির্বাচিত করেছি।"

সেই ব্যক্তি আমীরুল মু'মিনীনের (রা) ইরশাদ শুনে চমকে উঠলেন এবং তৎক্ষণাৎ আরজ করলেন ঃ "না, না। আমীরুল মু'মিনীন! আমি সেই পদের যোগ্য নই। আমাকে এই ফিতনায় নিক্ষেপ করবেন না।"

ফারুকে আজম (রা) (খুব দ্রুতকণ্ঠে) বললেন, "ভাল! তোমরা খিলাফতের জিঞ্জির আমার গর্দানে চাপিয়ে রেখেছ এবং নিজেরা কোন ধরনের দায়িত্ব গ্রহণ থেকে পশ্চাদপসরণ করছো। আল্লাহর কসম! আমি তোমাকে ছেড়ে দিতে পারি না। হেমসের ইমারতের দায়িত্ব অবশ্যই তোমাকে গ্রহণ করতে হবে।"

সেই ব্যক্তি বার বার ক্ষমা চাইলেন। কিন্তু ফারুকে আজম (রা) নিজের কথার ওপর অটল রইলেন। অনেক পীড়াপীড়ির পর তিনি সেই পদ গ্রহণে সম্মত তো হলেন। কিন্তু তিনি যখন খিলাফতের দরবার থেকে বিদায় হলেন তখন তাঁর চক্ষু দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল এবং তিনি কোন পাহাড়ের নীচে চাপা পড়ে গিয়েছেন বলে অনুভব করছিলেন।

এই আশ্চর্য ধরনের মানুষ যিনি ইসলামী খিলাফতের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশের গভর্ণর পদ গ্রহণে খুব কষ্টে রাজী হলেন, তিনি হলেন হযরত সাঈদ (রা) বিন আমের।

বিশ্ব নবী (সা) দাওয়াতে হক প্রদান শুরু করলেন। এ সময় সাঈদ বিন আমের (বিন কুদায়েম বিন সালামান বিন রবিয়া বিন সায়াদ বিন জামাহ বিন আমর বিন মুসাইস বিন কায়াব) সাত-আট বছরের বালক ছিলেন। এটা ছিল তাঁর খেলাধূলার বয়স। এ জন্য প্রথম দিকে ইসলামের দিকে অগ্রসর হননি। যৌবনপ্রাপ্ত হলেন এবং হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করণের অনুভূতি সৃষ্টি হলে রাসূলে আকরাম (সা) হিজরত করে মদীনা তাশরীফ নিয়েছিলেন। তাসত্ত্বেও নেক স্বভাব সম্পন্ন সাঈদকে (রা) আল্লাহ পাক এই তাওফিক দিয়েছিলেন যে, তিনি খায়বারের যুদ্ধের পূর্বে মদীনা গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। তারপর খায়বার, মক্কা বিজয়, হুনাইন, তাবুক প্রভৃতি যুদ্ধে বীরত্বের সঙ্গে অংশ নেন। প্রিয়নবী (সা) ওফাত পেলে তিনি ভগ্ন হৃদয়ে নির্জনত্ব গ্রহণ করলেন এবং সকল সময় ইবাদাতে অতিবাহিত করতে লাগলেন। কিন্তু জিহাদের উৎসাহ তাঁকে বেশী দিন ঘরে বসে থাকতে দিল না। হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) খিলাফতকালে সিরিয়ায় সেনা অভিযান চালানোর সময় তিনিও মুজাহিদদের দলে শামিল হয়ে গেলেন।

আল্লামা ইবনে আছির (র) বর্ণনা করেছেন যে, সাঈদ (রা) মহানবীর (সা) যুগে বিভিন্ন যুদ্ধে যে ধরনের বীরত্ব প্রদর্শন করেছিলেন তাতে তাঁকে আরবের বাহাদুরদের কাতারভুক্ত করে দেয়। বস্তুত কানসারিনের যুদ্ধে হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ যখন এক বিশেষ অভিযানের জন্য দশজন অভিজ্ঞ যোদ্ধাকে নির্বাচিত করেন তখন সেই দশ জনের একজনও ছিলেন সাঈদ (রা) বিন আমের। সিদ্দীকে আকবারের (রা) ইন্তেকালের পর তিনি মদীনা অবস্থানে করছিলেন। এমন সময় ইয়ারমুকের যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। এই যুদ্ধে রোমকরা নিজেদের সকল শক্তি একত্রিত করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল। রোমকদের তুলনায় মুসলমানদের সংখ্যা খুব কম ছিল। এ জন্য সেনাপতি হযরত আবু ওবায়দাহ (রা) ইবনুল জারাহ রাজধানী থেকে সাহায্য চাইলেন।

তাঁর পয়গাম পেয়েই হযরত ওমর ফারুক (রা) সাঈদ (রা) বিন আমেরকে ডেকে পাঠালেন এবং এক হাজার সওয়ার সমেত তাঁকে তৎক্ষণাৎ ইয়ারমুক রওয়ানা করে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে হযরত আবু ওবায়দাকে (রা) বলে পাঠালেন যে, শীঘ্রই আরো সামরিক সাহায্য আপনি পেয়ে যাবেন। ঘটনাক্রমে যে দিন হযরত আবু ওবায়দার (রা) দূত তাঁর নিকট ফিরে গেলেন সেই দিন হযরত সাঈদও (রা) এক হাজার জানবাজসহ তাঁর নিকট পৌঁছে গেলেন। তাঁদের আগমনে মুসলমানরা বেশ শক্তিশালী হলেন এবং তাঁরা খুব উৎসাহ উদ্দীপনা এবং সাহসিকতা ও দৃঢ়তার সাথে যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন। সিরিয়ার ভাগ্য নির্ধারণকারী এই ভয়াবহ যুদ্ধে হযরত সাঈদ (রা) বিন আমের বিস্ময়কর বাহাদুরী ও দৃঢ়তার পরিচয় দেন এবং প্রচণ্ডতম নাজুক মুহূর্তেও তাঁর সামান্যতম পদস্খলন হয়নি। যুদ্ধের ময়দানে তিনি কয়েকবার রোমকদের হামলার মুখে পড়েছিলেন। কিন্তু তাঁর তরবারী প্রতিবারই দুশমনের দাঁত ভেঙ্গে দিয়েছিল এবং তিনি সহীহ্ সালামতে সঙ্গীদের সাথে এসে মিলিত হয়েছিলেন। ইয়ামুকের পর তিনি সিরিয়ার আরো কতিপয় যুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শন করেন এবং পুনরায় মদীনায় ফিরে এসে পূর্বের মত নির্জন ইবাদাতে বসে গেলেন। সেই সময়ই হেমসের গভর্ণর হযরত আয়াজ (রা) বিন গানাম ওফাত পান এবং তাঁর স্থলাভিষিক্ত করার জন্য ফারুকে আজমের (রা) দৃষ্টি হযরত সাঈদ (রা) বিন আমেরের ওপর নিবদ্ধ হলো।

হযরত সাঈদ (রা) ফারুকে আজমের (রা) পীড়াপীড়িতে বাধ্য হয়ে হেমস গেলেন। সেখানে গিয়ে গভর্ণরীর দায়িত্ব এমনভাবে পালন করলেন যে, সকলেই তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলো। হযরত ওমর ফারুক (রা) সরকারী কর্মচারীদের ওপর খুব কড়া নজর রাখতেন। তাঁর কানে সাঈদের(রা) সুন্দর ব্যবস্থাপনার খবর পৌঁছলে খুব খুশী হলেন। একবার তিনি মদীনা এলে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "সাঈদ (রা) সিরিয়ার মানুষ তোমার প্রশংসা করে কেন?" তিনি আরজ করলেন, "আমিরুল মু'মিনীন! আমি রাখালীর সঙ্গেও সহানুভূতি প্রকাশ করে থাকি।" হযরত সাঈদের (রা) এই জবাবে কোন অতিশয়োক্তি ছিল না। তাঁর রাখালী এবং সহানুভূতি প্রকাশের অবস্থা এমন ছিল যে, যে বেতন পেতেন [হযরত ওমর (রা) গভর্ণদেরকে অত্যন্ত যৌক্তিক ভাতা দিতেন] তা থেকে কয়েক দিরহাম খানা-পিনার সামানের জন্য ব্যয় করতেন এবং অবিশিষ্ট সকল অর্থ আল্লাহর পথে বিলিয়ে দিতেন। স্ত্রী যখন জিজ্ঞেস করতেন যে, বেতনের অবশিষ্ট অংশ কোথায় তখন বলতেন, "ঋণ দিয়ে দিয়েছি।" ঋণ প্রদানের অর্থ এই ছিল যে, সেই অর্থ আল্লাহর পথে

ব্যয় করে ফেলেছেন। কেননা, কুরআনে হাকিমে তাকে করজে হাসানা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

একবার কতিপয় ব্যক্তি প্রতিনিধি দল হিসেবে হযরত সাঈদের (রা) নিকট গেলেন এবং বললেন, "হে আমীর। আমরা আপনাকে সবসময় অসহায় ও গরীব হিসেবে দেখছি। আপনার পরিবার পরিজনেরও তো হক আছে। নিজের হাতকে এতো প্রশস্ত করবেন না এবং নিজের পরিবার পরিজনেরও খেয়াল রাখুন।"

হযরত সাঈদ (র) জবাব দিলেন, "এটা আমার ইচ্ছার ব্যাপার নয়। আমিতো দারিদ্রের ঐশ্বর্যকেই পসন্দ করে থাকি। কেননা, আমি আকায়ে নামদার (সা) থেকে শুনেছি যে, দরিদ্র মু'মিনরা অন্যান্যদের থেকে সত্তর বছর পূর্বে জান্নাতে দাখিল হবেন।"

বাস্তবিকই হযরত সাঈদের (রা) সংসার বৈরাগ্য ও অল্পে তুষ্টির অবস্থাটা এমন ছিল যে, সাধারণ গরীব ও মিসকিন এবং হেমসের গভর্ণরের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না।

একবার হযরত ওমর ফারুক (রা) সিরিয়া সফরে তাশরীফ নিলেন। হেমস পৌছে তিনি সেখানকার নেতৃস্থানীয় লোকদেরকে ফকির মিসকিনের একটি তালিকা প্রস্তুত করে আনার নির্দেশ দিলেন। লক্ষ্য ছিল তাদের দৈনন্দিন জীবন চালানোর ব্যবস্থা করা।

তালিকা তৈরী হয়ে যখন ফারুকে আজমের (রা) সামনে এলো তখন তালিকা শীর্ষে সাঈদ (রা) বিন আমেরের নাম উল্লেখ পাওয়া গেল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "এই সাঈদ (রা) বিন আমের কে?" লোকেরা বললো, "আমাদের আমীর।" আমীরুল মু'মিনীন বিস্মিত হয়ে বললেন, "তিনি যে বেতন পান তা কি করেন।" তারা বললো, "তিনি যে বেতন পান তা অন্য অভাবীদের জন্য ব্যয় করে দেন।"

একথা শুনে ফারুকে আজম (রা) অশ্রু সজল হয়ে উঠলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি এক হাজার দিনারের একটি থলে ব্যক্তিগত প্রয়োজন পূরণ করার কথা বলে তাকে প্রেরণ করলেন। কাসিদ যখন এই অর্থ সাঈদ (রা) বিন আমেরকে প্রদান করলেন তখন তাঁর মুখ দিয়ে অযাচিতভাবে 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' কুরআনের এই আয়াত বের হয়ে পড়লো।

স্ত্রীর কানে এই আয়াত পৌছতেই দৌড়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "ভাল তো। আমীরুল মু'মিনীন ওফাত পেয়েছেন কি?" তিনি বললেন, "না, ঘটনা তার চেয়েও বড়।"

স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন : "কিয়ামতের কোন আলামত দেখা দিয়েছে কি?" তিনি বললেন, "তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে।"

স্ত্রী বললেন, "বলুনতো, ব্যাপারটি কি?"

হযরত সাঈদ (রা) বললেন, "এই দেখ দুনিয়া ফিতনা হয়ে আমার গৃহে প্রবেশ করেছে।"

স্ত্রী বললেন, "তাতে আপনি এতো অস্থির হচ্ছেন কেন। তা তদারকির কথা চিন্তা করুন।"

হযরত সাঈদ (রা) সকল অর্থ একটি বড় থলেতে রাখলেন এবং নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন। সারা রাত ইবাদাতে কেটে গেল। সকালে দেখলেন যে, ইসলামী বাহিনী তাঁর বাড়ীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করছে। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই অর্থ থলে থেকে বের করলেন এবং সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই সকল অর্থ মুজাহিদদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন।

হযরত ওমর ফারুক (রা) আরেকবার এক হাজার দিনার হযরত সাঈদ (রা) বিন আমেরকে ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহারের কথা বলে প্রেরণ করলেন। সাঈদের (রা) স্ত্রী তাঁকে বললেন, "আমাদের কোন খাদেম নেই। এই অর্থ দিয়ে একটি গোলাম খরিদ করাটাই উত্তম হবে।"

হযরত সাঈদ (বা) বললেন, "এই অর্থ কি তাদের মধ্যে বন্টন করাটা বেশী ভাল নয়, যারা আমাদের চেয়েও বেশী অভাবী ও অসহায়।"

স্ত্রীও নেকবখত ছিলেন। তিনি এই প্রস্তাবে সম্মত হয়ে গেলেন এবং হযরত সাঈদ (রা) এই সকল অর্থ বিধবা, ইয়াতিম, অসুস্থ এবং মিসকিনদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন।

একবার হেমসবাসী ফারুকে আজমের (রা) খিদমতে হযরত সাঈদ (রা) বিন আমেরের বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ পেশ করলেন। তার বিস্তারিত নিম্নরূপ :

(১) সকাল থেকে অনেক বেলা না হওয়া পর্যন্ত সাঈদ (রা) বাড়ী থেকে বের হন না।

(২) রাতে কেউ ডাকলে তার জবাব দেন না।

(৩) মাঝে মধ্যেই তিনি দিওয়ানা হয়ে যান।

(৪) মাসে একদিন বাড়ীর অভ্যন্তরে কাটান এবং সেদিন আর কোনক্রমেই বাইরে বেরোন না।

ফারুকে আজম (রা) এসব অভিযোগ যাচাইয়ের জন্য হযরত সাঈদকে (রা) মদীনা তলব করলেন।

সাঈদ (রা) এই অবস্থায় মদীনা পৌছলেন যে, তালি লাগানো কাপড় তাঁর গায়েছিল। এক হাতে ছিল লাঠি এবং অন্য হাতে ছিল খাওয়ার একটি পাত্র।

আমিরুল মু'মিনীন (রা) জিজ্ঞেস করলেন, "ব্যস, তোমার সামান বলতে কি এই?"

তিনি আরজ করলেন, "এর চেয়ে বেশী কোন কিছুর প্রয়োজন নেই। লাঠিতে পাথেয় ঝুলিয়ে রাখি। আর এই পাত্রে খাই।"

হযরত ওমর ফারুক (রা) তাঁর কথায় খুব প্রভাবিত হলেন এবং মনে মনে সাঈদ (রা) সম্পর্কে তিনি যে সুধারণা পোষণ করতেন তা ভুল প্রমাণিত না হওয়ার জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করতে লাগলেন। অতপর তিনি তাঁর সামনে হেমসবাসীর অভিযোগগুলোর কথা পুনরুল্লেখ করলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন ঃ "এসব অভিযোগের তোমার জবাব কি?"

হযরত সাঈদ (রা) আরজ করলেন, "আমিরুল মু'মিনীন! আল্লাহর কসম, আমি এসব বিষয়ে কোন কিছু বলাটা পসন্দ করি না। কিন্তু আপনি যখন জিজ্ঞেস করছেন তখন প্রকৃত ব্যাপার প্রকাশ ছাড়া গত্যন্তর নেই। এ জন্য নিবেদন করছি ঃ

(১) সকাল সকাল আমি বাড়ী থেকে বের হই না। কারণ, আমাদের কোন খাদেম নেই। স্ত্রীর সঙ্গে ঘরের কাজ আঞ্জাম দিয়ে থাকি। সে অন্য কাজ করে। আর আমি আটা গুলাই। অতপর খামিরা ওঠার অপেক্ষা করি। তারপর রুটি পাকাই এবং অতপর তাদের খিদমতের জন্য বাইরে বের হই।

(২) রাতে এজন্য জবাব দিই না যে, সারাদিন আল্লাহর সৃষ্টির সেবায় অতিবাহিত হয়ে যায় এবং নিজের রবের সামনে ইতমিনানের সঙ্গে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ পাই না। অতএব রাতকে আমি আল্লাহর ইবাদাতের জন্য ওয়াকফ করে রেখেছি।

(৩) দিওয়ানা বা পাগল হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো যে, পাগল হয়ে যাওয়ার কোন রোগ আমার নেই। তবে মাঝে মধ্যে অবশ্যই আমি বেহুশ হয়ে পড়ি। তার কারণ হলো, খুবায়েব (রা) বিন আদিকে যখন শূলে চড়ানো হয়েছিল তখন আমিও সেখানে উপস্থিত ছিলাম। খুবায়েব (রা) কুরাইশ মুশরিকদের জন্য বদ দোয়া করছিলেন। সে সময় কুরাইশ মুশরিকদের

মধ্যে আমার উপস্থিতি এবং খুবায়েবের (রা) নির্যাতনমূলক শাহাদাতের অনুভূতি কোন কোন সময় আমাকে বেচাইন করে দেয় এবং আমি বেহুশ হয়ে পড়ি।

(৪) মাসে একদিন আমি বাইরে বের হই না। কারণ, আমার মাত্র এক জোড়া কাপড় রয়েছে। তা যখন ময়লা হয় তখন ধুয়ে পরিধান করি। মাসে একবার অবশ্যই কাপড় ধৌত করে থাকি। যখন তা শুকোয় তখন তা পরে বাইরে বের হই। ফলে দিনের একটি বিরাট অংশ অতিবাহিত হয়ে যায়। এজন্য লোকদের সঙ্গে মিলিত হতে পারি না।

হযরত সাঈদের (রা) জবাব শুনে ফারুকে আজমের (রা) চেহারা খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো এবং তিনি বললেন, "সাঈদ (রা) তোমার সম্পর্কে আমার সুধারণা সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে। এখন হেমসে ফিরে যাও এবং এমনিভাবে আল্লাহর সৃষ্টির সেবা করে যাও।"

হযরত সাঈদ (রা) আরজ করলেন, "আমিরুল মু'মিনীন। এখন আমাকে গভর্ণরীর দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিন।"

আমিরুল মু'মিনীন (রা) ঃ "অবশ্যই নয়। আল্লাহর কসম, তোমাকে অবশ্যই হেমসে ফিরে যেতে হবে। তোমার মত রাখাল এবং সহানুভূতিশীল ব্যক্তি তারা পাবে না।"

ফারুকে আজমের (রা) পীড়াপীড়িতে বাধ্য হয়ে হযরত সাঈদ (রা) হেমসে ফিরে গেলেন। কিন্তু তিনি সেখানে ফিরে যাওয়ার পর মাত্র কিছুদিন বেঁচেছিলেন। তারপর প্রকৃত স্রষ্টার ডাক এসে উপস্থিত হলো এবং ১৯ অথবা ২১ হিজরীতে তিনি ৪০ বছর বয়সে পরপারে যাত্রা করেন।

হযরত সোহায়েল (রা) বিন আমর

একাদশ হিজরীতে বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সা) ওফাত পান। এ সময় হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) খলিফা নির্বাচিত হন। তাঁর খলিফার দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই সমগ্র আরবে ধর্মদ্রোহিতার আগুন জ্বলে উঠলো। মদীনার আনসার এবং মক্কার কুরাইশ ছাড়া আরবের এমন কোন কবিলা ছিল না যারা কোন না কোনক্রমে এই আগুনের লেলিহান শিখার শিকার হয়নি। তা সত্ত্বেও সিদ্দীকে আকবারের (রা) দৃঢ়তা ও অটলতা মুসলমানদের উৎসাহ উদ্দীপনায় ভাটা পড়তে দেয়নি। কিন্তু কিছুদিন পরই যখন মক্কায় কুরাইশদের নওমুসলিমদের মধ্যেও কানা ঘুষা শুরু হলো এবং তাদের মধ্যে বিদ্রোহের আলামত প্রকাশ পেলো তখন পরিস্থিতি সীমাহীন নাজুক হয়ে দাঁড়ালো। কুরাইশরা ছিলেন ইসলামের তরবারী ধারী বাহু। ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের বিদ্রোহের অর্থই ছিল নতুন ভূমিষ্ঠ ইসলামী খিলাফতের কিশতী আপদ-বিপদের ধাক্কায় ধ্বংস প্রাপ্ত হওয়া। কুরাইশের জ্ঞানী-গুণী ও ইসলামের সত্যিকারের অনুসারীরা এই পরিস্থিতিতে খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন। কিন্তু প্রশ্ন দাঁড়িয়েছিল যে, কুরাইশদেরকে সঠিক পথে রাখার দায়িত্ব কে গ্রহণ করবেন? এটা ছিল খুব শক্ত কাজ। এখানে জ্ঞানের নয় বরং "ভালবাসার" প্রয়োজন ছিল।

মক্কায় কুরাইশ কবিলাসমূহের এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। সেই জনসভায় নূরানী চেহারার লম্বাদেহী এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে। তাঁর লাল ও সাদা রং এবং সাদা দাড়ি তার চেহারার ঔজ্জ্বল্য দ্বিগুণ করছিল। তাঁর চেহারায় এমন এক মহিমা ছিল যে, তাতে দৃষ্টি স্থির থাকতে পারছিল না। তাঁর অর্ধ উন্মিলিত চক্ষু থেকে প্রকাশ পাচ্ছিল যে, তিনি একজন রাতজাগরণকারী আবেদ এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর সামনে মাথানত করতে প্রস্তুত নন। তিনি অত্যন্ত আস্থাপূর্ণ কণ্ঠে এবং উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে জনসভায় এই বক্তব্য পেশ করছিলেন ঃ

"কুরাইশ ভাইসব! তোমরা শুনেছ যে, আমাদের আকা ও মাওলা মুহাম্মাদ মুস্তাফাকে (সা) আল্লাহ তায়ালা নিজের নিকট ডেকে নিয়েছেন। একদিন না একদিন এই ঘটনা ঘটার ছিল। এইটিই প্রকৃতির নিয়ম। কিন্তু কিছুদিন হলো আমি তোমাদের মধ্যে কতিপয়ের চেহারায় পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি। তা

কেন? মুহাম্মাদ মুস্তাফাতো (সা) তোমাদের মাবুদ ছিলেন না। তিনি ছিলেন আল্লাহর রাসূল এবং নির্দিষ্ট সময়ে নিজের স্রষ্টার নিকট পৌঁছে গেছেন। তিনি সেই স্রষ্টার নিকট পৌঁছে গেছেন যিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী—তার ওপর কখনো মৃত্যু আপতিত হবে না। তোমাদের মধ্যে অধিকাংশই হলে এমন যারা ইসলামে অগ্রগমন থেকে বঞ্চিত রয়েছো। তা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তোমাদের ওপর ইহসান করেছেন এবং অবশেষে তোমরা ইসলামের নিয়ামতে অভিষিক্ত হয়েছ। এখন সেই মহান নিয়ামত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞ হওয়ার কোন কারণ নেই। মুহাম্মাদের (সা) ওফাতের অর্থ এই নয় যে, ইসলাম শেষ হয়ে গেছে। আল্লাহর কসম। ইসলাম চিরদিন থাকবে এবং চন্দ্র ও সূর্য যেমন সমগ্র বিশ্বে নিজের আলো ছড়ায় তেমনি ইসলামের আলোতে সমগ্র বিশ্ব আলোকিত হবে। কান খুলে শুনে নাও যে, তোমাদের মধ্যে যদি কেউ ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার চেষ্টা চালায় তাহলে আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেব।"

এই বক্তৃতায় কুরাইশদের অন্তর বিগলিত হয়ে গেলো এবং তারা বলে উঠলো ঃ

"হে আমাদের বুজর্গ! আল্লাহর কসম, আপনি আমাদেরকে সকল অবস্থায় ইসলামের ওপর অটল পাবেন। আমরা হকের দুশমনকে কখনো নিজেদের ব্যূহে ঢুকতে দেব না এবং হক পথে যে কোন ধরনের কুরবানী করতে দ্বিধা করবো না।"

এই ব্যক্তি যাঁর ঈমানী জোশ ও শক্তিশালী বক্তৃতা মক্কার আকাশ বাতাস বা পরিবেশ মুহূর্তের মধ্যে পরিবর্তিত করে দিয়েছিল এবং এমনিভাবে ইসলামকে এক ভয়ানক অবস্থা থেকে বাঁচিয়েছিল তিনি ছিলেন কুরাইশের খতিব হযরত সোহায়েল (রা) বিন আমর।

হযরত সোহায়েল (রা) বিন আমর (বিন আবদি শামস বিন আবদুদ বিন নসর বিন মালিক বিন হাসাল বিন আমের বিন লুব্বী কারাশী আমেরি) কুরাইশের প্রভাবশালী সরদারদের অন্যতম হিসেবে পরিগণিত ছিলেন। বিশ্ব নবী (সা) হকের দাওয়াতের কাজ শুরু করলে আবু লাহাব, আবু জেহেল, আবু সুফিয়ান, উকবা বিন আবি মুইত, রবিয়া পুত্র উতবা ও শাইবা, উমাইয়া বিন খালফ প্রমুখ অন্যান্য কুরাইশ সরদারের মত সোহায়েলও হক বিরোধিতা জীবনের একমাত্র কাজ হিসেবে বেছে নেন। তিনি ছিলেন একজন অনলবর্ষী ও জাদুস্পর্শী বক্তা। কাব্যেও তিনি ব্যুৎপত্তি রাখতেন এবং শক্তিশালী বক্তৃতার মাধ্যমে মুহূর্তের মধ্যে তিনি সমগ্র জাতিকে গতিময় করে তুলতেন। তিনি

নিজের সকল যোগ্যতা ইসলাম বিরোধিতায় নিয়োজিত করেছিলেন এবং দাওয়াতে হকের পদে পদে বাধা দিয়েছিলেন। কিন্তু আল্লাহর কৃতিত্ব দেখুন। তিনি যেভাবে ইসলামের কট্টর দুশমন ছিলেন, তাঁর সন্তানরা আবার তেমনি ইসলাম প্রেমিক ছিলেন। তাঁর দু'জন যুবক পুত্র আবু জান্দাল (রা) এবং আবদুল্লাহ (রা) ইসলামের প্রথম যুগেই রহমতে আলমের (সা) পবিত্র জামা মজবুতভাবে আকড়ে ধরেছিলেন। তেমনি তাঁর দু'জন বিবাহিত কন্যা সাহলা (রা) ও উম্মে কুলছুম (রা) স্ব স্ব স্বামীসহ [হযরত আবু হোজায়ফা (রা) এবং আবু সাবরা (রা) বিন আবি রুহম] হক দাওয়াতের ইতিবাচক জবাব দিয়েছিলেন। এভাবে তারা সকলেই সাবিকুনাল আউয়ালুনের পবিত্র দলে অন্তর্ভুক্ত হন। সোহায়েল নিজের পুত্রদের ইসলাম গ্রহণে খুব বিচলিত হলেন এবং তাদেরকে জিঞ্জিরাবদ্ধ করে কয়েদ করে রাখলেন।

হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন সোহায়েল সুযোগ পেয়ে হাবশার দ্বিতীয় হিজরীতে সেখানে চলে যান। অবশ্য হযরত আবু জান্দাল (রা) হুদায়বিয়ার সন্ধি পর্যন্ত পিতার কঠোর নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন। হযরত আবদুল্লাহও(রা) কিছুদিন পর হাবশা থেকে মক্কা ফিরে এলেন। এ সময় তিনি পুনরায় পিতার নির্যাতনের পাল্লায় ফেঁসে গেলেন। তিনি মুসলিহাতান নিজেকে পিতার আনুগত্য প্রকাশ করে মুক্তি লাভ করলেন। কিন্তু মনে মনে তিনি ইসলামেরই অনুরাগী রইলেন। বদরের যুদ্ধে তিনি মুশরিকদের সৈন্যের সঙ্গে মদীনা গেলেন এবং সেখানেই সুযোগ পেয়ে মুসলমান সৈন্যদের দলে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলেন। ওদিকে সোহায়েল কন্যাদ্বয় এবং তাদের স্বামীরাও ইসলাম গ্রহণের অপরাধে মুশরিকদের ক্রোধের শিকার হন। বিশ্ব নবী (সা) মুসলমানদেরকে হাবশায় হিজরতের অনুমতি দেন। এ সময় তারাও মুহাজিরদের কাফিলায় শামিল হয়ে হাবশা গমন করেন এবং বছরের পর বছর ধরে উদ্বাস্তু জীবনের দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে থাকেন। সোহায়েল নিজের পুত্র ও কন্যার কোন পরওয়া করতো না। ইসলাম বিরোধিতার যে পথ তিনি অবলম্বন করেছিলেন তা তিনি দাপটের সঙ্গে অব্যাহত রাখেন। ইসলাম যতই সম্প্রসারিত হচ্ছিল ইসলাম বিরোধী আবেগ তার ততই কঠোর হচ্ছিল। মোট কথা, তাঁর জীবনের দিন-রাত্রি এই কাজেই ওয়াকফ বা নিয়োজিত হয়েছিল। মুসলমানদের প্রতি তার ঘৃণার পরিমাপ একটি ঘটনা দিয়েই করা যায়। ঘটনাটি হলো, বাইয়াতে উকবায়ে কবিরার পর মদীনার আনসাররা স্বদেশে ফিরে এলেন। এ সময় খাজরাজ সরদার হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাহ কোন কারণে পিছে পড়েছিলেন। মক্কার মুশরিকরা মদীনাবাসীদের পিছনে ধাওয়া করতে করতে আজাখির নামক স্থানে তাদেরকে ধরে ফেললো। অতপর

তাদেরকে উটের পিঠের হাওদার চামড়া দিয়ে বেঁধে ফেললো এবং তাদের মাথার চুল ধরে মারতে মারতে মক্কা নিয়ে এলো। যে মুশরিকই আসতো সেই তাদের ওপর নির্যাতন চালাতো এবং তাদের লম্বা চুল ধরে টেনে মাটির ওপর ঘসে নিয়ে বেড়াতো। স্বয়ং হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদা (রা) বর্ণনা করেছেন, আমি একজন লাল ও সাদা বর্ণের সুন্দর সুরতের মানুষকে আমার দিকে আসতে দেখলাম এবং ধারণা করলাম যে, ব্যক্তিটি রহমদিল ও যুক্তিবাদী হবে। সম্ভবত সে আমাকে এই শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি দেবে। কিন্তু আমার নিকট এসে সে আমার মুখের ওপর এত জোরে এক থাপ্পড় মারলো যে আমার মুখ ফিরে গেল। (অন্য রেওয়ায়াত অনুযায়ী প্রচণ্ড জোরে আমাকে এক ঘুষি মারলো) আমি বুঝতে পেলাম যে, তাদের মধ্যে কোন কল্যাণ নেই এবং তারা কেউই যুক্তিবাদী নয়। (থাপ্পড় অথবা ঘুষি দানকারী মানুষটি ছিল হযরত সোহায়েল বিন আমর) অবশেষে জনৈক মুশরিক (আবুল বখতরী বিন হিশাম) আমার প্রতি দয়া প্রদর্শন করে বললো "মক্কায় তোমার পরিচিত কেউ আছে কি?"

জবাবে আমি বললাম ঃ "হাঁ। জোবায়ের বিন মাতয়াম এবং হারিছ বিন হারব বিন উমাইয়া বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে মাঝে মধ্যে ইয়াছরাব গিয়ে থাকে। তারা আমাকে চিনে।"

সেই ব্যক্তি বললো, "সেই দু'জনের নাম নিয়ে দোহাই দাও।"

আমি তাই করলাম। অন্যদিকে সেই ব্যক্তি তাদেরকে গিয়ে বললো যে, খাজরাজের এক ব্যক্তি সায়াদ বিন উবাদা নামে এক ব্যক্তিকে আবতাহতে খুব করে মারা হচ্ছে আর সে তোমাদের নামের দোহাই দিচ্ছে।

তারা বললো, "ব্যাপারতো জটিল হয়ে গেছে। খোদার কসম, সে যা বলে তা সঠিকই বলে থাকে। সায়াদ বিন উবাদা হলেন খাজরাজের সরদার এবং আমাদের সঙ্গে তিনি সবসময় ভাল আচরণ করেছেন।" একথা বলেই তারা দৌড়ে সেখানে উপস্থিত হলেন এবং সায়াদকে (রা) সেসব জালেমের নির্যাতনের পাঞ্জা থেকে মুক্তি দিলেন।

নবীর (সা) হিজরতের দুই বছর পর বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হলো। এ সময় সোহায়েল অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে অন্যান্য মুশরিকের সাথে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গেলেন। যুদ্ধে কুরাইশরা পরাজিত হলো। সোহায়েল হযরত মালিক (রা) বিন ওয়াখশামের হাতে গ্রেফতার হয়ে গেলেন। তাঁকে যখন হুজুরের (সা) সামনে আনা হলো তখন তাঁকে দেখে

হযরত ওমরের (রা) খুন টগবগ করে উঠলো। আজ সেই ব্যক্তি তাদের কবজায় এসেছে যে ব্যক্তি মুখ দিয়ে তেরটি বছর ধরে তাদেরকে ঘায়েল করে এসেছে। তিনি বিশ্ব নবীর (সা) নিকট আরজ করলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল! আপনি অনুমতি দিলে সোহায়েলের সামনের দু'টি দাঁত ভেঙ্গে দি। যাতে বক্তৃতা করার শক্তি আর না থাকে। এই ব্যক্তির বাকশক্তি হকপন্থীদেরকে মারাত্মক ক্ষতি সাধন করেছে। তার দাঁত যদি ভেঙ্গে ফেলা হয় তাহলে সে আগের মত জোর ও জোশের সঙ্গে বক্তৃতা করতে পারবে না।"

রহমতে আলম (সা) হযরত ওমরের (রা) কথা মানলেন না। এবং বললেন ঃ

"রাখো, ওমর রাখো। আল্লাহ তায়ালা তাকে বক্তৃতা দানের যে যোগ্যতা প্রদান করেছেন সম্ভবত কোন সময় তা তোমাদের উপকারে আসতে পারে এবং তোমরা খুশী হয়ে যাবে।"

তারপর হুজুর (সা) সোহায়েলকে তাদের নিকট থেকে মুক্ত করে দিলেন।

কতিপয় রেওয়াতে এই ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু তাতে এটা বিশ্লেষণ করা হয়নি যে, এই ঘটনা বদরের যুদ্ধের সময় সংঘটিত হয়েছিল না অন্য কোন সময়। বদরের যুদ্ধের পর সোহায়েল ওহোদ ও খন্দকের যুদ্ধেও মুসলমানদের বিরুদ্ধে অংশ নেয়। যদিও প্রতিবারই কুরাইশরা পরাজিত হয়েছিল তবুও সোহায়েলের ওপর এই পরাজয়ের কোন প্রভাবই পড়েনি এবং সে ইসলামের মূলোৎপাটনের প্রচেষ্টায় জোরেশোরেই লেগেছিল।

৬ষ্ঠ হিজরীর জিলকদ মাসে রাসূলে আকরাম (সা) চৌদ্দশ' সাহাবীসহ ওমরাহ্ করার জন্য ইহরাম বেঁধে মদীনা থেকে মক্কা রওয়ানা হয়ে গেলেন। কুরাইশরা যখন ব্যাপারটা জানতে পেলো তখন তারা মুসলমানদের মক্কা প্রবেশে বাধা দানের জন্য খুব প্রস্তুতি নিল। হুজুর (সা) যখন কুরাইশদের মনোভাব বুঝতে পারলেন তখন মক্কা থেকে এক মনযিল আগে হুদায়বিয়ার ময়দানে তাবু ফেললেন এবং কুরাইশদেরকে বলে পাঠালেন যে, তারা শুধু ওমরা করতে এসেছেন, যুদ্ধ-বিগ্রহ তাদের উদ্দেশ্য নয়। কিছুদিনের জন্য কুরাইশরা যদি আমাদের সঙ্গে সন্ধি করে নেয়, সেটাই হবে উত্তমকাজ। কুরাইশরা তার জবাবে উরওয়া বিন মাসউদ ছাকাফিকে দূত হিসেবে রাসূলের (সা) নিকট প্রেরণ করলো। তিনি ফিরে গিয়ে কুরাইশদেরকে পরামর্শ দিলেন যে, সন্ধি করাতেই কল্যাণ রয়েছে। কেননা, তিনি মুসলমানদের মধ্যে

মুহাম্মাদের (সা) জন্য মৃত্যুবরণ করার সীমাহীন আবেগ দেখতে পেয়েছেন কুরাইশরা উরওয়ার কথা মানলো না। হুজুর (সা) পুনরায় একজন দূত প্রেরণ করলেন। কুরাইশরা তাঁর সঙ্গেও অসদাচরণ এবং মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য একটি দল প্রেরণ করলো। মুসলমানরা তাদেরকে ধরে ফেললো। কিন্তু রহমতে আলম (সা) তাদের ক্ষমা করে দিলেন এবং চূড়ান্ত প্রচেষ্টার জন্য হযরত উসমানকে (রা) দূত হিসেবে মক্কা প্রেরণ করলেন। কুরাইশরা তাঁকে মক্কায় আটকে রাখলো। ওদিকে মুসলমানদের মধ্যে এই খবর মশহুর হয়ে গেল যে, উসামানকে (রা) শহীদ করে ফেলা হয়েছে। মুসলমানদের নিকট কুরাইশদের এই আচরণ ছিল অগ্রহণযোগ্য। তারা হযরত উসমানের(রা) বদলা নেয়ার লক্ষ্যে লড়াই করে মৃত্যুবরণ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল এবং সবাই একটি বাবলা বৃক্ষের নীচে প্রিয় নবীর (সা) পবিত্র হাতে মৃত্যুর জন্য বাইয়াত করলেন। এই বাইয়াতের নাম হলো বাইয়াতে রিদওয়ান। কেননা, এই বাইয়াতে অংশগ্রহণকারী জানবাজদেরকে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে নিজের সন্তুষ্টির সুসংবাদ দিয়েছিলেন। পরে জানা গেল যে, হযরত উসমানের (রা) শাহাদাতের খবর সঠিক ছিল না। তা সত্ত্বেও মুসলমানদের উৎসাহ উদ্দীপনা দেখে কাফেরদের সাহসে ভাটা পড়লো এবং তারা সন্ধির চুক্তিতে প্রস্তুত হয়ে গেল। সন্ধির শর্তাবলী নিরূপণের জন্য তারা সোহায়েল বিন আমরকে নিজেদের দূত নির্বাচন করলো। তিনি হুজুরের (সা) খিদমতে হাজির হলেন এবং সন্ধি চুক্তি লিখিতভাবে পেশ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। হুজুর (সা) চুক্তি লিপিবদ্ধ করার দায়িত্ব হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুর ওপর ন্যস্ত করলেন এবং তাঁকে "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম" লিখতে বললেন।

সোহায়েল চমকে উঠে বললেন, "আমরা জানি না কে রহমান। তার পরিবর্তে "বিইসমিকা আল্লাহুম্মা" লিখা হোক কারণ, আল্লাহুম্মার ব্যাপারে আমরা এবং আপনারা সকলেই একমত আছি।"

এ সময় উপস্থিত সাহাবায়ে কিরাম (রা) আলী (রা) যা লিখেছেন তাই রাখার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন এবং বললেন, তাতে কোন পরিবর্তন হওয়া উচিত হবে না। কিন্তু হুজুরে আকরাম (সা) মুচকি হেসে হযরত আলীকে (রা) বললেন, "হে ভাই! সোহায়েল যেভাবে বলে সেভাবেই লিখে দাও।" হযরত আলী (রা) রাসূলের (সা) নির্দেশ পালন করলেন। এরপর হুজুর (সা) তাঁকে বললেন লিখো ঃ "এই প্রস্তাব মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহর (সা) পক্ষ থেকে করা হয়েছে।"

হযরত আলী (রা) এই বাক্য লিখলেন। এ সময় সোহায়েল প্রতিবাদ করলো ঃ

"সাহেব, এই বাক্য আমরা অনুমোদন করি না। আমরা যদি মুহাম্মাদকে (সা) রাসূল হিসেবে মেনেই নি তাহলে তো সকল বিরোধই শেষ হয়ে যায়। আপনি এখানে মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহর পরিবর্তে মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ লিখুন"।

হুজুর (সা) বললেন ঃ "আমার রিসালাত তোমার এবং তোমার মুয়াক্কিলদের স্বীকৃতির ওপর নির্ভরশীল নয়। আমি যেমন ইবনে আবদুল্লাহ তেমনি আল্লাহর রাসূলও। তবুও আমি তোমার কথা মেনে নিচ্ছি। অতপর তিনি হযরত আলীকে (রা) বললেন ঃ

"রাসূলুল্লাহ শব্দ মুছে ইবনে আবদুল্লাহ লিখে নাও।"

হযরত আলী (রা) আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল। আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। আমিতো রাসূলুল্লাহ শব্দ মুছে ফেলার হিম্মত আমার মধ্যে পাচ্ছি না।"

হুজুর (সা) বললেন ঃ "ঠিক আছে, কাগজ এদিকে আনো।" যখন কাগজ তাঁর সামনে পেশ করা হলো তখন তিনি নিজের পবিত্র হাত দিয়ে রাসূলুল্লাহ শব্দ মুছে ফেললেন এবং সেই স্থানে "ইবনে আবদুল্লাহ" লিখালেন। এই পর্যায়ে শেষ হলে হুজুর (সা) হযরত আলীকে (রা) বললেন ঃ "লিখো, মুসলমানদের ওমরা করার ব্যাপারে কুরাইশের কোন ওজর থাকবে না।

সোহায়েল ঃ খোদার কসম, আপনারা চলতি বছর ওমরার জন্য মক্কা প্রবেশ করবেন তা আমরা মানবো না এভাবেতো সমগ্র আরব আমাদেরকে বুযদিল বলে ভর্ৎসনা করবে। হাঁ, আগামী বছর আপনারা তাওয়াফের জন্য আসতে পারেন।"

রহমতে আলম (সা) বললেন ঃ "ঠিক আছে, তাই হবে।" সুতরাং এই শর্ত লিখা হলো।

সোহায়েল বললো ঃ "এখন লিখান যে, মক্কাবাসীর যে কেউ যদি পালিয়ে মুসলমানদের নিকট চলে যায়, সে যদি মুসলমানও হয় তাহলে তাকে কুরাইশের নিকট ফেরত পাঠাতে হবে এবং যদি কোন মুসলমান মক্কাবাসীর কবজায় চলে আসে তাহলে তাকে ফেরত পাঠানো হবে না। মুসলমানরা যদি ফেরতের দাবীও করে তবুও নয়।"

মুসলমানদের নিকট এই শর্ত খুবই আশ্চর্য ধরনের মনে হলো এবং তারা এক বাক্যে বললো, "এই শর্ত ইনসাফভিত্তিক নয় এবং আমরা তা

কোনক্রমেই অনুমোদন করি না।" এই শর্তের ব্যাপারে কথা কাটাকাটি চলছিল। এমন সময় এক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে গেল। সোহায়েল তনয় আবু জানদাল (রা) যাঁকে তিনি ইসলাম গ্রহণের অপরাধে জিঞ্জিরাবদ্ধ করে রেখেছিলেন কেমন করে যেন কয়েদখানা থেকে বের হয়ে জিঞ্জির টানতে টানতে অনেক কষ্ট করে হুদায়বিয়া এসে পৌছলেন। তাঁর পায়ের গোড়ালীর হাড় এবং পায়ের গোড়ালী থেকে রক্ত ঝরছিল। পায়ে দেয়া ছিল বেড়ি এবং তিনি ডেকে ডেকে মুসলমানদের নিকট ফরিয়াদ করছিলেন ঃ

"বেরাদারানে ইসলাম, দেখো ইসলাম গ্রহণের অপরাধে আমার পিতা আমাকে এই করেছে। তোমরা কি আমাকে এই জিল্লতি থেকে মুক্তি দেবে না।"

তাঁকে এই অবস্থায় দেখে মুসলমানদের মধ্যে ক্রন্দনের রোল পড়ে গেল। কিন্তু সোহায়েল উঠে দাঁড়ালো এবং বলতে লাগলো ঃ

"হে মুহাম্মাদ! এই সন্ধিপত্র বাস্তবায়ন প্রথমে এই কুলাঙ্গারকে ফেরত দানের মাধ্যমে করতে হবে। মুসলমানদের জন্য সন্ধিনামা বাস্তবায়নের এটাই প্রথম সুযোগ"।

রাসূলে আকরাম (সা) ঃ "সাহেব! এই শর্ততো এখনো লিখাই হয়নি। এ জন্য আবু জানদালের ওপর তার বাধ্যবাধকতা কি করে আরোপিত হতে পারে।"

সোহায়েল অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে জবাব দিলেন ঃ "যাই হোক, আবু জানদালকে আমাদের নিকট ফেরত না দেয়া পর্যন্ত আমরা কোন শর্তের ওপর সন্ধি করবো না।"

বিশ্ব নবী (সা) এবং সাহাবীরা (রা) তাকে বোঝানোর জন্য অনেক চেষ্টা করলো। কিন্তু সে কোনমতেই মানলো না। অবশেষে হুজুর (সা) সোহায়েলের শর্ত মেনে নিলেন এবং বললেন, "ঠিক আছে, তুমি আবু জানদালকে সঙ্গে করে নিয়ে যাও।"

আল্লামা ইবনে কাইয়েম (র) যাদুল মায়াদে লিখেছেন যে, এ সময় আবু জানদাল (রা) হাউমাউ করে কাঁদতে লাগলেন এবং উচ্চৈস্বরে বললেন ঃ

"হে মুসলমানেরা! একজন মুসলমানকে মুশরিকদের নিকট ন্যস্ত করছো। তোমরা দেখো, কিভাবে আমার শরীর থেকে রক্তের ধারা বইছে।"

প্রিয় নবী (সা) আবু জানদালকে (রা) সম্বোধন করে বললেন, আবু জানদাল! ধৈর্যধারণ কর। আমাদের কর্মপদ্ধতির ফল খুব শীঘ্রই প্রকাশ পাবে।

(এটা তিনি রূপক আকারে বলেছিলেন) আল্লাহ তোমাকে এবং অন্যান্য মজলুম মুসলমানদের জন্য কোন পথ বানিয়ে দেবেন।"

সুতরাং আবু জানদালকে (রা) পায়ে জিঞ্জির লাগানো অবস্থায় সোহায়েলের হাওয়ালা করে দেয়া হলো এবং সন্ধিনামায় স্বাক্ষর হয়ে গেল।

মহানবী (সা) ওমরা পালন ছাড়াই সঙ্গীদেরসহ হুদায়বিয়া থেকে মদীনা রওয়ানা হলেন। এমন সময় আল্লাহর তরফ থেকে ইরশাদ হলো ঃ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا (الفتح - ١) অর্থাৎ "হে পয়গাম্বর! আমরা তোমাকে প্রকাশ্য বিজয় দান করেছি।"

আল্লাহর এই ইরশাদ বাস্তবত সেই সব বিজয় ও সাফল্যের ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যা ভবিষ্যতে মুসলমানরা লাভ করতে যাচ্ছিল। নচেৎ মুসলমানরা মনে করছিলো যে, তারা চাপে পড়ে এই সন্ধি করেছে।

অষ্টম হিজরীর রমযান মাসে নবীয়ে আকরাম (সা) বিজয়ীর বেশে মক্কায় প্রবেশ করলেন। এ সময় শুধুমাত্র একটি অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটে। তাতে সোহায়েল, ইকরামা বিন আবু জেহেল এবং সাফওয়ান বিন উমাইয়া আগে ভাগে ছিল। তারা বনি বকর, বনি হারিছ এবং হুযাইল প্রভৃতি গোত্রের অনেক গোঁড়া মুশরিককে সঙ্গে নিয়ে মুসলমানদের সেই সৈন্যদলকে বাধা দিয়েছিল যারা হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদের নেতৃত্বে মক্কায় প্রবেশ করছিলেন। মুসলমানরা তৎক্ষণাৎ মুশরিকদেরকে যথোচিত জবাব দিলেন এবং তারা নিজেদের বহু সংখ্যক মানুষকে নিহত অবস্থায় ফেলে রেখে পালিয়ে গেল। মুসলমানদের শুধু দুই ব্যক্তি শহীদ হয়েছিলেন। সোহায়েল পালিয়ে স্বগৃহে গিয়ে ঢুকেছিল। সে সময় তার যে অবস্থা ছিল তা তিনি এই ভাষায় বর্ণনা করেছেন ঃ

"রাসূলুল্লাহই (সা) মক্কায় প্রবেশ করতেই আমি ভয়ে ভীত হয়ে ঘরের অভ্যন্তরে বসে গেলাম এবং নিজের পুত্র আবু জানদালকে (রা) ডেকে বললাম ঃ "হে আমার প্রাণ প্রিয় পুত্র! যেভাবেই হোক মুহাম্মাদের (সা) নিকট সুপারিশ করে আমাকে জীবনে বাঁচাও।"

হযরত আবু জানদাল (রা) পিতার হাতে খুব নির্যাতন সহ্য করেছিলেন। কিন্তু এ সময় তিনি সবকিছু ভুলে গিয়েছিলেন এবং তিনি পিতাকে বাঁচানোর আশা পোষণ করলেন। সেখান থেকে তিনি সোজা বিশ্ব নবীর (সা) খিদমতে হাজির হলেন এবং প্রার্থনা জানালেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতাকে নিরাপত্তা দিন।" হুজুর (সা) আবু জানদালের (রা) কুরবানী সম্পর্কে সম্যক

ওয়াকিফহাল ছিলেন। কোন চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই তিনি তাঁর সুপারিশ মেনে নিলেন এবং বললেন ঃ

"সোহায়েল আল্লাহর নিরাপত্তায় রয়েছে। তিনি যেন কোন ভয়-ভীতি ছাড়াই ঘর থেকে বের হন। কোন মুসলমানের তাকে কোন ক্ষতি করার অনুমতি নেই। আমার বয়সের কসম, সোহায়েল একজন জ্ঞানী ও শরীফ মানুষ। এমন মানুষ ইসলামের নিয়ামত থেকে বঞ্চিত থাকতে পারে না।" (সে সময় পর্যন্ত বয়স প্রভৃতির কসম খাওয়া নিষিদ্ধ হয়নি)।

আবু জানদাল খুশী খুশী পিতার নিকট ফিরে গেলেন এবং তাঁকে হুজুরের (সা) ইরশাদ সম্পর্কে অবহিত করলেন। তিনি চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, "খোদার কসম! মুহাম্মাদ (সা) শৈশবকালেও নেক্‌কার ছিলেন এবং বয়স্ককালেও নেককার রয়েছেন।"

এই বর্ণনাটি মুসতাদরাকে হাকিমের। হাফিজ ইবনে হাজার (র) ইসাবাতে লিখেছেন যে, মক্কা বিজয়ের দিন যখন সকল মক্কাবাসী রাসূলে আকরামের(সা) সামনে এলেন; তখন হুজুর (সা) খুতবার পর তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

"হে কুরাইশ নেতৃবৃন্দ! আজ তোমরা আমার নিকট কি আশা করতে পার?"

এ সময় সোহায়েল (রা) কুরাইশের মুখপাত্র হিসেবে সামনে অগ্রসর হলেন এবং আরজ করলেন ঃ

"আপনি আমাদের শরীফ ভাই এবং শরীফ ভ্রাতুষ্পুত্র। আমরা আপনার নিকট ভালই আশা করি।"

রহমতে আলম (সা) বললেন ঃ

"হে কুরাইশ ভাইয়েরা। আমি আপনাদেরকে সেই কথাই বলবো যা হযরত ইউসুফ (আ) নিজের ভাইদেরকে বলেছিলেন ঃ লা তাছরিবা আলাইকুমুল ইয়াওমা অর্থাৎ আজ তোমাদের ওপর কোন জবাবদিহি বা প্রতিশোধ নেয়া হবে না।

আপনারা সকলেই মুক্ত। সোহায়েল রহমতে আলমের (সা) ক্ষমাশীলতা দেখে খুবই প্রভাবিত হলেন। কিছুদিন পর হুজুর (সা) যখন হুনাইনের যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করছিলেন তখন তিনি জি'রানা নামক স্থানে পৌঁছে রাসূলের

(সা) দরবারে হাজির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। রহমতে আলম (সা) তার অন্তর জয়ের উদ্দেশ্যে হাওয়াযিনের সম্পদ থেকে একশ' উট দান করলেন। ব্যস, সেই দিন থেকে তিনি নিজের অন্তর ও জীবন রাসূলে আরাবীর (সা) ওপর উৎসর্গ করে বসলেন এবং জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত অতীত অপরাধের ক্ষতিপূরণে ব্যস্ত ছিলেন। ইমাম বুখারী (র) এবং হাকিম (র) লিখেছেন যে, হযরত সোহায়েল (রা) হুনাইনের যুদ্ধে প্রকৃত অংশও নিয়েছিলেন।

ইসলাম গ্রহণের পর হযরত সোহায়েলের (রা) জীবনে সম্পূর্ণ বিপ্লব এসে গেল। তিনি খুব বেশী বেশী নামাজ পড়তেন, রোযা রাখতেন এবং নিজের ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে অকাতরে দান করতেন। আল্লামা ইবনে আছির (রা) "উসুদুল গাব্বাহ"-তে লিখেন যে, সেই সকল কুরাইশ সরদার যারা সবশেষে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তাদের মধ্যে সোহায়েল (রা) বিন আমর সবচেয়ে বেশী নামায পড়তেন, রোযা রাখতেন, দান-খয়রাত করতেন এবং আমলে সালেহ বা নেক কাজ করতেন। অতিরিক্ত পরিশ্রমে তাঁর শরীর শুকিয়ে এবং রং পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল। নিজের অতীত কর্মের কথা স্মরণ করে খুব কাঁদতেন। বিশেষ করে যখন পবিত্র কুরআন শুনতেন তখন চক্ষু দিয়ে অশ্রু দর দর করে প্রবাহিত হতো। মোটকথা, ইসলাম গ্রহণের পর তিনি একজন উদাহরণযোগ্য মরদে মু'মিন হয়ে গিয়েছিলেন। মহানবীর (সা) ওফাতের পর ধর্মদ্রোহিতার ভয়াবহ ফিতনা যখন সমগ্র আরবে কিয়ামত কায়েম করে ফেললো তখন সোহায়েলের (রা) পা এক মুহূর্তের জন্যও টলমল করেনি। বরং তিনি সেই ভয়ংকর সময়েও এমন অটলতা ও বীরত্ব প্রদর্শন করেন যে, যার কোন নজীর পাওয়া যায় না। মক্কায় কুরাইশদেরকে সঠিক পথে রাখা তাঁর এমন এক মহান কৃতিত্ব ছিল যে, তাঁকে নিশ্চিন্তে ইসলামের মুহসিনদের কাতারে স্থান দেয়া যায়। ধর্মদ্রোহিতার ফিতনা নির্মূল করণে শুধুমাত্র হযরত সোহায়েলই (রা) নন বরং তাঁর পরিবারের সকলেই জীবনবাজি রেখে প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে সবচেয়ে রক্তাক্ত যুদ্ধ মুসায়লামা কাজ্জাবের বিরুদ্ধে ইয়ামামা নামক স্থানে সংঘটিত হয়েছিল। হযরত সোহায়েলের (রা) বড় পুত্র আবদুল্লাহ (রা) ইয়ামামার যুদ্ধে বীর বিক্রমে অংশ নেন এবং লড়াই করতে করতে শাহাদাতের পেয়ালা পান করেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) হজ্জের জন্য মক্কা গিয়ে শোকজ্ঞাপনের জন্য হযরত সোহায়েলের (রা) বাড়ী তাশরীফ নেন। সে সময় হযরত সোহায়েল (রা) বলেছিলেনঃ

"আমি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে শুনেছি যে, কিয়ামতের দিন শহীদ ব্যক্তি নিজের বংশের বা খান্দানের ৭০ ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করবেন। আমি আশা করি যে, আবদুল্লাহ সর্বপ্রথম আমার জন্য সুপারিশ করবে।"

হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) খিলাফতকালে যখন রোমক সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে জিহাদ শুরু হলো এবং ইসলামের মুজাহিদরা সিরিয়ার (ফিলিস্তিনসহ) দিকে অগ্রাভিযান শুরু করলো তখন হযরত সোহায়েল (রা) জিহাদের আবেগে উদ্বেলিত হয়ে নিজের খান্দানের সকলের সঙ্গে ইসলামী বাহিনীতে শামিল হয়ে গেলেন। আল্লামা ওয়াকেদী বর্ণনা করেছেন, সিরিয়ার অনেক যুদ্ধে তিনি জীবনবাজি রাখার নজীর বিহীন উদাহরণ পেশ করলেন এবং উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করলেন। সেই কালে তিনি নিজেকে হক পথে সম্পূর্ণরূপে ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন। সারা রাত নামায পড়তেন এবং দিনে জিহাদের ময়দানে অতিবাহিত করতেন। সিরিয়ার সবচেয়ে রক্তাক্ত যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল ইয়ারমুকের ময়দানে। এই যুদ্ধে হযরত সোহায়েল (রা) ইসলামী বাহিনীর একটি দলের অফিসার ছিলেন। যুদ্ধের প্রথম দিন আরবের সকল গোত্রের সঙ্গে সম্পর্কশীল ৬০ হাজার খৃস্টান যোদ্ধা জাবালা বিন আইহামের নেতৃত্বে মুসলমানদের বিরুদ্ধে দাঁড়ালো। এ সময় ইসলামের সিপাহসালার হযরত আবু ওবায়দাহ (রা) ইবনুল জারাহর অনুমতিক্রমে হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ এমন এক ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন দুনিয়ার যুদ্ধের ইতিহাসে যার কোন উদাহরণ নেই। তিনি মুসলমানদের মধ্য থেকে ৬০ জন বাছাই করা সেরা অশ্বারোহী নির্বাচন করলেন এবং বললেন যে, এর প্রত্যেক অশ্বারোহী এক হাজার মানুষের মুকাবিলা করতে পারে। এটা ছিল আত্মবিশ্বাসের এক বিরল দৃষ্টান্ত। বিশ্ব প্রত্যক্ষ করলো যে, আল্লাহর এই ৬০ সিপাহী ৬০ হাজার কাফেরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমে পড়েছেন। সেই ৬০ সেরা অশ্বারোহীর মধ্যে একজন ছিলেন হযরত সোহায়েল (রা) বিন আমর। এই বাহাদুর মানুষটি রাতের অন্ধকার বিস্তার লাভ পর্যন্ত জাবালার আরব বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করলেন। এই যুদ্ধে শত্রু পক্ষের হাজার হাজার সৈন্য নিহত হলো এবং মুসলমানদের শুধুমাত্র দশ ব্যক্তি শহীদ এবং পাঁচজন বন্দী হলেন।

হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র) "ইসতিয়াব" গ্রন্থে লিখেছেন যে, হযরত সোহায়েল (রা) বিন আমর ইয়ারমুকেরই এক সংঘর্ষে বীরত্ব প্রদর্শন করতে করতে শাহাদাতের পেয়ালা পান করলেন।

এই প্রসঙ্গে তিনি যে ঘটনা বর্ণনা করেছেন তাও এক বিরল ঘটনা। তিনি লিখেছেন, হযরত সোহায়েল (রা) আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়ে মাটির ওপর

পড়ে গেলেন। এই অবস্থায় তার মুখ দিয়ে "পানি" "পানি" আওয়াজ বের হলো। একজন মুসলমান যিনি আহতদেরকে পানি পান করাচ্ছিলেন দৌড়ে তার নিকট পৌছলেন এবং পানির পেয়ালা তাঁর মুখে লাগিয়ে দিলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে নিকটে পড়ে থাকা অন্য আরেকজন আহত ব্যক্তি পানি চাইলেন। সোহায়েল (রা) তাঁর আওয়াজ শুনলেন। তিনি পানি পান না করে পেয়ালা নিজের ঠোঁট থেকে সরিয়ে দিলেন এবং বললেন যে, আগে আমার ভাইকে পান করাও। দ্বিতীয় আহত ব্যক্তির নিকট পানি নেয়া হলো। এ সময় তিনি তৃতীয় এক আহত ব্যক্তির আওয়াজ শুনলেন। তিনি বলছিলেন, "কেউ থাকলে আমাকে পানি পান করিয়ে দাও।" দ্বিতীয় আহত ব্যক্তিত্ব পানির কোন কাতরা পান না করেই বললেন, "প্রথমে আমার ভাইকে পানি পান করাও।" এমনিভাবে একের পর এক সাতজন আহত মানুষ পানি পানি করে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেলেন। কিন্তু নিজের পিপাসার চেয়ে অন্যের কষ্টের কথা চিন্তা করে কেউই পানি পান করলেন না। এমনিভাবে সেই সব ত্যাগ স্বীকারকারী শহীদরা ইসলামী ভ্রাতৃত্ব এবং ঈমানের প্রতি মুহাব্বাতের এমন এক উচু স্তরের উদাহরণ পেশ করলেন যা মুসলমানদের পক্ষে চিরকালের জন্য মশাল হিসেবে কাজ করবে।

কতিপয় রেওয়ায়াতে এই ঘটনার অন্য চরিত্রের মধ্যে হযরত সোহায়েল(রা) বিন আমরের সাথে শুধুমাত্র ইকরামা (রা) বিন আবু জেহেল এবং হারিছ বিন হিশামের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। অন্য এক রেওয়ায়াতে হযরত সোহায়েলের (রা) স্থানে হযরত আয়াশ (রা) বিন আবি রাবিয়ার নাম উল্লেখ রয়েছে। এই ঈমান প্রজ্জলিত ঘটনার চরিত্রে তিনজন থাকুন অথবা সাতজন। তাতে সোহায়েল (রা) বিন আমর থাকুন অথবা আয়াশ (রা) বিন আবি রাবিয়ার নাম উল্লেখ থাকুক। তবে, এই ঘটনার সত্যতা প্রশ্নে কোন দ্বিমত নেই।

আল্লামা ইবনে সায়াদ (র) এবং হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র) বর্ণনা করেছেন, হযরত সোহায়েল (রা) বিন আমর আমওয়াসের প্লেগ মহামারীতে (১৮ হিঃ) ওফাত পান। এই প্রসঙ্গে তাঁরা হযরত আবু সায়াদ বিন ফুজালা (রা) (কতিপয় রেওয়ায়াতে তাঁর নাম সায়াদ বিন ফুজালা উল্লেখ করা হয়েছে) থেকে রেওয়ায়াত করেছেন ঃ "আমি সিরিয়ার যুদ্ধে সোহায়েল (রা) বিন আমরের সঙ্গে ছিলাম। তিনি বলতেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে শুনেছি যে, আল্লাহর রাস্তায় সামান্য সময় অবস্থান করা সমগ্র জীবনের আমল থেকে উত্তম। এজন্য আমি আমৃত্যু অব্যাহতভাবে জিহাদ করতে থাকবো এবং এখন মক্কা ফিরে যাবো না। বস্তুত তিনি নিজের ওয়াদা পূরণ করেন।

আমওয়াসের প্লেগ মহামারীর সময়ও জিহাদের ময়দান থেকে হটে যাননি এবং সেখান থেকেই আখিরাতের প্রতি যাত্রা শুরু করেন।"

হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র) আল ইসতিয়াবে লিখেছেন, হযরত সোহায়েল (রা) তনয় হযরত আবু জানদালও (রা) যখন আমওয়াসের প্লেগে মারা যান সে সময় সোহায়েলের (রা) সন্তান-সন্ততির মধ্যে একটি কন্যা এবং একজন পুতি ছাড়া দুনিয়ায় আর কেউ ছিলেন না। এমনিভাবে তিনি নিজেও এবং প্রায় তাঁর সকল সন্তানই ইসলামের জন্য কুরবান হয়ে গিয়েছিলো।

হযরত সোহায়েল (রা) বিন আমর সেই মহান সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা হুজুরে আকরামের (সা) বর্ণনার অনুরূপ ছিলেন ঃ

"খিয়ারুকুম ফিল জাহিলিয়াতি খিয়ারুকুম ফিল ইসলাম।" অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যারা জাহেলী যুগে উচু মর্যাদার ছিলেন তারা ইসলামী যুগেও উচু মর্যাদায় রয়েছে।

জাহেলী যুগে হযরত সোহায়েল (রা) যেমন নিজের মর্যাদা, জমিদারী, সম্পদ এবং বক্তৃতা শক্তিকে ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছিলেন তেমনি ইসলাম গ্রহণের পর তার থেকেও বেশী উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে নিজেকে হকের খিদমতে ওয়াক্‌ফ করে দিয়েছিলেন। তাঁর ওজস্বী বক্তৃতা কুফুরীর মুকাবিলায় তরবারী হিসেবে নিপতিত হতো এবং তাঁর অগ্নিঝরা বাণী ইসলাম ও হকপন্থীদের জন্য ঢাল হিসেবে বিবেচিত হতো। একদিন এমন ছিল যে, ইসলামের বিরুদ্ধে তাঁর সেই আগুনঝরা বক্তৃতায় অস্থির হয়ে হযরত ওমর ফারুক (রা) বিশ্ব নবীর (সা) নিকট সোহায়েলের (রা) সামনের দাঁত ভেঙ্গে ফেলার অনুমতি চেয়েছিলেন। কিন্তু রহমতে আলম (সা) বলেছিলেন, রাখো একদিন এমনও আসতে পারে যেদিন সে তোমাদেরকে খুশী করে দিতে পারে। অতপর সত্যি এমন একদিন এলো যেদিন হুজুরের (সা) এই ভবিষ্যতবাণী অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছিল। সোহায়েলের (রা) শক্তিশালী বক্তৃতা ও আগুন ঝরা বর্ণনা মক্কায় উত্থিত ধর্মদ্রোহিতার তুফানকে ধোঁয়া বানিয়ে উড়িয়ে দিয়েছিলো এবং সকল মুসলমান খুশী হয়ে গিয়েছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর রোযা, নামায এবং কুরআনের সঙ্গে তাঁর গভীর সম্পর্ক দেখে অন্যরা ঈর্ষা করতেন। তাঁর স্বভাব প্রকৃতি থেকে জাহেলী যুগের গর্ব ও অহংকার সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত এবং তিনি বিনয় ও নিরহংকারের এক ছবি হয়ে গিয়েছিলেন।

মক্কা বিজয়ের পর কুরআনের মশহুর আলেম হযরত মায়াজ (রা) বিন জাবাল আনসারী কিছুদিন মক্কা অবস্থান করলেন। হযরত সোহায়েল (রা) এই সুযোগকে খুব মূল্যবান মনে করলেন এবং তাঁর নিকট থেকে পবিত্র কুরআন

তালিম নিতে লাগলেন। তখনো তাঁর শিক্ষা পূর্ণ হয়নি এমন সময় হযরত মায়াজ (রা) মক্কা থেকে মদীনা চলে গেলেন। হযরত সোহায়েল (রা) তারপর প্রায়ই মক্কা থেকে মদীনা গমন করতেন এবং হযরত মায়াজের (রা) নিকট তালিম নিতেন। একবার হযরত জিরার (রা) বিন আমুর তাকে বললেন ঃ এই খাজরাজীর (হযরত মায়াজ) নিকট থেকে আপনার পবিত্র কুরআন শিখাটা কি খুব আবশ্যক? নিজের খান্দানের কারোর নিকট থেকে কুরআন শিক্ষা লাভে দোষ কি?"

হযরত সোহায়েল (রা) জবাব দিলেন ঃ "জিরার! এই গোঁড়ামীর কারণে আমাদের এই অবস্থা দাঁড়িয়েছে। আর অন্যরা কোথায় থেকে কোথায় পৌঁছে গেছে। ইসলাম জাহেলিয়াতের সকল উঁচু নীচু খতম করে দিয়েছে। আমরাও যদি দাওয়াতের শুরুতে হক কবুল করে নিতাম তাহলে আজ আমাদের মর্যাদা কয়েক মনযিল সামনে হতো। আমিতো নিজের গোষ্ঠীর সদস্য বরং নিজের গোলাম ওমায়ের (রা) বিন আওফের ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামিতার মর্যাদাতেও আনন্দ অনুভব করি এবং মনে করি যে, তাদের দোয়ার বদৌলতেই আমার ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ ঘটেছে। নচেৎ অন্য মুশরিকের মত আমিও মুসলমানদের সঙ্গে লড়াই করে কোন যুদ্ধে মারা যেতাম। জিরার! আমি যখন হুদায়বিয়ায় আমার কর্মপদ্ধতির কথা স্মরণ করি তখন আমি রাসূলের (সা) সঙ্গে কৃতকর্মের জন্য লজ্জা অনুভব করি। আল্লাহর কসম! যাঁরা ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামিতার গৌরব লাভ করেছেন তাঁরা আমাদের চেয়ে অনেকগুণ শ্রেষ্ঠ। এ জন্য আমি অবশ্যই মায়াজের (রা) নিকট থেকে কুরআনের শিক্ষা গ্রহণ করবো।" তাঁর ঈমান আলোকিত জবাব শুনে হযরত জিরার (রা) নীরব ও নিথর হয়ে গেলেন এবং তারপর তিনি আর কখনো কারোর সঙ্গে এ ধরনের কথা বলেননি।

মুসতাদরাকে হাকিমে হযরত হাসান (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত ওমরের (রা) খিলাফতকালে একবার কুরাইশের বড় বড় নেতা এবং লোকেরা আমিরুল মু'মিনীনের সঙ্গে সাক্ষাত করতে এলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন আবু সুফিয়ান (রা) বিন হারব, ইকরামা (রা) বিন আবু জেহেল, হারিছ (রা) বিন হিশাম এবং সোহায়েল (রা) বিন আমর। ইত্যবসরে অন্য আরও কতিপয় লোকও আমিরুল মু'মিনীনের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য এসে পড়লেন। তাঁদের মধ্যে হযরত বিলাল (রা) হাবশী, সালমান ফারসী (রা), আম্মার বিন ইয়াসির (রা) এবং সোহায়েব রুমীর (রা) মত সাহাবীও (যাঁরা একসময় গোলাম ছিলেন) অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হযরত ওমর (রা) এসব সাহাবীর আগমনের খবর

পেলেন। তখন তিনি সর্বপ্রথম পরে উল্লেখিত সাহাবীদেরকে ভেতরে ডেকে পাঠালেন। কেননা তাঁরা সাবিকুনাল আউয়ালুন এবং বদরের যোদ্ধা ছিলেন। হযরত ওমর (রা) তাঁদেরকে সীমাহীন শ্রদ্ধা ও সম্মান করতেন। হযরত আবু সুফিয়ানের (রা) নিকট ব্যাপারটি অসহনীয় মনে হলো এবং বলে উঠলেন, "আমি আজকের মত জিল্লতী কখনো দেখিনি। আমরা অপেক্ষা করছি। অথচ গোলামদেরকে ভেতরে ডেকে নেয়া হচ্ছে।" হযরত সোহায়েল (রা) সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রতিবাদ করলেন এবং বললেন ঃ

"তাঁদেরকে গালি দিও না। নিজেকে গালি দাও। তাঁদেরকেও দাওয়াত দেয়া হয়েছিল এবং তোমাদেরকেও। বস্তুত দাওয়াতের প্রতি তারা দ্রুত অগ্রসর হয়েছিলেন এবং তোমরা পেছনে রয়ে গিয়েছিলে।"

অতপর বললেন ঃ "ঈমান আনয়নে তারা তোমাদের থেকে অগ্রগামী হয়েছিলেন। এখন আর এমন কোন বস্তু নেই যা তোমাদেরকে তাদের ওপর অগ্রগণ্য করবে। সুতরাং তোমরা জিহাদের প্রতি মনোযোগ দাও এবং তা নিজেদের ওপর বাধ্যতামূলক করে নাও। সম্ভবত আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে শাহাদাতের নিয়ামত প্রদান করে ক্ষতিপূরণ করিয়ে দিতে পারেন।"

তারপর এসব ব্যক্তি হযরত সোহায়েল (রা) সমেত সিরিয়া (জিহাদের জন্য) চলে গেলেন। ওয়াকেদীর (র) বর্ণনা অনুযায়ী হযরত সোহায়েল (রা) হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) খিলাফতকালেই সিরিয়ার ওপর হামলাকারী সেনাবাহিনীতে শামিল হয়ে গিয়েছিলেন। সম্ভবত তিনি কিছু দিনের জন্য যুদ্ধের ময়দান থেকে ফিরে এসেছিলেন এবং ইয়ারমুকের যুদ্ধের পূর্বে হযরত ওমরের (রা) খিদমতে উপস্থিত হয়ে থাকবেন। ওয়াকেদী এবং হাকিমের বর্ণনার মধ্যে এমনিভাবেই সামঞ্জস্য বিধান করা যেতে পারে।

ইসলাম গ্রহণের পর হযরত সোহায়েল (রা) অধিকাংশ সময় রাসূলের (সা) দরবারে হাজির থাকতেন। তা সত্ত্বেও দেরীতে ঈমান আনার কারণে নবীর (সা) ফয়েজ লাভের সুযোগ খুব কমই হয়েছিল। এ জন্য হাদিস বর্ণনায় তিনি খুব সতর্ক থাকতেন। তবুও তিনি রাসূলের (সা) নিকট যা কিছু শুনতেন তা জীবনের জপমালা বানিয়ে নিতেন এবং উপযুক্ত সময়ে হুজুরের (সা) ইরশাদসমূহ অন্যদের নিকট পৌঁছে দিতেন। জিহাদ ও শাহাদাতের ফজিলত সম্পর্কে তিনি যা কিছু শুনিয়েছেন তার উল্লেখ ওপরে করা হয়েছে। মুসনাদে আবু দাউদে তাঁর থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন ঃ "রাসূলুল্লাহ (সা) এমন এক উটের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেন, যার পিঠ পেটের সাথে লেগেছিল। তিনি বলেন যে, হে লোকেরা! এসব বাকহীন পশুদের

ব্যাপারে আল্লাহ্ তায়ালাকে ভয় করো। যদি সওয়ার হতে চাও তাহলে পশুদেরকে ভালভাবে রাখো।"

ইসলাম গ্রহণের পর হযরত সোহায়েলের (রা) জীবনের যেদিকেই দৃষ্টিপাত করা যাক না কেন তা চন্দ্র ও সূর্যের মত আলোকিত মনে হবে। এ জন্যই হাফেজ ইবনে হাজার (র) তার সম্পর্কে লিখেছেন যে, ইসলাম গ্রহণের দিন হযরত সোহায়েলের (রা) চাল চলন একজন প্রশংসাযোগ্য মুসলমানের চাল চলনের অনুরূপ ছিল।

হযরত ছাবিত (রা) বিন

কায়েস আনসারী

রাসূলের যুগের শেষ দিকের কথা। একদিন রহমতে আলম (সা) সাহাবীদের (রা) মধ্যে বসেছিলেন। কোন একটি সমস্যার ব্যাপারে আলোচনা চলছিল। আলোচনাকালে হঠাৎ করে কিছু সাহাবীর (রা) কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে উঁচু হয়ে গেল। রাসূলের (সা) দরবারে সাহাবীদের (রা) এ ধরনের উঁচু কণ্ঠস্বর আল্লাহ তায়ালা পসন্দ করলেন না এবং তৎক্ষণাৎ এই আয়াত নাযিল হলো ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْٓا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ -

"হে মানুষেরা! যারা ঈমান এনেছো; নিজের কণ্ঠস্বরকে নবীর (সা) কণ্ঠস্বর থেকে উঁচু করো না এবং নবীর (সা) সাথে উঁচু গলায় কথা বলবে না যেভাবে তোমরা পরস্পর একে অপরের সাথে করে থাকো। এমন যেন না হয় যে, তোমাদের আমলসমূহ ধ্বংস হয়ে যাবে এবং তোমরা সে সম্পর্কে খবরই রাখো না।" (সূরা আল হুজুরাত ঃ ২)

এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর সাহাবায়ে কিরাম (রা) আল্লাহর ভয়ে কেঁপে উঠলেন এবং তাঁরা প্রতিজ্ঞা করলেন যে, হুজুরের (সা) সামনে নিজেদের কণ্ঠস্বরকে সবসময় নীচু রাখবেন। হাজেরিনে মজলিশে এমন একজন সাহাবী ছিলেন যাঁর কণ্ঠস্বর ছিলো খুব ঝাঁঝালো। তিনি ওপরে বর্ণিত আয়াতে এতো প্রভাবান্বিত হলেন যে বাড়ী ফিরে নির্জনত্বে বসে গেলেন এবং সবসময় তওবা এবং ইসতিগফারে ব্যাপৃত হয়ে পড়লেন। অব্যাহতভাবে কয়েকদিন যখন রাসূলে আকরাম (সা) তাঁকে মজলিসে দেখতে পেলেন না তখন সাহাবীদের(রা) নিকট জিজ্ঞেস করলেন যে, সে অসুস্থ তো হয়ে পড়েনি? আওস সরদার হযরত সায়াদ (রা) বিন মায়াজ আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আমি তাঁর খবর আনছি।"

সুতরাং তিনি সেই সাহাবীর (রা) বাড়ী গেলেন। সেখানে গিয়ে দেখতে পেলেন যে, তিনি বিমর্ষ ও মলিনতার এক ছবির মত বসে আছেন। হযরত সায়াদ (রা) বললেন ঃ "আপনি বেশ কিছু দিন হলো নবীর মজলিশে গমন করেননি। হুজুর (সা) আজ আমাকে আপনার অবস্থা জানার জন্য প্রেরণ করেছেন।"

তিনি বললেন, "ভাল আর কি করে থাকি। আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূলের (সা) সামনে উঁচু কণ্ঠে কথা বলা নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং সে সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শনের আয়াত নাযিল হয়েছে। আপনি জ্ঞাত আছেন যে, নবীর মজলিশে আপনাদের সবার মধ্যে আমার কণ্ঠস্বরই উঁচু হয়ে পড়ে। বর্তমানে দুশ্চিন্তায় আমার কোমর ভেঙ্গে গেছে। আমি ভাবছি যে আমার সকল আমলই বরবাদ হয়ে গেছে এবং আমি জাহান্নামী হয়ে পড়েছি।"

হযরত সায়াদ (রা) হুজুরের (সা) খিদমতে ফিরে গিয়ে সকল কথা বললেন। এ সময় তিনি বললেন ঃ "সেতো জাহান্নামী নয় বরং জান্নাতী।"

রাসূলের (সা) এই সাহাবী যাঁকে মহানবী (সা) স্পষ্টভাষায় জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ দিয়েছিলেন তিনি ছিলেন হযরত ছাবিত (রা) বিন কায়েস আনসারী।

সাইয়্যেদেনা আবু মুহাম্মাদ ছাবিত (রা) বিন কায়েস আনসারী মদীনার খাজরাজ খান্দানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। তাঁর নসবনামা হলো ঃ

ছাবিত (রা) বিন কায়েস বিন সামাছ বিন যোহায়ের বিন মালিক বিন ইমরুল কায়েস বিন মালিক আয়াজ বিন ছা'লাবা বিন কায়াব বিন খাজরাজ বিন হারিছ বিন খাজরাজ আকবার।

আল্লামা ইবনে আছিরের (র) বর্ণনা অনুযায়ী তাঁর মাতা তায় কবিলাভুক্ত ছিলেন।

হিজরতের পূর্বে দ্বিতীয় বাইয়াতে উকবা অথবা উকবায়ে কাবিরার পর কোন এক সময় ইসলাম গ্রহণ করেন। প্রকৃতিগতভাবেই তাঁর মধ্যে বক্তৃতা করার গুণ বিদ্যমান ছিল এবং বাকপটুত্ব ও অসাধারণ বক্তা হিসেবে মদীনাবাসীর মধ্যে তিনি এক বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল দরাজ। এ জন্য আনসাররা তাঁকে নিজেদের খতিব বানিয়েছিলেন। বিশ্ব নবী (সা) তাঁর যোগ্যতা ও গুণাবলী সম্পর্কে অবহিত হয়ে তিনিও তাঁকে নিজের খতিব নিয়োগ করলেন। সুতরাং তিনি রাসূলের (সা) খতিব উপাধিতে মশহুর হয়ে গেলেন।

হাফেজ ইবনে হাজার (র) "আল ইসাবা" গ্রন্থে লিখেছেন, হিজরতের পর রাসূলে আকরাম (সা) মদীনায় শুভ পদার্পণ করলেন। এ সময় মদীনার আনসারবৃন্দ এমন উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে রাসূলকে (সা) ইসতিকবাল বা অভ্যর্থনা জানালেন যে বিশ্ববাসী তা কখনো প্রত্যক্ষ করেনি। অভ্যর্থনাকারীদের মধ্য হযরত ছাবিত (রা) বিন কায়েসও ছিলেন। প্রিয় নবীর (সা) খিদমতে পৌঁছে তিনি আরজ করলেন ঃ

"হে আল্লাহর নবী! আমরা আপনাকে এমনভাবে হেফাজত করবো যেমন নিজের জীবন ও সন্তানকে হেফাজত করে থাকি। তবে আমরা তার বিনিময়ে কি পাবো?

তিনি বললেন ঃ "জান্নাত।"

একথায় সকলেই বলে উঠলেন, "আমরা সবাই রাজি আছি।"

বদরের যুদ্ধে হযরত ছাবিতের (রা) অংশ গ্রহণ প্রশ্নে মতবিরোধ রয়েছে। হাফেজ ইবনে হাজার (র) তাঁকে বদরের সাহাবীদের মধ্যে পরিগণিত করে থাকেন। কিন্তু অধিকাংশ চরিত গ্রন্থে তাঁকে বদরের সাহাবী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। হযরত ছাবিত (রা) খুব মুখলিস সাহাবী ছিলেন। এ জন্যে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করার ব্যাপারে বিশেষ কারণ থাকতে পারে। হয়ত তিনি অসুস্থ ছিলেন অথবা তিনি সে সময় মদীনাতে উপস্থিতই ছিলেন না।

অতপর তিনি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নবীর (সা) সকল যুদ্ধেই বীরত্বের সাথে অংশ গ্রহণ করেন এবং প্রতিটি যুদ্ধে খুবই দৃঢ়তার পরিচয় দেন।

মুররে ইয়াসি'র (পঞ্চম হিজরী) যুদ্ধে বনু মুসতালিকের সরদার হারিছ বিন আবি জিরারের কন্যা জুয়াইরিয়াকে হযরত ছাবিত (রা) বিন কায়েস গ্রেফতার করেন। বাঁদী হিসেবে থাকাটা তাঁর সহ্য হলো না। এ জন্য হযরত ছাবিতের(রা) নিকট পরস্পর চিঠি লিখার দরখাস্ত করলেন। তিনি ১৯ আওকিয়া সোনার বিনিময়ে পত্র লিখক হওয়ার প্রস্তাব মঞ্জুর করলেন। জুয়াইরিয়া (রা) হুজুরের (সা) খিদমতে হাজির হয়ে আরজ করলেন যে, "আমি সরদারে কওম হারিছ বিন আবি জিরারের কন্যা। আল্লাহ আমাকে ইসলাম কবুল করার তাওফিক দিয়েছেন। এ সময় মুসিবতে পড়েছি এবং নিজেকে আজাদ করাতে চাই। আপনি আমাকে সাহায্য করুন।"

হুজুর (সা) বললেন ঃ "এটা কি ঠিক নয় যে, তোমার সঙ্গে আরো ভাল আচরণ করা হবে?" জিজ্ঞেস করলেন, "তা আবার কি?" ইরশাদ হলো ঃ

"তোমার চিঠি লিখার বিনিময় আমি আদায় করবো এবং তোমাকে স্বয়ং আমি বিয়ে করবো।"

এই প্রস্তাব তিনি আনন্দ চিত্তে মঞ্জুর করে নিলেন। আর এমনিভাবে হযরত জুয়াইরিয়া (রা) উম্মুল মু'মিনীন হওয়ার মহান মর্যাদা লাভ করলেন।

প্রতিনিধিদলসমূহের বছর নবম হিজরীতে বনু তামিমের প্রতিনিধিদল খুব ঠাটবাটের সঙ্গে মদীনা এলো। সত্তর অথবা আশি ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত ছিল এই দল এবং তাতে কবিলার বড় বড় সরদার, অনলবর্ষী বক্তা এবং উচু মর্যাদার কবি শামিল ছিলেন। জাহেলী যুগে আরবদের মধ্যে পারস্পরিক গৌরবও মুকাবিলার আবেগ ছিল প্রচণ্ড এবং তারা প্রত্যেক ধরনের গুণের প্রশ্নে পরস্পর মুকাবিলা করতেন। বনু তামিমের মস্তিষ্কেও খান্দানী ফখর এবং গৌরবের নেশা পূর্ণ ছিল। তাঁরা নবীর (সা) আবাসস্থলে গিয়ে বেতমিজের মত উচ্চৈস্বরে চেঁচাতে লাগলো। "মুহাম্মাদ (সা) বাইরে এসো। আমাদের কথা শোনো।" তাদের এই আচরণ রাসূলের (সা) নিকট অসহ্য মনে হলেও তিনি ছিলেন ক্ষমার আধার। তিনি বাইরে এসে হাসি খুশীর সঙ্গে তাদের সাথে সাক্ষাত করলেন। প্রতিনিধি দলের নেতা আকরা' (রা) বিন হাবিস বললেন ঃ "আমরা আপনার সাথে পরস্পর গৌরব বা গর্বের কথা ব্যক্ত করতে চাই। তারপর হবে ইসলামের কথা।" প্রিয়নবী (সা) বললেন, আমি আত্মগৌরব প্রচার এবং কবিতা ও কাব্য ফলানোর জন্য প্রেরিত হইনি। কিন্তু তোমরা যদি তাই চাও তাহলে আল্লাহর ফজিলতে আমরা সে ব্যাপারেও পিছিয়ে নেই।" বনু তামিমে আতারদ বিন হাজিব নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। তার ভাষা ছিল সুন্দর এবং তিনি বাকপটুও ছিলেন। একবার সে মওশিরওয়ার দরবারে শক্তিশালী বক্তৃতা দিয়ে কিংখাবের খিলায়াত লাভ করেন। সর্বপ্রথম সেই দাঁড়ালো এবং এই বক্তৃতার মাধ্যমে আত্মগৌরব প্রচার শুরু করলো ঃ

"প্রশংসা সেই খোদার যিনি নিজের ফজল ও করমের মাধ্যমে আমাদেরকে সিংহাসনের মালিক বানিয়েছেন। প্রাচ্যবাসীর মধ্যে আমাদেরকে সবচেয়ে বেশী সম্মানিত করেছেন। আমাদের ধনাগার সোনা রূপায় পূর্ণ। এই ধনাগার থেকে আমরা দরাজ হাতে ব্যয় করে থাকি। মানুষের মধ্যে আমরা অতুলনীয়। আমরা কি মানুষের সরদার এবং তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নই। অন্য কেউ যদি এই দাবী করে তাহলে সামনে আসুক এবং আমাদের কথা থেকে ভাল কথা এবং আমাদের অবস্থা থেকে ভাল অবস্থা পেশ করুক। আমার যা বলার ছিল তা বলে দিয়েছি।"

আতারদ বক্তৃতা শেষ করে বসে পড়লো। তখন প্রিয় নবী (সা) হযরত ছাবিতকে (রা) বললেন ঃ "ছাবিত ওঠো এবং তার জবাব দাও।"

হযরত ছাবিত (রা) রাসূলের (সা) নির্দেশ পালন করলেন এবং আতারদের জবাবে এই খুতবা দিলেন ঃ

"প্রশংসা সেই খোদার যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, তার ওপর নিজের হুকুম জারী করেছেন। নিজের কুরসী ও নিজের ইলমকে ব্যাপকতা দিয়েছেন। তিনি হলেন কাদেরে মতলক। যা কিছু ঘটে তা তারই নির্দেশ ও কুদরতে হয়ে থাকে। তার কুদরতসমূহের মধ্যে একটি হলো এই যে, নিজের মাখলুক বা সৃষ্টির মধ্য থেকে একজন পয়গাম্বর প্রেরণ করেছেন। এই পয়গাম্বর সবচেয়ে বেশী শরীফ, সবচেয়ে বেশী সত্যবাদী এবং সবচেয়ে বেশী বুলন্দ আখলাকের মানুষ। অতপর সেই পয়গাম্বরের ওপর একখানি কিতাব নাযিল করেছেন এবং নিজের সৃষ্টিকে তার আমানতদার বানিয়েছেন এবং তাঁকে আল্লাহ তায়ালা সমগ্র বিশ্ব থেকে বাছাই করেছেন এবং সমগ্র বিশ্বের সার সংক্ষেপ বানিয়েছেন। অতপর তিনি লোকদেরকে হকের দিকে আহ্বান করেছেন। তখন তার কওম ও আত্মীয় স্বজনের মধ্য থেকে প্রথম মুহাজিররা তাঁর দাওয়াত কবুল করে। যারা নসবের দিক দিয়ে আফজাল। তাদের চেহারা সবচেয়ে বেশী আলোকিত এবং তাদের আমলসমূহ সবচেয়ে ভাল। অতপর তাদের পর সমগ্র আরবে আমরা আনসারের দল হক দাওয়াতের প্রতি ইতিবাচক সাড়া দিয়েছি। অতএব, আমাদের গৌরব শুধু এই যে, আমরা হলাম আল্লাহর আনসার ও রাসূলের উজির। এবং মানুষেরা যতক্ষণ পর্যন্ত ঈমান না আনবে ও লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ না বলবে ততক্ষণ আমরা তাদের সঙ্গে লড়াই করবো এবং যে-ই আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলকে (সা) মানতে অস্বীকার করবে আমরা তার বিরুদ্ধে আল্লাহর পথে জিহাদ করবো এবং জিহাদ করা আমাদের জন্য কোন কঠিন কাজ নয়। ব্যস, আমার যা বলার ছিল তা বলেছি এবং আমি এখন সকল মু'মিন ও মু'মিনাতের জন্য আল্লাহর দরবারে মাগফিরাত কামনা করছি।"

তারপর কবিতা ও কাব্যের প্রতিযোগিতা হলো। এই প্রতিযোগিতায় বনু তামিমের পক্ষে যবরকান বিন বদর এবং প্রিয়নবীর (সা) পক্ষে হযরত হাসসান (রা) বিন ছাবিত অংশ নিয়েছিলেন। কাব্য প্রতিযোগিতা শেষ হলে আকরা (রা) বিন হাবিস যিনি স্বয়ং একজন বিরাট কবি ও শক্তিশালী বক্তা ছিলেন এবং যার সঠিক মতের প্রতি সমগ্র আরব শ্রদ্ধা পোষণ করতো এমনকি

পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত লোকসমূহ নিজেদের বিবাদে তাঁকে সালিশ মানতো—তিনি বলে উঠলেন ঃ

"পিতার কসম! মুহাম্মাদের (সা) খতিব আমাদের খতিব থেকে আফজাল এবং তাঁর কবি আমাদের কবির চেয়ে উত্তম।"

প্রতিনিধি দলের অন্য সদস্যবৃন্দ তাঁর সাথে ঐকমত্য পোষণ করলেন এবং সকলেই তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ করলেন।

সে বছরই বনু হানিফার একটি বড় প্রতিনিধি দল মুসায়লামা কাজ্জাবের নেতৃত্বে মদীনা এলো। প্রিয় নবী (সা) হযরত ছাবিত (রা) বিন কায়েসকে সঙ্গে নিয়ে সরাসরি প্রতিনিধি দলের নিকট তাশরিফ নিলেন। আলাপকালে মুসায়লামা বললো, "আপনি যদি আপনার পর আমাকে স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করেন, তাহলে এখনই আপনার হাতে বাইয়াত করি।"

এই অযৌক্তিক শর্তের কথা শুনে হুজুর (সা) ক্রোধান্বিত হলেন। তাঁর পবিত্র হাতে একটি লাঠি ছিল। তা উঠিয়ে বললেন ঃ

"স্থলাভিষিক্ত তো অনেক বড় বস্তু। আমি তো তোমাকে এই লাঠি প্রদানও পসন্দ করি না। আল্লাহ তোমার জন্য যা ঠিক করে রেখেছেন তাই হবে। তোমার পরিণতি আমাকে স্বপ্নে দেখানো হয়েছে। অন্য কিছু জিজ্ঞেস করার থাকলে এই ছাবিত এখানে উপস্থিত রয়েছে। তাকে জিজ্ঞেস কর। আমি এখন চলে যাচ্ছি।"

একথা বলে তিনি হযরত ছাবিতকে (রা) মুসায়লামার সঙ্গে আলোচনার জন্য সেখানে রেখে স্বয়ং চলে গেলেন।

বিশ্ব নবীর (সা) ওফাতের পর আনসাররা সকিফায়ে বনি সায়েদাতে একত্রিত হয়ে হযরত সায়াদ (রা) বিন উবাদাকে খলিফা বানানোর ইচ্ছা প্রকাশ করলো। একথা প্রকাশ হয়ে পড়লে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) এবং ওমর ফারুক (রা) অন্য কতিপয় মুহাজিরকে সাথে নিয়ে আনসারদের সমাবেশে উপস্থিত হলেন। উভয় পক্ষ থেকে স্ব স্ব দিকে শক্তিশালী বক্তৃতা দেয়া হলো। এ সময় হযরত ছাবিত (রা) বিন কায়েসও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি আনসারদের খিলাফতের পক্ষে এক তেজস্বী ভাষণ দিলেন। তাতে আনসারদের খিদমত ও কুরবানীসমূহের উল্লেখ করলেন এবং বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন যে, কতিপয় ব্যক্তি আনসারদেরকে খিলাফত থেকে বঞ্চিত করতে চায়। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) আনসারদের খিদমতের স্বীকৃতি দিলেন। সেই সাথে তিনি শক্তিশালী যুক্তির সাথে কুরাইশদেরকে

খিলাফতের হকদার প্রমাণ করলেন। যখন সাধারণ মুসলমানরা তাঁকে খলিফা নির্বাচন করলো তখন হযরত ছাবিত (রা) বিন কায়েসও তাঁর হাতে বাইয়াত করা থেকে পিছিয়ে রইলেন না এবং মনে প্রাণে সিদ্দীকে আকবরের (রা) সমর্থক ও সহযোগিদের দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলেন। সেই যুগেই ধর্মদ্রোহিতার ফিতনা মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। হযরত ছাবিত (রা) তা নির্মূল করার জন্য জীবন বাজী রাখলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) যখন মশহুর মুরতাদ তোলায়হা আসাদীকে উৎখাতের জন্য মদীনা থেকে সৈন্য বাহিনী প্রেরণ করলেন তখন হযরত ছাবিত (রা) তাতে শামিল হয়ে গেলেন। এই সৈন্যবাহিনীর সেনাপতি ছিলেন হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ এবং আনসার সৈন্যদের নেতৃত্ব ছিল হযরত ছাবিতের (রা) হাতে। মুসলমানরা মুরতাদদেরকে ভয়ানকভাবে পরাজিত করলো এবং তোলায়হা নিজের কতিপয় সঙ্গী সমভিব্যাহারে সিরিয়ার দিকে পালিয়ে গেল [আল্লাহর কুদরত এই তোলায়হাই পরে ইসলামের এক বিরাট মুজাহিদ হয়েছিলেন। হযরত ওমর ফারুকের (রা) খিলাফতকালে তিনি দ্বিতীয়বার নিষ্ঠাপূর্ণ অন্তরে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং হজ্জের জন্য মদীনা আগমন করেন। সেখানেই হযরত ওমরের (রা) হাতে বাইয়াত করেন। সে সময় আমীরুল মু'মিনীন ধর্মদ্রোহিতায় যোগদানের জন্য তাঁকে গালি দেন। তিনি আরজ করেন, "আমিরুল মু'মিনীন। এটাও কুফ্‌রী ফিতনাসমূহের অন্যতম ফিতনা ছিল। ইসলাম এ ফিতনাকে চিরদিনের জন্য খতম করে দিয়েছে।" তোলায়হা অন্যতম আরব বাহাদুর হিসেবে পরিগণিত হতেন এবং তাকে এক হাজার সওয়ারের সমান মনে করা হতো। সিরিয়ার যুদ্ধে তিনি জীবন উৎসর্গের এবং জীবন বাজী রাখার বিস্ময়কর কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন।]

দ্বাদশ হিজরীতে মুসায়লামা কাজ্জাবের বিরুদ্ধে ইয়ামামার রক্তাক্ত যুদ্ধ সংঘটিত হয়। হযরত ছাবিত (রা) এই যুদ্ধেও অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে অংশগ্রহণ করেন। একবার যখন মুসলমানদের ব্যূহে ফাটল ধরলো এবং তারা পিছু হটে গেল তখন হযরত ছাবিত (রা) অস্থির হয়ে পড়লেন এবং অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বললেন যে, আমরা রাসূলের যুগে এভাবে লড়াই করতাম না। অতপর তিনি হনুতের আতর লাগালেন এবং একটি গর্তে পা ঢুকিয়ে দুশমনের মুকাবিলায় মজবুতভাবে দাঁড়িয়ে গেলেন। যে মুরতাদ তাঁর দিকে আসতো তাকে তিনি তরবারী দিয়ে লাশ বানিয়ে ছাড়তেন। অবশেষে দুশমনরা সম্মিলিতভাবে রাসূলের (সা) খতিবের ওপর তরবারী ও বর্শার মেঘ বর্ষণ করলো। আর এমনিভাবে তিনি শাহাদাতের মর্যাদায় অভিষিক্ত হলেন।

হযরত আনাস (রা) বিন মালিক থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত ছাবিতের (রা) দেহের ওপর অত্যন্ত সুন্দর যিরাহ ছিল তাঁর শাহাদাতের পর জনৈক মুসলমান তা খুলে নিয়েছিল। অন্য আরেকজন মুসলমান স্বপ্নে দেখলেন যে, হযরত ছাবিত (রা) তাঁকে বলছেন ঃ অমুক মুসলমান ভাই আমার যিরাহ খুলে নিয়েছেন। আপনি খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদকে বলবেন তিনি যেন যিরাহটি তার নিকট থেকে ফেরত নেন। আমি এতো ঋণী। রাসূলের (সা) খলিফা এই যিরাহ বিক্রয় করে যেন আমার ঋণ আদায় এবং আমার অমুক গোলাম যেন আজাদ করে দেন। বস্তুত হযরত খালিদ (রা) এই যিরাহ ফিরিয়ে নিলেন এবং মদীনা পৌছে সমগ্র ঘটনা হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) নিকট বর্ণনা করলেন। তিনি হযরত ছাবিতের (রা) ওসিয়ত অনুযায়ী তাঁর ঋণ আদায় এবং গোলামও স্বাধীন করে দিলেন।

হযরত ছাবিত (রা) শাহাদাতকালে চার পুত্র ও এক কন্যা রেখে যান। তাঁর থেকে কতিপয় হাদিসও বর্ণিত আছে। এসব হাদিস তাঁর পুত্র মুহাম্মাদ এবং কন্যা ছাড়া হযরত আনাস (রা) বিন মালিক ও আবদুর রহমান বিন আবি লায়লা (রা) বর্ণনা করেছেন।

হযরত ছাবিত (রা) বিন কায়েস জালিলুল কদর সাহাবী হিসেবে পরিগণিত হয়ে থাকেন। তাঁর চারিত্রিক গুণাবলীর মধ্যে ছিল রাসূলের (সা) প্রতি সম্মান প্রদর্শন, আল্লাহভীতি ও জিহাদে উৎসাহ। তাঁর রাসূলের (সা) প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং খোদাভীতির একটি ঘটনা ওপরে বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লামা হাকিম (র) ও ইমাম জাহাবী (র) তাঁর পুত্র মুহাম্মাদ বিন ছাবিত (রা) থেকে এবং আল্লামা তিবরানী (র) তাঁর কন্যার নিকট থেকে এ ধরনের আরো একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন যে, সূরায়ে লুকমানের এই আয়াত যখন নাযিল হলো ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ - وَاقْصِدْ فِىْ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ اِنَّ اَنْكَرَ الاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ -

"অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা কোন অহংকারীকে পসন্দ করেন না।" তখন হযরত ছাবিত (রা) আল্লাহর ভয়ে কেঁপে উঠলেন এবং ঘরে বসেই ক্রন্দন শুরু করে দিলেন। প্রিয় নবী (সা) একজন মানুষ পাঠিয়ে তাঁকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন ঃ "কি ব্যাপার?" তিনি আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আমি সৌন্দর্য এবং নিজের প্রশংসা পসন্দ করে থাকি।

আমার ভয় হলো যে, এই আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে আমি ধ্বংস না হয়ে যাই।"

তিনি বললেন, "হে ছাবিত! তুমি কি একথায় রাজী নও যে, তুমি এমন সুন্দরভাবে জীবন অতিবাহিত করবে যে, তোমাকে প্রশংসা করা হবে এবং শাহাদাতের মৃত্যু লাভ করে জান্নাতে প্রবেশ করবে?"

আরজ করলেন : "হে আল্লাহর রাসূল! একথাতো আমি খুবই পসন্দ করি।"

হুজুর (সা) হযরত ছাবিতকে (রা) খুবই ভালবাসতেন এবং তিনি তাঁকে খুবই স্নেহ করতেন। আবি ওয়ায়েদ (র) কিতাবুল আমওয়ালে লিখেছেন যে, বনি কুরায়জার যুদ্ধে, যেসব ইহুদী গ্রেফতার হয়েছিল তাদের মধ্যে হুজুর (সা) দু'জনের মৃত্যুদণ্ড মওকুফ করেছিলেন। এই দু'জনের একজন ছিল যিবির বিন বাতা। হুজুর (সা) তাকে অনুমান হযরত ছাবিত (রা) বিন কায়েসের খাতিরে ছেড়ে দিয়েছিলেন। কেননা, জাহেলী যুগে সে বুয়াছের যুদ্ধে হযরত ছাবিতকে(রা) আশ্রয় দিয়েছিল। তিনি যিবিরের ইহসানের বদলা আদায়ের জন্য তাকে হযরত ছাবিতের (রা) নিকট সোপর্দ করে দিয়েছিলেন।

হযরত ইবনে হাজার (র) তাহজিবুত তাহজিবে বর্ণনা করেছেন যে, একবার হযরত ছাবিত (রা) অসুস্থ এবং চলাফেরায় অক্ষম হয়ে পড়লেন। প্রিয় নবী (সা) এই খবর পেয়ে তাঁর শুশ্রূষার জন্য তাশরীফ নিলেন এবং তাঁর আরোগ্য কামনা করে দোয়া করলেন।

হযরত উমায়ের (রা) বিন সায়াদ

জালাস বিন সুয়ায়েদ মদীনার শরীফদের মধ্যে পরিগণিত হতেন। তিনি যখন সায়াদ বিন উবায়েদ আওসীর বিধবা পত্নীকে নিকাহ করলেন তখন তিনি মরহুম স্বামীর এক ছোট বাচ্চাও নিজের সঙ্গে আনলেন। এই শিশুর নামই ছিল উমায়ের। লোকজন তাকে জালাস কারবিব বলে ডাকতো। কিন্তু তিনি এত ভালবাসা ও স্নেহের সঙ্গে তাকে লালন পালন করেন যে আপন পিতাও এ ধরনের করতে পারতো না। এই নিষ্পাপ শিশুরও জালাসের প্রতি এমন মমতা ও ভালবাসা হয়ে গিয়েছিল যে, সবসময় আঙ্গুল ধরে তাঁর সঙ্গে চলাফেরা করতো। লোকজন ভুলেই গিয়েছিল যে উমায়ের হলো জালাস কারবিবের পালিত পুত্র। তারা তাকে তার প্রকৃত পুত্রই মনে করতো। উমায়েরের শৈশবকালেই বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (সা) মক্কা থেকে হিজরাত করে মদীনা মুনাওয়ারাতে শুভাগমন করেন। মদীনাবাসীর একটি বিরাট সংখ্যক মানুষ নবীর (সা) হিজরতের পূর্বেই ইসলামের নিয়ামতে অবগাহিত হয়েছিলেন। তারপর অবশিষ্টরাও আস্তে আস্তে ইসলাম গ্রহণ করতে লাগলেন। জালাসও একদিন শিশু উমায়েরের সাথে রহমতে আলমের (সা) খিদমতে হাজির হলেন এবং ইসলামের নিয়ামতে পরিপূর্ণ হয়ে গেলেন। চরিতকাররা জালাস (রা) ও উমায়েরের (রা) ইসলাম গ্রহণের কাল নির্দিষ্ট করেননি। কিন্তু এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে, ইসলাম গ্রহণের সময় উমায়ের শিশু ছিল। তিনি আওসের আমর বিন আওফ খান্দানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন এবং পিতা সায়াদ বিন ওবায়েদ (বিন নুমান বিন কায়েস বিন আমর বিন আওফ) তাঁর শৈশবকালেই মারা যান। ইসলাম গ্রহণের সময় যদিও উমায়ের প্রাপ্ত বয়স্ক হননি তবুও আল্লাহ পাক তাঁকে অত্যন্ত সুন্দর স্বভাব দান করেছিলেন। প্রিয় নবীর (সা) দর্শন লাভের পর তাঁর অন্তরে হুজুরের (সা) প্রতি এতো ভালবাসা ও আকর্ষণ সৃষ্টি হয়েছিল যে, প্রতিদিন তাঁকে না দেখলে থাকতে পারতেন না। হুজুরও (সা) তাঁকে খুব স্নেহ করতেন। দিন অতিবাহিত হতে লাগলো আর রাসূলের (সা) প্রতি উমায়েরের (রা) বিশ্বাস, মুহাব্বাত ও আনুগত্য বৃদ্ধিই পেতে লাগলো।

এমনিতেই আরবে বৃষ্টি কম হয়ে থাকে। কিন্তু নবম হিজরীতে প্রচণ্ড খরা হলো এবং সমগ্র দেশে দুর্ভিক্ষ পড়ে গেল। বাগানের শহর ছিল মদীনা। কিন্তু দুর্ভিক্ষ ও গরমের প্রচণ্ডতায় মদীনাবাসীও আশ্রয় প্রার্থনা করছিল। তাদের

আশা-ভরসার একমাত্র স্থল ছিল খেজুরের বাগান। বাগানের খেজুর বৃক্ষে তখন কাঁধি কাঁধি খেজুর এসেছে এবং তা পারার সময় সম্পূর্ণ সন্নিকটবর্তী ছিল। ঠিক এমনি সময় একদিন মদীনাবাসী এই খবর শুনে চমকে উঠলো যে, রোমকদের এক বিরাট বাহিনী আরবের ওপর হামলার জন্য এগিয়ে আসছে। বিশ্ব নবী (সা) পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল ছিলেন। তিনি মু'মিনদেরকে জিহাদের প্রস্তুতির নির্দেশ দিলেন এবং বললেন যে, আমরা অগ্রসর হয়ে সীমান্তে দুশমনের মুকাবিলা করবো।

মুসলমানদের জন্য এটা ছিল কঠিন পরীক্ষার সময়। খেজুরের তৈরী ফসল, ভয়াবহ গরম, উত্তপ্ত মরুভূমির সুদীর্ঘ সফরের কষ্ট, খাদ্য, পানি এবং সওয়ারীর কমতি; সবই তাদের দৃষ্টিতে ছিল। কিন্তু তারা তো নিজের জীবন, ধন-সম্পদ ও সন্তান সকল কিছুই আল্লাহর রাস্তায় বিক্রয় করেছিলেন। তাঁরা সারওয়ারে আলমের (সা) নির্দেশকে কোন যুক্তি তর্ক ও টাল-বাহানা ছাড়াই মেনে নিলেন এবং আপাদমস্তক জিহাদের প্রস্তুতিতে মশগুল হয়ে পড়লেন। এটা ছিল তাবুকের অথবা জায়শুল উসরার ভূমিকা। এ সময় ত্যাগ, কুরবানী ও নিষ্ঠার এক বিস্ময়কর দৃশ্য পরিদৃষ্ট হয়েছিল। হযরত আবু বকর সিদ্দীক(রা) নিজের সকল ধন-সম্পদ হুজুরের (সা) পায়ের ওপর এনে রেখেছিলেন এবং হুজুর (সা) যখন জিজ্ঞেস করলেন যে, "আবু বকর! তুমি নিজের সন্তান-সন্ততির জন্য কি রেখে এসেছ?" এই প্রশ্নের জবাবে তিনি আরজ করলেন যে, "হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল।" হযরত উমর (রা) নিজের অর্ধেক সম্পদ নিয়ে হাজির হয়েছিলেন। হযরত উসমান গনি (রা) হাওদা সমেত তিনশ' উট, একশ' ঘোড়া এবং এক হাজার দিনার হক পথে পেশ করলেন। হযরত আবদুর রহমান (রা) বিন আওফ দুশ' আওকিয়া রূপা নিয়ে এসেছিলেন। হযরত তালহা (রা) বিন উবায়েদুল্লাহ মাল-দওলতের এক বোঝা সমেত হাজির হয়েছিলেন। আছেম (রা) বিন সত্তর ওয়াসাক খেজুর পেশ করেছিলেন। মহিলারা নিজেদের অলংকার খুলে আল্লাহর পথে দান করেছিলেন। মোট কথা, প্রত্যেকেই নিজের সামর্থ অনুযায়ী বরং সামর্থের চেয়ে বেশী কুরবানীর পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছিলেন। একদিকে মু'মিনরা এমনিভাবে ইতিহাসের পাতায় নিজেদের ইসলাম প্রেম ও ত্যাগের নজীরবিহীন উদাহরণ পেশ করছিলেন। অন্যদিকে মুনাফিকরা পাপের সামান হাজির করছিলো। তারা ঈমানদারদের অন্তর খারাপ করার কোন চেষ্টাই ছেড়ে দেয়নি। তারা কখনো বলতো, "খেজুরের ফসল সম্পূর্ণ তৈরী। তোমাদের অনুপস্থিতিতে এসব বরবাদ হয়ে যাবে এবং তোমাদেরকে কোথায়ও পাওয়া যাবে না।" কখনো বলতো, "এই ভয়াবহ গরমে তোমরা ঝলসে যাবে এবং

জীবিত ফিরে আসবে না।" কখনো রোমকদের ব্যাপক যুদ্ধ প্রস্তুতির কথা বর্ণনা করে তাদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করার চেষ্টা করতো। তারা অধিকাংশ সময় সুইলেম নামক এক ইহুদীর বাড়ী একত্রিত হতো এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনা তৈরী করতো। সেই সময়ই একদিন আল্লাহ জানেন জালাস বিন সুয়াইদের যেন কি হয়ে গেল। তিনি মুনাফিকদের ধোঁকায় পড়ে গেলেন অথবা খেজুরের অত্যন্ত উত্তম তৈরী ফসল তাঁর বোধ শক্তি খতম করে দিল। তিনি ছিলেন একজন ভাল মুসলমান। কয়েকটি যুদ্ধেও তাঁর অংশগ্রহণের সুযোগ হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে এক মজলিশে তাঁর মুখ দিয়ে এই বাক্য বের হয়ে গেল ঃ

"মুহাম্মাদ (সা) যদি নিজের দাবীতে সঠিক হন তাহলে আমরা গাধা থেকেও নিকৃষ্টতর।"

সেই মজলিশে উমায়ের (রা) বিন সায়াদও উপস্থিত ছিলেন। তিনি যদিও যুবক ছিলেন তবুও তার ললাটে সৌভাগ্য সূর্যের আলো ঝলমল করছিলো এবং অন্তরে ছিল রহমতে আলমের (সা) প্রতি ভালবাসার সামুদ্রিক গভীরতা। প্রিয় নবী (সা) সম্পর্কে জালাসের মুখ দিয়ে ওপরে বর্ণিত বাক শুনে তাঁর রক্ত টগবগ করে উঠলো। তিনি কর্কশ কণ্ঠে বললেন ঃ

"মুহাম্মাদ (সা) অবশ্যই নিজের দাবীতে সঠিক এবং তুমি অবশ্যই গাধার চেয়েও নিকৃষ্টতম।"

জালাস উমায়েরের (রা) কথা শুনে নীরব হয়ে গেলেন, এই ছেলে যে কখনো তার সামনে চোখ তুলে তাকায়নি আজ তার মুখের ওপর কথা বলে দিল। খুব রেগে গেলো এবং বললো ঃ "আমি কি তোমাকে এ জন্য পেলে-পুষে বড় করেছি। আমি আর তোমার জামিন নই। অন্য কোন স্থান তালাশ করে নাও।"

সতালো পিতার গঞ্জনা শুনে উমায়ের (রা) সোজা রাসূলে আকরামের (সা) খিদমতে পৌঁছলেন এবং সমগ্র ঘটনা কম-বেশী বর্ণনা করে দিলেন। হুজুর(সা) জালাসের সাহসে বিস্ময় প্রকাশ করলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাকে ডেকে পাঠালেন। সে হাজির হলে হুজুর (সা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ

"জালাস, তুমি কি অমুক মজলিশে একথা বলেছ।"

একথা স্বীকার করতে জালাসের সাহস হলো না। পরিষ্কার অস্বীকার করে বসলো। সে সময় রাসূলের (সা) মুখ দিয়ে এই আয়াত উচ্চারিত হলো ঃ

يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوْا ط وَلَقَدْ قَالُوْا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوْا بَعْدَ اِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوْا بِمَا لَمْ يَنَالُوْا ج وَمَا نَقَمُوْا اِلَّاۤ اَنْ اَغْنٰهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ مِنْ فَضْلِهٖ ج فَاِنْ يَّتُوْبُوْا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ ج

"এই লোকেরা আল্লাহর নামে শপথ করে বলে যে, তারা সেই কথা বলেনি, অথচ তারা নিশ্চয়ই সেই কাফেরী কথা বলেছে। তারা ইসলাম গ্রহণের পর কুফুরী অবলম্বন করেছে, আর তারা সেসব কাজ করার ইচ্ছা করেছিল যা তারা করতে পারেনি। তাদের এসব ক্রোধ কেবল এ কারণেই যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল স্বীয় অনুগ্রহে তাদেরকে সচ্ছল ও ধনশালী করে দিয়েছেন। এখন যদি তারা নিজেদের এই আচরণ থেকে ফিরে আসে, তবে তাদের পক্ষেই ভাল।" (আত তাওবা ঃ ৭৪)

হুজুর (সা) আল্লাহর কালাম পাঠ করে যাচ্ছিলেন আর জালাসের চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছিল। যখন তিনি খাইরাল লাহুম পর্যন্ত পৌঁছলেন তখন জালাস চীৎকার দিয়ে উঠলেন। অবলীলাক্রমে রহমতে আলমের (সা) পায়ের ওপর উপুড় হয়ে পড়লেন এবং আরজ করলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল! আমি ভুল করেছি। ক্ষমা চাই। আমি ভুল করে ফেলেছি। এখন তওবা করছি। আল্লাহর ওয়াস্তে ক্ষমা করে দিন।"

বিশ্ব নবী (সা) ক্ষমাশীলও ছিলেন। জালাসের ওপর তাঁর রহম এসে গেল। তিনি তাকে ক্ষমা করে দিলেন। অতপর তিনি প্রকৃতপক্ষেই মুসলমান হয়ে গেলেন এবং নিজের কোন কথা বা কাজে কখনো অভিযোগের সুযোগ দেননি। তাওবা কবুল হওয়ার আনন্দে তিনি উমায়েরকে (রা) পুনরায় নিজের জামানতে নিয়ে নিলেন এবং আজীবন তাঁকে নিজের থেকে পৃথক করেননি।

জালাসের (রা) অপরাধ বা গুনাহর স্বীকৃতি এবং তাওবা কবুলের সময় হযরত উমায়ের (রা) উপস্থিত ছিলেন। হুজুর (সা) স্নেহপূর্ণ স্বরে তার কান ধরে মুচকি হেসে বললেন ঃ "এই ছেলে, তোমার কান ঠিক শুনেছিল।"

রাসূলের (সা) যুগে হযরত উমায়ের (রা) যদিও কম বয়সী ছিলেন। তবুও, তাঁর প্রতি ছিল গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা। নবীর (সা) দরবারে নিয়মিত উপস্থিতি তাঁকে ফজিলতের আধার ও পূর্ণ বানিয়েছিল এবং তিনি হয়েছিলেন ইসলামী চরিত্রের এক বাস্তব উদাহরণ। তাঁর ঈমানী আবেগ এতো প্রচণ্ড ছিল

যে, অপ্রাপ্তবয়স্ক হওয়া সত্ত্বেও জায়শুল উসরাহ'র যুদ্ধে তিনি উদ্দীপনার সঙ্গে অংশ নিয়েছিলেন এবং সফরকালীন সকল মুসিবত হাসি মুখে বরণ করেছিলেন। রাসূলে আকরামের (সা) ওফাতের পর তিনি এতো দুঃখ পেয়েছিলেন যে, কোথায়ও আসা-যাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং সব সময় ইবাদাতে ব্যাপৃত থাকতেন। প্রকৃতিতে আল্লাহভীতি ও পরকালভীতি প্রাধান্য বিস্তার করে থাকতো। তিনি অত্যন্ত সাধনার জীবন যাপন করতেন। তবে, শুধুমাত্র সাধনাতেই ডুবে থাকতেন না বরং মানুষের সুখ-দুঃখেও সবসময় অংশ নিতেন। আল্লাহ্ পাক মেধা শক্তি দান করেছিলেন। জটিল জটিল মাসয়ালা বা সমস্যা মুহূর্তের মধ্যে সমাধান করে দিতেন। আল্লাহর পথে জিহাদেও সীমাহীন উৎসাহ ছিল। হযরত ওমর ফারুক (রা) তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে জানতেন এবং তাঁর চরিত্র ও গুণাবলীর খুব প্রশংসা করতেন। নিজের খিলাফতকালে তিনি সবসময় এমন মানুষের সন্ধানে থাকতেন যারা সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদের দায়িত্ব কিতাব ও সুন্নাত অনুযায়ী আঞ্জাম দিতে পারেন। তাঁর মাপকাঠিতে হযরত উমায়ের (রা) সবদিক থেকেই উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। বস্তুত তিনি উমায়েরকে (রা) ডেকে পাঠালেন এবং মুজাহিদদের এক বাহিনীর অফিসার বানিয়ে সিরিয়া প্রেরণ করলেন। সেখানে তিনি রোমকদের বিরুদ্ধে কয়েকটি যুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শন করেন। কিছুদিন পর তিনি ফিরে এলেন। এ সময় হযরত ওমর (রা) তাঁকে সামরিক দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে হেমসের আমীর নিয়োগ করেন।

হেমসের আমীরের পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর হযরত উমায়ের (রা) সেখানকার সরকারী কাজ-কর্ম এতো সুন্দরভাবে আঞ্জাম দিলেন যে, ফারুকে আজমের (রা) দৃষ্টিতে তাঁর মর্যাদা কয়েকগুণ বেড়ে গেল। তিনি উমায়েরের (রা) যোগ্যতায় বিস্ময় প্রকাশ করতেন এবং তাঁকে "উপমাহীন" উপাধিতে স্মরণ করতেন। তিনি বলতেন; উমায়েরের (রা) মত যোগ্যতা সম্পন্ন কয়েকজন মানুষ যদি আমি পেতাম তাহলে আমার খিলাফতের বোঝা হালকা হয়ে যেতো।

হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রা) বলতেন যে, উমায়ের (রা) বিন সায়াদের চেয়ে বেশী ভাল এবং যোগ্য মানুষ সিরিয়ায় আর ছিল না।

তাবকাতে ইবনে সায়াদের রেওয়ায়াত অনুযায়ী হযরত উমায়ের (রা) বছরের পর বছর ধরে হেমসের আমীর ছিলেন। হযরত ওমর ফারুক (রা) যখন শাহাদাতপ্রাপ্ত হলেন তখন তিনি সেই পদ থেকে সরে দাঁড়ালেন এবং একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে হেমসের বাসিন্দা হয়ে গেলেন এবং

সেখানেই আমীর মুয়াবিয়ার (রা) শাসনামলে ওফাত পান। কিন্তু আল্লামা ইবনে আছির এবং অন্য কতিপয় ঐতিহাসিক বর্ণনা করেছেন যে, তিনি হযরত ওমর ফারুকের (রা) জীবদ্দশাতেই হেমসের ইমারত পরিত্যাগ করেছিলেন এবং মদীনা মুনাওয়ারা থেকে কয়েক মাইল দূরে নিজের পরিবার পরিজনসহ এক গ্রামে বসবাস শুরু করেন। তিনি সেখানেই হযরত ওমর ফারুকের (রা) খিলাফতকালে মৃত্যুবরণ করেন এবং মদীনার কবরস্তান "বাকী' গারকাদে" তাঁর লাশ দাফন করা হয়। তাঁর ইন্তেকালের খবর শুনে হযরত ওমর (রা) খুব দুঃখ পেলেন এবং তিনি পায়ে হেঁটে "বাকী' গারকাদ" গোরস্তানে তাশরীফ নিলেন এবং হযরত উমায়েরের (রা) কবরের নিকট দাঁড়িয়ে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত মাগফিরাতের জন্য দোয়া করতে থাকলেন।

যেসব চরিতকার পরে উল্লেখিত বর্ণনার প্রবক্তা তাদের মতে হযরত ওমর ফারুক (রা) হযরত উমায়েরকে (রা) যাকাত আদায়ের অফিসার হিসাবে নিয়োগ করে হেমস প্রেরণ করেছিলেন। হেমস পৌছার পর পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হলো। কিন্তু তাঁর পক্ষ থেকে যাকাতের কোন অর্থও পাওয়া গেল না। এমনকি তাঁর কোন খবরও পাওয়া গেল না। তাতে হযরত ওমর (রা) খুব অস্থির হয়ে পড়লেন। তিনি নিজের আমীর এবং সরকারী কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের ওপর কড়া দৃষ্টি রাখতেন এবং তিনি চাইতেন যে, তারা যেন তাকে নিয়মমত পত্র প্রেরণ করেন। হযরত উমায়েরের (রা) দীর্ঘ নীরবতা তাঁর জন্য ছিল অসহ্য। সুতরাং তিনি উমায়েরকে (রা) একটি কঠিন পত্র লিখলেন। তাতে তিনি যত অর্থ আদায় হয়েছে তা সহ মদীনায় চলে আসার নির্দেশ দিলেন।

হযরত উমায়ের (রা) ফারুকে আজমের (রা) পত্র পেয়ে পাথেয়'র থলি কাঁধে এবং হাতে লাঠি নিয়ে পদব্রজেই মদীনা রওয়ানা হয়ে গেলেন। কয়েকদিনের ক্লেশপূর্ণ সফর শেষে যখন তিনি মদীনা মুনাওয়ারা পৌছলেন তখন চুল ছিল আলুথালু, চেহারা ছিল বিমর্ষ এবং ধূলাবালিতে দেহ হয়ে গিয়েছিল ধূসরিত। খলিফার দরবারে পৌছলেন। হযরত ওমর (রা) তাঁকে এই অবস্থায় দেখে বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ

"উমায়ের (রা)। আমি তোমাকে একি অবস্থায় দেখছি?" উমায়ের (রা) "আমিরুল মু'মিনীন। আল্লাহর ফজলে আমি ভাল আছি। হাঁ, আমার সঙ্গে রয়েছে পার্থিব জগৎ। যার বোঝায় আমি দেবে যাচ্ছি।"

হযরত ওমর (রা) "তোমার নিকট কি ধরনের পার্থিব জগৎ রয়েছে?"

উমায়ের (রা) "আমিরুল মু'মিনীন! এই আমার থলি। এর মধ্যে আমি আমার পাথেয় রেখে রওয়ানা দিয়েছিলাম। এটা একটা পাত্র। এতে খাবার খাই অথবা তাতে পানি ভরে নিজের কাপড় ও মাথা ধৌত করি—এটা হলো আমার মশক। তাতে খাবার এবং ওজুর পানি রেখে থাকি। এ হলো আমার লাঠি। যা দিয়ে পথের কাঁটা ও দুশমনের মুকাবিলা করে থাকি। মোটকথা, এগুলোর নামইতো দুনিয়া বা পার্থিব জগৎ।"

হযরত ওমর (রা) একথা শুনে আল্লাহু আকবার বলে উঠলেন। অতপর জিজ্ঞেস করলেন ঃ

"তুমি কি সকল পথ পদব্রজে সফর করেছ?"

উমায়ের (রা) ঃ "জ্বী, হাঁ।"

হযরত ওমর (রা) ঃ "কেন, সেখানে কি এমন কেউ ছিল না যে তোমার জন্য সওয়ারীর ব্যবস্থা করে দিত?"

উমায়ের (রা) ঃ "আমি কারোর নিকট দাবীও করিনি এবং কেউ সওয়ারীর ব্যবস্থাও করেনি।"

হযরত ওমর (রা) ঃ "তারা কত খারাপ মানুষ, যারা নিজেদের আমীরের তাকলিফের কথা অনুভব করেনি।"

উমায়ের (রা) ঃ "আমিরুল মু'মিনীন! এ ধরনের বলবেন না। তারা মুসলমান এবং আমি তাদের বেশী বেশী নামায পড়তে দেখেছি।"

হযরত ওমর (রা) ঃ "তুমি জানো, আমি তোমাকে কোথায় প্রেরণ করেছিলাম এবং কি ধরনের কাজ তোমার ওপর ন্যস্ত করেছিলাম।"

উমায়ের (রা) ঃ "আমিরুল মু'মিনীন! আপনি আমাকে যেখানে পাঠিয়ে ছিলেন সেখানকার আল্লাহভীতু ও আমানতদার লোকদেরকে একত্রিত করেছিলাম এবং তাদেরকে রাজস্ব আদায়ের জিম্মাদার বানিয়েছিলাম যা কিছু তারা আদায় করে এনেছিল তা তাদের প্রয়োজনে ব্যয় করে দিয়েছিল। যদি কিছু বাঁচতো তাহলে খিলাফতের দরবারেও অবশ্যই প্রেরণ করতো।"

হযরত ওমর (রা) ঃ তাঁর জবাব শুনে খুব খুশী হলেন এবং বললেন, "তোমার প্রতি আমার এই আশাই ছিল। এখন তুমি তোমার পদে ফিরে যাও।"

উমায়ের (রা) ঃ "আমিরুল মু'মিনীন! এখন আমাকে এই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিন। এই বোঝা বহনের হিম্মত আমার নেই। সবসময়ই ভয়ে ভীত থাকি যে কোন কথায় আবার পরকালে ধরা পড়বো। একদিন ইমারাতের

তোড়ে এক খৃষ্টানকে বলে বসেছি যে, আল্লাহ তোকে অপমানিত করুক। সেই সময় থেকে মনটা খুব খারাপ হয়ে আছে। আমি আর ইমারতের দায়িত্ব কবুল করবো না।"

হযরত ওমর (রা) তাঁকে নিয়মমত তার কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য খুব চাপ দিলেন। কিন্তু তিনি তা মানলেন না এবং নিজের পরিবার-পরিজনসহ মদীনার কয়েক মাইল দূরে একটি গ্রামের বাসিন্দা হয়ে গেলেন।

কিছুদিন পর হযরত ওমর (রা) এক ব্যক্তিকে একশ' দিনার দিয়ে উমায়েরের (রা) গ্রামে পাঠালেন এবং বলে দিলেন যে, উমায়েরকে (রা) যদি নির্ভাবনা ও সচ্ছলতার সঙ্গে বসবাস করতে দেখ তাহলে চুপচাপ ফিরে আসবে। আর যদি অসচ্ছল অবস্থায় দেখো, তাহলে এই দিনার তাঁকে দেবে। সেই ব্যক্তি হযরত উমায়েরের (রা) আবাসস্থলে পৌঁছে দেখতে পেলো যে, তিনি একটি দেয়ালের সঙ্গে হেলান দিয়ে নিজের কুরতার উকুন পরিষ্কার করছেন। সেই ব্যক্তিকে দেখে তিনি অহলান ও সাহলান বললেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কোথা থেকে তাশরীফ আনছেন।" জবাবে তিনি জানালেন, "মদীনা থেকে।" জিজ্ঞেস করলেন, "আমিরুল মু'মিনীন কেমন আছেন?" বললেন, "ভাল আছেন। আল্লাহ তায়ালার আইন-কানুন জারী করছেন।"

একথা শুনে উমায়ের (রা) নিজের হাত দোয়ার জন্য উঠালেন এবং বললেন, "হে আল্লাহ! ওমরকে সাহায্য কর। তিনি নিজের জীবন তোমার পথে ওয়াক্‌ফ করে রেখেছেন।"

দূত তিনদিন পর্যন্ত উমায়েরের (রা) বাড়ীতে অবস্থান করলেন। এ সময় তিনি দেখতে পেলেন যে, সারা দিনে বড় কষ্টে উমায়ের (রা) একটি রুটি পেয়ে থাকেন। তা তিনি মেহমানের সামনে তুলে দেন এবং নিজে অভুক্ত থাকেন। তিনদিন পর তিনি একশ' দিনার উমায়েরের (রা) সামনে রেখে দিলেন এবং বললেন, "আমিরুল মু'মিনীন এই দিনার আপনার জন্য প্রেরণ করেছেন।" উমায়ের (রা) দিনার উঠিয়ে নিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, "আল্লাহর কসম! আমার এই দিনারের প্রয়োজন নেই" এবং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তিনি সকল অর্থ অভাবগ্রস্ত ও এতিমদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন।

দূত মদীনা ফিরে হযরত ওমরকে (রা) এই ঘটনা শুনালেন। তখন তাঁর চোখ বুঁজে এলো। সেই সময়ই তিনি উমায়েরকে (রা) ডেকে পাঠালেন। তিনি যখন উপস্থিত হলেন তখন তাঁর সামনে অনেক খাদ্যদ্রব্য ও কাপড় রেখে দিলেন এবং বললেন, এসব নিয়ে যাও। উমায়ের (রা) আরজ করলেন ঃ

"আমিরুল মু'মিনীন! খাদ্যদ্রব্য আমার প্রয়োজন নেই। কেননা যখন আমি বাড়ী থেকে বের হই তখন আমার ঘরে দুই সা' যব মওজুদ ছিল। অবশ্য আমি কাপড় নিচ্ছি। কাপড় আমার স্ত্রীর প্রয়োজন রয়েছে। বেশ কিছুদিন যাবত শরীর ঢাকার জন্য পূর্ণ পোশাক সে পায়নি।"

এই ঘটনার কিছুদিন পরই উমায়ের (রা) বিন সায়াদ পরপারে যাত্রা করেন। তাঁর সন্তানের মধ্যে দু'জনের নাম চরিতগ্রন্থসমূহে পাওয়া যায়। তারা হলো আবদুর রহমান ও মুহাম্মাদ। হযরত উমায়ের মহান সাহাবীদের মধ্যে পরিগণিত হয়ে থাকেন। তাঁর আল্লাহভীতি উদাহরণ হয়ে রয়েছে এবং হযরত ওমর ফারুক (রা) তাঁকে খুব সম্মান করতেন। তিনি কতিপয় হাদিসও বর্ণনা করেছেন।

হযরত আমর (রা) বিন উমাইয়া জুমরী

চরিত্র ও চাল-চলনের দিক থেকে রাসূলের (সা) সাহাবীবৃন্দ এত উচু মর্যাদায় সমাসীন ছিলেন যে, তাদের সত্যবাদিতা ও নিষ্ঠা, দিয়ানত এবং আমানত ও আল্লাহভীতির কসম খাওয়া যায়। আল্লাহ তায়ালা নিজের এসব পবিত্রতম বান্দাদেরকে স্পষ্ট ভাষায় বেহেশতের সুসংবাদ দিয়েছেন এবং তাদের দুশমনদেরকে নিজের দুশমন হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। সাইয়্যেদেনা হযরত আবু উমাইয়া আমর (রা) বিন উমাইয়াতাজ জুমরী এই সাহাবীদলের অন্যতম সম্মানিত সদস্য ছিলেন। মহামহিম আল্লাহ তায়ালা তাঁকে অসংখ্য গুণ দিয়ে অভিষিক্ত করেছিলেন। এসব গুণের মধ্যে রয়েছে বীরত্ব, সাহসিকতা দ্রুতগতি, মেধা ও বিচক্ষণতা। কাহিনী বর্ণনা এবং অজ্ঞতার ছদ্মাবরণে কিছু মানুষ হযরত আমর (রা) বিন উমাইয়ার সেই অসাধারণ গুণাবলীকে সামনে রেখে “ওমর আইয়ার” নামক একজন আনুমানিক ব্যক্তিত্ব বানিয়ে নেয় এবং অসংখ্য তৈরী কাহিনী তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে দেয়। ফলে হযরত আমর (রা) বিন উমাইয়ার আসল ব্যক্তিত্ব দৃষ্টির বাইরে চলে যায়। নেতৃস্থানীয় চরিতকাররা যদিও হযরত আমর (রা) বিন উমাইয়ার প্রসঙ্গে বেশী কিছু লিখেননি, তবুও বিশুদ্ধ বর্ণনাসমূহ থেকে যা কিছু পাওয়া যায় তা এটা প্রমাণে যথেষ্ট যে, হযরত আমর (রা) বিন উমাইয়া প্রিয় নবীর (সা) একজন মুখলিস সাহাবী এবং হক পথে আত্মোৎসর্গকারী একজন মুজাহিদ ছিলেন। তাঁর প্রতি মহানবীর (সা) এত বেশী আস্থা ছিল যে, কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব তাঁর ওপর ন্যস্ত করেন। এমনকি তাঁকে একজন বিদেশী বাদশাহ'র (হাবশার বাদশাহ নাজ্জাশী) নিকট নিজের দূত হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন। এমনি ধরনের একজন জালিলুল কদর সাহাবীর জীবনের ঘটনাবলীকে বিকৃত করে উপস্থাপন করাটা প্রচণ্ড ঔদ্ধত্য ও বেয়াদবী ছাড়া আর কি হতে পারে।

সাইয়্যেদেনা হযরত আবু উমাইয়া আমর বিন উমাইয়া বনু জুমরা গোত্রের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। তাঁর নসবনামা নিম্নরূপ ঃ

আমর বিন উমাইয়া বিন খুয়ায়েলদ বিন আবদুল্লাহ বিন আয়াস বিন আবদ (অথবা উবায়েদ) বিন কাশিরাহ বিন কায়াব বিন আদি বিন জুমরাহ।

বনু জুমরাহ একটি বড় গোত্র ছিল। বদরের উত্তর পাশে ছিল তাদের বসতি। অবশ্য তার একটি শাখা বনি আবদ বিন আদি মক্কায় হেরেমের

সীমানায় গিয়ে বসতি স্থাপন করেছিল। মশহুর কবিলা বনু গিফারও বনু জুমরারই একটি শাখা ছিল। ইবনে সায়াদ (র) ও সোহায়লীর (র) বর্ণনা অনুযায়ী দ্বিতীয় হিজরীর সফর মাসে রাসূলে আকরাম (সা) বনু জুমরার সঙ্গে একটি লিখিত চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। এই চুক্তিনামায় প্রয়োজনের সময় একে অপরকে সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল। কতিপয় রেওয়ায়াত অনুসারে প্রিয় নবী (সা) একবার বনু জুমরাকে প্রশংসা করেছিলেন। এ জন্য চরিতকাররা এই কবিলা বা গোত্রকে সভ্রান্ত ও সম্মানিত হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। হযরত আমর (রা) প্রথম বয়সেই নিজের দ্রুতগামিতা, মেধা, বীরত্ব এবং সাহসিকতার কারণে মশহুর হয়ে গিয়েছিলেন। আল্লামা ইবনে আবদুল বার (র) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি দীর্ঘদিন যাবত কুফর ও শিরকের ভ্রান্ত পথে পথভ্রষ্ট হয়েছিলেন এবং বদর ও ওহোদের যুদ্ধে মক্কার মুশরিকদের পক্ষে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে অংশ নিয়েছিলেন। তাঁর পুত্র জাফর (র), ফজল (র) এবং আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, কুরাইশরা যখন ওহোদ থেকে ফিরে গেল তখন আমাদের পিতা ইসলাম গ্রহণ করেন।

আল্লামা ইবনে সায়াদ (র) তাবকাতে কাবিরে হযরত আমর (রা) বিন উমাইয়ার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে এক চিত্তাকর্ষক কাহিনী বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, ওহোদের যুদ্ধের পর একবার আবু সুফিয়ান বিশ্ব নবীকে (সা) মদীনায় শহীদ করার পরিকল্পনা করে এবং এ উদ্দেশ্য সাধনে আমর বিন উমাইয়াকে নির্বাচন করে। কাপড়ের নীচে একটি খঞ্জর লুকিয়ে একটি দ্রুতগতিসম্পন্ন উটে চড়ে আমর মদীনা রওয়ানা হয়ে গেলেন। ৬ষ্ঠ দিনে মদীনার নিকটে জাহরুল হিরা নামক স্থানে পৌছলেন। সেখান থেকে জিজ্ঞেস করতে করতে মসজিদে বনু আশহালে গেলেন। সেখানে হুজুর (সা) আরাম করছিলেন। আমরের ওপর দৃষ্টি পড়তেই সেখানে উপস্থিত সাহাবীদেরকে তিনি বললেন, "দেখো, যে ব্যক্তি এলো তার নিয়ত ভাল মনে হয় না।" একথা শুনে হযরত উসায়েদ (রা) বিন হুজায়ের আনসারী উঠে দাঁড়ালেন এবং ঝাঁপিয়ে পড়ে আমরকে (রা) কাবু করে ফেললেন। তাঁর কাপড়ের তলা থেকে খঞ্জর বেরিয়ে এলো। তাতে তিনি খুব ছটফটাতে লাগলেন এবং চেঁচিয়ে বললেন ঃ "আমার রক্ত, আমার রক্ত।"

হুজুর (সা) তাকে সম্বোধন করে বললেন, "সত্যি করে বলো তুমি কে এবং কোন নিয়তে এখানে এসেছ?"

বললেন ঃ "আপনি যদি আমাকে হত্যা না করেন, তাহলে সবকিছু বলবো।"

হুজুর (সা) বললেন ঃ "তুমি যদি সত্যি কথা বলো, তাহলে দেখবো।"

আমর (রা) সকল ঘটনা কম-বেশী বলে দিলেন। তা শুনে রহমতে আলম (সা) মুচকি হেসে বললেন ঃ

"সে সত্য কথা বলেছে। আমি তার অপরাধ ক্ষমা করে দিলাম।"

আমর (রা) নবুওয়াতের মহিমায় প্রথমে প্রভাবিত হয়েছিলেন। এক্ষণে হুজুরের (সা) শান দেখে নির্দ্বিধায় রাসূলের (সা) পায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং ইসলাম গ্রহণ করলেন।

অন্য কতিপয় রেওয়ায়াতে এই ঘটনা এভাবেই বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু তাতে হযরত আমর (রা) বিন উমাইয়ার নামের ব্যাখ্যা নেই। বরং বলা হয়েছে যে, একজন গ্রাম্য মানুষ আবু সুফিয়ানের ইঙ্গিতে হুজুরকে (সা) শহীদ করার ইরাদায় এলো এবং ধরা পড়লো। এসব রেওয়ায়াত অনুযায়ী এই ঘটনা ৬ অথবা ৭ হিজরীতে সংঘটিত হয়েছিল। যদি এসব রেওয়ায়াত সঠিক হয় তাহলে সেই ঘটনার সাথে হযরত আমর (রা) বিন উমাইয়ার ইসলাম গ্রহণের সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না। কেননা তিনি তৃতীয় হিজরীর শেষে অথবা চতুর্থ হিজরীর প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

এখানে একথা উল্লেখ করা আবশ্যক যে, হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র) এবং আল্লামা ইবনে আছিরের (র) নিকট এ ধরনের সকল রেওয়ায়াত ভিত্তিহীন। এসব রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে যে, অমুক সময় (ইসলাম গ্রহণের পূর্বে) হযরত আবু সুফিয়ান (রা) হুজুরের (সা) হত্যার পরিকল্পনা করেছিল এবং অমুক ব্যক্তি তাঁকে শহীদ করার জন্য মদীনা প্রেরণ করেছিল।

কাজী মুহাম্মাদ সুলায়মান সালমান মানসুরপুরী (র) "রাহমাতুল লিল আলামীন" গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে লিখেছেন যে, হযরত আমর (রা) বিন উমাইয়া ৬ষ্ঠ হিজরীতে ইসলাম কবুল করেন এবং পুনরায় মক্কা ফিরে গিয়ে ইসলামের তাবলিগ করতে থাকেন। কিন্তু কাজী সাহেব নিজের বর্ণনার সূত্র উল্লেখ করেননি। অন্যান্য রেওয়ায়াত ও কার্যকারণ এই রেওয়ায়াত ও কার্যকারণ এই রেওয়ায়াতকে সমর্থন করে না।

চতুর্থ হিজরীর সফর মাসে বি'রে মাউনার বেদনাপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হলো। কতিপয় চরিতকার এই প্রসঙ্গে হযরত আমর (রা) বিন উমাইয়ার উল্লেখ বিশেষভাবে করেছেন। সেই ঘটনার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ

চতুর্থ হিজরীতে বনু কালাবের সরদার আবু বারা আমের বিন মালেক নজদ থেকে বিশ্ব নবীর (সা) খিদমতে হাজির হলেন। হুজুর (সা) তাকে ইসলামের

দাওয়াত দিলেন। সে ইসলাম কবুল করলো না। অবশ্য রাসূলের (সা) নিকট একটি আবেদন জানালেন। আবেদনে তার সঙ্গে কতিপয় ব্যক্তিকে প্রেরণ করতে বললেন। যাতে তারা তার কওমের নিকট ইসলামের দাওয়াত দিতে পারেন। হুজুর (সা) সাহাবীদেরকে (রা) তার সঙ্গে প্রেরণের ব্যাপারে চিন্তায় পড়ে গেলেন। কেননা কিছুদিন পূর্বে বনু আমেরের সরদার আমের বিন তোফায়েল (আবু বারার ভাতিজা) মুসলমানদেরকে এই বলে ধমক দিয়েছিল যে, মুহাম্মাদ (সা) আমাকে তার স্থলাভিষিক্ত করুক অথবা নরম মাটির বাসিন্দাদের ওপর সে শাসন করুক এবং কঠিন মাটিতে বসবাসকারীদের ওপর আমি শাসন করি। নচেৎ আমি বনু গাতফানের হাজার হাজার যোদ্ধাকে সঙ্গে নিয়ে মদীনার ওপর চড়াও হবো। কিন্তু আবু বারা' হুজুরকে (সা) নিশ্চয়তা দিলেন যে, যাদেরকে আপনি আমার সঙ্গে প্রেরণ করবেন তাদের হেফাজত ও সালামতির দায়িত্ব আমার।

সহীহ বুখারীতে হযরত আনাস (রা) বিন মালিক থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলে আকরাম (সা) হযরত হারাম (রা) বিন মিলহান আনসারীর নেতৃত্বে ৭০ জন সওয়ারীকে নজদে প্রেরণ করলেন। কিন্তু ইবনে ইসহাক (র) এবং হাফেজ ইবনে কাছির (র) বর্ণনা করেছেন যে, আবু বারার নিশ্চয়তা প্রদানের পর হুজুর (সা) ৪০ জন সাহাবীকে (রা) হযরত মানযার (রা) বিন আমর আনসারীর নেতৃত্বে তার সঙ্গে প্রেরণ করেছিলেন। এই ৪০ জন সাহাবীর (রা) মধ্যে হযরত আমর (রা) বিন উমাইয়াও শামিল ছিলেন। এসব সাহাবীর বেশীরভাগই ছিলেন "আনসার" ও "আসহাবে সুফফা।" আল্লাহর এসব পবিত্র বান্দাহর অধিকাংশই কুরআনে কারিমের হাফেজ ছিলেন এবং "কারী" লকবে মশহুর ছিলেন। বিশ্ব নবী (সা) আমের বিন তোফায়েলের নামে একটি চিঠিও সেই দলের হাতে প্রেরণ করলেন। এসব ব্যক্তি মদীনা থেকে বিদায় হয়ে "বিরে মাউনা" নামক স্থানে গিয়ে যাত্রা বিরতি করলেন এবং হযরত হারাম (রা) বিন মিলহানকে (রা) হুজুরের (সা) চিঠি আমের বিন তোফায়েলের কাছে প্রেরণ করলেন।

হযরত হারাম (রা) হুজুরের (সা) পত্র আমের বিন তোফায়েলকে প্রদান করলেন। সে সময় সেই হতভাগা তা পাঠ করার মত ধৈর্যও ধারণ করতে পারলো না এবং আরবদের প্রথাগত মেহমানদারীকে তাকে উঠিয়ে রেখে এক ব্যক্তিকে ইঙ্গিত করলো। সে হযরত হারামকে (রা) পেছনের দিক থেকে এসে নেযাহ মারলো। এই নেযাহ তাঁর দেহের এপার-ওপার হয়ে গেল। হযরত হারাম (রা) আঁজলা ভরে রক্ত নিজের চেহারা ও মাথার ওপর নিক্ষেপ করলেন এবং বললেন, "ফুযতু ওয়া রাব্বিল কা'বা" (কা'বার রবের কসম, আমি সফল

হয়ে গিয়েছি) তারপরই মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন এবং জীবন আল্লাহর হাতে সঁপে দিলেন।

তারপর আমের বিন তোফায়েল নিজের গোত্রের (বনু আমের) লোকদেরকে অন্য মুসলমানের সঙ্গেও একই আচরণ করার কথা বললো। কিন্তু তারা আবু বারার আশ্রয়ের কারণে চিন্তিত হয়ে পড়লো। ফলে, আমের আশপাশের গোত্র রায়াল, জাকওয়ান, আসবা এবং কারাকে একত্রিত করে মুসলমানদের ওপর হামলা করে বসলো। হকপন্থীরা অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে এই হামলার মোকাবেলা করলো। তবে বিরাট সংখ্যক নজদী দাগাবাজ তাদেরকে ঘিরে ফেললো এবং হযরত কায়াব (রা) বিন যায়েদ আনসারী ছাড়া (তিনি বনি দিনার বিন নাজ্জার গোত্রভুক্ত ছিলেন) অবশিষ্ট সকলকে এক এক করে শহীদ করে ফেললো। হযরত কায়াবও (রা) মারাত্মকভাবে আহত হলেন এবং মৃত ভেবে কাফেররা তাকে ফেলে গেল। সে সময় হযরত আমর(রা) বিন উমাইয়া নিজের একজন আনসারী সঙ্গীর সাথে মুসলমানদের পশু চরানোর জন্যে গিয়েছিলেন। আকাশে শকুন উড়তে দেখলেন। তা দেখে তাঁর মনে খটকা লাগলো। তিনি মনে করলেন যে, অবশ্যই কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে। তৎক্ষণাৎ তিনি বিরে মাউনার দিকে অগ্রসর হলেন। সেখানে পৌঁছে সকল সঙ্গীকে রক্তে ডোবা অবস্থায় পেলেন। দাগাবাজ দুশমনরা রক্তাক্ত তরবারীসহ তাঁদের পাশে দাঁড়িয়েছিল। হযরত আমর (রা) নিজের সাথীকে বললেন, "চলো, ফিরে গিয়ে হুজুরের (সা) নিকট এই মর্মন্তুদ ঘটনার খবর দি।"

তিনি বললেন "শহীদদেরকে ছেড়ে এই স্থান থেকে চলে যেতে আমার মন চায় না। এখানে আমাদের সঙ্গীরা চির নিদ্রায় শায়িত রয়েছেন।"

সুতরাং উভয়েই তরবারী উঁচিয়ে অগ্রসর হলেন এবং যুদ্ধের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কিন্তু দু'ব্যক্তি কি করে হাজার হাজার মানুষের মোকাবিলা করতে পারে। আনসারী মুজাহিদতো লড়াই করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন এবং আমর (রা) বিন উমাইয়াকে নজদীরা গ্রেফতার করলো।[১] আমের বিন তোফায়েলের মাতা কোন ব্যাপারে একটি গোলাম আযাদ করার মানত

---

১. হযরত আমর (রা) বিন উমাইয়ার সঙ্গীর নাম কতিপয় রেওয়ায়াতে মানযার (রা) বিন আমর বলে উল্লেখ আছে এবং কতিপয় রেওয়ায়াতে "তাকে বনি আমর বিন আওফের একজন আনসারী বলা হয়েছে। ইবনে আছির বর্ণনা করেছেন যে, নজদীরা মানযারকে(রা) নিরাপত্তা দানের প্রস্তাব দিয়েছিল। কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন এবং যেস্থানে হযরত হারাম (রা) শহীদ হয়ে গিয়েছিলেন সেখানে পৌঁছে যুদ্ধ করে শহীদ হয়ে যান। হুজুর (সা) এই ঘটনা শুনে বললেন ঃ "তিনি স্বয়ং মৃত্যুর দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন।"

মেনেছিলেন। যখন আমর (রা) আমের বিন তোফায়েলকে বললেন যে, তিনি মুদির বংশোদ্ভূত তখন সে তার মায়ের মানত পূর্ণ করার জন্য তাঁকে আযাদ করে দিলো এবং নিজের রসম অনুযায়ী তাঁর ভ্রু কেটে নিলো। কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত আমর (রা) এক আধদিন মুশরিকদের গ্রেফতারীতে ছিলেন এবং সুযোগ পয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যান। যাহোক, তিনি মুক্তি পেয়ে দ্রুতগতিতে মদীনা রওয়ানা হয়ে গেলেন। পথিমধ্যে একজন মুশরিক রাখালের সঙ্গে সাক্ষাত হলো। সে একটি কবিতা আবৃত্তি করলো। কবিতাটির অর্থ হলো ঃ "আমার জীবন থাকা অবস্থায় মুসলমান হবো না এবং মুসলমানদের দ্বীনও গ্রহণ করবো না।"

আমর (রা) লাফ দিয়ে পড়ে সেই রাখালকে ধরাশায়ী করে ফেললেন এবং খঞ্জরের এক কোপে তাকে জাহান্নামে প্রেরণ করলেন। সামনে অগ্রসর হলেন। রাস্তায় বনু আমেরের দু'ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত হলো বিশ্ব নবী (সা) তাদেরকে নিরাপত্তা দিয়েছিলেন। কিন্তু আমর (রা) তা জানতেন না। তাঁর অন্তর ছিল বনু আমেরের বিরুদ্ধে ক্রোধে পূর্ণ। হঠাৎ করে হামলা করে সেই দুই ব্যক্তিকে হত্যা করে ফেললেন [অন্য কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে যে, উভয় ব্যক্তি ইহুদী এবং বনু কুরায়জার সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল। আমর (রা) তাদেরকে বনি আমেরের মানুষ মনে করে হত্যা করেন] অতপর তিনি খুব দ্রুত গতিতে মদীনা পৌঁছে প্রিয় নবীর খিদমতে হাজির হয়ে সকল ঘটনা বর্ণনা করলেন। বিরে মাউনার হৃদয় বিদারক ঘটনা শুনে হুজুর (সা) প্রচণ্ড দুঃখ পেলেন। তা সত্ত্বেও তিনি বনু আমেরের (অথবা বনু কোরায়জা) দুই ব্যক্তির হত্যায়, অসন্তুষ্ট হলেন এবং তাদের দিয়াত আদায় করলেন। অজ্ঞতাবশতঃ হযরত আমর (রা) এই কাজ করে বসেছিলেন। তিনি ক্ষমা প্রার্থী হলেন এবং সবসময় এই কাজের জন্য আফসোস করতেন। কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে যে, হুজুর(সা) এক মাস পর্যন্ত বিরে মাউনার সাহাবীদের হত্যাকারীদের জন্য বদদোয়া করেছিলেন।

সেই সময়ই মুসলমানদেরকে আরেকটি দুঃখজনক ঘটনায় ক্ষত-বিক্ষত হতে হয়েছিল। প্রিয় নবী (সা) বিভিন্ন রেওয়ায়াত অনুযায়ী ৬ অথবা দশ সাহাবীর একটি দল হযরত আছেম (রা) বিন ছাবিত আনসারীর নেতৃত্বে তাবলীগের জন্য বনু আজল বিকারার দিকে প্রেরণ করলেন। বনু লাহইয়ানের দুশ' সওয়ার সেই জামায়াত বা দলকে রাজি' নামক স্থানে ঘিরে ধরলো এবং দু'জন ছাড়া সকল সাহাবীকে শহীদ করে ফেললো। হযরত খুবায়ের (রা) বিন আদি এবং যায়েদ (রা) বিন দাছনাকে সেই হতভাগারা গ্রেফতার করে মক্কার মুশরিকদের নিকট বিক্রয় করে দিল। হারাম মাসসমূহ অতিবাহিত হওয়ার পর

মুশরিকরা অত্যন্ত নির্দয়ভাবে সেই দুই হক প্রেমিককে শহীদ করে ফেললো। হযরত যায়েদের (রা) লাশতো তারা মাটিতে পুতে দিল। কিন্তু হযরত খুবায়েবের (রা) লাশ শুলির ওপর লটকে রাখলো। রাসূলে আকরাম(সা) এই ঘটনার কথা অবগত হলে খুব দুঃখিত হলেন এবং তিনি হত্যাকারীদেরকে আল্লাহর দুশমন বলে আখ্যায়িত করলেন। আল্লামা তাবারী(র) এবং হাফেজ ইবনে হাজার (র) লিখেছেন যে, বিশ্ব নবী (সা) হযরত আমর (রা) বিন উমাইয়াকে মক্কায় গিয়ে খুবায়েবের (রা) লাশ শুলি থেকে নামিয়ে এখানে নিয়ে আসার চেষ্টা চালাতে বললেন। হযরত আমর (রা) হুজুরের (সা) ইরশাদ অনুযায়ী মনযিলের পর মনযিল অতিক্রম করে মক্কা পৌঁছলেন এবং রাতের অন্ধকারে তানয়িম উপস্থিত হলেন। সেখানেই হযরত খুবায়েবের (রা) লাশ শুলিতে লটকানো ছিলো। তিনি বৃক্ষের ওপর চড়ে শুলির রশি কেটে দিলেন এবং হযরত খুবায়েবের (রা) পবিত্র দেহ মাটিতে পড়ে গেল। হযরত আমর (রা) গাছ থেকে নীচে নামলেন। নেমে হতভম্ব হয়ে গেলেন। সেখানে তিনি লাশের কোন নাম নিশানাও দেখতে পেলেন না। হযরত আমরের (রা) মুখ দিয়ে অযাচিতভাবে বের হয়ে পড়লো, "তাহলে কি তাঁর লাশ মাটি গিলে ফেলেছে!" তাঁর বিস্ময় প্রকাশটা সঠিক ছিল। কেননা, হযরত খুবায়েবের (রা) পবিত্র দেহ প্রকৃতপক্ষেই মাটির কোলের শোভা হয়ে গিয়েছিল। এ জন্যই তাঁর উপাধি হলো "বালিয়ুল আরদ" (অর্থাৎ যাকে মাটি গিলে ফেলেছে)। হযরত আমর (রা) মদীনা ফিরে গিয়ে সকল ঘটনা বিশ্ব নবীর (সা) খিদমতে বর্ণনা করলেন।

আল্লামা মুহাম্মাদ (র) বিন সায়াদ কাতিবুল ওয়াকেদী হযরত আমর (রা) বিন উমাইয়ার আরো একটি অভিযানের কথা "সারিয়ায়ে, আমর ইবনুজ জুমরি" শিরোনামে লিপিবদ্ধ করেছেন। এই অভিযান কখন সংঘটিত হয়েছিল সে ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। ইবনে সায়াদের এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী এই অভিযান চতুর্থ হিজরীর সফর মাসে সংঘটিত হয়। অর্থাৎ হযরত আমরের (রা) ইসলাম গ্রহণের অব্যবহিত পরই তিনি যখন এই অভিযান থেকে ফারেগ হয়ে মক্কা থেকে মদীনা ফিরে আসছিলেন তখন পথিমধ্যে বিরে মাউনার শহীদদের লাশ দেখে মুশরিকদের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত হয়ে পড়লেন। তারা তাঁকে গ্রেফতার করলো। কিন্তু ইবনে সায়াদের দ্বিতীয় রেওয়ায়াত থেকে স্পষ্ট হয় যে, এই অভিযান ৬ অথবা ৭ হিজরীতে সংঘটিত হয়েছিল। সে সময় হযরত আমর (রা) হাবশার দূতগিরির কাজ শেষে ফিরে এসেছিলেন। এই অভিযানের সংক্ষিপ্ত ঘটনা হলো ঃ একবার হযরত আমর (রা) বিন উমাইয়ার মনে রাসূলের (সা) সবচেয়ে বড় দুশমন আবু সুফিয়ানকে খতম করে ফেলার

খেয়াল চাপলো। [এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী হযরত আমর বিশ্ব নবীর (সা) ইঙ্গিতে সেই অভিযানে রওয়ানা হয়েছিলেন। কিন্তু এই রেওয়ায়াত দুর্বল] সুতরাং তিনি অন্য একজন সাহাবী হযরত সালমা (রা) বিন আসলাম আনিসারীকে সঙ্গে নিয়ে মক্কা পৌছলেন। মক্কার মুশরিকরা তাঁদেরকে দেখে ক্রোধে ফেটে পড়লো এবং একটি উত্তেজিত জনতা তাঁদেরকে পাকড়াও করার জন্য অগ্রসর হলো। হযরত আমর (রা) নিজের সাথীকে উটের ওপর সওয়ার করালেন এবং তাঁকে সেখান থেকে পালিয়ে যেতে বললেন। হযরত সালমা (রা) দ্রুত গতিতে উট হাঁকিয়ে সেখান থেকে বের হয়ে যেতে পারলেন এবং আমর (রা) মুশরিকদের সামনে চক্কর মারতে লাগলেন। তিনি দুশমনদের নিকটে পৌছে লাফ দিয়ে এমন বিদ্যুৎ বেগে চলে গেলেন যে মুশরিকরা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো। আমর (রা) মক্কা থেকে বেশ দূরে গিয়ে একটি গুহায় লুকিয়ে রইলেন। ভাগ্যের ফের! উসমান (অথবা উবায়েদুল্লাহ) নামক একজন মুশরিক সেখানে এসে উপস্থিত। আমর (রা) হঠাৎ করে হামলা করে তাকে শেষ করে দিলেন এবং মদীনার দিকে যাত্রা করলেন। পথিমধ্যে হযরত সালমার (রা) সঙ্গেও তাঁর সাক্ষাত মিললো। তাঁরা উভয়ে মদীনা আসতে আসতে আরো দু'জন মুশরিককে হত্যা এবং আরেক মুশরিককে গ্রেফতার করে মদীনায় প্রবেশ করলেন। মদীনাবাসী তাঁদের উভয়ের সহীহ সালামতে প্রত্যাবর্তনে খুব খুশী হলেন। হযরত আমর (রা) নবীর (সা) দরবারে হাজির হয়ে সকল ঘটনা বর্ণনা করলেন। ঘটনা শুনে তিনি মুচকি হেসে দিলেন এবং তাঁদের জন্য দোয়া করলেন।

৬ষ্ঠ হিজরীর শেষের দিকে মহানবী (সা) বিভিন্ন দেশের শাসকদের নিকট ইসলামের দাওয়াত সম্বলিত পত্রাবলী প্রেরণ করলেন। তিনি হযরত আমর(রা) বিন উমাইয়াকে নিজের দূত হিসেবে হাবশা প্রেরণ করেন। এই প্রসঙ্গে অধিকাংশ রেওয়ায়াত অনুযায়ী এই দূত প্রেরণের দু'টি লক্ষ্য ছিল ঃ

১. হাবশার বাদশাহ নাজ্জাশীকে ইসলামের দাওয়াত প্রদান।

২. হযরত উম্মে হাবিবাকে (রা) (বিনতে আবু সুফিয়ান) হুজুরের (সা) পক্ষ থেকে নিকাহর পয়গাম প্রদান। প্রখ্যাত দার্শনিক ডাঃ মুহাম্মাদ হামিদুল্লাহ স্বগ্রন্থ "রাসূলে আকরামের (সা) রাজনৈতিক জীবন" -এ লিখেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত আমর (রা) বিন উমাইয়ার হাতে হাবশার বাদশাহকে প্রেরিত পত্রের বিষয়বস্তু ছিল নিম্নরূপ ঃ

"মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর পক্ষ থেকে হাবশার বাদশাহ নাজ্জাশীর নামে—শান্তি বর্ষিত হোক সেই ব্যক্তির ওপর যে হেদায়াতের পায়রবী করেছে।

তারপর! আমি তোমার পক্ষ থেকে সেই আল্লাহর প্রশংসা করছি যে আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। যিনি বাদশাহ থেকে অনেক পবিত্র (সমস্ত দোষ থেকে) সালামত ওয়ালা, নিরাপত্তা দানকারী ও নিগাহবান এবং আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে, ঈসা (আ) বিন মারয়াম হলেন রুহুল্লাহ ও কালিমাতুল্লাহ। আল্লাহ তায়ালা নিজের নির্দেশকে পবিত্র মারয়ামের প্রতি অবতীর্ণ করেন। অতপর তিনি ঈসাকে (আ) পেটে ধারণ করেন। আল্লাহ তায়ালা আদমকে (আ) যেমন নিজের কুদরতী হাত দিয়ে সৃষ্টি করেছিলেন, তেমনি হযরত ইসাকে (আ) নিজের নির্দেশসহ সৃষ্টি করেন এবং আমি তোমাকে অংশীদারহীন একক আল্লাহর দিকে আহবান করছি ও তার আনুগত্যের জন্য বন্ধুত্বের দাওয়াত দিচ্ছি। তুমি আমাকে অনুসরণ কর, আমার ওপর যে কালাম অবতীর্ণ হয়েছে তার ওপর ঈমান আনয়ন করো। আমি আল্লাহর রাসূল (সা) এবং তোমাকেও তোমার কওমকে আল্লাহর দিকে আহবান জানাচ্ছি। আমি তোমাকে রিসালাতের পয়গাম পৌছে দিয়েছি এবং তোমাকে নসিহত করেছি। অতএব আমার নসিহত কবুল করো এবং হেদায়াত অনুসরণকারীদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।"

কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে যে, এই পবিত্র পত্রের প্রভাবে নাজ্জাশী হযরত জাফর তাইয়ারের (রা) হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। কিন্তু অধিকাংশ চরিতকার বলেছেন যে, নাজ্জাশী সেই সময় মুসলমান হয়েছিলেন যখন মুশরিকদের একটি প্রতিনিধি দল মুহাজির মুসলমানদেরকে হাবশা থেকে বহিষ্কারের জন্য তার নিকট গমন করেছিল। নবুওয়াতের ৬ষ্ঠ বছরে এই ঘটনা ঘটে (৬ষ্ঠ হিজরীতে নয়) মুসনাদে আবু দাউদে হযরত আবু হুরায়রা(রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, কুরাইশ প্রতিনিধি দলের কথার জবাবে হযরত জাফর (রা) এমন হৃদয়গ্রাহী ও প্রভাবশালী বক্তৃতা করেছিলেন যে নাজ্জাশীর চক্ষু দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হয়ে গেল এবং তিনি অযাচিতভাবে বলে উঠলেন ঃ

"আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হুজুর (সা) অবশ্যই আল্লাহর রাসূল এবং তিনি সেই ব্যক্তি যাঁর স্বাক্ষ্য ঈসা (আ) বিন মারয়াম (আ) প্রদান করেছিলেন।"

নাজ্জাশী আসমাহার ইসলাম গ্রহণ এবং দ্বিতীয়বার তাঁকে ইসলামের দাওয়াত দানের ঘটনা দ্ব্যর্থবোধক এবং তা বিশ্লেষণের দাবী রাখে। ইমাম মুসলিম (র) লিখেছেন যে, নাজ্জাশী যিনি হযরত জাফরের (রা) হাতে মুসলমান হয়েছিলেন তিনি ৬ষ্ঠ হিজরীর পূর্বে মারা গিয়েছিলেন এবং হুজুর(সা) তাঁর স্থলাভিষিক্তের নিকট তাবলিগী পত্র প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু অন্যান্য নেতৃস্থানীয় চরিতকারদের মধ্য থেকে অধিকাংশই বর্ণনা করেছেন যে,

নাজ্জাশী আসমাহা (রা) [যিনি হযরত জাফরের (রা) হাতে মুসলমান হয়েছিলেন) নবম হিজরীতে ওফাত পান। যেদিন তাঁর ইন্তেকাল হয় রাসূলে অকরাম (সা) সেই দিনই ওহী মারফত মৃত্যু খবর পেয়ে গিয়েছিলেন এবং তিনি সাহাবীদের (রা) সঙ্গে তাঁর গায়েবানা নামাযে জানাজা আদায় করেন। হাফেজ ইবনে কাইয়েম্ (র) মুসলিমের রেওয়ায়াতকে একদমই মানেননি এবং তা বর্ণনাকারীর ধারণা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এই ধারণাই সম্ভবত ঠিক হবে যে, হুজুর (সা) হযরত আমর (রা) বিন উমাইয়ার হাতে যে পত্র নাজ্জাশীকে প্রেরণ করেছিলেন তাতে শুধুমাত্র পদ্ধতিগতভাবে ইসলামের দাওয়াত নবায়ন করেছিলেন। যাহোক, নাজ্জাশী সেই পবিত্র পত্র তাজিমের সঙ্গে গ্রহণ করলেন এবং বাইয়াতের নবায়ন করলেন (ইসলাম গ্রহণ করেননি)। এই ধারণার সমর্থন এভাবেও হয় যে, হুজুরের (সা) নির্দেশ অনুযায়ী হযরত আমর (রা) তাঁর নিকাহর নির্দেশ নাজ্জাশীর দ্বারাই হযরত উম্মে হাবিবার (রা) নিকট পৌঁছালেন।

মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বল এবং তাবকাতে ইবনে সায়াদে আছে যে, হযরত আমর (রা) বিন উমাইয়া হাবশা পৌঁছলে নাজ্জাশী নিজের দাসী আবরাহার মাধ্যমে হযরত উম্মে হাবিবার (রা) নিকট বিশ্ব নবীর (সা) পয়গাম পাঠালেন এবং বলে পাঠালেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে তোমার বিয়ের কথা লিখেছেন। তুমি নিজের কোন উকিল ঠিক করো যাতে এই অনুষ্ঠান আনজাম দেয়া যায়। হযরত উম্মে হাবিবা (রা) খালিদ (রা) বিন সাঈদ বিন আসের নিকট মানুষ প্রেরণ করে তাঁকে নিজের উকিল বানালেন এবং আবরাহাকে নিকাহর পয়গাম আনার খুশীতে রূপার দু'টি কঙ্কন, দু'টি পায়ের অলংকার এবং রূপার কয়েকটি আংটি দিলেন। যখন সন্ধ্যা হলো তখন নাজ্জাশী হযরত জাফর (রা) বিন আবি তালিব, হযরত খালিদ (রা) বিন সাঈদ এবং হাবশায় অবস্থানরত অন্যান্য মুসলমানকেও ডেকে পাঠালেন এবং তাদের সামনে স্বয়ং নিকাহর খুতবা পড়ে চারশ' দিনার মহরানা ঠিক করে হযরত উম্মে হাবিবার (রা) উকিল হযরত খালিদ (রা) বিন সাঈদকে দিলেন। হাফেজ ইবনে কাছির (র) বর্ণনা করেছেন, নিকাহর পর নাজ্জাশী উপস্থিত সকলকে খাবার খাইয়ে বিদায় করেন।

এই রেওয়ায়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, হযরত আমরের (রা) হাবশা পৌঁছার পূর্বেই নাজ্জাশী মুসলমান হয়েছিলেন। নচেৎ হুজুর (সা) নিকাহর পয়গাম তাঁর মাধ্যমে প্রেরণ করতেন না। এমনিতেও এটা ধারণাতীত ব্যাপার যে, একজন নওমুসলিম নিকাহর খুতবাহ পড়লেন এবং তাতে আল্লাহর

একত্ববাদ ও হুজুরের (সা) রিসালাতের কথা অত্যন্ত সুন্দরভাবে স্বীকৃতি দিলেন। এই প্রসঙ্গে হযরত আমর (রা) ইবনুল আছের সেই রেওয়ায়াতের উল্লেখও অপ্রাসঙ্গিক হবে না, যাতে তিনি নিজের ইসলাম গ্রহণের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। হযরত আমর (রা) বিন আছ কুরাইশের পক্ষ থেকে নবুওয়াতের পঞ্চম ও ৬ষ্ঠ বছরে হাবশা গিয়েছিলেন এবং নাজ্জাশীর নিকট তার দেশ থেকে মুসলমানদেরকে বের করে দেয়ার আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু নাজ্জাশী তার আবেদনই শুধু বাতিল করে দেননি বরং স্বয়ং ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত আমর (রা) ইবনুল আছ থেকে বর্ণিত আছে যে, খন্দকের যুদ্ধের পর আমি কুরাইশদের মধ্য থেকে নিজের হামখেয়াল লোকদেরকে একত্রিত করে বললাম, খোদার কসম! আমি মুহাম্মাদের (সা) কাজ প্রতিদিন উন্নতির দিকে যাচ্ছে বলে দেখছি। আমি এখন ঠিক করেছি যে, হাবশার বাদশাহ নাজ্জাশীর নিকট গিয়ে বসবাস শুরু করবো। মুহাম্মাদ (সা) যদি কুরাইশদের ওপর বিজয় লাভ করে তাহলে আর ফিরে আসবে না। আর যদি কুরাইশরা বিজয়ী হয় তাহলে আমাদের জন্য শুধু ভাল আর ভাল।

লোকেরা আমার ধারণাকে সমর্থন করলো। সুতরাং আমি মক্কার পাকা চামড়া বিপুল সংখ্যায় একত্রিত করলাম এবং কতিপয় সাথীর সঙ্গে তা নাজ্জাশীর খেদমতে উপঢৌকন হিসেবে পেশ করার জন্য হাবশা পৌছলাম। সেই সময়ই আমর (রা) বিন উমাইয়া রাসূলের (সা) পক্ষ থেকে দূত হয়ে হাবশা পৌছেন। আমি আমার সাথীদেরকে বললাম যে, আমরা আমরকে (রা) আমাদের হাওয়ালা করে দেয়ার জন্য নাজ্জাশীর নিকট আবেদন জানাবো। তারপর আমরা তাকে শেষ করে দেব। তাহলেই আমাদের প্রতিশোধ নেয়া হবে। তাঁরা আমার প্রস্তাব সমর্থন করলো। সুতরাং আমি নাজ্জাসীর নিকট গেলাম। সে "স্বাগতম, স্বাগতম—আমার বন্ধু" এই বলে আমাকে সম্বর্ধনা জানালো। অতপর আমি যখন মক্কা থেকে আনা চামড়া তার খিদমতে উপঢৌকন হিসেবে পেশ করলাম তখন তিনি খুব খুশী হলেন। এরপর আমি তার নিকট নিবেদন পেশ করে বললাম যে, মক্কা থেকে যে ব্যক্তির দূত আপনার নিকট এসেছে সে আমাদের শত্রু। আপনি সেই দূতকে আমাদের হাওয়ালা করে দিন। তাহলে আমরা আপনার ইহসানমন্দ হবো। নাজ্জাশী আমার কথা শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো এবং রাগে গরগর করতে করতে সজোরে নাকের ওপর থাপ্পর মারলো। ভয়ে আমার শরীর কেঁপে উঠলো। আমি বললাম ঃ

"জাঁহাপনা! খোদার কসম, আমি জানতাম না যে, কথাটি আপনি অসহ্য মনে করবেন। নচেৎ কখনই তা মুখ দিয়ে বের করতাম না।"

নাজ্জাশী বললেন ঃ "তুমি কি আমার কাছে সেই ব্যক্তির দূত ফেরত দাবী করো, যার নিকট জিবরাঈল (আ) আগমন করে থাকে।"

আমি আরজ করলাম, "বাদশাহ সালামত, আপনিকি সত্যি এ ধরনের চিন্তা করে থাকেন?"

নাজ্জাশী বললেন, "হে আমর! তুমি ধ্বংস হও। আমার কথা মেনে নাও এবং তার আনুগত্য কর। খোদার কসম, তিনি হকের ওপর আছেন এবং নিজের শত্রুর ওপর অবশ্যই বিজয়ী হবেন।"

আমি বললাম, "আপনি কি তাঁর পক্ষ থেকে আমার ইসলাম গ্রহণের বাইয়াত নিতে পারেন?

সে বললো, "হাঁ, হাঁ" সুতরাং নাজ্জাশী হাত বাড়িয়ে দিল এবং তার হাতে ইসলামের বাইয়াত নিলাম। তা সত্ত্বেও আমি ইসলামকে গোপন রাখলাম—এমনকি মক্কা বিজয়ের কিছু দিন পূর্বে খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদের সঙ্গে মদীনা গিয়ে হুজুরের (সা) হাতে বাইয়াত করলাম।"

এই রেওয়ায়াত থেকে স্পষ্ট প্রকাশ পায় যে, নাজ্জাশী আসমাহা (রা) হযরত আমর (রা) বিন উমাইয়ার দূতগিরির পূর্বেই মুসলমান হয়েছিলেন। এই দূতগিরির অব্যবহিত পরই উম্মে হাবিবা (রা) এবং অন্যান্য মুসলমান হাবশা থেকে ফিরে আসেন। এটাই ধারণা করা হয় যে, হযরত আমর (রা) বিন উমাইয়াও তাঁদের সঙ্গেই ফিরে এসেছিলেন। সে সময় খায়বার বিজয় হয়ে গিয়েছিল। তাদের প্রত্যাবর্তনে মুসলমানরা দু'ধরনের খুশী হয়েছিল। প্রথমতঃ খায়বার বিজয়ের খুশী এবং দ্বিতীয় বিক্ষিপ্ত ভাইয়ের সাথে মিলিত হওয়ার খুশী।

ওপরের ঘটনাবলী ছাড়া হযরত আমর (রা) বিন উমাইয়ার জীবনের কোন এবং বিশেষ ঘটনা চরিতগ্রন্থসমূহে পাওয়া যায় না। তবে, "তাহজিবুল কামালের" রেওয়ায়াত অনুযায়ী তিনি আমীর মুয়াবিয়ার (রা) ইমারাতের শেষ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন এবং ৬০ হিজরীতে অথবা তার কিছু আগে মদীনায় ওফাত পান। হাফেজ ইবনে হাজার (র) লিখেছেন, মৃত্যুর সময় তিনি জাফর, ফজল এবং আবদুল্লাহ নামে তিন পুত্র রেখে যান।

হযরত আমর (রা) বিন উমাইয়া থেকে ২০টি হাদিস বর্ণিত আছে। তাঁর হাদিস বর্ণনাকারীদের মধ্যে তিন পুত্র ছাড়া শা'বী (র), যবরকান (র), আবুল মুহাজির (র), আবুল কালাবা জারবী (র) এবং আবু সালমা (র) বিন আব্দুর রহমান অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন।

হযরত আমর (রা) বিন উমাইয়া যদিও ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারেননি। তবে, ইসলাম গ্রহণের পর কিছুদিনের মধ্যেই বিশ্ব নবীর (সা) আস্থা অর্জনের সম্মান লাভ করেন। এর প্রকৃত প্রমাণ হলো বি'রে মাউনার সাহাবীদের মধ্যে তার উপস্থিতি। অথচ বি'রে মাউনার কিছুদিন পূর্বেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। সহীহ্ বুখারীতে হযরত উরওয়াহ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, বি'রে মাউনার সাহাবীরা (রা) যখন শহীদ হয়ে গেলেন এবং আমর (রা) বিন উমাইয়া জুমরী গ্রেফতার হলেন তখন তাঁর নিকট আমের বিন তোফায়েল একজন নিহত ব্যক্তির প্রতি ইশারা করে জিজ্ঞেস করলেন যে, এই ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, "তিনি হলেন আমের বিন ফাহিরাহ।" আমের বিন তোফায়েল বললেন, "আমি তার হত্যার পর দেখলাম যে, তার লাশ আকাশের দিকে উঠিয়ে নেয়া হলো, এমনকি তিনি দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তার (কিছুক্ষণ পর) তাকে মাটির উপর রেখে দেয়া হলো।"

এমনিভাবে মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বল এবং তিবরানীতে রাজির ঘটনার ব্যাপারে স্বয়ং হযরত আমর (রা) বিন উমাইয়া থেকে বর্ণিত আছে ঃ

"প্রিয় নবী (সা) কুরাইশের খবর নেয়ার জন্য আমাকে একাকী মক্কা প্রেরণ করলেন। সেখানে গিয়ে আমি সেই লাকড়ীর দিকে অগ্রসর হলাম যার ওপর খোবায়েব (রা) বিন আদিকে শুলিতে চড়ানো হয়েছিল এবং আমি পাহারাদারদের ব্যাপারে ভয় পাচ্ছিলাম। আমি লাকড়ীর ওপর আরোহণ করলাম এবং খোবায়েবের (রা) দেহের সাথে বাঁধা রশি কেটে দিলাম। তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন। আমি নীচে নেমে তার লাশ পেলাম না। মাটি যেন তাকে নিজের মধ্যে লুকিয়ে ফেলেছিল।

হযরত আমর (রা) বিন উমাইয়ার হাবশায় দূতগিরি তাঁর মহান মর্যাদার প্রমাণ দেয়। এটা কোন সাধারণ ধরনের দূতগিরি ছিল না। তার একটি লক্ষ্য ছিল স্বয়ং রাসূলের (সা) একটি বিশেষ ব্যক্তিগত কাজ আঞ্জাম দেয়া। এটা স্পষ্ট যে, এ জন্য এমন ধরনের কোন ব্যক্তিকেই প্রেরণ করা যেত যার মেধা, নিষ্ঠা ও দিয়ানতের ওপর রাসূলের (সা) পূর্ণ আস্থা ছিল। এটা হযরত আমর(রা) বিন উমাইয়ার সৌভাগ্য ছিল যে, রহমতে আলম (সা) তাঁকে এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। তিনি যেন হুজুরের (সা) আস্থাভাজন সাহাবীদের অন্যতম ছিলেন। এমন একজন জালিলুল কদর সাহাবীর নাম বিকৃত করা এবং তার সঙ্গে কল্পকাহিনী সংশ্লিষ্ট করা নিসন্দেহে বড় গুনাহর কাজ।

হযরত আবু তালহা যায়েদ (রা)

বিন সাহাল আনসারী

নবীর (সা) যুগের এক সন্ধ্যাকাল। রহমতে আলম (সা) পতঙ্গবৎ সাহাবীদের (রা) এক দলের মধ্যে বসেছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি খুব পেরেশান অবস্থায় তাঁর খিদমতে হাজির হয়ে আরজ করলেন :

"হে আল্লাহর রাসূল! আমি একজন মুসাফির। মদীনায় থাকা ও খাওয়ার জন্য আমার কোন ব্যবস্থা নেই। আপনার সাহায্যের মুখাপেক্ষী।"

হুজুর (সা) তৎক্ষণাৎ আজওয়াজে মুতাহহিরাতকে (রা) জিজ্ঞেস করে পাঠালেন যে, ঘরে খাবার কিছু আছে কিনা। সবদিক থেকে জবাব এলো আজ সকলেই অভুক্ত। এ সময় হুজুর (সা) সাহাবীদের (রা) দিকে তাকালেন এবং বললেন :

"এমন কেউ আছে কি যে আল্লাহর এই বান্দাকে মেহমান বানাবে?"

হুজুরের (সা) এই ইরশাদ শুনে গমের রঙের এক হাস্যোজ্জ্বল চেহারার যুবক, যাঁর কপাল ঈমানের আলোয় ঝলমল করছিল উঠে দাঁড়ালেন এবং আরজ করলেন :

"হে আল্লাহর রাসূল! তাকে আমি সাথে করে নিয়ে যাবো।"

একথা বলেই তিনি বাড়ি গেলেন এবং স্ত্রীকে মেহমান আগমনের খবর অবহিত করলেন। তিনি বললেন :

"বাচ্চাদের জন্য সামান্য খাবার রান্না করেছি। আল্লাহর কসম! এ ছাড়া ঘরে আর কোন খাবার নেই।"

সেই ব্যক্তি বললেন : "কোন অসুবিধা নেই। বাচ্চাদেরকে ভুলিয়ে ভালিয়ে শুইয়ে দাও। যখন তারা ঘুমিয়ে পড়বে তখন আমরা তাদের খাবার মেহমানের সামনে রেখে দেবো। তুমি বাতি ঠিক করার বাহানা করে দাঁড়িয়ে তা নিভিয়ে দিবে। অন্ধকারে মেহমান খাবার খেয়ে নেবেন এবং আমরাও এমনি এমনি মুখ চালাতে থাকবো।"

মোটকথা এভাবে মেহমানকে খাবার খাইয়ে স্বামী স্ত্রী উভয়ে এবং বাচ্চারা অভুক্ত অবস্থায় রাত কাটিয়ে দিলেন। সকালে যখন এই মেযবান হুজুরের (সা) খিদমতে হাজির হলেন তখন রাসূলের যবানে এই আয়াত উচ্চারিত হচ্ছিল :

وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ –

"তারা নিজেদের চেয়ে অন্যদেরকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। যদিও তারা অভুক্তও থেকে থাকে।"

এবং হুজুর (সা) বলছিলেন ঃ "রাতে মেহমানের সাথে তোমাদের আচরণ আল্লাহ তায়ালা খুব পসন্দ করেছেন।"

হুজুরের (সা) ইরশাদ শুনে তিনি এত খুশী হয়েছিলেন যে, মাটির ওপর তার পা আর থাকছিল না। অন্য একদিনও এই একই ব্যক্তি হুজুরের (সা) খিদমতে হাজির ছিলেন। এমন সময়

لَنْ تَنَالُوْا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ

"যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় খরচ না করবে ততক্ষণ তোমরা অবশ্যই কল্যাণ পাবে না।"

এই আয়াত নাযিল হলো। এই ব্যক্তি মসজিদে নববীর সামনে এক প্রশস্ত, উর্বর এবং সুষমামণ্ডিত বাগানের মালিক ছিলেন। সেই বাগানের "বিরহা" নামক কূপের পানি খুব পরিষ্কার, মিষ্টি ও সুবাসিত ছিল। প্রিয় নবী (সা) এই কূপের পানি খুব উৎসাহের সাথে পান করতেন। মদীনা মুনাওয়ারাতে এই ধরনের সম্পদ খুবই নিয়ামতের বস্তু ছিল। কিন্তু এই ব্যক্তি উঠে দাঁড়ালেন এবং আরজ করলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল! আমার সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ হলো "বিরহা" আমি আল্লাহর পথে তা ওয়াকফ করছি এবং আল্লাহর কসম। একথা যদি লুকিয়ে রাখা যেত তাহলে আমি তা কখনো প্রকাশ করতাম না।"

আল্লাহর পথে তার খরচের আবেগ দেখে হুজুরের (সা) চেহারা মুবারক খুশীতে ঝলমল করে উঠলো। তার কল্যাণের জন্য দোয়া করলেন এবং বললেন যে, এই সম্পদ তুমি তোমার আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বন্টন করে দাও। তিনি তৎক্ষণাত রাসূলের (সা) নির্দেশ তামিল করলেন এবং এই সকল সম্পত্তি নিজের আত্মীয়দের মধ্যে বন্টন করে দিলেন।

এই সাহাবী (রা) যাঁর নজীরবিহীন ত্যাগ ও কুরবানী আল্লাহর নিকট গ্রহণীয় হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছিল এবং যাঁর কল্যাণের আবেগ রাসূলকে(সা) খুশী করেছিল, তিনি ছিলেন হযরত আবু তালহা যায়েদ (রা) বিন সাহাল আনসারী।

হযরত আবু তালহা (রা) যায়েদ বিন সাহাল খাজরাজের সেই খান্দানের নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে ছিলেন যাকে বিশ্ব নবী (সা) আনসারের সকল খান্দানের মধ্যে উত্তম বলে অভিহিত করেছিলেন। অর্থাৎ এই খান্দানটি ছিল বনু নাজ্জার। নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বছরে বাইয়াতে উকবায়ে কাবিরার পূর্বে তিনি ছিলেন একজন সুশ্রী যুবক। রিসালাতের সূর্য ফারান পর্বতমালার ওপর দিয়ে উদিত হয়েছিল এবং তার কিরণমালা ইয়াছরাবের ভূখণ্ড পর্যন্ত এসে পড়েছিল। নবুওয়াতের ১১-১২ বছরে ইয়াছরাবের অনেক নেক প্রকৃতির মানুষ মক্কা গিয়ে রাসূলে আকরামের (সা) পবিত্র কদমে স্থান করে নিয়েছিলেন এবং ইসলামের দায়িয়ে আউয়াল হযরত মাসয়াব (রা) বিন উমায়ের তাঁদের দাওয়াতে ইয়াছরাব এসে প্রতিটি ঘরে ইসলামের আলো সম্প্রসারিত করছিলেন। কিন্তু আবু তালহা যায়েদের পানাহার ও নৃত্যগীতের মাহফিল ছাড়া অন্যদিকে মনোযোগ দানের সুযোগই হতো না। তিনি কাঠের এক মূর্তিকে নিজের মা'বুদ বানিয়ে রেখেছিলেন। সেই যুগে তিনি বনু নাজ্জারের এক বিধবা মহিলা উম্মে সুলাইম (রা) বিনতে মিলহানকে নিকাহর পয়গাম পাঠিয়েছিলেন। উম্মে সুলাইম (রা) বেশ কিছুদিন যাবত ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং নিজের পুত্র আনাস (রা) বিন মালিককে লালন পালন করছিলেন। আনাস (রা) বয়োঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর আর কোন বস্তু উম্মে সুলাইমের (রা) দ্বিতীয় নিকাহর পথে বাধা ছিল না। কিন্তু তিনি আবু তালহাকে বলে পাঠালেন ঃ

"আমিতো আল্লাহর সাচ্চা রাসূলের (সা) ওপর ঈমান এনেছি। তোমার জন্য দুঃখ যে তুমি কাঠের মূর্তি পূজা কর। যা কোন লাভ অথবা লোকসান করতে পারে না। আমি হলাম একক আল্লাহর ইবাদাতকারী আর তুমি হলে মূর্তিপূজারী। আমার তোমার মিল কি করে হতে পারে?"

উম্মে সুলাইমের (রা) কথা আবু তালহার অন্তরে বসে গেল। কিছুদিন চিন্তা-ভাবনা করলেন। অতপর হযরত উম্মে সুলাইমের (রা) নিকট এসে ইসলাম গ্রহণ করে ফেললেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণে উম্মে সুলাইম (রা) এত খুশী হলেন যে স্বতস্ফূর্ত তাঁকে বললেন ঃ

"আমি এখন তোমার সাথে নিকাহ বসতে সম্মত আছি। দুনিয়ার মোহর মাফ করে দিচ্ছি এবং নিজের মোহর তোমার ইসলামকে ধার্য করছি।"

অতপর পুত্র আনাসকে (রা) বললেন ঃ "এখন তুমি তাঁর সঙ্গে আমার নিকাহ দিয়ে দাও।"

সুতরাং হযরত আনাস (রা) নিজের মায়ের নিকাহ হযরত আবু তালহার(রা) সঙ্গে পড়িয়ে দিলেন। তিনি বলতেন "আমার মায়ের নিকাহ হযরত আবু তালহার সঙ্গে আশ্চর্য ধরনের মোহরের বিনিময়ে হয়েছিল।"

ইসলাম গ্রহণের পর হযরত আবু তালহার (রা) আনসারের সেই ৭৫ পবিত্র নফসের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় মর্যাদা লাভ ঘটেছিল যারা নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বছরে মক্কা গিয়ে বিশ্ব নবীর (সা) খিদমতে হাজির হয়ে বাইয়াত গ্রহণ করেন এবং এই প্রতিশ্রুতি দেন যে, তাঁরা নিজেদের জীবন, ধন-সম্পদ এবং সন্তান দিয়ে রহমতে আলমকে (সা) সাহায্য করবেন। ইতিহাসে এই বাইয়াতকে বাইয়াতে লাইলাতুল উকবা, বাইয়াতে উকবায়ে ছানিয়া এবং বাইয়াতে উকবায়ে কাবিরাহ নামে ডাকা হয়। ইসলামের ইতিহাসে এই বাইয়াত মাইল ফৌনের মর্যাদা রাখে। নেতৃস্থানীয় চরিতকারদের নিকট বাইয়াতে উকবায়ে উলা ও ছানিয়ায় অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের (রা) মর্যাদা খোলাফায়ে রাশেদীন, আজওয়াজে মুতাহহিরাত (রা) এবং প্রথম যুগের মুহাজিরদের পর অন্যান্য সকল সাহাবী (রা) থেকে আফজাল বা সর্বোত্তম।

রাসূলে আকরামের (সা) মদীনা মুনাওয়ারাতে শুভ পদার্পণের কয়েকমাস পর ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এ সময় হযরত আবু তালহাকে (রা) আমিনুল উম্মাত হযরত আবু উবায়দা (রা) ইবনুল জাররাহর ভাই বানানো হয়। দ্বিতীয় হিজরীতে বদরের ময়দানে যখন হক ও বাতিলের প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয় তখন হযরত আবু তালহা (রা) সেই তিনশ' তের জন হকের জানবাজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। যাদেরকে "আসহাবে বদর" বা বদরী সাহাবীর মহান উপাধিতে ডাকা হয় এবং যাদের মহান মর্যাদার ব্যাপারে সকল চরিতকারের মধ্যে মতৈক্য রয়েছে।

তৃতীয় হিজরীতে ওহোদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। হযরত আবু তালহা (রা) এই যুদ্ধেও অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে অংশ নেন। ঘটনাক্রমে একটি ভুলের কারণে যখন যুদ্ধের গতি ফিরে গেল তখন তিনি সেই কতিপয় সাহাবীর (রা) অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা শেষ পর্যন্ত রহমতে আলমের (সা) চারপাশে দাঁড়িয়ে প্রতিশোধমূলক বীরত্ব প্রদর্শন করতে থাকেন এবং কোন মুশরিককে হুজুর (সা) পর্যন্ত পৌঁছতে দেননি। হযরত আবু তালহা (রা) ঢাল নিয়ে হুজুরের (সা) সামনে দাঁড়িয়েছিলেন এবং অত্যন্ত উৎসাহের সাথে তীরের পর তীর ছুঁড়তে লাগলেন।

তাঁর তীর নিক্ষেপের প্রচণ্ডতার অবস্থা এমন ছিলো যে, পরপর তিনটি ধনু ভেঙ্গে গেল। ইত্যাবসরে প্রিয় নবী (সা) যখনই পবিত্র গরদান উঠিয়ে

কাফেরদের দিকে দেখতেন তখনই আবু তালহা (রা) আরজ করতেন "আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরআন হোক। গরদান উঠিয়ে দেখবেন না। বলা যায় না আপনার গর্দানে কোন তীর লেগে যেতে পারে। আমার বুক আপনার বুকের সামনে রয়েছে।" হুজুরকে (সা) রক্ষা করতে করতে তাঁর একটি হাত অবশ হয়ে গেল। কিন্তু তিনি উঃ শব্দ করলেন না। হুজুর (সা) তাঁর আত্মোৎসর্গের আবেগ দেখে খুব খুশী হলেন এবং বললেন ঃ

"সেনাবাহিনীতে আবু তালহার আওয়াজ শত মানুষ থেকেও উত্তম।"

ওহোদের যুদ্ধের পর খন্দকের যুদ্ধে এবং অন্যান্য সকল যুদ্ধেও একজন আবেগোজ্জ্বল মুজাহিদ হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। খায়বারের যুদ্ধে তাঁর উট বিশ্ব নবীর (সা) উটের পাশাপাশি চলছিল। সেই যুদ্ধেই বিশ্ব নবী (সা) তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, খুব উঁচু স্বরে মুসলমানদেরকে গাধার গোশত খাওয়া থেকে নিষেধ করে দাও। খায়বার বিজয়ের পর হুজুর (সা) মদীনা মুনাওয়ারা ফিরে আসার সময় পথিমধ্যে তাঁর উট হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল এবং বিশ্ব নবী (সা) ও উম্মুল মু'মিন হযরত সুফিয়া (রা) বিনতে হাই সুমাইত উটের ওপর বসেছিলেন। তাঁরা মাটিতে পড়ে যাচ্ছিলেন। হযরত আবু তালহা (রা) নিকটেই ছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ নিজের উট থেকে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং দৌড়ে হুজুরের (সা) নিকট পৌঁছলেন। তাঁকে পাহারা দিলেন এবং অস্থির চিত্তে জিজ্ঞেস করলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল। আঘাত লাগেনিতো?"

হুজুর (সা) বললেন ঃ না, তবে মহিলার খবর নাও।"

হযরত আবু তালহা (রা) মুখের ওপর রুমাল নিক্ষেপ করে হযরত সুফিয়ার (রা) নিকট পৌঁছলেন এবং তাঁর হাওদা ঠিক করে উটের ওপর বসিয়ে দিলেন।

অষ্টম হিজরীতে হযরত আবু তালহা (রা) সেই ১০ হাজার পুণ্যাত্মার দলে শামিল হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছিলেন যাঁরা মক্কা বিজয়ের সময় প্রিয়নবীর(সা) সফরসঙ্গী ছিলেন এবং যাঁদের সম্পর্কে বহু শতাব্দী পূর্বে কিতাবে ইসতিছনাতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল।

মক্কা বিজয়ের পর তিনি নিজের স্ত্রী উম্মে সুলাইমের (রা) সঙ্গে হুনাইনের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। এই যুদ্ধে তিনি এমন নজীরবিহীন বীরত্ব ও অটলতা প্রদর্শন করেন যে, নিজের আত্মীয় ও অনাত্মীয় সকলেই বিস্মিত হয়ে যান। বনু হাওয়াযিনের পারদর্শী তীরন্দাজরা গুপ্তভাবে বসে এত প্রচণ্ডতার সঙ্গে তীর ও পাথর নিক্ষেপ করেছিলো যে মুসলমানদের ব্যূহসমূহ একদম বিশৃংখল হয়ে

পড়েছিল। সেই সময় যেসব ব্যক্তি বিশ্ব নবীর (সা) সঙ্গে অটল পাথর হয়ে যুদ্ধের ময়দানে অবস্থান নিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে হযরত আবু তালহাও (রা) ছিলেন। তিনি সেই দিন ২০-২১ জন মুশরিককে জাহান্নামে প্রেরণ করেন। যখন প্রচণ্ড যুদ্ধ হচ্ছিল তখন হযরত উম্মে সুলাইম (রা) খঞ্জর হাতে নিয়ে নবীর (সা) জন্য জীবন কুরবান করার উদ্দেশ্যে কোমর বেঁধে দাঁড়িয়েছিলেন এবং হযরত আবু তালহা (রা) হুজুরের (সা) ডাইনে ও বাঁয়ে এমন আত্মহারা হয়ে লড়াই করছিলেন যে, কোন হুঁশ ছিল না। উম্মে সুলাইমের (রা) ওপর নজর পড়তেই হুজুরের (সা) নিকট আরজ করলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল! উম্মে সুলাইম (রা) খঞ্জর হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে।"

হুজুর (সা) উম্মে সুলাইমকে (রা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ "খঞ্জর দিয়ে কি করবে?"

তিনি জবাব দিলেন "ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন মুশরিক নিকটে এলে তার পেট ফেড়ে ফেলবো।"

হুজুর (সা) তাঁর জবাব শুনে মুচকি হাসি দিলেন।

দশম হিজরীতে বিদায় হজ্জে হযরত আবু তালহা (রা) রহমতে আলমের (সা) সঙ্গে মক্কা গেলেন। সেখানে গিয়ে তিনি এক মহান নেয়ামত লাভ করলেন। হুজুর (সা) মিনায় মাথা মুণ্ডন করালেন। এ সময় পবিত্র মাথার বাম দিকের সকল পবিত্র চুল তিনি হযরত আবু তালহাকে (রা) প্রদান করলেন। এই নিয়ামত লাভের পর তিনি এতখুশী হয়েছিলেন যে, বারবার আল্লাহর শুকুর আদায় করতেন।

একাদশ হিজরীতে মহানবী (সা) ওফাত পেলেন। তখন হযরত আবু তালহার (রা) ওপর দুঃখের পাহাড় ভেঙ্গে পড়লো। তাসত্ত্বেও সে সময় তিনি এমন এক মর্যাদা লাভ করলেন যে তাঁর কোন জুড়ি নেই। হুজুরের (সা) কবর মুবারক খননের কথা উঠলে সাহাবায়ে কিরামের (রা) দৃষ্টি হযরত আবু তালহা এবং হযরত আবু ওবায়দা (রা) ইবনুল জাররাহর ওপর নিপতিত হলো। প্রথমজন বগলী কবর খননে এবং পরের জন সিন্দুকী কবর খননে পারদর্শী ছিলেন। উভয় ব্যক্তিকে এই খেদমত আঞ্জাম দেয়ার জন্য পয়গাম প্রেরণ করা হলো এবং সঙ্গে সঙ্গে এও সিদ্ধান্ত নেয়া হলো যে, তাঁদের মধ্য থেকে যিনি আগে পৌঁছবেন তিনিই কবর খনন করবেন। বস্তুত নবী করিম (সা) বগলী কবর পসন্দ করতেন। এ জন্য সাহাবা কেরামের (রা) আন্তরিক কামনা ছিল যেন আবু তালহা (রা) আগে পৌঁছেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁদের দোয়া কবুল

করলেন এবং হযরত আবু তালহা (রা) আগে পৌঁছে গেলেন। সুতরাং হুজুরের (সা) স্থায়ী আরামস্থল তৈরীর মর্যাদা তিনিই লাভ করলেন।

হুজুরের (সা) ইন্তেকালের পর হযরত আবু তালহা (রা) সিরিয়া চলে যান এবং সেখানেই আবাস গড়ে তোলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) শাসনকালের এবং হযরত ওমর ফারুকের (রা) শাসনকালের অধিকাংশ সেখানেই তিনি অতিবাহিত করেন এবং সে যুগের অনেক যুদ্ধে একজন আবেগ উদ্বেলিত মুজাহিদ হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। অন্তরে যখনই কোন আবেগ উত্থিত হতো তখনই মদীনা মুনাওয়ারা আসতেন এবং হুজুরের (সা) পবিত্র রওজায় হাজির হয়ে নিজের অস্থির অন্তরের শান্তির সামান সঞ্চয় করতেন। হযরত ওমরের (রা) ওফাতের সময় নিকটবর্তী হলে ঘটনাক্রমে হযরত আবু তালহা (রা) মদীনায় উপস্থিত ছিলেন। নিজের স্থলাভিষিক্ত নির্বাচনের জন্য ফারুকে আজম (রা) ৬ সদস্যের মজলিশে শুরা মনোনীত করেন। হযরত আবু তালহাকে (রা) ডেকে তার পাহারাদার নিযুক্ত এবং এ প্রসংগে তাঁকে প্রয়োজনীয় ওসিয়ত করলেন। হযরত ওমর ফারুকের (রা) ইন্তেকালের পর তিনি পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে সেই ওসিয়ত পালন করলেন এবং কোন হাঙ্গামা ছাড়া হযরত ওসমান জুন্নুরাইন (রা) খলিফা নির্বাচিত হয়ে গেলেন।

এরপর হযরত আবু তালহা (রা) নির্জনতা অবলম্বন করেন এবং নিজেকে সবসময়ের জন্য আল্লাহর ইবাদাতে ওয়াক্‌ফ করে দিলেন। একদিন সূরায়ে তাওবা তিলাওয়াত করছিলেন। যখন এই আয়াতে পৌঁছলেন ঃ

انْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالاً وَّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

"তোমরা বের হয়ে পড়—হালকাভাবে কিংবা ভারী ভারাক্রান্ত হয়ে। আর জিহাদ কর আল্লাহর পথে নিজেদের মাল সামান ও নিজেদের জান-প্রাণ সঙ্গে নিয়ে।"

তখন অন্তরে জিহাদের উৎসাহের আগুন প্রজ্জলিত হয়ে উঠলো। পরিবার-পরিজনদেরকে নিজের জিহাদে গমনের কথা বললেন। সে সময় তাঁর বয়স প্রায় ৭০ বছর হয়ে গিয়েছিল এবং অধিক রোযা রাখার কারণে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। এ জন্য পরিবার-পরিজনরা তাঁর সফরের বন্দোবস্ত করার প্রশ্নে চিন্তা-ভাবনা করছিলো এবং বললো যে আপনি আপনার জীবনে

অনেক জিহাদ করেছেন। এখন আরাম করুন। আমরা আপনার পক্ষ থেকে জিহাদে গমন করবো। কিন্তু হযরত আবু তালহা (রা) নিজের কথার ওপর অটল রইলেন। অবশেষে ঘরের লোকজন তাঁর নির্দেশ পালন করলো এবং ৭০ বছর বয়সের এই জালিলুল কদর মুজাহিদ আল্লাহর পথে লড়াই করার জন্য ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন। সেই যুগে নৌবাহিনী একটি অভিযানে যাত্রা করছিলো। তিনি তাতে শামিল হয়ে জাহাজে সওয়ার হয়ে গেলেন। বার্ধক্য এবং রোযার আধিক্যে শক্তি আর অবশিষ্ট ছিল না। একদিন যখন তুফানের কারণে জাহাজ প্রচণ্ডভাবে আন্দোলিত হচ্ছিল তখন তাঁর আত্মাপাখী দেহের খাঁচা থেকে উড়ে গেল। সাত দিন পর জাহাজটি কোন এক দ্বীপের কিনারায় গিয়ে লাগলো। সেই সাত দিন লাশ তেমনি পড়েছিল। তাতে সামান্যতম পরিবর্তনও হয়নি। লোকজন শুকনো মাটিতে নেমে সেই দীপেই তাঁর স্থায়ী আরামস্থল বানালেন। ওফাতের সাল সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের রেওয়ায়াত পাওয়া যায়। এসব রেয়ায়াতের মধ্যে সবচেয়ে বিশ্বস্ত রেওয়ায়াত হলো হযরত আনাস (রা) বিন মালিকের [হযরত আবু তালহার (রা) সতালো পুত্র]। সেই রেওয়ায়াত অনুযায়ী তিনি ৫১ হিজরীতে ওফাত পেয়েছিলেন। এটা ছিল আমীরে মুয়াবিয়ার (রা) শাসনকাল। ধারণা করা হয় যে, হযরত আবু তালহা (রা) সেই নৌ অভিযানে অংশ নিয়েছিলেন যা আমীরে মুয়াবিয়া (রা) কাসতানতুনিয়া পদানত করার জন্য প্রেরণ করেছিলেন।

হযরত আবু তালহা (রা) যায়েদ বিন সাহাল আনসারী জালিলুল কদর সাহাবীর (রা) মধ্যে পরিগণিত হয়ে থাকেন। তাঁর ফজিলত ও কামালিয়াতের একটি স্বীকৃত দুনিয়া ছিল। এ জন্য মুহাদ্দিসরা তাঁকে ফুজালায়ে সাহাবার দলে শামিল করেছেন। যদিও তিনি প্রিয় নবীর (সা) বরকতপূর্ণ সুহবতে বছরের পর বছর কাটিয়েছেন তবুও হাদিস বর্ণনার ব্যাপারে খুব সতকর্তা অবলম্বন করেছেন। বস্তুত তাঁর থেকে শুধুমাত্র ৯২টি হাদিস বর্ণিত হয়েছে। রাসূলে আকরাম (সা) তাঁর ঈমানের জোশ এবং কুরবানীর আবেগের খুব কদর করতেন। তিনিও হুজুরকে (সা) প্রচণ্ডভাবে ভালবাসতেন, তাঁর গৃহে কখনো কোন বস্তু এলে যতক্ষণ পর্যন্ত তা থেকে কিছু রাসূলের (সা) খিদমতে প্রেরণ না করতেন ততক্ষণ শান্তি হতো না। আপাদমস্তক নিষ্ঠায় পরিপূর্ণ ছিল। এ জন্য হুজুর (সা) তাঁর প্রেরিত অতি সাধারণ জিনিসও গ্রহণ করতেন।

রহমতে আলম (সা) কোন নির্দেশ দিলে তা জীবনের মন্ত্র বানিয়ে নিতেন এবং তা পালন করাকে ঈমানের অংশ হিসেবে মনে করতেন। জীবন চলে যাওয়াকে তিনি বরাশত করতে পারতেন, কিন্তু রাসূলের (সা) শরীরে

সামান্যতম একটা কাঁটা বিদ্ধ হওয়াকেও তিনি সহ্য করতে পারতেন না। ওহোদ ও হুনাইনের যুদ্ধে তিনি এমন জানবাজী ও ফিদাকারীর উদাহরণ সৃষ্টি করেন যে, তা তাঁকে রাসূলের (সা) জন্য জীবন উৎসর্গকারীদের কাতারে এমন এক স্থান প্রদান করে যে, তাতে অন্যরা ঈর্ষা পোষণ করতেন। একবার মদীনায় গুজব ছড়িয়ে পড়লো যে, শত্রুরা হঠাৎ করে হামলা করার জন্য অমুক স্থানে ঘাপটি মেরে বসে আছে। হুজুর (সা) মানুষের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বাহাদুর ছিলেন। তিনি হযরত আবু তালহার (রা) নিকট তাঁর ঘোড়া "মানদুব"-কে চেয়ে পাঠালেন এবং তার ওপর সওয়ার হয়ে একাকী ভীতিমূলক স্থানের দিকে রওয়ানা দিলেন। হযরত আবু তালহা (রা) বেচাইন হয়ে গেলেন এবং তাঁর হেফাজতের ধারণায় পিছু পিছু চললেন। কিছুদূর যাওয়ার পর হুজুরকে (সা) ফিরে আসা অবস্থায় পেলেন। তিনি বললেন, "আবু তালহা, সেখানে তো কিছুই নেই। হাঁ, তোমার ঘোড়া খুব দ্রুতগামী।"

মদ হারাম হওয়ার পূর্বে একদিন তিনি উৎকৃষ্ট ধরনের মদ পান করছিলেন। জনৈক ব্যক্তি এসে খবর দিল যে কেবলমাত্র রাসূলের (সা) ওপর অবতীর্ণ আয়াতে মদ পান হারাম করা হয়েছে। আবু তালহা (রা) তৎক্ষণাৎ মদের পাত্র ছুঁড়ে মারলেন এবং সতালো পুত্র আনাসকে (রা) বললেন, মদের এই পাত্র ভেঙ্গে ফেলো। তিনি তা ভেঙ্গে বাইরে নিক্ষেপ করলেন। সেদিন থেকে তিনি মদের নামও শুনতে পারতেন না।

একদিন জানতে পেলেন যে, রাসূলে আকরাম (সা) অভুক্ত রয়েছেন। তাতে তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন এবং বাড়ি গিয়ে স্ত্রী উম্মে সুলাইমকে (রা) বললেন, হুজুর (সা) অভুক্ত রয়েছেন। তাঁর জন্য অবিলম্বে খাবার প্রেরণ কর। তিনি পুত্র আনাসকে (রা) কিছু রুটি দিয়ে বললেন, "এক্ষুণি গিয়ে প্রিয় নবীকে (সা) খাবার খাওয়াও।" হুজুর (সা) সে সময় মসজিদে ছিলেন এবং তার চারপাশে অনেক সাহাবীর (রা) ভীড় ছিল। তিনি হযরত আনাসকে (রা) দেখে বললেনঃ

"আবু তালহা তোমাকে পাঠিয়েছেন?"

হযরত আনাস (রা) আরজ করলেন ঃ "অবশ্যই হে আল্লাহর রাসূল।"

হুজুর (সা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ "খাওয়ার জন্য?"

তিনি বললেন ঃ "জ্বি হ্যাঁ"।

হুজুর (সা) সকল সাহাবীকে (রা) নিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং হযরত আবু তালহার (রা) বাড়ি গেলেন। তিনি মনে মনে ভাবলেন যে, এত মানুষের জন্য তো খাবার হবে না। হযরত উম্মে সুলাইমের (রা) নিকট নিজের সন্দেহের

কথা জিজ্ঞেস করলেন। তখন তিনি বললেন, ব্যাপারটি আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল (সা) বেশী বোঝেন।" তারপর যে খাবার ছিল তা আবু তালহা (রা) প্রফুল্ল চিত্তে রাসূলে করিম (সা) ও সাহাবীদের (রা) সামনে এনে রাখলেন। আল্লাহ তায়ালা তাতে এতো বরকত দিলেন যে, সকলেই একদম আসুদাহ হয়ে গেলেন। হযরত আবু তালহার (রা) স্ত্রী হযরত উম্মে সুলাইমও (রা) জালিলুল কদর মহিলা সাহাবীদের মধ্যে পরিগণিত হতেন। পিতার দিক থেকে তিনি রাসূলের (সা) পরদাদী সালমার পুতি ছিলেন। এ কারণে তিনি হুজুরের(সা) খালা হিসেবে মশহুর ছিলেন। জালিলুল কদর সাহাবী খাদেমে রাসূল (সা) হযরত আনাস (রা) তাঁর প্রথম স্বামী মালিক বিন নাজারের ঔরষজাত ছিলেন। বিধবা হওয়ার পর তিনি হযরত আনাসের (রা) বয়োঃপ্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত একাকী তাঁর লালনপালন করেন। নবীর (সা) হিজরতের পর তিনি তাঁর কিশোর পুত্র আনাসকে (রা) হুজুরের (সা) খাদেম বানিয়ে দিলেন এবং দশটি বছর তিনি তাঁর খাদেম ছিলেন। হযরত আবু তালহা (রা) উম্মে সুলাইমের তাবলীগে মুসলমান হয়েছিলেন এবং তারপর তিনি তাঁকে নিকাহ করেছিলেন। আবু তালহার (রা) ইসলাম গ্রহণ উম্মে সুলাইমের (রা) মোহর নির্ধারিত হয়। মশহুর সাহাবী হযরত ছাবিত (রা) বিন কায়েস আনসারী বলেছেন যে, আমি কোন মহিলার মোহর উম্মে সুলাইমের (রা) মোহর থেকে উত্তম পাইনি।

হযরত উম্মে সুলাইমের (রা) গর্ভে হযরত আবু তালহার (রা) কয়েকটি সন্তান হয়। কিন্তু একমাত্র একটি পুত্র "আবদুল্লাহ" ছাড়া সকলেই শৈশবকালে মারা যান। হযরত আবদুল্লাহ (রা) জন্মগ্রহণ করলে হযরত আবু তালহা (রা) তাঁকে হুজুরের (সা) খিদমতে পেশ করলেন। তিনি খেজুর চিবিয়ে নবজাতককে তার বিচি গালে দিলেন এবং তার নাম রাখলেন আবদুল্লাহ। তিনি বড় হলে স্বয়ং হুজুরে আকরাম (সা) তাকে প্রশিক্ষণ দিলেন এবং তিনি একজন বিরাট জ্ঞানীগুণী হয়েছিলেন। হযরত আবদুল্লাহর (রা) মাধ্যমেই হযরত আবু তালহার (রা) বংশধারা অব্যাহত থাকে।

হযরত আবু তালহা (রা) এবং তাঁর খান্দানের লোকজনের সাথে রাসূলে আকরামের (সা) গভীর সম্পর্ক ছিল। তিনি কখনো কখনো হযরত আবু তালহার (রা) বাড়ি তাশরীফ নিতেন এবং দ্বিপ্রহরের সময় সেখানেই আরাম করতেন। আবু তালহার (রা) একটি অল্পবয়স্ক পুত্রের নাম ছিল আবু উমায়ের। সে সুন্দর কণ্ঠস্বরের একটি পাখি পুষতো। হঠাৎ করে পাখিটি মরে গেল। তাতে শিশু আবু উমায়ের খুব কষ্ট পেল। ইত্যবসরে রাসূলে আকরাম(সা)

তাশরিফ রাখলেন। আবু উমায়েরের চেহারা মলিন দেখে হযরত উম্মে সুলাইমকে (রা) জিজ্ঞেস করলেন, "কি ব্যাপার, আজ আবু উমায়ের চুপচাপ যে।" তিনি আরজ করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল। আবু উমায়েরের পাখী আজ মরে গেছে। তার সাথে সে খেলা করতো। এ জন্য সে খুব বিষণ্ণ।"

হুজুর (সা) আবু উমায়েরকে (রা) কাছে ডাকলেন এবং নিজের স্নেহের হাত তার মাথায় রেখে বললেন, "হে আবু উমায়ের তোমার পাখির কি হয়েছে।"

আবু উমায়ের (রা) হুজুরের (সা) কথা শুনে হেসে দিলেন। অতপর খেলা-ধূলায় মশগুল হয়ে পড়লেন। সে সময় থেকে রাসূলের (সা) এই কথা প্রবাদ বাক্য হিসেবে পরিগণিত হতে লাগলো।

সহীহ মুসলিমে আছে, হযরত আবু তালহার (রা) প্রিয় পুত্র আবু উমায়ের অল্প বয়সে ইন্তেকাল করলো। আবু তালহা সে সময় বাড়ি ছিলেন না। উম্মে সুলাইম (রা) অত্যন্ত ধৈর্য ও স্থৈর্যের সাথে কাজ করলেন এবং আবু তালাহাকে (রা) এই খবর না দেয়ার জন্য বাড়ির সবাইকে বলে দিলেন। রাতে হযরত আবু তালহা (রা) বাড়ি এলেন। উম্মে সুলাইম (রা) তাঁকে খাবার খাওয়ালেন এবং তিনি অত্যন্ত ইতমিনানের সঙ্গে বিছানায় শুলেন। রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত হলো। তখন উম্মে সুলাইম (রা) তাঁকে সম্বোধন করে বললেন, "তোমাকে যদি কোন বস্তু ধার দেয়া হয় এবং পরে তা ফেরত চাওয়া হয়, তাহলে তুমি কি তা দিতে অস্বীকার করবে?"

আবু তালহা (রা) জবাব দিলেন ঃ "অবশ্যই নয়। এ ধরনের কাজ করাতো ইনসাফ বিরোধী।"

উম্মে সুলাইম (রা) বললেন ঃ "তাহলে তোমাকে তোমার পুত্রের ব্যাপারেও ধৈর্য ধরতে হবে। আল্লাহ তায়ালা নিজের আমানত ফেরত নিয়েছেন।"

হযরত আবু তালহা (রা) "ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন" পড়লেন এবং বললেন যে ব্যাপারটি আগে বলোনি কেন।

সকালে ঘুম থেকে উঠে রাসূলে আকরামের (সা) খিদমতে হাজির হলেন এবং সকল ঘটনা বর্ণনা করলেন। হুজুর (সা) বললেন ঃ "গতরাতে আল্লাহ তায়ালা তোমাকে অনেক বরকত দিয়েছেন।" অথবা অন্য রেওয়ায়াত অনুযায়ী হুজুর (সা) এই বলে দোয়া করেছিলেন যে, আল্লাহ তোমাকে এবং উম্মে সুলাইমকে (রা) আবু উমায়েরের বদল নিয়ামত দান করুন। হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন আবি তালহা (রা) এই ঘটনার পর জন্ম নিয়েছিলেন।

নামাযের প্রতি হযরত আবু তালহার (রা) সীমাহীন আকর্ষণ ছিল। এত গভীরভাবে নামায পড়তেন যে, দুনিয়া ও তার সম্পর্কে কোন খবর থাকতো না। মুয়াত্তায়ে ইমাম মালিকে আছে যে, একদিন বাগানে নামায পড়ছিলেন। একটি পাখী একটি ডাল থেকে উড়ে এসে তাঁর মাথার চারপাশে চক্কর মারতে লাগলো। বাগান ছিল খুব ঘন। পাখিটি বাইরে বেরোবার রাস্তা পাচ্ছিল না। হযরত আবু তালহার (রা) নামাযে বিপত্তি ঘটলো। তিনি ক' রাকায়াত নামায পড়েছেন তা ভুলে গেলেন। নামায শেষ করে তিনি সোজা রাসূলের (সা) নিকট পৌঁছলেন এবং ঘটনা বর্ণনা করে আরজ করলেন যে, এই বাগানের কারণে আমার নামাযে বিপত্তি ঘটলো। এ জন্য তা আমি আল্লাহর পথে ওয়াক্ফ করে দিচ্ছি। মোটকথা, হযরত আবু তালহা (রা) ছিলেন মহান চরিত্রের আধার বিশেষ।

হযরত হারিছ (রা) বিন রাবয়ী

রহমতে আলম (সা) একবার কোন এক মরুপ্রান্তরে সফর করছিলেন। তখন রাত। তাঁর চারপাশে ছিলেন এক বিরাট সংখ্যক সাহাবী। সফরকালে হুজুর (সা) কি যেন ধারণা করলেন এবং সাহাবাদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

"হে মানুষেরা! পানি সন্ধান করো। নচেৎ সকালে শুকনো ঠোটে জাগবে"।

হুজুরের (সা) ইরশাদ শুনে লোকেরা চমকে উঠলেন এবং পানির সন্ধানে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়লেন। কিন্তু জনৈক ব্যক্তির প্রিয় নবীকে (সা) একা ফেলে যাওয়া সহ্য হলো না। তিনি হুজুরের (সা) সওয়ারীর সাথে রইলেন। বিশ্ব নবী (সা) উটের ওপর স্বপ্নে বিভোর ছিলেন। তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় তিনি যখন কোন দিকে ঝুকে পড়তেন তখন সেই ব্যক্তি বিদ্যুৎ গতিতে সামনে অগ্রসর হয়ে ঠেস দিতেন। একবার গভীর তন্দ্রায় নিমগ্ন হলেন এবং কোথায়ও পড়ে যাওয়ার আশংকা দেখা দিল। সে সময় তিনি অগ্রসর হয়ে পূর্ণশক্তি দিয়ে রাসূলকে (সা) পাহারা দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি জেগে গেলেন এবং বললেন ঃ "তুমি কে?" তিনি নিজের নাম বললেন। এ সময় হুজুর (সা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ "কখন থেকে আমার সঙ্গে রয়েছ? আরজ করলেন ঃ সূর্য ডোবার সময় থেকে। সারওয়ারে আলম (সা) তাঁর জবাব শুনে খুশী হলেন এবং এই বলে দোয়া দিলেন ঃ "আল্লাহ তোমাকে রক্ষা করুন, যেভাবে তুমি তার রাসূলকে (সা) রক্ষা করেছ।"

রাসূলের (সা) এই সাহাবী যাঁর নিষ্ঠাপূর্ণ কাজকে রাসূলে আকরাম (সা) প্রশংসা করেছিলেন এবং যাঁর জন্য রাসূলের (সা) যবান থেকে "আল্লাহ তোমাকে হেফাজত করুন" বাক্য বের হয়েছিলো, তিনি ছিলেন হযরত হারিছ (রা) বিন রাবয়ী আনসারী। ইতিহাসে তিনি আবু কাতাদাহ কুনিয়াতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন।

সাইয়েদেনা আবু কাতাদাহ হারিছ (রা) বিন রাবয়ীর সম্পর্ক খাজরাজ গোত্রের শাখা বনু সালমার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল। তাঁর নসবনামা হলো ঃ হারিছ বিন রাবয়ী বিন বালদামা বিন খান্নাস বিন সিনান বিন উবায়েদ বিন আদি বিন গানাম বিন কায়াব বিন সালমা বিন যায়েদ বিন জাছাম বিন খাজরাজ।

মাতার নাম ছিল কাবশা বিনতে মাজহার। তিনিও বনু সালমার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন।

রহমতে আলম (সা) একবার হযরত আবু কাতাদাহকে (রা) সর্বোত্তম অশ্বারোহী হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন। এ জন্য তিনি "রাসূলের অশ্বারোহী"র উপাধিতে মশহুর হয়ে যান। নবুওয়াতের দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় বছরে তিনি মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন। আনসারদের মধ্যে যখন ইসলামের সূত্রপাত ঘটলো তখন তিনি অল্প বয়স্ক ছিলেন। তিনি অল্প বয়স অবস্থাতেই দ্বিতীয় বাইয়াতে উকবার পর কোন এক সময় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এমনিভাবে আনসারদের অগ্রগামী মুসলমানদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য তার ঘটেছিল। বয়স কম হওয়ার কারণে বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে পারেননি। তারপর ওহোদ, খন্দক, হুনাইন প্রভৃতি সকল যুদ্ধে বীরত্বের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন। তিনি একজন ভাল অশ্বারোহী ছিলেন এবং নেযাবাজী ও তরবারী চালনাতেও পূর্ণ মাত্রার পারদর্শীতা রাখতেন। রাসূলের (সা) যুগটি ছিল তাঁর পূর্ণ যৌবনের সময়। যৌবনের গরম রক্ত তাঁর শিরা-উপশিরাতে প্রচণ্ড গতি এনে দিয়েছিল এবং আনসারদের মধ্যে তিনি একজন ব্যূহ ভঙ্গকারী বাহাদুর হিসেবে পরিচিত ছিলেন। মহানবীর (সা) প্রতি ছিল গভীর ভালবাসা। এ জন্য হুজুরের (সা) সামান্যতম ইঙ্গিতেই সবসময় জীবনের বাজী লাগিয়ে দিতে প্রস্তুত থাকতেন।

৬ষ্ঠ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে আইনিয়া বিন হাসান ফাযারী ৪০ জন সওয়ারী সঙ্গে নিয়ে মদীনা মুনাওয়ারা থেকে কয়েকমাইল দূরে (জিকারদ পুকুরের নিকট) গাবাহ নামক চারণভূমিতে হঠাৎ করে হামলা চালালো এবং উটের দলের রাখাল হযরত যার (রা) বিন আবু যার গিফারীকে (রা) শহীদ করে হুজুরের ২০টি দুধালো উটনী হাঁকিয়ে নিয়ে চললো। ঘটনাক্রমে হযরত সালমা (রা) ইবনুল আকওয়া এবং হুজুরের গোলাম হযরত রাবাহ (রা) ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। হযরত সালমা (রা) বিদ্যুতের গতি সম্পন্ন একজন দ্রুতগামী মানুষ ছিলেন। তিনি এই ঘটনা দেখলেন। দীনের প্রতি মর্যাদাবোধ তাঁকে আগুনের শিখায় পরিণত করলো। প্রথমত তিনি নিকটবর্তী একটি টিলার ওপর আরোহণ করে মদীনার দিকে মুখ করে "ইয়া সাবাহাহ"—এই ধ্বনি তুললেন। (আরববাসী মুসিবতের সময় সাহায্য প্রার্থনার জন্য এই ধ্বনি দিতো। তার অর্থ হলো, "হে সকালবেলার মুসিবত।") অতপর হযরত রাবাহকে (রা) ঘোড়ার ওপর সওয়ার করিয়ে হুজুরকে (সা) দেয়ার জন্য মদীনা রওয়ানা করিয়ে দিলেন এবং নিজে একা বৃক্ষের আড়াল থেকে সেই হামলাকারীদের ওপর পাথর এবং তীরের বন্যা

বইয়ে দিল। এমনকি তারা উটনীগুলো রেখে পালিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর সাহায্য নিয়ে পুনরায় এসে উপস্থিত হলো। হযরত সালমা (রা) মুকাবিলায় অটল রলেন। কিন্তু তাঁর জীবন হুমকীর সম্মুখীন হয়ে পড়লো। ওদিকে এই ঘটনার খবর পেতেই বিশ্ব নবী (সা) মুসলমানদেরকে লুটেরাদের পিছু ধাওয়া করার নির্দেশ দিলেন। হুজুরের (সা) নির্দেশ পেতেই হযরত আবু কাতাদাহ(রা), মিকদাদ (রা) ইবনুল আসওয়াদ কিন্দী এবং মুহরিয বিন নাদলাল মুলাক্কাব বিহ আখরাম আসদী (রা) ঘোড়ার ওপর সওয়ার হয়ে বদ্যুৎ গতিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছলেন। বনু ফাযারার লুটেরারা মুসলমান অশ্বারোহীদেরকে দেখে পালিয়ে গেল। কিন্তু হযরত আখরাম (রা) তাদের পেছনে ধাওয়া করলেন। হযরত সালমা (রা) তাঁর ঘোড়ার বাগডোর ধরে থামালেন। তিনি বললেন, তাড়াতাড়ি করো না। রাসূলুল্লাহ (সা) এবং সাহাবীদের আগমন পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ কর। কিন্তু হযরত আখরাম (রা) তাঁর কথা শুনলেন না এবং বীরত্বের আবেগে সামনে এগিয়ে গেলেন। আবদুর রহমান ফাযারী তাঁকে বাধা দিলো। আখরাম (রা) তার ওপর নেযা দিয়ে পূর্ণভাবে হামলা করলেন। তার ঘোড়া মারা গেল। কিন্তু সে নিজে বেঁচে গেল এবং নিজের নেযা দিয়ে হযরত আখরামের (রা) বুক ছিদ্র করে ফেললো। তিনি শহীদ হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। সে এই সময় তাঁর ঘোড়ার ওপর সওয়ার হলো। ঠিক সেই সময় হযরত আবু কাতাদাহ (রা) নিজের ঘোড়া দৌড়িয়ে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। হযরত আখরামকে (রা) রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে পড়ে থাকতে দেখে তাঁর চোখ দিয়ে রক্ত বের হয়ে এলো। নিজের বর্শা দিয়ে আবদুর রহমানের ওপর এমন হামলা করলেন। মুহূর্তের মধ্যে সে জাহান্নামে প্রবেশ করলো। এমনিভাবে তিনি পলকের মধ্যে হযরত আখরামের (রা) প্রতিশোধ নিলেন। ইত্যবসরে হযরত সালমা (রা) এবং মিকদাদও (রা) তাঁর সঙ্গে এসে মিলিত হলেন এবং এই তিন আত্মোৎসর্গকারী লুটেরাদেরকে নিজেদের বর্শার তীক্ষ্ণ প্রান্তে এনে ফেললো। যখন হুজুরের (সা) প্রেরিত আরো কিছু সওয়ারও পৌঁছে গেল তখন সেই দুর্বৃত্ত লুটেরারা পালিয়ে গেল। কিন্তু ইসলামের অশ্বারোহীরা সূর্য ডোবা পর্যন্ত তাদের পেছনে ধাওয়া করা অব্যাহত রাখলেন। রাতের অন্ধকার বিস্তারের পর তাঁরা যখন জিকারদ পৌঁছলেন তখন সেখানে বিশ্ব নবীকে (সা) পাঁচশ' সশস্ত্র জান নিছারের সঙ্গে উপস্থিত পেলেন। হুজুর (সা) সমগ্র ঘটনা শুনে হযরত আবু কাতাদাহ (রা), সালমা (রা) ইবনুল আকওয়া, মিকদাদ (রা) এবং অন্যান্য মুজাহিদের জানবাজীর প্রশংসা করলেন। হযরত আবু কাতাদাহর (রা) ব্যাপারে বললেন, "আবু কাতাদাহ আজ সর্বোত্তম সওয়ার ছিলেন।"

৬ষ্ঠ হিজরীর জিলকদ মাসে হযরত আবু কাতাদাহর (রা) বাইয়াতে রিদওয়ানে শরীক হওয়ার সৌভাগ্য লাভ ঘটে এবং তিনি সেই পবিত্র দলের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যান যাদেরকে আল্লাহ তায়ালা আসহাবুশ শাজারাহ নামে ডেকেছেন এবং স্পষ্ট ভাষায় নিজের সন্তুষ্টি ও জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন।

অষ্টম হিজরীর শা'বান মাসে মহানবী (সা) খবর পেলেন যে বনু গাতফানের লোকজন নাজদের খুজরাহ নামক স্থানে বৈঠক করেছে। তারা মদীনার ওপর হামলার পরিকল্পনা আটছে। বনু গাতফান ছিল পেশাদার লুটেরা। এর পূর্বেও তারা কয়েকবার মদীনার উপকণ্ঠে অতর্কিতে হামলা চালিয়েছে। হুজুর (সা) পনেরো ব্যক্তির একটি দল দিয়ে হযরত আবু কাতাদাহকে (রা) তাদের শাস্তি দানের জন্য প্রেরণ করলেন। হযরত আবু কাতাদাহ (রা) মদীনা থেকে খুজরাহ পর্যন্ত অত্যন্ত সন্তর্পণে এমন সর্তকতার সঙ্গে অতিক্রম করলেন যে দুশমনের কান পর্যন্তও সে খবর পৌছলো না। যখন তিনি হঠাৎ করে গাতফানী দুর্বৃত্তদের মাথার ওপর গিয়ে পৌছলেন তখন তারা বিচলিত হয়ে পড়লো। কিছু লোক বাধা দানের চেষ্টা করলো। কিন্তু শীঘ্রই সাহস হারিয়ে ভেগে গেল। হযরত আবু কাতাদাহ (রা) প্রচুর গণিমতের মাল পেলেন। তার মধ্যে অনেক কয়েদী ছাড়া দু'হাজার বকরী এবং দু'শ উটও ছিল। তিনি তার এক-পঞ্চমাংশ বের করে অবশিষ্ট সব মুজাহিদদের মধ্যে সমান সমান বন্টন করে দিলেন। এই ঘটনাকে সারিয়্যায়ে মাহারিব বলে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। দু'সপ্তাহের মধ্যে এই অভিযান থেকে ফারেগ হয়ে হযরত আবু কাতাদাহ (রা) মদীনা পৌছলেন। হুজুর (সা) কিছুদিন পর তাঁকে আট ব্যক্তির একটি গ্রুপ দিয়ে বাতেন আখামের দিকে রওয়ানা করে দিলেন। স্থানটি মদীনা থেকে তিন মনযিল দূরে মক্কার রাস্তায় অবস্থিত। সে সময় হুজুর (সা) মক্কায় তাওহীদের ঝাণ্ডা উত্তোলনের মজবুত ইচ্ছা করে ফেলেছিলেন। কিন্তু তিনি মক্কার মুশরিকদেরকে হঠাৎ করে ঘিরে ফেলতে চেয়েছিলেন। এই অভিযান প্রেরণের লক্ষ্যও তাই ছিল। যাতে লোকজনের দৃষ্টি এদিকেই থাকে এবং মক্কায় সামরিক অভিযানের ব্যাপারে কেউ ধারণাও করতে না পারে। হযরত আবু কাতাদাহ (রা) নিজের দলসহ জি খাশাব নামক স্থানে পৌছলেন। এ সময় তাঁরা খবর পেলেন যে, বিশ্ব নবী (সা) হকের প্রতি জীবন উৎসর্গকারীদের একটি সৈন্যবাহিনীসহ মক্কার দিকে রওয়ানা হয়ে গেছেন। সুতরাং হযরত আবু কাতাদাহ (রা) সঙ্গীদেরসহ সুফিয়া নামক স্থানে হুজুরের (সা) খিদমতে পৌছে গেলেন। এমনিভাবে তাঁর সেই দশ হাজার পবিত্র নফসের মধ্যে শামিল হওয়ার মর্যাদা লাভ ঘটলো যারা আরবের কেন্দ্র মক্কায়

ইসলামের ঝাণ্ডা বুলন্দ করে সমগ্র আরবে হকের কথা জারী করে দিয়েছিলেন।

মক্কা বিজয়ের পর অষ্টম হিজরীর শওয়াল মাসে হুনাইনের রক্তাক্ত যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধের শুরুতে বনু হাওয়াযিনের পারদর্শী তীরন্দাজরা নিজেদের খাত থেকে এমন প্রচণ্ডভাবে তীর বর্ষণ শুরু করলো যে, মুসলমানদের ব্যূহ বিশৃংখল হয়ে পড়লো এবং ওহোদের যুদ্ধের দৃশ্যের অবতারণা হয়ে গেল। সেই নাযুক মুহূর্তে রহমতে আলম (সা) ধৈর্য ও স্থৈর্যের অটল পাহাড়ের মত যুদ্ধের ময়দানে দাঁড়িয়ে রইলেন। শুধুমাত্র কতিপয় জান নিছার তাঁর নিকট উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন কাতাদাহ (রা)। তিনি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধের ময়দানে বীরত্ব প্রদর্শন করতে থাকেন। যুদ্ধে এমন এক সময় এলো যে, একেকজন মুসলমান ও মুশরিক পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়লো। অন্য একজন মুশরিক পেছন দিক থেকে মুসলমানদের ওপর হামলা করতে চাইলো। হযরত আবু কাতাদাহ তৎক্ষণাৎ বিদ্যুত বেগে অগ্রসর হলেন এবং সেই মুশরিকের ওপর তরবারী দিয়ে এমন এক কোপ মারলেন যে তার হাত কেটে দূরে গিয়ে পড়লো। লোকটি খুব তেজস্বী ও শক্তিশালী ছিল। অন্য হাত দিয়ে হযরত আবু কাতাদাহকে জাপটে ধরলো এবং কাহিল করে ফেললো। কিন্তু আবু কাতাদাহ (রা) ছিলেন খুব হিম্মতওয়ালা। সুযোগ পেয়ে নিজের খ র তার পেটে ঢুকিয়ে জাহান্নামে প্রেরণ করলেন এবং নিজে অন্য দিকে চলে গেলেন। এই যুদ্ধে অংশগ্রহণরত মক্কার এক ব্যক্তি দেখলো যে আবু কাতাদাহ (রা) সরে গেছে তখন সে নিহত মুশরিকের সামান না নিয়ে নিজের কব্জায় নিয়ে নিল। ইত্যবসরে অন্যমুসলমানরাও উল্টে হামলা চালালো এবং মুশরিকদেরকে বর্শা ও তরবারীর খোরাক বানিয়ে ছাড়লো। শীঘ্রই মুশরিকরা পরাজয়ের স্বাদ গ্রহণে বাধ্য হলো এবং আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদেরকে সফল ও বিজয়ী করলেন। যুদ্ধের পর রাসূলে আকরাম (সা) ঘোষণা দিলেন যে, কোন মুসলমান যদি কোন মুশরিককে হত্যা করে থাকে তাহলে সে যেন তার প্রমাণ পেশ করে। তাহলে নিহত ব্যক্তির সামান তাকেই দেয়া হবে। হযরত আবু কাতাদাহ (রা) উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, "আমি একজন মুশরিককে হত্যা করেছি। কে আছ যে আমার কথার সত্যতা স্বীকার করবে।" লোকজন চুপ মেরে রইলো। তিনি তিনবার এই ঘোষণা দিলেন। কিন্তু কেউই কোন জবাব দিল না। বিশ্ব নবী (সা) বললেন ঃ

"আবু কাতাদাহ (রা) কি ব্যাপার?" তিনি সমগ্র কাহিনী বর্ণনা করলেন। এ সময় এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়ালো এবং আরজ করলো "হে আল্লাহর রাসূল। সেই

সামান আমার নিকট আছে। কিন্তু আবু কাতাদাহকে রাজী করিয়ে তা আমাকে দিইয়ে দিন।"

হযরত আবু বকর সিদ্দীকও (রা) সে সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন ঃ

"এটা ইনসাফের কথা নয়। কারণ, মুশরিককে মারবে আল্লাহর একজন বাঘ। আর তার মালের ওপর কব্জা জমিয়ে রাখবে মক্কার একজন কুরাইশী।"

রহমতে আলম (সা) হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) রায়ের সঙ্গে ঐকমত্য পোষণ করলেন এবং সেই সামান আবু কাতাদাহকে (রা) দেয়ালেন। তিনি তা বিক্রয় করে বনু সালমার মহল্লায় একটি বাগান ক্রয় করলেন।

একাদশ হিজরীতে মহানবী (সা) ওফাত পেলেন। তখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) খলিফা নির্বাচিত হলেন। এ সময় হঠাৎ করে সমগ্র আরবে ধর্মদ্রোহিতার ফিতনা ছড়িয়ে পড়লো। সিদ্দীকে আকবর (রা) এই ফিতনা নির্মূলের জন্য বিভিন্ন এলাকায় ১১টি বাহিনী প্রেরণ করলেন। হযরত আবু কাতাদাহ (রা) সেই বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলেন। এই বাহিনীর নেতৃত্ব করছিলেন হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ। হযরত খালিদ (রা) প্রথমে তোলায়হা বিন খুয়ায়েলদ আসাদীকে পরাজিত করলেন। তারপর বাতাহ পৌছে মালিক বিন নুয়াইরাহ ইয়ারবুয়ীর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন। কিছুদিন পূর্বে মালিক সাজাহ বিনতে হারিছকে (মিথ্যা নবুওয়াতের দাবীদার) সমর্থন করেছিল। কিন্তু পরে সে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। হযরত খালিদ (রা) মুসলমানদের একটি দল এলাকার বিভিন্ন গ্রামের দিকে প্রেরণ করেন এবং তাদেরকে এই বলে হেদায়াত দেন যে, তারা যে বস্তিতে পৌছবে সেখানে প্রথমে আযান দেবে। জবাবে যদি সেই বস্তির মানুষও আযান দেয় তাহলে তাদের সাথে কোন সংঘর্ষে লিপ্ত হবে না। যদি আযানের জবাব না দেয় অথবা তোমাদের বাধা দেয় তাহলে তাদের সাথে যুদ্ধ করবে।

এই দল টহল দিতে দিতে মালিক বিন নুয়াইরাহর বস্তির নিকটে পৌছলো এবং আযান দিলো। এ সময় বস্তিবাসীর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে তাদের মধ্যে মতপার্থক্য হয়ে গেল। কিছু মানুষ বলতে লাগলো যে, জবাবে আমরা আযানের আওয়াজ শুনেছি। অন্যরা বলছিল যে, বস্তিবাসীরা কোন জবাব দেয়নি। সুতরাং তারা মালিক বিন নুয়াইরাহ এবং তার কতিপয় সাথীকে গ্রেফতার করে ইসলামী বাহিনীতে পৌছে দিল। হযরত খালিদের (রা) সামনে ব্যাপারটি পেশ করা হলে তিনি তাদেরকে হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিলেন

এবং আগামীকাল সকালে তাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে বলে উল্লেখ করলেন। রাতে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পড়েছিল। হযরত খালিদ (রা) সৈন্যবাহিনীতে ঘোষণা দিয়ালেন যে, কয়েদীদেরকে তাপে রাখো। কতিপয় আবর গোত্রের ভাষায় এই বাক্যের অর্থ কয়েদীদেরকে হত্যা করো—এও হতো। যশহুর সাহাবী হযরত জিরার (রা) বিন আযওয়ার এই অর্থেই বুঝেছিলেন এবং মালিক বিন নুয়াইরাহ এবং তাঁর সঙ্গীদেরকে হত্যা করে ফেললেন। হযরত আবু কাতাদাহর (রা) নিকট এই হত্যাকাণ্ড খুবই অসহনীয় ব্যাপার ছিল। তাঁর ধারণা ছিল যে, মালিক বিন নুয়াইরাহর বস্তি থেকে আযানের আওয়াজ এসেছিল। এ জন্য তিনি ক্ষমা পাওয়ার যোগ্য ছিলেন। সুতরাং তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে সোজা সিদ্দীকে আকবারের (রা) খিদমতে মদীনা পৌঁছলেন এবং খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলেন যে, তিনি মালিক বিন নুয়াইরাহকে হত্যা করিয়েছেন।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) হযরত খালিদকে (রা) মদীনায় ডেকে জবাব তলব করলেন। তিনি সকল ঘটনা বর্ণনা করলেন। সিদ্দীকে আকবার (রা) তাঁর ওজর কবুল করে নিলেন। এ সময় হযরত ওমর ফারুক (রা) হযরত কাতাদাহর (রা) বক্তব্য সমর্থন করলেন এবং হযরত খালিদকে (রা) অপসারণের পরামর্শ দিলেন। কিন্তু হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) একথা বলে মুয়ামিলা শেষ করে দিলেন যে, যে তরবারী আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের ওপর নিপতিত করেছেন তা আমি খাপে ঢুকাতে পারবো না।

হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) খিলাফতকালের পর হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুর খিলাফতকালেই হযরত আবু কাতাদাহর (রা) নাম স্পষ্টভাবে সামনে এসেছে। হযরত ওমর ফারুকের (রা) আমলে কোন জিহাদে কি তিনি অংশ নিয়েছিলেন? চরিতগ্রন্থসমূহ এ ব্যাপারে নীরব। সম্ভবত এ সময়ে তিনি মদীনায় চুপচাপ কাটিয়ে দেন। কেননা সাহাবায়ে কিরামের (রা) একটি দল এমন ছিলেন যারা আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওমর ফারুকের (রা) ইঙ্গিতে ধৈর্যের সাথে মদীনায় অবস্থান করছিলেন। হযরত আলী (রা) হযরত আবু কাতাদাহকে (রা) মক্কার আমীর পদে অধিষ্ঠিত করান। কিন্তু কিছুদিনের জন্য তার স্থলে কাছাম বিন আব্বাসকে (রা) এই পদ সোপর্দ করেন। উষ্ট্র ও সিফ্‌ফীনের যুদ্ধে হযরত আলীর (রা) পক্ষ থেকে হযরত কাতাদাহ (রা) অংশগ্রহণ করেন। ৩৮ হিজরীতে খারেজীদের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। নাহারোয়ান নামক স্থানে খারেজী (তাদের নেতৃত্ব করছিল আবদুল্লাহ বিন ওয়াহাব রাহেবী) এবং হযরত আলীর (রা) বাহিনীর মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ সংঘটিত

হলো। এই যুদ্ধে হযরত আবু কাতাদাহকে (রা) হযরত আলী (রা) পদাতিক বাহিনীর অফিসার বানান। তিনি বীরত্বপূর্ণ হামলার মাধ্যমে খারেজীদের মত প্রচণ্ড যুদ্ধবাজদের মুখ ভেঙ্গে দিয়েছিলেন এবং সে সময়েও দৃঢ় ও অটল রইলেন যখন খারেজীদের অব্যাহত ভয়াবহ হামলায় হযরত আলীর (রা) সৈন্যের সওয়ারীদের পা টলমল করে উঠলো। হযরত আবু কাদাতাহ (রা) কায়েস বিন সায়াদ (রা), কায়েস (রা) বিন মাবিয়া এবং তাঁদের মত অন্য জানবাজদের আপ্রাণ প্রচেষ্টায় পরিস্থিতি অনুকূলে এলো। প্রচণ্ডযুদ্ধের পর খারেজী বাহিনী নাস্তানাবুদ হয়ে গেল।

কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত আবু কাতাদাহ (রা) হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুর খিলাফতকালে (৪০ হিজরী) ওফাত পান। কিন্তু ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন, তিনি ৫০ ও ৬০ হিজরীর মধ্যবর্তী কোন সময়ে পরকালে যাত্রা করেন। আল্লামা ইবনে সায়াদ (র) লিখেছেন, মৃত্যুকালে তাঁর চার পুত্র ছিলেন। তাঁরা হলেন ঃ আবদুল্লাহ, মা'বাদ, আবদুর রহমান ও ছাবিত। তাঁর স্ত্রীর নাম হলো সালাফাহ (রা)। তিনি ছিলেন মশহুর সাহাবী হযরত বারা' (রা) বিন মা'রুর আনসারীর কন্যা। তিনি নিজেও সাহাবীয়া ছিলেন। হযরত আবু কাতাদাহ মহান সাহাবীদের মধ্যে পরিগণিত হয়ে থাকেন। তাঁর থেকে ১৭০টি হাদিস বর্ণিত আছে।

মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে আছে, হযরত আবু কাতাদাহ (রা) একবার জনৈক ব্যক্তিকে করজেহাসানা দিয়েছিলেন। নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হওয়ার পর নিজের দেয়া অর্থ ফেরত চাইতে গেলেন কিন্তু সেই ব্যক্তি লুকিয়ে রইলেন। কয়েকবার এ রকম ঘটলো। একদিন সেই ব্যক্তি বাড়ি ছিল। তিনি তাকে ডাকলেন। সে চুপ মেরে রইলো। ইত্যবসরে তার শিশু পুত্র বাইরে এলো। তাকে জিজ্ঞেসের পর বললো, বাড়িতেই আছেন এবং খাবার খাচ্ছেন।

তিনি উচ্চস্বরে ডাকলেন, "আমি জেনে ফেলেছি যে তুমি খাচ্ছো এখন বের হয়ে এসো। লুকিয়ে থেকে কোন লাভ নেই।"

সেই ব্যক্তি বাইরে এলেন। তখন জিজ্ঞেস করলেন ঃ "আমি বার বার আসছি আর তুমি আমার সাথে সাক্ষাত করতে ইতস্তত করছো। এর কারণ কি?"

তিনি জবাব দিলেন ঃ "নিজের মুসিবতের কথা অন্যের নিকট বলা ঠিক নয়। বাস্তব কথা হলো, আমি নিজের মুসিবতকে দুনিয়া থেকে লুকিয়েছিলাম। আমার অবস্থা এখন খুবই খারাব। পরিবার-পরিজন লালন-পালনও খুব কষ্টের মধ্যে করছি। আমার নিকট যদি কিছু থাকতো তাহলে করজ চুকিয়ে দিতাম।"

হযরত আবু কাতাদাহ (রা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ "আল্লাহর কসম, সত্যি কি তোমার অবস্থা এই?"

তিনি ইতিবাচক জবাব দিলেন। তখন হযরত আবু কাতাদাহর (রা) চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো এবং বললেন ঃ "আল্লাহর কসম, আমি তোমার থেকে কিছু নেবো না। যাও, আমি তোমার ঋণ মাফ করে দিলাম।"

একবার বিশ্ব নবীর (সা) সামনে এক আনসারীর জানাযা আনা হলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, মৃত ব্যক্তির কোন ঋণ নেই তো? লোকজন আরজ করলো, "হে আল্লাহর রাসূল! সে মাত্র দু'দিনার ঋণী।" হুজুর (সা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ "সে মৃত্যুর সময় কোন সম্পত্তি রেখে গেছে কি?" লোকজন নেতিবাচক জবাব দিল। তিনি বললেন, তোমরা নামায পড় (আমি ঋণী ব্যক্তির জানাযার নামায পড়াতে পারি না)।

সঙ্গে সঙ্গে হযরত আবু কাতাদাহ (রা) সামনে অগ্রসর হয়ে আরজ করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! মৃত ব্যক্তির ঋণ যদি আমি আদায় করি, তাহলে কি আপনি নামায পড়াবেন?

হুজুর (সা) বললেন, "হাঁ।"

হযরত আবু কাতাদাহ (রা) সেই সময়ই গিয়ে মরহুম মুসলমানটির ঋণ আদায় করে দিলেন এবং হুজুরকে (সা) এই খবর পাঠালেন। তারপর হুজুরের (সা) ইতমিনান হয়ে গেল এবং তিনি জানাযা তলব করে নামায পড়ালেন।

হযরত আবু কাতাদাহ (রা) একবার নিজের বিবাহিত পুত্রের বাড়ি গেলেন। নামাযের সময় হলে পুত্রবধু ওজুর পানি এনেদিল। ইতিমধ্যে একটি বিড়াল এলো এবং ওজুর পাত্রে মুখ লাগিয়ে পানি পান করতে লাগলো। অন্য কেউ হলে বিড়ালকে মেরে তাড়িয়ে দিত। কিন্তু হযরত আবু কাতাদাহ (রা) পানির পাত্র আরো কাত করে দিলেন। যাতে বিড়াল আসানীর সাথে নিজের পিপাসা নিবৃত্ত করতে পারে। দৃষ্টি ওপরের দিকে ওঠালেন। দেখলেন পুত্র বধু বিস্ময়ের সাথে এই তামাশা দেখছে। তিনি বললেন, "বেটি, এতে বিস্ময়ের কি আছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "বিড়াল অপবিত্র পশু নয়। সেতো ঘরে গমনাগমনকারী পশু।"

তিনি এতো সরল ছিলেন কদাচিৎই চুলে চিরুনী করতেন। অথচ ঘাড় পর্যন্ত চুল ছিল। একবার হুজুর (সা) তাঁর বিশৃংখল চুল দেখে বললেন ঃ

"আবু কাতাদাহ (রা) নিজের চুল ঠিক করো। কেউ যদি তার চুলের খবর নিতে না পারে তাহলে তার উচিত মাথা মুণ্ডিয়ে ফেলা।"

সহীহ বুখারীতে আছে যে, হযরত আবু কাতাদাহ (রা) শিকারে খুব উৎসাহী ছিলেন। একবার মক্কা মুয়াজ্জামার সফরে রাসূলের (সা) সঙ্গে ছিলেন। পথিমধ্যে কতিপয় সাথী নিয়ে বের হয়ে গেলেন এবং নিকটবর্তী একটি পাহাড়ে আরোহণ করলেন। সেখানে একটি বন্য গাধা নজরে এলো। যেহেতু সঙ্গীরা ইহরাম বেঁধে ছিলেন। এ জন্য বর্শা নিয়ে একাই গর্ধভের পিছনে দৌড়ে গেলেন এবং তা শিকার করে ছাড়লেন। কোন সঙ্গীই তা উঠিয়ে আনার ব্যাপারে সাহায্য করলেন না। একাই তা উঠিয়ে আনলেন এবং নিজেই তার গোশত পাকালেন। কিছু সাহাবী এই গোশত খেলেন না আবু কাতাদাহ (রা) হুজুরের (সা) খিদমতে হাজির হয়ে ঘটনা বর্ণনা করলেন। তিনি বললেন ঃ

"তা খাওয়া জায়েজ। তোমরা অবশ্যই খাবে। আল্লাহ তোমাদের জন্যই প্রেরণ করেছেন। থাকলে আমার জন্যও আনো।

হযরত আবু কাতাদাহ (রা) হুজুরের (সা) ইরশাদ শুনে খুব খুশী হলেন এবং শিকারের গোশত তাঁর খিদমতে পেশ করার সৌভাগ্য লাভ করলেন।

হযরত আবু কাতাদাহ (রা) অত্যন্ত বাগ্মীতার ধাঁচে লোকদেরকে নৈতিক শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন, আমি রাসূল (সা) থেকে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি লোকদেরকে পানি পান করাবে, তার উচিত সবার শেষে পান করা। কোন ব্যক্তি যেন ডান হাত দিয়ে ইস্তিনজা না করে এবং পানির পাত্রে ফুঁ না দেয়। এমনিভাবে তিনি মহানবীর (সা) অনেক ইরশাদ উম্মত পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন। যার ওপর আমল করলে দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যাণ হতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জী

১। সহীহ বুখারী

২। সহীহ মুসলিম

৩। মুয়াত্তা ইমাম মালিক

৪। মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বল

৫। ফতুহুশ শাম—ওয়াকেদী

৬। ফতুহুল আজম—ওয়াকেদী

৭। তারিখুল উমাম ওয়াল মুলুক—তাবারী

৮। উসুদুল গাব্বাহ—ইবনে আছির (র)

৯। তারিখুল কামিল—ইবনে আছির (র)

১০। আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া—ইবনে কাছির (র)

১১। আস সিরাতুন নববিয়া—ইবনে হিশাম (র)

১২। তাবাকাত—ইবনে সায়াদ কাতিবুল ওয়াকেদী

১৩। কিতাবুল ইসাবাহ—হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র)

১৪। আল ইস্তিয়াব—হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র)

১৫। রিয়াদুস সালেহীন—ইমাম নববী (র)

১৬। আল আখবারুত তাওয়াল—আবু হানিফা দিনাওয়ারী

১৭। সিরাতুন নবী (সা)—শিবলী নো'মানী (র)

১৮। আসহাবে বদর—কাজী মুহাম্মাদ সুলায়মান মনসুরপুরী

১৯। তরজুমানুস সুন্নাহ—মাওলানা বদরে আলম মিরাঠি

২০। সিরতে কুবরা—আবুল কাসেম রফিক দিলাওয়ারী

২১। আল মাশাহিদ—হাকিম রহমান আলী খান

২২। তাজকিরায়ে হুফফাজে শিয়া—সাইয়েদ আলীনকী

২৩। মুহাজিরিন (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)—শাহ্ মঈনুদ্দীন আহমদ নদবী (র)

২৪। সিয়ারে আনসার (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)—মাওলানা সাঈদ আনসারী

২৫। সিয়ারুস সাহাবা (সপ্তম খণ্ড)—শাহ্ মুঈনুদ্দীন আহমদ (র)

২৬। আল ফারুক—শিবলী নো'মানী (র)

২৭। গোলামানে ইসলাম—মাওলানা সাঈদ আহমদ আকবারাবাদী

২৮। তারিখে ইসলাম—আকবার শাহ খান নজিব আবাদী

২৯। উসওয়ায়ে সাহাবা (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)—মাওলানা আবদুস সালাম নদবী (র)

৩০। তারিখে ইসলাম—শাহ মুঈনুদ্দীন আহমদ নদবী (র)

৩১। হায়াতুস সাহাবা (রা)—মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ কান্দুলভী (র)

৩২। তারিখে ইসলাম—মুন্সী গোলাম কাদের ফসিহ।

আমাদের প্রকাশিত কিছু বই

- তাফহীমুল কুরআন (১-১৯ খণ্ড)
  –সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র.
- তরজমায়ে কুরআন মজীদ (এক খণ্ডে)
  –সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র.
- তাদাব্বুরে কুরআন (১-২ খণ্ড)
  –মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী
- শব্দে শব্দে আল কুরআন (১-১ ৪খণ্ড)
  –মাওলানা মুহাম্মাদ হাবিবুর রহমান
- সহীহ আল বুখারী (১-৬ খণ্ড)
  –আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল বুখারী র.
- সুনান ইবনে মাজা (১-৪ খণ্ড)
  –আবু আবদুল্লাহ ইবনে মাজা র.
- শারহু মাআনিল আছার (তাহাবী শরীফ) (১-২ খণ্ড)
  –ইমাম আবু জাফর আহমাদ আত-তাহাবী র.
- সীরাতে সরওয়ারে আলম (১-২ খণ্ড)
  –সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র.
- মহানবীর সীরাত কোষ
  –খান মোসলেহ উদ্দীন আহমদ
- বিশ্বনবীর মোযেজা
  –ওয়ালিদ আল আযমী
- হযরত আবু বকর রা.
  –মুহাম্মদ হুসাইন হাইকল
- শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ দা'য়ী ইলাল্লাহ
  –মুহাম্মদ নূরুজ্জামান
- মাওলানা মওদূদীকে যেমন দেখেছি
  –অধ্যাপক গোলাম আযম
- মুনশী মেহেরউল্লা ঃ জীবন ও কর্ম
  –নাসির হেলাল